বিজ্ঞানময়মেবৈতদংশমবগচ্ছত

মাসিক পত্র ও সমালোচন

প্রথম খণ্ড।

শ্রীযোগেন্দ্র নাথ সাধু কর্তৃক

যোড়াসাঁকো ৫নং ৺দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি হইতে
প্রকাশিত।

কলিকাতা

১১৩ নং গ্রেষ্ট্রীট অন্নদা প্রেসে

শ্রীঅম্বিকাচরণ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

১২৮৯

মূল্য তিন ৩ টাকা।

সূচীপত্র।

সম্পূর্ণ।

সচিত্র।

"विज्ञानमयमेवैतद्ब्रह्मैषमवगच्छत ।"

১ম ভাগ | কলিকাতা, বৈশাখ ১২৮৯। | ১ম সংখ্যা।

অবতরণিকা।

কালের কি কুটিল গতি! দৈবের কি দুরন্ত শাসন! জগদ্বিখ্যাত নিউটনের যখন জন্মকল্পনাও হয় নাই, তখন ভাস্করাচার্য্য লোকস্থিতির আধারভূত আকর্ষণ-শক্তির আবিষ্কার করিয়া, যে ভারতের মুখকান্তি উজ্জ্বল করিয়াছেন; অথবা তত্ত্ববিদ্ বরিষ্ঠ ইউক্লিড যখন কালের ভবিষ্যদ্গর্ভে নিহিত, তখন আচার্য্যকুল-শিরোমণি গর্গাচার্য্য রেখা গণিতের সূক্ষ্মতম গূঢ়তত্ত্ব সকল উদ্ভাবন করিয়া, যে ভারতের গৌরবপ্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করিয়াছেন; এইরূপে যাহা কিছু আমাদিগের লৌকিক, পারলৌকিক বা আর্থিক, পারমার্থিক সর্ব্বপ্রকার সমুন্নতি সাধন করে, কিম্বা আত্মার ও মনের উৎকর্ষ সম্পাদন করিয়া, ইহকাল ও পরকালের পদবী পরিষ্কৃত করিয়া দেয়, তৎসমস্তই প্রথমতঃ যে ভারতবর্ষে লব্ধোদয় হইয়া, পরে পৌর্ণমাসী চন্দ্রপ্রভার ন্যায় অন্যত্র প্রতিফলিত ও প্রসারিত হইয়াছে; সেই ভারত, আজ এতাদৃশ জঘন্য অবস্থার বশবর্ত্তী হইয়া নিজের সম্পদে চোরের ন্যায়, মলিনমুখ ও মূকভাবাপন্ন হইয়া

নির্জীব পদার্থের ন্যায় নিশ্চেষ্টভাবে রহিয়াছে দেখিয়া, কাহার না হৃদয় ব্যথিত ও প্রাণ আকুল হইয়া থাকে? সহসা ইহার সৌভাগ্যপ্রদীপ নির্ব্বাণ হইয়া, অতি দুরন্ত দুরদৃষ্টতামসী-নিশার আবির্ভাবই বা কেন হইল, ইহা জানিতে, বোধ হয়, সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেরই কৌতূহল উদ্বুদ্ধ হইয়া থাকে।

ভারতের সেই সূর্য্য সেইভাবেই অনন্ত আকাশের এক প্রান্ত হইতে, অপর প্রান্তপর্য্যন্ত বিচরণ করিয়া, যথাক্রমে উদিত ও অস্তমিত হইতেছে। সেই চন্দ্র সেই ভাবেই অপার অসীম গগনসাগর আলোড়ন করিয়া স্নেহ ও প্রীতির প্রতিমার ন্যায় ধীরে ধীরে সঞ্চরণ করিতেছে; সেই বায়ু এখন ও প্রমদা-কর-পরিলালিত সুকোমল বিলাস-ব্যজনের ন্যায় মৃদুমন্দ হিল্লোল-লীলায় আব্রহ্মস্তম্ভপর্য্যন্ত সুশীতল করিতেছে; সেই গ্রহ, সেই নক্ষত্র, সেই ভাবেই সুনির্ম্মল চন্দ্রাতপে বিকসিত মুক্তাপুঞ্জের ন্যায়, বিচিত্রভাবে লীলায়িত হইতেছে; ফলতঃ সেই সমস্তই সেই ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে; তবে কেন ভারত সহসা জ্ঞানহীন দর্শনের ন্যায় এবং সৌজন্যহীন যৌবনের ন্যায় এরূপ শোচনীয় মলিনমূর্ত্তি ধারণ করিল? ইহার কারণ, সহজ বুদ্ধির ও সুদূরব্যবহিত নহে। যে ব্যক্তি যে পরিমাণে আপনাকে অবগত হয়, সে সেই পরিমাণে প্রকৃতির প্রসাদ উপভোগ করিয়া থাকে। সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি পশুগণ আপনাকে জানে না বলিয়াই চিরকাল জঘন্য বনচর অবস্থায় জীবনযাপন করিতেছে। পূর্ব্বে ভারত যতদিন আপনাকে জানিয়াছিল, ততদিন তাহার উন্নতির সীমা ছিল না। সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, হ্রদ, নদ, নদী, সরোবর অথবা সমস্ত প্রকৃতিই ততদিন তাহার পদানত থাকিয়া নিত্য নূতন সুখের ও নূতন নূতন সন্তোষের সমাবেশ বিধান করিয়া দিত। ফলতঃ, আমি কে? কোথা হইতে আসিয়াছি? এই দৃশ্যমান বিশ্বের সহিত আমার সম্পর্ক কি? এই সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ নক্ষত্রাদি আমার জন্য, কি ইহাদের নিজের জন্যই নিত্য নিত্য এই ভাবে বিচরণ করিতেছে? সবিশেষ মন ও বুদ্ধি নিয়োজিত করিয়া, অনুরূপ ধ্যান, ধারণা বা সমাধিসহকারে পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক ইত্যাকার বিচার মীমাংসা দ্বারা আপনার ঐহিক ও আমুষ্মিক সর্ব্বপ্রকার উৎকর্ষবিধানে কৃতযত্ন ও কৃতচিত্ত হইলেই, বোধ হয়, আপনাকে প্রকৃতপক্ষে জানা যাইতে পারে। আবার যে আত্মজ্ঞানে অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ড, অতিক্ষুদ্রবীজগর্ভে অতি প্রকাণ্ড মহীরুহের ন্যায়, অন্তর্নিহিত ও অনুপ্রবিষ্ট আছে, আহার বিহারাদি নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার পরম্পরার ন্যায়, সেই বিশ্বজনীন বৃহৎজ্ঞানের প্রাত্যহিক আলোচনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য ও সৃষ্টির অভিপ্রেত। জ্ঞান বৃদ্ধি হইলেই মন প্রশস্ত হয়; নূতন নূতন বিষয় শিক্ষা করাই প্রশস্ত মনের কার্য্য ও উন্নতির প্রধান উপায়।

যাহার প্রভাবে আপনার সহিত সমুদায় জগৎপ্রপঞ্চের উল্লিখিতরূপ পর্য্যালো-

চনা করিয়া, আত্মার উৎকর্ষ বিধান পূর্ব্বক উন্নতির পর উন্নতি অথবা স্বর্গের পর স্বর্গ সাধিত হয়, প্রাচীন আচার্য্যগণ তাহাকেই সত্ত্বাংশ বা বিজ্ঞান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সবিশেষ চিন্তা করিলেই সুস্পষ্ট প্রতীতি জন্মে যে, উন্নতি ও কর্ত্তব্য এই দুইটি লইয়াই সংসার। অর্থাৎ শরীরের উন্নতি, মনের উন্নতি ও আত্মার উন্নতি এই ত্রিবিধ উন্নতি বিধান করিয়া, ঈশ্বরের প্রতি, আত্মার প্রতি ও আত্মসম অন্যান্য সহজনি বা ভ্রাতৃভাববদ্ধ জীবের প্রতি যুগপৎ এই তিন প্রকারে কর্ত্তব্য সাধন করিলেই, সংসার সিদ্ধ হইয়া থাকে। এই উন্নতি ও উৎকর্ষ, উল্লিখিত বিজ্ঞানচর্চ্চারই অন্তর্নিবিষ্ট। ভারত যেরূপ প্রকৃতির প্রসাদে নদ, হ্রদ, পর্ব্বতাদি সকল বিষয়েই এক প্রকার সর্ব্বলোকোত্তর মহীয়সী সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই ভারতের অধিবাসী আর্য্য মহাপুরুষগণ উল্লিখিত বিজ্ঞান-বলেই সর্ব্ব লোকোত্তর সাধীয়সী উন্নতিসম্পদ অধিকার করেন। ইহার প্রমাণস্বরূপ, এস্থলে একথা বলিলে, বোধ হয়, অত্যুক্তি হইবে না যে, ভারতের হিমালয় প্রভৃতির ন্যায় প্রকৃতিসমৃদ্ধির এবং ভারতের বেদ, পুরাণ, তন্ত্র ও স্মৃতি প্রভৃতি অন্যান্য বহুবিধ সম্পত্তির শতাংশের এক অংশও অন্যদেশের কুত্রাপি লক্ষিত হয় না। ভারতের জ্যোতিষ ও সাহিত্যবিজ্ঞানও বোধ হয়, অদ্বিতীয় ও অনন্যসাধারণ উৎকর্ষবিশিষ্ট। আবার, দর্শন বলিয়া যে সকল শাস্ত্রের বিখ্যাতি আছে, তাহার ত তুলনাই হয় না। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া বর্ত্তমান শতাব্দীর কোন একজন বিদেশীয় প্রকৃত গুণজ্ঞ মহামহোপধ্যায় যথার্থই বলিয়াছেন যে, ভারতের ন্যায় প্রকৃতির প্রথম অনুগৃহীত ও পরম অনুকূলিত দেশেই হিমালয় ও বেদ প্রভৃতির উৎপত্তি ও অবস্থিতির শোভা পায়। আর একজন ভূয়োদর্শী সুবিজ্ঞ মনীষীও বর্ত্তমান গ্রহগণনা-প্রণালীর উৎপত্তিসম্বন্ধে এইরূপে স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন যে, প্রাচীন আর্য্যগণের প্রণীত পুরাণ নামে যে শাস্ত্র প্রচলিত আছে, তাহা হইতেই এই প্রণালী সংগ্রহ হইয়াছে। এইরূপে, প্রধান প্রধান পণ্ডিত বা মনীষিগণের মতে ভারতেই প্রথমে বিজ্ঞানচর্চ্চার পরিণামস্বরূপ সভ্যতার প্রফুল্লজ্যোতি আবির্ভূত ও প্রস্ফুরিত হইয়া, পরে অন্যান্য দেশে বিস্তৃত আকারে প্রতিফলিত হইয়াছে। অথবা পূর্ব্ব গৌরব স্মরণ করিয়া, অনর্থক অভিমান বা আত্মগর্ব্ব প্রকাশ করা কখন প্রকৃত পুরুষত্বের পরিচায়ক হইতে পারে না। তবে, যে জাতি যে পরিমাণে বিজ্ঞান-চর্চ্চায় প্রবৃত্ত, সে জাতি সেই পরিমাণে উন্নত হইয়া থাকে, ইহাই দেখাইবার জন্য আমরা প্রসঙ্গতঃ আমাদের পূর্ব্বগৌরবের কথার অবতারণা করিলাম। আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় এই যে, বর্ত্তমান সময়ে যাঁহারা একবারেই নিতান্ত হস্তপদশূন্যের ন্যায়, এই প্রকার ভাবিয়া হতাশ ও নিরাশ্বাস চিত্তে চতুর্দ্দিক অন্ধকার ও শূন্যময় দেখিয়া, ভারপূর্ণ ভগ্ন নৌকার ন্যায়, একবারেই

বসিয়া পড়িয়াছেন, যে ভারতের অদৃষ্টে আর ইংলণ্ডের ন্যায় সুখ-সৌভাগ্য ঘটিয়া উঠিতেছে না ; পূর্ব্ব গৌরব স্মরণ করাইয়া দিলে, তাহাদের ভগ্ন মগ্ন ও উদ্বিগ্ন অন্তঃকরণে আশা, আশ্বাস ও তৎসহকারে আগ্রহ ও উৎসাহ, অমারজনীর সুনিবিড় গগন-গহ্বরে, সন্ধ্যার দুই একটি তারার ন্যায়, অল্পে অল্পে প্রস্ফুরিত হইতে পারে। ফলতঃ ইংরেজ ও জর্ম্মণ প্রভৃতি উচ্চতম জাতির ন্যায়, আমরাও এক দিন প্রকৃত মানুষ ছিলাম, এই কথা স্মরণ করাইয়া দিলে, ইহা নিতান্তই সম্ভব যে, তৎসমকালেই কিরূপে আমরা ঐরূপ মানুষ হইয়াছিলাম, আবার কিরূপেই বা এখন ঐপ্রকার ঈশ্বরদত্ত সাধারণ-সত্ত্বে বঞ্চিত হইলাম, ইত্যাদি গুহ্য বিষয় অবশ্য সবিশেষ অবগত হইতে, সকলেরই ইচ্ছা ও আগ্রহ জন্মিতে পারে।

এস্থলে, একথা বলিলে, বোধ হয়, অপ্রাসঙ্গিক বা মত্তপ্রলাপ হইবে না যে, যত দিন না বিজ্ঞান বিষয়ে আমাদের চেষ্টা, যত্ন, শ্রদ্ধা ও অনুরাগ হইবে, তত দিন আর আমাদের কোন মতেই ভদ্রতা নাই। বহু দিনের কথা নহে, সুপ্রসিদ্ধ মহামহোপাধ্যায় ভট্টমোক্ষও এই উপলক্ষে সমস্ত ভারতবাসীকে আবর্জ্জিত ও অভিমুখীন করিয়া বলিয়াছেন, ভারতবাসিন্! তোমাদের যাহা আছে, তাহা অন্যের পর্ব্বত। তোমরা যদি এখনও তাহার পরিদর্শন ও আলোচনা কর, তাহা হইলে,তোমাদিগকে আর উচ্ছিষ্টভোজী কাক ও কুক্কুরের ন্যায়, অন্যের দ্বার হইতে ম্লানমুখে প্রসাদমুষ্টি ভিক্ষা করিতে হয় না। বর্ত্তমান জর্ম্মণজাতির যে সহসা এরূপ সৌভাগ্যসম্পদ উদিত হইয়াছে, তজ্জন্য তাহারা কাহারও নিকট ঋণী বা বাধ্য নহে। তাহারা নিজেরই পূর্ব্ব বিষয় আলোচনা করিয়া, ঈদৃশী মহীয়সী সমৃদ্ধি সাধন করিয়াছে। আমাদেরও পূর্ব্ব বিষয়ের কিছুমাত্র অভাব নাই। আমাদের যেমন পৃথিবীর মধ্যে সুবিখ্যাত ও সুপ্রসাদ-সম্পন্ন নদ, হ্রদ ও পর্ব্বত প্রভৃতি বহুল ও বিপুল প্রাকৃতিক বিভব প্রচারিত আছে ; সেইরূপ পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সুমার্জ্জিত ভাষা প্রভৃতিরও সুপ্রচুর অধিকার আছে। স্বল্পমাত্র আয়াস স্বীকার করিলেই আমরাও সে সকলের উন্নতি করিয়া, দশের মধ্যে একজন হইতে পারি। গত বিংশ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালাভাষা যেরূপ পরিপুষ্ট ও মার্জ্জিত হইয়া উঠিয়াছে, পৃথিবীতে কোন দেশের ভাষাই, বোধ হয়, ঈদৃশ স্বল্পসময়ের মধ্যে ঈদৃশী সুসংস্কৃত সমুন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। অথচ দুই এক জন কৃতবিদ্য ব্যক্তির যত্ন ও অধ্যবসায়েই ঐপ্রকার পরিপুষ্টি সাধিত হইয়াছে। ইহাতে সুস্পষ্টই প্রতীতি জন্মিয়া থাকে, যে, দশজনের যত্ন ও অধ্যবসায় একত্র মিলিত হইলে যে, অপেক্ষাকৃত সমধিক সমুন্নতি সংঘটিত হইত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

সম্প্রতি ইহাও নিঃসংশয়ে প্রতিপাদিত হইয়াছে, যে, বাঙ্গালীরা বুদ্ধি বিচারা-

দিতে পৃথিবীর কোন জাতি অপেক্ষাই হীন বা ন্যূনতা-দোষে দূষিত নহে। বর্ত্তমান সময়ে যে ইংরেজ জাতিকে বুদ্ধির রাজা বলিলেও অসঙ্গত ও অতিবাদ-দোষে পতিত হইতে হয় না; বাঙ্গালীরা তাহাদের দেশে গিয়াও অনায়াসে নানা বিষয়ে তাহাদের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া, স্বদেশে কৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাগমন করিতেছেন। অন্ততঃ এই সকল চিন্তা করিলে, আপনা আপনি নির্জ্জীব ও নিঃসত্ত্ব ভাবিয়া, নিরুদ্যম ও হতাশ হইবার কোন অবসরই থাকে না। দুর্ভাগ্যবশতঃ যে ব্যক্তি বিলাত যান, তিনি যেন দেশ ছাড়া হন। তাঁহার যেমন দেশের প্রতি মমতা থাকে না, দেশের লোকেরও তেমনি তাঁহার উদ্দেশে কোন সংবাদ বা সম্বন্ধ থাকে না। পশুপক্ষ্যাদি ইতর প্রাণীর ন্যায় আমরা আপনাকে জানি না বলিয়াই, আমাদের এই প্রকার ব্যভিচার ও বিপরিণাম সংঘটিত হইয়া থাকে। আমরা যদি স্বপ্নেও একবার ভাবিয়া দেখি, যে, এই প্রকার আত্মবিস্মৃতিদোষেই আমাদের বুদ্ধি বিদ্যার লাঘব ঘটিয়া, ধনমান ও কুলমর্য্যাদারও সর্ব্বতোভাবে গৌরব ধ্বংস ও বহুমান হানি হইয়াছে এবং অতঃপরও যদি সাবধান ও সচেতন না হই, তাহা হইলে অধঃপাতের শেষ দশারও শেষ দশা উপস্থিত হইবে; যে দশায় ইতরযোনিতে পর্য্যবসান বা অন্তর্ভাব ঘটিয়া থাকে। পৃথিবীর ইতিহাসই তাহার সুস্পষ্ট সাক্ষ্য দিতেছে; যে জাতি এইরূপ আত্মবিস্মৃত হইয়াছে, সেই জাতিরই ঐরূপ অধঃপতন ও দুরবস্থা ঘটিয়াছে।

সুপ্রসিদ্ধ আর্য্য ঋষিগণ এইপ্রকার উল্লেখ করিয়াছেন, যে, "যোগঃকর্ম্মসু কৌশলং" "যোগো ব্রহ্মাত্মনোরৈক্যম্" সবিশেষ কর্ম্মকুশলতা অথবা পরব্রহ্মে আত্মার নির্ব্বিশেষ ভাবে অধিষ্ঠানই যোগ। যোগাচার্য্য মনীষিগণ এইরূপে ইহার মর্ম্মার্থ উদ্ঘাটন করিয়াছেন, যে, সবিশেষ কার্য্যকুশল হইলে, সাক্ষাৎ ঈশ্বরকেও অনায়াসে জয় করিতে পারা যায়। তাঁহাদের মতে আত্মজ্ঞানই চরম কার্য্য। এই উপলক্ষে তাঁহারা সাহঙ্কারে ইহাও নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, মনুষ্যমাত্রেরই এই প্রকার চিন্তা করা কর্ত্তব্য। এই সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, বায়ু, জল, অগ্নি, আকাশ, সমস্তই জীবের সুখসচ্ছন্দ ও প্রীতিবিধানের জন্যই নির্ম্মিত হইয়াছে। আপনাকে প্রভু বা শক্তিবিশিষ্ট মনে করিয়া, তদনুরূপ উদ্যোগ ও অধ্যবসায় সম্পন্ন হইলেই, অভিলাষানুরূপ ফলসমৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইহারই নাম যোগসিদ্ধ। ইংরেজ, ফরাসীস্ ও জর্ম্মণ প্রভৃতি জাতিসকল বর্ত্তমানে এইপ্রকার যোগসিদ্ধ হইয়াছেন, বলিতে পারা যায়। দুঃখের বিষয়, যে জাতির বুদ্ধিবলে প্রথমে যোগের আবির্ভাব হয়, সেই জাতি এখন আত্মবিস্মৃতি দোষে ইংরেজ প্রভৃতির পদানত হইয়া দাসমধ্যে গণ্য হইয়াছে। কাল! তুমি সকলই করিতে পার!!!

যাহা হউক, মশা মারিতে কামান পাতার ন্যায় এ সকল তত্ত্বকথায় প্রয়োজন

নাই। আমাদের বক্তব্য এই যে শত বৎসরেরও অধিক হইল, ইংরেজজাতি ভারত অধিকার করিয়াছে, সেই শত বৎসরের মধ্যে তাহারা স্বদেশের ও স্বজাতির আরও কতপ্রকার উন্নতি ও সমৃদ্ধি সাধন করিয়াছে, তাহা বলা যায় না; কিন্তু আমরা কেবল কাব্য, নাটক ও নবন্যাসাদি পাঠে বালকের ন্যায় মগ্ন ও মুগ্ধ থাকিয়া, এই শত বৎসর কাল অনর্থক যাপন করিয়াছি; এবং তদ্দারা এই অন্ধ, অলস ও জড়জীবনকে আরও অন্ধ অলস ও জড়িত করিতেছি। ভ্রমেও ভাবি নাই যে, নবন্যাসাদিরসে ও ললিতলবঙ্গলতার পরিশীলনে মজ্জিয়া থাকিলে অহিফেন সেবনের ন্যায় নিদ্রাকর্ষণ হয়; অশ্লীল কবিতা পাঠে মগ্ন থাকিলে, মদ্যপান সুলভ অবসাদ ও মোহ আবির্ভূত হয়; এবং জঘন্য নাটকাদি পাঠে সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিলে, বিষপানবৎ আত্মার মলিনিমা উপস্থিত ও তদ্দারা উৎকর্ষের প্রতিঘাত সমাহিত হইয়া থাকে। যদি এই কাব্য-নাটকাদির আলোচনায় প্রকৃত উপকার ও উন্নতি হইত, তাহা হইলে, ভারত কেন অধঃপাতে যাইবে? ভারতেও ত সকলের অভাব পূর্ব্বে ছিল না। ফলতঃ, সহৃদয় ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেই ইহা অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে, পাশ্চাত্য সভ্যতার চূড়ান্ত নিদর্শনস্বরূপ তাড়িতবার্ত্তা, বাষ্পীয় শকট ও বাষ্পীয় যন্ত্র প্রভৃতি বিশ্বজনীন ব্যাপার সকল একমাত্র বিজ্ঞান চর্চ্চার প্রসাদেই প্রাদুর্ভূত হইয়াছে; নভেল বা নাটকাদি পাঠে কখন ঐরূপ হইতে পারে না; অথবা নভেল ও নাটকাদি পাঠ করিলে, কখন ও তিন দিবসের পথ তিন ঘণ্টায় যাতায়াত হয় না; কিম্বা পাঁচ ক্রোশ ব্যবধানস্থ ব্যক্তিদ্বয়ের মনের কথাও কখন একসেকেণ্ডে পরস্পরের বিদিত হয় না; অথবা সুগভীর জলপ্রবাহে, অতলস্পর্শ নদীহৃদয়ে, দুর্গমকান্তারমধ্যে ও দুর্ভেদ্য গিরিগর্ত্তে ও কখন সুপ্রশস্ত ও সুবিস্তৃত পথ নির্ম্মিত হয় না। এ সকল বিজ্ঞান চর্চ্চারই অবশ্যম্ভাবী ফল বা অবশ্যলভ্য অক্ষয় প্রসাদ।

বর্ত্তমান ভারতবর্ষের এই বিজ্ঞান চর্চ্চার প্রকৃত অবসর উপস্থিত হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, এপর্য্যন্ত কেহই ইহাতে হস্তক্ষেপ করিলেন না। শীঘ্রও যে কেহ হস্তক্ষেপ করিবেন, তাহারও কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া, আমরা ইহার সোপানমাত্র গঠনে কৃতসংকল্প হইয়াছি। আমাদের উদ্দেশ্য এই, অপেক্ষাকৃত কৃতবিদ্য ও কৃতচিত্ত লোকেরা আমাদের এই দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হইয়া ইহাতে প্রবৃত্ত হইতে পারেন। যাহা হউক, আমাদের কল্পিত সোপান বিজ্ঞান-দর্পণ নামে আখ্যাত হইল এবং ইহাতে স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভাষায় গ্রথিত ও সমালোচিত বিজ্ঞানশাস্ত্র সকলের সরল বাঙ্গালায় অনুবাদমাত্র সন্নিবিষ্ট হইবে। সেই অনুবাদিত বিষয় যাহাতে বিশদ বা অনায়াসেই হৃৎপ্রতীত হইতে পারে, তজ্জন্য চিত্রাদি প্রভৃতি উপায় সকলও অবলম্বিত হইবে। এস্থলে ইহা উল্লেখ করা বাহুল্য যে, বিজ্ঞান বিষয়ে

অপেক্ষাকৃত কৃতশ্রম ও কৃতকৃত্য বহুদর্শী ব্যক্তিগণই ইহার লেখক-পদে মনোনীত হইয়াছেন।

উপক্রমণিকা।

বিজ্ঞান এই শব্দটি অনেকেই অনেক সময় ব্যবহার করিয়া থাকেন; কিন্তু উহা-দ্বারা কিরূপ অর্থের প্রতীতি হয়, বোধ হয়, তাহা অনেকেই সম্যকরূপে অবধারণ করিতে পারেন না। হস্তী, অশ্ব, বৃক্ষ, লতা, প্রস্তর ইত্যাদি বলিবামাত্র যেমন বস্তুর চাক্ষুষ অস্তিত্ব প্রযুক্ত লোকের মনে একটি স্পষ্ট ভাবের উদয় হয়, বিজ্ঞান শব্দটি দ্বারা সেরূপ কোন প্রকার সুস্পষ্ট অর্থবোধ হয় না। সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মানুসারে বি পূর্ব্বক জ্ঞাধাতুর উত্তর অনট্ প্রত্যয় করিয়া বিজ্ঞান পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে, বি উপসর্গের অর্থ বিবিধ বা বিরূপ জ্ঞাধাতুর অর্থ জ্ঞান, বোধ বা জানা *। তবেই বুঝিতে হইবে যে বিজ্ঞান শব্দের অর্থ কোন বিষয় বিশেষরূপে জানা। যেমন সূর্য্যকে দেখিবামাত্র উহাকে একটি জ্যোতির্ব্বিশিষ্ট পদার্থ বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু উহা দিবসেই দেখিতে পাওয়া যায়, রাত্রিকালে কেন দেখিতে পাওয়া যায় না, রাত্রি-কালে কোথায় অবস্থান করে এবং কখন কখনই বা (গ্রহণকালে) লুপ্ত হইয়া কোথায় থাকে; এই সকল তথ্যের বিশেষরূপ অনুসন্ধান করাকে বৈজ্ঞানিক গবেষণা কহে এবং যদ্দ্বারা এইরূপ কুতূহল নিবৃত্তি হয় অর্থাৎ এই সকল বিষয়ের বিশেষ বিশেষ তথ্য ও যথার্থ মর্ম্ম সকল জানিতে পারা যায়, তাহাকে বিজ্ঞান অথবা বিজ্ঞানশাস্ত্র কহে। ভূমণ্ডলস্থ যাবতীয় পদার্থেরই এইরূপ বহুবিধ তথ্য আছে; বায়ুসম্বন্ধীয় এই এক প্রধান তথ্য, যে ইহা গুরু কি লঘু? শব্দসম্বন্ধীয় এই যে দুই স্থানে এক সময়ে দুইটি শব্দ করিলে পর, পূর্ব্বোক্ত দুইটি শব্দই এক সময়ে এক ব্যক্তির শ্রুতিগোচর না হইয়া কি জন্য একটির অল্পক্ষণ পরেই অপর শব্দটি শ্রুতিগোচর হয়? দৃষ্টিসম্বন্ধীয় এই যে দুই চক্ষে একটি বস্তুর দুইটি প্রতিবিম্ব পতিত হইলেও দুইটি বস্তু দৃষ্টিগোচর

---

* "মোক্ষে ধীর্জ্ঞানমনাত্র বিজ্ঞানং শিল্পশাস্ত্রয়োঃ" ইত্যমরঃ।

"বিবিধং বিরূপং বা জ্ঞানং" ইতি ভরতঃ।

"মোক্ষে শিল্পে শাস্ত্রে চ যা ধীঃ সা জ্ঞানং বিজ্ঞানঞ্চোচ্যতে"। এষা বিশেষ প্রবৃত্তিঃ, অন্যত্র ঘট-পটাদৌ যা ধীঃ সাঽপি জ্ঞানং বিজ্ঞানঞ্চোচ্যতে এষা সামান্যপ্রবৃত্তিঃ। এবং চিত্রজ্ঞানং ব্যাকরণ জ্ঞানং ঘটপটবিজ্ঞানং ইত্যাদি প্রযুজ্যত এব॥

চতুর্দ্দশানাং বিদ্যানাং ধারণংহি যথার্থতঃ * * * বিজ্ঞানং।

না হইয়া কি জন্য একটিমাত্র বস্তু দেখিতে পাওয়া যায়? সমসংস্থানসম্বন্ধীয় এই যে বৃক্ষ হইতে ফল আকাশমার্গে উত্থিত না হইয়া কি জন্য ভূতলে পতিত হইয়া থাকে? এইরূপ বহুবিধ তথ্যসকল বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও গবেষণা দ্বারা সুস্পষ্টরূপে জানিতে পারা যায়; সুতরাং বিজ্ঞানশাস্ত্রই ভূমণ্ডলস্থ পদার্থপুঞ্জের শক্তি নির্ণয়ের এবং শিল্প-শাস্ত্রাদির উন্নতিসাধনের প্রধান কারণ।

এতদ্দেশে বিজ্ঞানশাস্ত্র বিরল। ইদানীং যাহা কিছু বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ আমরা বাঙ্গালাভাষায় দেখিতে পাই, তাহার অধিকাংশই ইউরোপীয় বিজ্ঞানশাস্ত্র হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। বাঙ্গালাভাষা প্রাপ্তযৌবন নহে, ইহাতে বিস্তর অভাব আছে, তন্মধ্যে বিজ্ঞানাভাবই সমধিক। ইহাকে প্রাপ্তযৌবন ভাষার অন্তর্ভূত করিতে হইলে, বিজ্ঞান শাস্ত্রসমূহ অন্যান্য ভাষা হইতে সংগ্রহ করিয়া, এই ভাষায় প্রকাশ করাই পরামর্শসিদ্ধ; তদ্ব্যতীত অন্য উপায় নাই। বিজ্ঞানবিষয়ে আমরা যাহা কিছু লিখিব বা বলিব, তাহার অধিকাংশই ইউরোপীয় বিজ্ঞানশাস্ত্র হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে বলিয়া জানিতে হইবে। পুরাকালে হিন্দুদিগের মধ্যে কতকগুলি বিজ্ঞান-শাস্ত্র ছিল; সেই সকল শাস্ত্র সংস্কৃতভাষায় লিখিত। তন্মধ্যে যাহা কিছু আমাদিগের প্রশস্ত বলিয়া বোধ হইবে, আমরা সেই সকল বিষয় ও ইহাতে সন্নিবেশিত করিব।

ইদানীং বিজ্ঞান আলোচনার বিশেষ আতিশয্য দৃষ্ট হইতেছে। পুরাকালে বিজ্ঞান আলোচনা ছিল বটে, কিন্তু এতাদৃশ পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয় নাই। পুরাকালের লোকেরা প্রায় দর্শনশাস্ত্র-অধ্যয়নেই কালক্ষেপণ করিতেন; অন্যান্য বিজ্ঞানবিষয়ে তাঁহাদের রুচি অত্যল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে হইলে বিজ্ঞান আলোচনার ইতিহাস অধ্যয়ন করা আবশ্যক এবং সকল অনুসন্ধিৎসুব্যক্তিরই যে তাহা সমধিক আদরনীয় তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

ইউরোপীয়দিগের পুরাবৃত্ত পাঠে আমাদের বিলক্ষণ প্রতীতি হয় যে, পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষ, চীন, গ্রীস, মিসর, কেলডিয়া ইত্যাদি দেশগুলি প্রাচীন। কিন্তু তন্মধ্যে কোনটি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, এ প্রশ্নের সম্যক্ উপযোগী উত্তর একাল পর্য্যন্তও প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই।

অধিকাংশ ইউরোপীয় ইতিহাসবেত্তাদের অভিমত এই যে, গ্রীস সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, কিন্তু গ্রীস প্রাচীন হইলেও যে ভারতবর্ষের নিকট সামাজিক, রাজকীয়, সাহিত্যসম্বন্ধীয় রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার প্রভৃতি অনেক বিষয়ে বহুল শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহাও কতকগুলি বিজ্ঞানবেত্তাদের অনভি-মতে বলা যাইতেছে না। ভারতবর্ষ প্রাচীন হইলেও ইহার ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত সকল দেশীয় প্রবাদ ও উপন্যাসের সহিত এতদূর দৃঢ়সম্লিষ্ট যে তাহা হইতে ঐতিহাসিক

ঘটনাগুলি নির্ব্বাচন করা অতীব দুরূহ। অনেকে অনুমান করেন যে, পৃথু-রাজার সময় হইতে ভারতে বিজ্ঞানচর্চ্চার সূত্রপাত হয়। কিন্তু সে অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। কথিত আছে * যে, পৃথিবী গাভী হইয়াছিলেন, হিমালয় তাহার বৎস, সুমেরু দোহক, এবং অন্যান্য পর্ব্বতগণ উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট রত্ন ও সঞ্জীবনী প্রভৃতি মহৌষধী সকল দোহন করিয়াছিল; ইহার তাৎপর্য্য এই যে, পৃথিবীর কোন স্থানে কি কি উৎকৃষ্ট পদার্থ আছে, পৃথুরাজা তাহার অন্বেষণ করিয়াছিলেন।

এক্ষণে বিজ্ঞান আলোচনার ইতিহাস সংগ্রহ করিতে হইলে আমাদিগকে ইউ-রোপীয় ইতিহাসবেত্তাদের অনুসরণ করিতে হইবে। তাঁহারা বলেন মিসরদেশের অন্তর্গত আলেকজেন্দ্রিয়া নগরে জাদুঘর (1) সংস্থাপন অবধিই পৃথিবীতে বিজ্ঞান-আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। যদিও ইহার বহুকাল পূর্ব্বে মিসাপোটেমিয়াদেশে জ্যোতির্বিদ্যার আলোচনা দৃষ্ট হয়; ফিনিসিয়ায় দর্শনশাস্ত্রের চর্চ্চা, জ্যোতির্জ্ঞান ও চিকিৎসা, কেলডিয়ায় জ্যোতির্ব্বিদ্যা এবং ভারতবর্ষে অঙ্কশাস্ত্রের সমধিক আলো-চনা হইত।

গণিত জ্যোতিষ ও চিকিৎসা শাস্ত্র যে ভারতের কত পুরাতন তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। বেলি নামক জনৈক ফরাশীস পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, ৫০০০ বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুরা যে সমস্ত বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ লিখিয়াছেন তাহার কিয়দংশ অদ্যাপিও প্রাপ্ত হওয়া যায়। বেণ্টলি, কেসেলি, প্লেফেয়ার প্রভৃতি ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ তাঁহার মতের পোষকতা করেন।

রেখাগণিত অঙ্কস্থাপন, জ্যোতিষও চিকিৎসাশাস্ত্র যে সর্ব্বাগ্রে আর্য্য জাতির হৃদয় হইতে আবির্ভূত হইয়াছিল, তাহা ইউরোপ ও আসিয়াবাসীরা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। ইহাও স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে, আরবীয়েরা বিজ্ঞান বিষয়ে ভারতের নিকট সম্পূর্ণ ঋণী, যেহেতু তাহাদের অনেক গ্রন্থেই আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের ও প্রাচীন গ্রন্থের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা ভাস্করাচার্য্যের অপর নাম বাথর্

---

* "গৌর্ভূমিরচলাঃ সর্ব্বে কর্ত্তারোহত্র পয়াংসিচ
ওষধ্যশ্চৈব ভাব্যন্তি রত্নানি বিবিধানি চ।
বৎসশ্চ হিমবানাসীৎ দোগ্ধা মেরুর্মহাগিরিঃ॥"
"যং সর্ব্বশৈলাঃ পরিকল্প্য বৎসং মেরৌ স্থিতে দোগ্ধরি দোহদক্ষে
ভাব্যন্তি রত্নানি মহৌষধীশ্চ পৃথূপদিষ্টাং দুদুহুর্ধরীত্রীং।"

(1) **Museum.**

ও ব্রহ্ম সিদ্ধান্ত বৃহৎসংহিতাকে বিহৎ সিন্দ হিন্দ, এবং চিকিৎসা শাস্ত্র চরককে সরক্, সুশ্রুতকে সশ্রদ্, নিদানকে জিদান প্রভৃতি নামান্তরিত করিয়াছে।

মহাত্মা আর্য্যভট্ট (আরবীয়েরা যাঁহাকে আর্য্য বাহার কহে) স্বীয় দশগীতিকা নামক গণিত গ্রন্থের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন যে, ম্লেচ্ছ জাতিরা তাহার নিকট হইতেই গণিত ও জ্যোতিষের উপদেশ গ্রহণ করে। ঐ কালে ডায়াফেণ্টস্ গ্রীস দেশে গণিতের সূত্রপাত করেন। তারখুল্ হোকমা আরবীয় গ্রন্থে দৃষ্ট হয় যে অলখুবা রেজমী নামক জনৈক গ্রন্থকর্ত্তা ভারতবর্ষীয় গণিত শাস্ত্র আনয়ন করিয়া তাহার অনুবাদ করিয়া আরবীয়দিগকে গণিত বিদ্যার শিক্ষাদান করিয়াছিলেন।

তথাচ উক্ত কোন দেশেই পদ্ধতি ও প্রণালী অনুসারে বিজ্ঞানের শিক্ষা প্রদত্ত হইতনা এবং প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে বৈজ্ঞানিক বিষয় কোনকালেই সপ্রমাণও হয় নাই। কিন্তু আলেকজেন্দ্রিয়ানগরে জাদুঘর সংস্থাপন হওয়া অবধিই ঐ সকল কার্য্য সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। এই জাদুঘরের সংস্থাপনকর্ত্তা টলেমিসোটার (2) এবং তাহার পুত্র ফিলাডেলফস (3)। পূর্ব্বোক্ত মিসরাধিপতি টলেমিসোটারের যত্নে ও রাজব্যয়ে অনেকগুলি হস্তলিখিত পুস্তক ক্রয় করা হয়; তিনি উদ্ভিজ্জ-বিদ্যা এবং প্রাণি-বিদ্যা শিক্ষাদানের জন্য নিজব্যয়ে একটি উদ্যান ও একটি পশুশালা সংস্থাপন করেন, এবং জ্যোতির্ব্বিদ্যা শিক্ষাপ্রদানের জন্য একটি মানমন্দির (4) ও সংস্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি রসায়নবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতগণকে আনয়ন করিয়া আপন ব্যয়ে শিক্ষাভিলাষিদিগকে উক্ত বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করাইতেন। সুতরাং মিসরদেশে জাদুঘর সংস্থাপন অবধিই যে আধুনিক বিজ্ঞান আলোচনার সূত্রপাত হয়, তদ্বিষয়ে অনুমাত্রও সংশয় নাই। লেপলেস ও (5) আমাদের এই মতের অনুমোদন করেন; তিনি বলেন যে, আলেকজেন্দ্রিয়া নগরে জাদুঘর সংস্থাপন অবধিই আধুনিক বিজ্ঞান-আলোচনার সূত্রপাত হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহার বহুকাল পূর্ব্বে ভারতবর্ষে দর্শনশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র, অঙ্কশাস্ত্র ইত্যাদির আলোচনা ছিল। তিনি বলেন যে আলেকজেন্দ্রিয়ানগরে জাদুঘর সংস্থাপন হইবার বহুকাল পূর্ব্বে, গ্রীসদেশে জড়পদার্থের আপেক্ষিকগুরুত্ব (6) আর্কিমিডিস (7) কর্তৃক নির্ণীত হয় এবং ইরাটসথেনিস (8) কর্তৃক পৃথিবী গোলাকার স্থিরীকৃত হয়।

---

(2) Ptolemy Soter.
(3) Philadelphus.
(4) Observatory.
(5) Laplace, a French scientific man.
(6) Specific gravity.
(7) Archimedes. (8) Eratosthenes.

জাতুঘর সংস্থাপন অবধিই যে, মিসরদেশে বিজ্ঞান আলোচনার সূত্রপাত হয়, এমৎ নহে, উক্তসমাজ সংস্থাপনের বহুকাল পুর্ব্বে টলেমী দৃষ্টি-বিজ্ঞানের নিয়মাবলী আবিষ্কার করিয়াছিলেন, এবং চীনদেশে জ্যোতির্বিদ্যার আলোচনা পুর্ব্বাবধিই লক্ষিত হয়। সুতরাং পৃথিবীর প্রাচীনদেশবাসিমাত্রেই দেশের সভ্যতার প্রাক্‌কাল হইতে বিজ্ঞান-অনুশীলনে যে যত্ন করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহারা তদ্বিষয়ের উৎকর্ষ সাধনে সমর্থ হন নাই। যাহাই হউক, মিসরদেশে বিজ্ঞান আলোচনার মূলভিত্তি সংস্থাপনের কিছুকালপরেই আরব জাতিরা সেই ভিত্তিকে আদর্শ করিয়া আপনারা বিজ্ঞান আলোচনায় যত্নবান হয়। খৃষ্টাব্দের ৭৫৩—৭৭৫ বৎসরে অর্থাৎ আলমানসোর (9) নামক বোগদাদ অধিপতির রাজত্বকালে আরবদেশে বিজ্ঞান আলোচনার প্রথম সূত্রপাত হয়। কিন্তু প্রথমেই সে বিষয়ের উন্নতি সাধিত হয় নাই; তখন মাত্র জ্যোতির্বিদ্যা, আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান এবং ব্যবহারশাস্ত্র এই তিনটি বিষয়ের আলোচনা আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু খৃষ্টাব্দের ৮১৩—৮৩২ বৎসরে অর্থাৎ কালিফআলমামুন নামক বোগদাদ অধিপতির রাজত্ব সময়ে আরবদেশে বিজ্ঞানশাস্ত্রালোচনা সমধিক উন্নীত হইয়াছিল। সেই প্রজাবৎসল ভূপতি আরবদেশের যে প্রকার হিতসাধন করিয়াছিলেন তাহা বচনাতীত। তিনি আপন ব্যয়ে অনেক অনেক বিজ্ঞানতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণকে আনয়ন করিয়া প্রজাগণকে আপন ব্যয়ে বিজ্ঞান শিক্ষা প্রদান করাইতেন; তাঁহারই আদেশানুসারে ভূবিজ্ঞান, তরল-সমসংস্থান, দৃষ্টি বিজ্ঞান এই তিনটি, পরীক্ষিত হইয়া পাঠকগণকে শিক্ষাদান করা হইত। সেই সময় হইতেই পাঠকেরা জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি, বীজগণিত, পাটীগণিত প্রভৃতি শাস্ত্র শিক্ষা আরম্ভ করে। তাঁহার আদেশানুসারে ইতিহাস, ব্যবহার শাস্ত্র, রাজনীতি, জীবনচরিত ইত্যাদির অনুশীলনের প্রথম সৃষ্টি হয়, সুতরাং তাহার শাসনকালেই বিজ্ঞান শাস্ত্রের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর আরবদেশে বিজ্ঞান আলোচনা প্রায় তিরোহিত হইল। সারাসান (10) জাতিরা আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষাপ্রদান করিবার জন্য ইতালিদেশের অন্তর্গত সেলারনো (11) নামক নগরে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিল এবং বোধ হয় ইউরোপে এই বিদ্যালয় প্রথম স্থাপিত হইয়াছিল। ক্রমে পুরাতন বিজ্ঞানগুলি পরিত্যক্ত হইতে লাগিল এবং ক্রমে ক্রমে বহুল নূতন নূতন বিজ্ঞানের আবিষ্কার হইতে লাগিল। এই সময়েই বোধ হয় ভারতবর্ষীয় পাটীগণিত ইউরোপে প্রথমে আনীত হয় এবং তাহার

(9) Almansor.

(10) Saracens.

(11) Salerno.

অনুশীলন আরম্ভ হয়। পরে ঐ দেশ হইতে ইউরোপীয়েরা বীজগণিতও আনয়ন করিয়া আপন দেশে তাহার আলোচনা আরম্ভ করে। ক্রমে বীজগণিত-শিক্ষা ইউরোপে বহুল উৎকর্ষলাভ করিল, কারণ এই সময়েই আবার আরবদেশীয় সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত মহম্মদ বেনমুসা বার্গিক-সমীকরণের নিয়মাবলী আবিষ্কার করেন এবং উমার বেন এব্রাহিম ও বার্গিক সমীকরণের নিয়মাবলী আবিষ্কার করত বীজগণিত শাস্ত্রের বিশেষ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। সারাসানদিগের বিজ্ঞান আলোচনার উদ্যম দেখিয়া স্পেইন দেশের অন্তর্গত সেভিল নামক নগরে একটি মানমন্দির স্থাপিত হয়; এই মানমন্দির স্থাপিত হওয়া অবধিই ইউরোপে জ্যোতির্ব্বিদ্যার সমধিক অনুশীলন হইতে লাগিল। নানাদেশ হইতে পাঠার্থিগণ আসিয়া সেভিলে জ্যোতির্ব্বিদ্যা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল; তথায় একটি বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বেত্তা রাজব্যয়ে নিযুক্ত হইয়া সকলকে জ্যোতির্ব্বিদ্যা বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করিতেন এবং মানমন্দির দ্বারা গ্রহনক্ষত্র-তারাগণের গতি, স্থিতি, ইত্যাদি প্রদর্শিত হইত। ক্রমে ইউরোপে জ্যোতির্ব্বিদ্যার অনুশীলন অত্যন্ত পরিচালিত হইতে লাগিল। কেপ্লার (12) বহুদিন চিন্তা করিয়া সৌরজগতের আভ্যন্তরিক নিয়মাবলী আবিষ্কার করিলেন। ক্রমে ডেভিন-সাই (13) দৃষ্টি-বিজ্ঞানের নিয়মাবলী এবং গেলিলিও গতিবিজ্ঞানের প্রাকৃতিক নিয়মাবলী আবিষ্কার করিয়া বিজ্ঞানের সমধিক উৎকর্ষ সাধন করিলেন। গেলিলিওর ছাত্র টরিসেলি(14) বায়ুবিজ্ঞানের একটি প্রধান নিয়ম আবিষ্কার করিয়া তমসাবৃত জনগণের মানসিক অন্ধকার দূরীভূত করিয়া পৃথিবীর যথেষ্ট উপকার সাধন করিল এবং অবশেষে নিউটনের অসীম বুদ্ধিপ্রাখর্য্যতায় আমরা জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর গতি আছে বলিয়া অবগত হইলাম। এক্ষণে আমরা দেখিলাম যে আরবদেশের বিজ্ঞান আলোচনা দেখিয়া সারাসান জাতিরা ইতালীদেশে উহার অনুশীলন আরম্ভ করেন এবং ইতালীদেশ হইতে ইউরোপের তাবৎ দেশেই বিজ্ঞানের অনুশীলন আরম্ভ হয়। ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে ষ্টিভিনস(15) নামক এক জন হলেণ্ডদেশীয় ইঞ্জিনিয়ার অর্থাৎ নির্ম্মাণবিদ্যাবিৎ পণ্ডিত সমসংস্থান শাস্ত্র প্রথম প্রচার করেন এবং তৎপরে অর্থাৎ ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে গেলিলিও কর্ত্তৃক যন্ত্র-বিজ্ঞান প্রচারিত হয়। সুতরাং ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দকে ইউরোপীয় বিজ্ঞানের জন্মলগ্ন বলিলেও বোধ হয় অসঙ্গত হয় না। কারণ এই বৎসরেই নিউটন কর্ত্তৃক প্রিন্সিপীয়া (16)

(12) Kepler.
(13) Davinci.
(14) Torrecelli.
(15) Stevinns.
(16) Principia.

নামক পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল এবং তৎপরে ক্রমান্বয়ে বহুবিধ বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ বোরেলী * হুক † হইগহেন্স ‡ প্রভৃতি পণ্ডিতগণের দ্বারা প্রচার হইয়াছিল. সে সকল কথার উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। খৃষ্টাব্দের ১৭০০ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে, এখন পর্য্যন্ত বিজ্ঞান শাস্ত্র যে কি পর্য্যন্ত উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, তাহা পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন এবং অতঃপর ইহার যে কি পর্য্যন্ত উন্নতি সাধনের সম্ভাবনা রহিয়াছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। বিশেষতঃ খৃষ্টাব্দের বর্ত্তমান শতাব্দীতে, বাষ্পীয়পোত বাষ্পীয়শকট, তাড়িৎবার্ত্তাবহ, তারলিকউৎপতন † ও তারলিকসেতু, বাষ্পীয়মুদ্রাযন্ত্র. ব্যোমযান প্রভৃতি শত শত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কৌশল আবিষ্কার করিয়া ভূমণ্ডলের যে অসীম ও অতুল উপকার সাধিত হইয়াছে, তদ্বিষয় বর্ণনার আবশ্যক নাই।

বিজ্ঞান আলোক দ্বারা আর একটি মহৎ উপকার সাধিত হইয়াছে ; যে প্রাচীন এবং বহু দিনের প্রচলিত ভ্রমাত্মক প্রবাদগুলি একেবারে মিথ্যা বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। যত দিন বিজ্ঞানশাস্ত্র প্রচলিত ও বিজ্ঞানালোচনার সমধিক উন্নতি সাধিত হয় নাই, তত দিন অনেকগুলি ভ্রমমূলক অপ্রত্যক্ষ প্রবাদের উপর জন সাধারণের বিশ্বাস সংস্থাপিত ছিল। বিজ্ঞান আলোচনা দ্বারা সে সকল প্রবাদগুলি মিথ্যা প্রমাণীকৃত হইল। বিজ্ঞান আলোচনায় যে মানবের বুদ্ধিবৃত্তিমাত্র উন্নীত হয়, এরূপ বিবেচনা করা উচিত নহে ; ইহা দ্বারা মানবের অপর সকল অবস্থারও উন্নতি হইয়া থাকে। পূর্ব্বকালে কেবল ক্রীতদাসের জন্য ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে সর্ব্বদা যুদ্ধ উপস্থিত হইত ; কারণ একজন জেতা, জেয়দেশবাসিদিগকে আপন দেশে লইয়া যাইত এবং তাহাদের দ্বারা আপনাদিগের সমস্ত কার্য্য করাইয়া লইত ; কারণ মানবের কার্য্য মানবের দ্বারাই লাঘব হইয়া থাকে। কিন্তু যখন তাহারা অবগত হইল যে যন্ত্রদ্বারা মানবের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে এবং পরিশ্রমেরও অনেক পরিমাণে লাঘব হয়, তখন তাহারা ক্রীতদাসের অনাবশ্যক বিবেচনা করিয়া একবারে ক্রীতদাসের প্রথা উঠাইয়া দিবার জন্য নানা প্রকার চেষ্টা ও যত্ন করিতে লাগিল। সুতরাং যুদ্ধ ও বিসম্বাদ সকল ঘুচিয়া গেল। যাহা হউক, খৃষ্টাব্দের উনবিংশশতাব্দীর শেষভাগে বিজ্ঞান আলোচনার দ্বারা যে সমস্ত আশ্চর্য্য কাণ্ড হইল ও হইতেছে, তাহার বিস্তৃত বর্ণনার প্রয়োজন নাই।

---

* Borelli.
† Hooke.
‡ Huyghens.
† Hydraulic lift.

বিজ্ঞান দুই ভাগে বিভক্ত; যথা—কাল্পনিক ১ এবং পারিক্ষীক ২। যে বিজ্ঞান-দ্বারা আমরা ক্ষুদ্রাকারে ভূমণ্ডলস্থ যাবতীয় স্বাভাবিক নিয়মাবলী অবধারণ করিতে পারি, তাহাকেই কাল্পনিক বিজ্ঞান কহে; যথা, রসায়নবিদ্যা, দেহতত্ত্ব, প্রাণিবিদ্যা ইত্যাদি। যে কাল্পনিক বিজ্ঞানদ্বারা স্বাভাবিক নিয়মানুসারে কার্য্য করা যায়, তাহাকেই পরীক্ষিক বিজ্ঞান কহে; যথা—নির্ম্মাণবিদ্যা. ভেষজবিদ্যা ইত্যাদি।

প্রকৃতিক বিজ্ঞান বা পদার্থ দর্শন বহুদিন হইতে প্রচলিত। যন্ত্রবিদ্যা, তরল-সমসংস্থান, তরল-অসমসংস্থান বায়ু-বিজ্ঞান, শব্দবিজ্ঞান, জ্যোতির্ব্বিদ্যা ইত্যাদি ইহার অন্তর্ভূত; এবং ইহা তিন প্রকার পদার্থের মধ্যে (দৃঢ়, তরল এবং বাষ্পীয়) ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

রসায়নবিদ্যা, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও জীবনতত্ত্বের অন্তর্ভূত। ইহা স্বাভাবিক নিয়মাবলী যথার্থ উপলব্ধি করিয়া, অর্থাৎ উপপাদ্য বিবেচনা করিয়া তাহাদের মিশ্রভাবে কি ফল উৎপন্ন হয়, তদ্বিষয়ের জ্ঞান প্রদান করে অথবা মিশ্রিত পদার্থের আদীম অংশগুলির বিভিন্নতা বা পার্থক্য অবধারণ করে;—যেমন মিছরি এবং জল একত্র করিলে সুরসপানীয় প্রস্তুত হয়; ইহাকে প্রাকৃতিক যোগ কহে; আর হরিদ্রা. লবণ, মরিচ, ধন্যা ইত্যাদি একত্র করিলে সূপ প্রস্তুত হয়, ইহাকে রসায়নিক যোগ কহে। তবে এই উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, পানীয়তে কতক পরিমাণে উহার আদীম বস্তুগুলি দৃষ্টিগোচর হয়, কিন্তু সূপে আদীম বস্তুর চিহ্ন কিছুমাত্র লক্ষিত হয় না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে বিজ্ঞান কাল্পনিক এবং পারীক্ষিক দুই ভাগে বিভক্ত; ইহা যে কতকগুলি প্রধান প্রধান বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতদিগের মত, তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। ডাক্তার আরনট বলেন যে, কাল্পনিক বিজ্ঞান চারিভাগে বিভক্ত; যথা প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, রসায়ন-বিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, এবং মনস্তত্ব। আমরা এই মতের অনুমোদন করিতে পারি না।

কোমৎ বলেন যে বিজ্ঞান ছয়ভাগে বিভক্ত;—যথা অঙ্কশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, রসায়ন-বিদ্যা, জীবনতত্ব ও সমাজতত্ব। তিনি বলেন যে জ্যোতির্বিদ্যা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অন্তর্ভূত হইতে পারে না, কারণ ইহা একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞান; এতদ্বারা আমরা মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম অবধারণ করিতে পারি। মনস্তত্ব বলিয়া যে স্বতন্ত্র বিজ্ঞান আছে, তাহা তিনি স্বীকার করেন না; এবং সেই জন্য তাঁহার মত অনেকেই অনুমোদন করেন না।

---

(1) Theoratical.
(2) Practical.

স্পেনসার নামক বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত বলেন, যে দুইটি মাত্র কাল্পনিক বিজ্ঞান আছে;—যথা প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এবং রসায়ন-বিদ্যা। আর দুইটিকে কাল্পনিক বিজ্ঞান বলিয়া গণ্য করিতে তাহার অসম্মতি দৃষ্ট হয় না যথা, অঙ্কশাস্ত্র ও তর্কশাস্ত্র। অবশিষ্ট বিজ্ঞানগুলিকে তিনি পারীক্ষিক বিজ্ঞান বলিয়া গণ্য করেন যথা, জ্যোতির্বিদ্যা জীবনতত্ব, মনস্তত্ত্ব, সমাজতত্ব, ভূতত্ব বা ভূ বিজ্ঞান ইত্যাদি। স্পেন্সার এই প্রকার শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন বলিয়া মিল সাহেব স্পেন্সারের পুস্তক সমালোচনায় তাহার অত্যন্ত নিন্দাবাদ করিয়াছেন।

পারীক্ষিক বিজ্ঞান কোন শ্রেণীভূত হইতে পারে না। তাহার কারণ এই যে তাহারা অসংখ্য এবং কাহারও সহিত কাহারও ঐক্য নাই। মন এবং সমাজ সম্বন্ধীয় বিজ্ঞানের মধ্যে প্রধানগুলি এই যথা;—নীতিজ্ঞান, তর্কশাস্ত্র, অলঙ্কার, ভাষাজ্ঞান, স্মৃতি, ন্যায়, রাজনীতি, অর্থব্যবহার ইত্যাদি। পারিশ্রমিক কার্য্যসম্বন্ধীয় প্রধান বিজ্ঞান গুলি যথা;—রণযাত্রাবিদ্যা,নৌযাত্রাবিদ্যা, খনিজবিজ্ঞান, ধাতুবিজ্ঞান, বস্ত্রধাবন ও বস্ত্ররঞ্জনজন্যরসায়নবিদ্যা ইত্যাদি। চিকিৎসাসম্বন্ধীয় প্রধান বিজ্ঞানগুলি যথা;—ভেষজবিদ্যা, অস্ত্রচিকিৎসা, ধাত্রীবিদ্যা ইত্যাদি।

আধুনিক বিজ্ঞানবিশারদ পণ্ডিতগণ বিজ্ঞানশাস্ত্রের অন্য প্রকার বিভাগ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে বিজ্ঞান দুই ভাগে বিভক্ত;—যথা জড়ভাববিশিষ্ট ও গতিভাগবিশিষ্ট। তাহার মতে বৈজ্ঞানিক নিয়মানুসারে বস্তুর স্থায়িত্ব সমসংস্থান ও অসমসংস্থানভাবে লক্ষিত হইয়া থাকে। যখন আমরা দেখি যে একখানি চৌকী একটি গৃহে স্থাপিত আছে, তখন বৈজ্ঞানিক নিয়মানুসারে চৌকীর স্থায়িত্বের বিষয় বলিতে হইলে, বলা উচিত, যে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির দ্বারা ভূতল ইহাকে আকর্ষণ করিয়া সমসংস্থানভাবে রাখিয়াছে, অর্থাৎ উহা কোন দিকে চলিতেছে না, অর্থাৎ উহা সেই দণ্ডে গতিরহিত হইয়াছে। সেই জন্য কোন পদার্থেরই অস্তিত্ব বিবেচনা করিতে হইলে, উহার সমসংস্থান এবং অসমসংস্থান বা গতি আছে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এক্ষণে যে বিজ্ঞানগুলির দ্বারা পদার্থপুঞ্জের সমসংস্থান লক্ষিত হয়, তাহাদিগকে প্রথম বিভাগভুক্ত এবং যে গুলি দ্বারা অসমসংস্থান লক্ষিত হয়, তাহাদিগকে দ্বিতীয় বিভাগভুক্ত করা হইয়াছে।

১ম বিভাগ

সমসংস্থান	Statics.
তরলসমসংস্থান	Hydro-statics.
তড়িৎ–বিজ্ঞান	Electricity.
চুম্বকাকর্ষণ	Magnetism.

বায়ু—বিজ্ঞান	Pneumatics.
শব্দ—বিজ্ঞান	Acoustics or sounds.
দৃষ্টি—বিজ্ঞান	Optics.
তাপ—বিজ্ঞান	Heat.

২য় বিভাগ।

অসমসংস্থান	Dynamics.
তরল—অসমসংস্থান	Hydrodynamics.
তড়িৎ—অসমসংস্থান	Electrodynamics.
তড়িৎ—চুম্বকাকর্ষণ	Electro-magnetism.
আবহ—বিজ্ঞান	Meteorology.

ইত্যাদি।

উপযুক্ত বিভাগ যিনি যে প্রকারেই করুন না কেন, সকলকেই সকল প্রকার বিজ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। তবে কেহ বলেন যে, এই বিজ্ঞানটি এই বিজ্ঞানের অন্তর্ভূত, কেহ বলেন অপরের অন্তর্ভূত, কেহ বলেন ইহা একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞান, ইহা এই বিজ্ঞানের অন্তর্গত নহে। কিন্তু অস্তিত্ব বিষয়ে কাহারও অমত করিবার ক্ষমতা নাই। সকলকেই সকল প্রকার বিজ্ঞানের অস্তিত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

উপসংহারকালে আমাদের বক্তব্য এই যে, আমরা যাহা কিছু এ বিষয়ে লিখিব তাহার অধিকাংশই ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের অনুসরণ করিয়াই লিখিত হইবে: ইহা আমরা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। কিন্তু এবিষয়ের মধ্যে আমাদের বক্তব্য এই যে, দিন দিন বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের বিস্তর প্রভেদ হইতেছে; আজ যে মত প্রচলিত, কাল তাহা পুরাতন, আজ যে মতের আদর আছে, কল্য তাহা অগ্রাহ্য। ইহার দৃষ্টান্ত, পূর্ব্বে ৬২টীমাত্র' অমিশ্র বস্তু জানা ছিল, কিন্তু এক্ষণে নূতন কতকগুলি আদীমবস্তু আবিষ্কৃত হইয়াছে; পূর্ব্বে যে কয়েকটি ধূমকেতু জানা ছিল; এক্ষণে তাহার সংখ্যা অনেক পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে; সুতরাং পূর্ব্বের মতানুসারে লিখিত হইলে তাহা অগ্রাহ্য হইবে। আমরা কি কারণে পুরাতন প্রবন্ধের অনুগামী হইয়াছি এস্থলে তাহা প্রকাশ করিবার আবশ্যক নাই; স্থলবিশেষে তাহার উল্লেখ করিব।

সমসংস্থান বা জড়বিজ্ঞান।

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পাঁচটি বাহ্যেন্দ্রিয় দ্বারা আমরা সচরাচর যাবতীয় পদার্থের গুণ অবগত হইয়া থাকি। চক্ষু দ্বারা কোন্ দ্রব্যের কেমন রূপ, কর্ণ দ্বারা কোন দ্রব্যের কেমন শব্দ, নাসিকা দ্বারা কোন দ্রব্যের কেমন ঘ্রাণ, জিহ্বা দ্বারা কোন্ দ্রব্যের কিরূপ আস্বাদন ও ত্বকের দ্বারা কোন দ্রব্য উষ্ণ বা শীতল এবং বন্ধুর বা মসৃণ ইত্যাদি জানিতে পারি। কিন্তু যখন আমরা কোন দ্রব্যের গুণ প্রত্যক্ষ করি, তখন যে ঐ গুণের আধার আছে, তাহা অবশ্যই প্রতীতি হয়। এরূপ প্রতীতি সহজেই হইতে পারে, কারণ আধার ব্যতীত গুণ থাকিতে পারে না, ইহা সংস্কারমূলক। যেমন মধু মিষ্ট—এস্থলে মিষ্টতা গুণ এবং মধু তাহার আধার। এই প্রতীতি স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া জানিতে হইবে।

এক্ষণে গুণসমূহের আধারকেই আমরা জড় বলিয়া নির্দ্দেশ করি। এই জড়ের কতকগুলি গুণ আছে; সেই গুণ সকল ক্রমে বিবৃত হইতেছে। এই গুণ সকলের মধ্যে কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ, কতকগুলি পরীক্ষাসিদ্ধ ও কতকগুলি আনুমানিক।

জড়ের প্রথম গুণ বিস্তৃতি—জড়পদার্থের যে বিস্তৃতি আছে, তাহা ব্যাখ্যা করিবার আবশ্যক নাই। ইহার অর্থ এই যে জড় মাত্রেরই দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ আছে, এই সকল গুণ থাকিলেই জড়ের বিস্তৃতি আছে বলা যায়। বিস্তৃতি থাকিলেই জড়ের অবয়ব এবং গঠন জানা যায়। একখণ্ড প্রস্তর, এক খণ্ড কাগজ, একখানা বস্ত্র, একটুকু সূত্র ইত্যাদি সকলেরই বিস্তৃতি আছে। জড়ের এই গুণ স্বতঃসিদ্ধ।

জড়ের দ্বিতীয় গুণ স্থানাবরোধকতা—এই গুণ আছে বলিয়াই জড় পদার্থ যে স্থলে থাকে, সেই স্থান সমস্ত অবরোধ করিয়া রাখে। সেই জন্যই দুইটি জড়-পদার্থ একস্থানে এক সময়ে কোন রূপে অবস্থান করিতে পারে না। জলে হস্ত নিমজ্জিত করা যাইতে পারে এবং যে স্থানে হস্ত মগ্ন করা যায়, সেখানে জল নাই, ইহাও বিশদরূপে বিবেচনা করা যাইতে পারে। হস্তের বলে জল পূর্ব্ব-স্থানচ্যুত হইবে। তজ্জন্য একস্থানে দুইটি জড় কোন প্রকারে এক সময়ে অব-স্থান করিতে পারে না। ইষ্টকনির্ম্মিত দেওয়ালে একটি পেরেক বিদ্ধ করা যায়, কিন্তু ঐ পেরেক যেস্থলে বিদ্ধ করা হইল, সে স্থলের বালুকা বা সুরকী

অবশ্যই অন্যস্থলে অপসৃত] হইবে, তাহার কারণ কেবল জড়ের স্থানাবরোধকতা গুণ ব্যতীত আর কিছুই নয়।

জড়ের তৃতীয় গুণ বিভাজ্যতা—জড়ের [এই গুণ সহজেই বোধগম্য হইতে পারে। কোন জড়পদার্থকে অসংখ্য ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। একখণ্ড ইষ্টক চারি ভাগে বিভক্ত করা হইল, তাহার পরে আবার সেই এক এক খণ্ডকে একশত ভাগে বিভক্ত করা হইল। তৎপরে সেই এক এক ভাগকে লইয়া কোন যন্ত্র দ্বারা পেষণ করিয়া চূর্ণ করা গেল, তাহারা এরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইল যে, সেই অংশগুলি দৃষ্টির অগোচর; কিন্তু দৃষ্টির অগোচর বলিয়াই যে তাহারা অবিভাজ্য এরূপ নহে। বোধ হয় তাদৃশ উপযুক্ত যন্ত্র হইলে অসংখ্য ভাগে জড়কে বিভাগ করা যায়, এবং উপযুক্ত বল প্রয়োগ করা হইলে, জড় পদার্থের পূর্ব্বাকৃতি থাকে না। জড় পদার্থ যে কিরূপ ক্ষুদ্রাংশে বিভক্ত হইতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত বর্ণিত হইতেছে; ঘন ১ ইঞ্চি স্বর্ণকে পিটিয়া ২০২০০০ সূক্ষ্মাংশ পাত প্রস্তুত হইয়া থাকে।

জড়ের চতুর্থ গুণ নিশ্চেষ্টতা—ইহার অর্থ এই যে জড়পদার্থকে নাড়িলে নড়ে; অর্থাৎ জড়পদার্থ নিজে আপনার স্থান পরিবর্ত্তন করিতে পারে না। যদি জড়পদার্থ স্থিরভাবে কোনস্থানে থাকে, তাহা হইলে ইহা নিজে স্থানান্তরিত হইতে পারে না। বল প্রয়োগ করিলে আমরা উহাকে পূর্ব্বস্থানচ্যুত করিতে পারি। কিন্তু উহা কখনই আপনা আপনি নড়িতে পারে না; অর্থাৎ অপরের সাহায্য ব্যতীত উহা সচল হইতে পারে না। একখানি শকট চালাইতে হইলে কিঞ্চিৎ বল আবশ্যক করে। কিন্তু ঐ শকট একবার চালিত হইলে পর, বিশেষ বল ব্যতীত তাহার গতিরোধ হয় না। যদি ঐ শকট বিপর্য্যস্ত হইয়া পতিত হয়, তাহা হইলে শকটস্থিত আরোহী জড়ের নিশ্চেষ্টতা গুণের জন্য পৃষ্ঠোপরি উল্‌টাইয়া পতিত হইবে। জড়ের নিশ্চেষ্টতা গুণের অপর একটি দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি—একটি অঙ্গুলি সোজা করিয়া তাহার উপর এক খানি তাস স্থির ভাবে রাখ এবং ঐ তাসের উপর একটি পয়সা রাখিয়া ঐ তাসে সজোরে আঘাত কর। তাহা হইলে দেখিবে যে, ঐ তাস ভূমিতলে পতিত হইবে, এবং ঐ পয়সাটি অঙ্গুলির উপর স্থিরভাবে থাকিবে। তাম্রের নিশ্চেষ্টতাগুণই ইহার প্রধান কারণ; তাস এবং ইহার ঘর্ষণ অপেক্ষা তাম্রের নিশ্চেষ্টতা গুণ অত্যন্ত অধিক। মাদুর বা গালিচার ধূলাঝাড়া ও এই কারণেই লক্ষিত হয়।

জড়ের পঞ্চম গুণ সঙ্কোচতা—যখন কোন পদার্থের আয়তন বলদ্বারা হ্রাস করা যায়, তখন ঐ পদার্থ সঙ্কুচিত হইল বলা যায়। স্পঞ্জ, সোলা, কাষ্ঠ,

ইত্যাদিকে সঙ্কুচিত করা যায়; কাষ্ঠও সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। সুতরাং জড়ের য সঙ্কোচতা গুণ আছে ইহা সহজেই অনুমিত হইয়া থাকে।

জড়ের ষষ্ঠ গুণ বিস্তার্য্যতা—যখন কোন পদার্থের আয়তন বলদ্বারা বৃদ্ধি করা যায়; তখন উহাকে বিস্তৃত করা হইল বলা যায়। সুতরাং জড়ের বিস্তার্য্যতা গুণও সহজেই বুঝা যাইতে পারে।

জড়ের সপ্তম গুণ স্থিতিস্থাপকতা। কোন কোন জড়পদার্থকে বল প্রয়োগ দ্বারা সঙ্কুচিত বা বিস্তৃত করিয়া ছাড়িয়া দিলে, উহা পুনর্ব্বার আপনার পূর্ব্বায়তন প্রাপ্ত হয়। যে গুণের দ্বারা এইরূপ কার্য্য হইয়া থাকে, তাহার নাম স্থিতিস্থাপকতা।

জড়ের অষ্টম গুণ সচ্ছিদ্রতা—পূর্ব্বোক্ত গুণসকল থাকাতে, আমরা জড়পদার্থকে সহজেই সচ্ছিদ্র বোধ করিতে পারি। তাহার কারণ এই যে সচ্ছিদ্র না হইলে, জড় পদার্থ কখনই সঙ্কুচিত বা কোন বস্তু দ্বারা বিদ্ধ হইতে পারিত না। কতকগুলি পদার্থ যথা স্পঞ্জ, কাষ্ঠ, চিনি ইত্যাদিকে সচ্ছিদ্র বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু পরীক্ষা দ্বারা অবগত হওয়া গিয়াছে যে, সকল দ্রব্যই সচ্ছিদ্র। সকল পদার্থই কতকগুলি পরমাণুসংহতি, এবং উহা সঙ্কুচিত এবং বিস্তৃত হইতে পারে বলিয়া উহাতে কম হউক বা বেশি হউক ছিদ্র আছেই, ইহা জানিতে হইবে। যখন কোন জড়কে সঙ্কুচিত করা যায়, তখন উহার পরমাণুগুলি একত্রীভূত হইল উহা উত্তমরূপ অনুমান করা যায়। সুতরাং এরূপ কোন জড় নাই যাহা সচ্ছিদ্র নহে, তবে বস্তু বিশেষে এইগুণ বেশি ও কম পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়।

জড়ের নবম গুণ আকর্ষণ। জড়ের এই গুণটি অনুমানসিদ্ধ। আকর্ষণ নানাবিধ; যে শক্তিদ্বারা উৎক্ষিপ্ত লোষ্ট্রাদি আকৃষ্ট হইয়া ভূতলে পতিত হয়, তাহাকে মাধ্যাকর্ষণ কহে। সুবিখ্যাত সার আইজ্যাক্ নিউটন্ বলেন যে, এই শক্তিদ্বারাই পৃথিবী চন্দ্রকে আকর্ষণ করে এবং পৃথিবীও উক্ত শক্তি দ্বারা সূর্য্যাভিমুখে ধাবিত হয়; সুতরাং ইহাদ্বারা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়, যে জড়ের প্রত্যেক পরমাণু অন্য পরমাণু কর্তৃক আকৃষ্ট হইয়া থাকে। যদি একখণ্ড চুম্বক-প্রস্তর একটি লৌহদণ্ডের নিকট আনীত হয় এবং পরস্পরের কোন প্রতিবন্ধক না থাকে, তাহা হইলে যে শক্তিদ্বারা তাহারা উভয়ে মিলিত হয়, তাহাকে চুম্বকাকর্ষণ কহে। আর যে শক্তিদ্বারা একখণ্ড লাক্ষা রেশমি বস্ত্র দ্বারা ঘর্ষিত হইয়া আপনার নিকটস্থ ক্ষুদ্র কাগজ বা পালক প্রভৃতিকে আকর্ষণ করে, তাহাকে তড়িতাকর্ষণ কহে।

উপরে যে সমস্ত আকর্ষণী-শক্তির বিষয় লিখিত হইল, তাহারা দূরস্থ ও নিকটস্থ জড়ের মধ্যে কার্য্য করিয়া থাকে। নেপচুন্ নামক গ্রহ মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে সূর্য্য হইতে ২,৯৫৪,০০০,০০০ মাইল অন্তরে স্বীয় কেন্দ্রে অবস্থান করে। ঐরূপ অনেক অনেক জড়পদার্থ সন্নিহিত পরমাণুসমষ্টির মধ্যেও কার্য্য করিয়া থাকে; এইরূপ শক্তিকে পারমাণবাকর্ষণ কহে; পারমাণবাকর্ষণ চারি প্রকার; যথা—যোগাকর্ষণ, অসমসংযোগ, বিপ্রকর্ষণ ও রাসায়নিক আকর্ষণ, যে শক্তিদ্বারা পরমাণু সকল পরস্পর আকৃষ্ট হইয়া অপেক্ষাকৃত স্থূলতর জড়াকার রূপে পরিণত হয়, তাহাকে যোগাকর্ষণ কহে; যদি পরমাণুসমষ্টির মধ্যে পরস্পরের আকর্ষণ শক্তি না থাকিত, তবে আমরা উহাদের কার্য্যকারিতার বিষয় কিছুমাত্র অনুভব করিতে পারিতাম না; উহাদিগকে কেবল স্তূপাকার বালুকারাশি বলিয়া বোধ হইত। কোন কোন পুরাতন দার্শনিকদিগের এরূপ কুসংস্কার মূলক মত ছিল, যে পরমাণু সকলের মধ্যে বড়িশের ন্যায় এক প্রকার কাঁটা আছে। তদ্দারাই তাহারা পরস্পর সংযুক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃত বিষয় এই যে দূরস্থ বস্তুর মধ্যে এমন কোন পদার্থই নাই যে যদ্দারা তাহারা পরস্পর সংযুক্ত হইতে পারে। ফলতঃ পরমাণুসকল পরস্পর অত্যন্ত সন্নিহিত না হইলে কথনই যোগাকর্ষণ-কার্য্য সম্পন্ন হয় না। যোগাকর্ষণ কার্য্য সম্পাদনের জন্য পরমাণু-সমষ্টির এরূপ সন্নিকর্ষ হওয়া উচিত, যাহা আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ের সাধ্যায়ত্ত নহে। সুতরাং পরমাণু-সমষ্টির পরস্পর দূর-সন্নিকর্ষ হইলে যোগাকর্ষণ শক্তি কোন মতেই ফলদায়িনী হইতে পারে না। যদি একখণ্ড সীসকে পরিস্কৃতরূপে কাটিয়া তৎক্ষণাৎ বলপূর্ব্বক আঘাত দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত করা যায়, তাহা হইলে উল্লিখিত দুই অংশই পুনর্ব্বার দৃঢ়রূপে মিলিত হয়। যোগাকর্ষণ শক্তির আধিক্যে কোন কোন পদার্থ অতিশয় কঠিন হইয়া থাকে। পরমাণু সমষ্টির আধিক্যই লৌহ ও প্রস্তর প্রভৃতির কাঠিন্য সাধনের প্রধান কারণ; সাতিশয় বল প্রয়োগ ব্যতীত উহাদিগের আকর্ষণ শক্তির প্রতিঘাত সাধন পূর্ব্বক উহাদিগকে খণ্ডাকারে বিভক্ত করা যায় না।

পরস্পর বিভিন্ন প্রকৃতি পদার্থ সকলের পরমাণুর আকর্ষণকে অসমসংযোগ কহে। যোগাকর্ষণ শক্তিদ্বারা এক প্রকারের দুইটি পদার্থ সংযুক্ত হয়; অসমসংযোগ দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন দুইটি পদার্থ সংযুক্ত হইয়া থাকে। যদিও উপর্য্যুক্ত উভয় শক্তির কার্য্যফল সমান বলিয়া হঠাৎ প্রতীয়মান হয়, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীতি হইবে যে, উহারা দুইটি ভিন্ন ভিন্ন শক্তি। দেওয়ালে অথবা কাষ্ঠের উপরে খড়ির দাগ কাগজের উপর গালা-মোহর ইত্যাদি অসম

সংযোগের দৃষ্টান্ত। কিন্তু উল্লিখিত দুইটি দৃষ্টান্তই কঠিন পদার্থের অসমসংযোগ বলিয়া জানিতে হইবে। কঠিন পদার্থের সহিত তরল পদার্থের অসমসংযোগ অন্য প্রকার; যেমন জল বা দুগ্ধ ইত্যাদি কোন তরল পদার্থে যদি হস্ত বা দণ্ড মগ্ন করা যায়, এবং উহা জলাদি হইতে উঠাইয়া লইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, হস্তে বা দণ্ডে জল বা দুগ্ধ লাগিয়া আছে; ইহাকেই কঠিন পদার্থের সহিত তরল পদার্থের অসমসংযোগ বলে। দুইটি বিভিন্ন প্রকার তরল পদার্থের অসমসংযোগ পশ্চাল্লিখিত উদাহরণ দ্বারা স্পষ্টরূপে বুঝা যাইতে পারে; যদি কোন কাচ পাত্রে জল রাখিয়া ঐজলে ইস্প্রিট্ বা এল্‌কোহল দেওয়া যায়; তাহা হইলে উহাদের মধ্যে যে তরল পদার্থটি গুরু, তাহার কিয়দংশ উপরে উত্থিত হইবে এবং যাহা লঘু, তাহার কিয়দংশ নীচে নামিয়া যাইবে। সুতরাং দুইটি ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির তরল সংযুক্ত হইল বলিয়া, উহাকে দুইটি তরল পদার্থের অসমসংযোগ বলে।

রাসায়নিক আকর্ষণ—একখণ্ড মার্ব্বল পাথরকে ভগ্ন করিয়া কতকগুলি অংশে বিভক্ত করিলে, প্রত্যেক অংশই মার্ব্বল পাথর রহিল। কিন্তু রসায়ণতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলেন, যে মার্ব্বল পাথরে তিন প্রকার ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ আছে; যথা—রৌপ্যবৎ এক প্রকার পদার্থ, কৃষ্ণবর্ণের এক প্রকার পদার্থ (যাহাকে অঙ্গারক কহা যায়) এবং এক প্রকার বাষ্প। পৃথিবীস্থ সমস্ত পদার্থই এইরূপ দুই বা তিন প্রকার ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের সমষ্টি। রসায়ণতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ ঐ তিন অংশকে পুনর্ব্বার বিভাগ করিতে চেষ্টা করিয়া তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। কারণ অঙ্গারককে যে প্রকারেই বিভক্ত করা যাউক না কেন, উহার অংশগুলি অঙ্গারকই থাকিবে; এবং অপর দুইটি পদার্থের বিষয়ও ঐরূপ। সুতরাং যখন কোন পদার্থ অন্য কোন নূতন পদার্থে বিভক্ত না হয় তখন উহাকে আদিম পদার্থ বলা যায়। ঐ প্রকার সমুদয় আদিম পদার্থের সংখ্যা ৬৫ এবং তাহাদের পরস্পরের মিশ্রণই পৃথিবীস্থ সমস্ত পদার্থের প্রসূতি। যেমন জল দুইটি বাষ্পের মিশ্রণে প্রস্তুত হইয়াছে; হিঙ্গুল, গন্ধক ও পারদের মিশ্রণে প্রস্তুত ইত্যাদি, এইরূপ মিশ্রণকে রাসায়নিক সংযোগ কহা যায়; এবং যে শক্তি দ্বারা ঐ সংযোগ সমুদ্ভূত হয় তাহাকেই রাসায়ণিক আকর্ষণ কহে। যোগাকর্ষণ শক্তিদ্বারা দুই প্রকার পদার্থ মিশ্রিত হইলে উহাদের গুণের কোন বৈষম্য ঘটেনা, কিন্তু রাসায়ণিক আকর্ষণ দ্বারা দুইটি পদার্থ সংযুক্ত হইলে তাহাদের উভয়েরই গুণ পরিবর্ত্তন হয় এবং যে নূতন বস্তু উৎপন্ন হয় তাহাও অন্য প্রকার গুণবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঃ———

জাতিতত্ত্ব।

মানবের ইতিহাস দুই ভাগে বিভক্ত; যথা সামাজিক ও প্রাকৃতিক। ব্যক্তি বিশেষের ক্ষমতা, ঘটনাবিশেষের ফল, ব্যক্তি বিশেষের কার্য্যের ফল, সমাজ সম্বন্ধীয় ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য ও তাহার ফল ইত্যাদিকেই সামাজিক ইতিহাস বলে। রাজ্যস্থাপন, সন্ধি ও বিগ্রহ প্রভৃতি সামাজিক ইতিহাসবেত্তারা লিখিয়া থাকেন। প্রাকৃতিক ইতিহাসবেত্তারা ভিন্ন ভিন্ন মানব জাতির মধ্যে কি সম্বন্ধ, অর্থাৎ কোন্ ব্যক্তি কোন্ জাতিবিশেষের অন্তর্গত, সেই ব্যক্তির শরীর ও গঠনের সহিত কোন্ জাতীয় ব্যক্তির শরীরের এবং গঠনের সৌশাদৃশ্য বা বৈষম্য আছে, তাহা নির্ণয় করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃতিবিৎ পণ্ডিতগণের কার্য্য স্বতন্ত্র, তাঁহারা পৃথিবীস্থ যাবতীয় পদার্থেরই ঐরূপ জাতি নির্ণয় করেন *। তাঁহারা উদ্ভিদের, এবং প্রাণিমাত্রেরই ঐ প্রকার জাতি বিভাগ এবং শ্রেণী ইত্যাদি নিরূপণ করেন † যদ্দ্বারা উদ্ভিজ্জের জাতি প্রভৃতি নির্ণয় হয়, তাহাকে উদ্ভিজ্জ বিদ্যা ‡ এবং যদ্দ্বারা ইতর প্রাণীর জাতি প্রভৃতি নির্ণীত হয়, তাহাকে প্রাণিবিদ্যা কহে ¶। এস্থলে কেবল আমরা মানবের জাতি ও শ্রেণী বিভাগ ইত্যাদির অবধারণ করিব। স্পেননিবাসিদের শরীরে মুরজাতির শোণিত কিপ্রকারে আসিল? ভারতবর্ষবাসীরাই বা ককেসীওর অন্তর্গত হইল কেন? ইত্যাদি তথ্য প্রাকৃতিক ইতিহাস দ্বারা সন্ধান করা হইবে।

জাতিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ মানবকে প্রাণী বলিয়াই, ইতর প্রাণীর সহিত সৌশাদৃশ্য ও বৈষম্য লইয়া গণ্য করেন; কিন্তু সামাজিক ইতিহাসবেত্তারা মানবকে বুদ্ধিমান প্রাণী বলিয়া গণ্য করিয়া, তাহাদের কার্য্য ও কার্য্যফল লইয়া তদ্বিষয়ের পর্য্যালোচনা করিয়া থাকেন।

---

* ন্যায়শাস্ত্রের মতে (নিত্যত্বে সতি অনেকসমবেতত্বং জাতিত্বং) নিত্য এবং অনেকে সমবেত ধর্ম্ম, অর্থাৎ এক জাতীয় যাবতীয় পদার্থের অসাধারণ ধর্ম্ম। যে ধর্ম্ম সেই জাতীয় পদার্থেই থাকে; তদ্ভিন্ন জাতিতে লক্ষিত হয় না।

† সামাজিক ইতিহাস বিষয়ক প্রবন্ধ পৌরাণিকতত্ত্বে লিখিত হইবে।

‡ ইহার বিষয় উদ্ভিজ্জবিদ্যা প্রবন্ধে লিখিত হইবে।

* ইহার বিষয় প্রাণিবিদ্যাসন্দর্ভে লিখিত হইবে।

জাতিতত্ত্ব মানবতত্ত্ব হইতে স্বতন্ত্র। যদি পৃথিবীতে কেবল এক জাতীয় মনুষ্যই থাকিত, তাহা হইলে জাতিতত্ত্ব বলিয়া আর নূতন প্রবন্ধ লিখিতে হইত না। যদি হিন্দু, ইংরাজ বা চীন ব্যতীত অন্য কোন প্রকার জাতি না থাকিত, তাহা হইলে মানবতত্ত্ব বলিয়াই এক শাস্ত্র লিখিত হইত। যেহেতু মানবতত্ত্ব দ্বারা মনুষ্যকে এক জাতি বলিয়া গণ্য করিয়া ইতর প্রাণীর সহিত তাহাদের সম্বন্ধ নির্ণীত হইয়া থাকে। মানবের প্রাকৃতিক ইতিহাসের দ্বিতীয় বিভাগ জাতিতত্ত্ব। জাতিতত্ত্ব দ্বারা মানবজাতির মধ্যেই ভিন্ন ভিন্ন জাতির প্রকৃতি অবধারিত হয়। কিন্তু তাই বলিয়া এরূপ বিবেচনা করা উচিত নহে যে, মানবতত্ত্ব নামক শাস্ত্র আছে বলিয়া জাতিতত্ত্ব নামে অবশ্যই একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র থাকিবে। যদি এক জাতির একটি ব্যতীত জীব না থাকে, তাহা হইলে তাহার জাতিতত্ত্ব হইতে পারে না। যদি সকল মানবই হিন্দু হইত, তাহা হইলে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় ব্যতীত একমাত্র ধর্ম্মের ন্যায়, সর্ব্বসম্মত সাধারণ রাজ্যের ন্যায়, জাতিতত্ত্ব ব্যতীত মানবতত্ত্বেরই আলোচনা হইত। ইহার কারণ এই যে, জাতিতত্ত্ব শাস্ত্রের দ্বারা মানবজাতির ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় নির্ণীত হইয়া থাকে। যদি মানবেরা সকলেই এক প্রকার হইত, তাহা হইলে জাতিতত্ত্ব শাস্ত্রের আবশ্যকতা থাকিত না।

রবিন্‌সন্ ক্রুশো যে নির্জ্জন দ্বীপমধ্যে অবস্থান করিয়াছিলেন, যদ্যপি সেই দ্বীপটিকে পৃথিবী বিবেচনা করিয়া মানবজাতির ইতিহাস লিখিতে হয়, তাহা হইলে মানবতত্ত্ব শাস্ত্র লিখিলেই হইত, জাতিতত্ত্ব লিখিবার আর কোন আবশ্যক থাকিত না। কিন্তু যদি শরীরের গঠন পারিপাট্যে ভিন্ন দুইটি মানব অবস্থান করে, অর্থাৎ একটি শুক্লবর্ণ মনুষ্য ও অপরটি কৃষ্ণবর্ণ, যেমন রবিন্‌সন্ ক্রুশোর দ্বীপে যখন ফ্রাইডে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন সেই দ্বীপস্থ মানবের ইতিহাস লিখিতে হইলে অনায়াসেই জাতিতত্ত্ব লেখা যাইতে পারে।

এক্ষণে মানবতত্ত্ব লেখা কতদূর সঙ্গত তাহা বিশদরূপে অবগত হওয়া গেল। যাহা কিছু এ বিষয়ে লেখা যাইতে পারে তাহা প্রাণিবিদ্যার অন্তর্গত; এক্ষণে আমরা জাতিতত্ত্ব লিখিতেছি। পৃথিবীতে বর্ণ, আকার, মস্তকের গঠন এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির নির্ম্মাণভেদে, বহুবিধ মনুষ্য দেখিতে পাওয়া যায়; স্থানভেদেই এইরূপ বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে, সুতরাং তাহারা ভিন্ন ভিন্ন জাতির অন্তর্গত বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।

প্রকৃতিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলেন—যে প্রাণিগণ বংশানুক্রমে জাতীয় প্রকৃতি অবলম্বন করে। এবং কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন না হইলে, তাহারা আপন জাতীয় প্রকৃতি ত্যাগ করে না। কিন্তু অবস্থাবিশেষে তাহাদের শারীরিক

প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হইলে, তাহাদের মানসিক বৃত্তিও পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। ব্যাঘ্র ও কুকুর এক জাতীয় প্রাণী; কিন্তু দেশ ও অবস্থাভেদে তাহাদের উভয়ের প্রকৃতির বৈষম্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। ব্যাঘ্র সকল দেশে সকল অবস্থাতেই সমান থাকে অর্থাৎ সকল দেশেই অরণ্যমধ্যে বাস করে, কখনই গৃহপালিত হয় না। কিন্তু সেই জাতীয় প্রাণী হইয়াও পৃথিবীর অনেক সভ্যদেশের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় পতিত হইয়া, নানা প্রকার আকৃতি বর্ণ ও মানসিক-বৃত্তির বৈলক্ষণ্য হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু ভূমণ্ডলে এরূপ স্থান আছে যেখানে প্রকৃতি পরিবর্ত্তন হইলে ও জীবনের পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় না। আবার এরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে যে, প্রকৃতির সাহায্যে জীবগণ পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইবামাত্র পুনর্ব্বার তাহাদের পূর্ব্বকার ভাব প্রাপ্ত হয়। বিবেচনা কর, ইউরোপের গৃহ-পালিত শূকর আমেরিকার বনে আগমন করিয়া, পুনর্ব্বার বন্য-শূকরোচিত দন্ত ও অন্যান্য অবয়ব প্রাপ্ত হইয়াছে। সেই জন্য প্রকৃতিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে, জাতীয় বিভিন্নতা ও পার্থক্যতা কেবল প্রকৃতি অনুসারেই ঘটিয়া থাকে অর্থাৎ তাহাতে তাহাদের বৈলক্ষণ্য হয় না; যেমন শূকর যেদেশে গিয়া প্রসব করুক না কেন, তাহার শাবক শূকরের আকৃতি ধারণ করিবে, সুতরাং দেশভেদে ও কখনই তাহাদের জাতীয় প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হয় না। কিন্তু যদি দুইটি অসমান জাতির মিলনে শাবক উৎপন্ন হয়; তাহা হইলে সেই শাবক পিতৃ মাতৃ উভয় জাতির গুণ এবং আকৃতি প্রাপ্ত হইবে; যেমন ঘোটকের ঔরসে গর্দ্দভীর গর্ব্ভে শাবক প্রসূত হইলে, সেই শাবক ঘোটক এবং গর্দ্দভী এই উভয়ের আকৃতি ধারণ করিবে; তাহাতে আর অন্যথা হইবে না। কিন্তু তদ্বারা এরূপ উপসংহার করা যাইতে পারে না—যে, জাতীয় আকৃতি একেবারে নষ্ট হইয়া যায়, তবে এই বিষয়ে কিয়ৎ পরিমাণে পরিবর্ত্তন হইল বলা যাইতে পারে।

ইতর প্রাণীর বিষয় আলোচনায় আমাদের এক্ষণে এই উপলব্ধি হইল যে, যথার্থই সকল মানবই এক জাতি, তবে ভিন্ন ভিন্ন দেশে বাস করে বলিয়া, এবং অন্যান্য বহুবিধ কারণে, ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ, আকার এবং মানসিক বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। সকল আকারের জন্তু সকল দেশে নাই; কিন্তু পৃথিবীর সর্ব্বত্রই মনুষ্য আছে; আবার এক এক জাতির মধ্যে বহুবিধ আকার চরিত্র ও গুণবিশিষ্ট মনুষ্যও আছে। সুতরাং সেই চরিত্র ও গুণদ্বারা তাহাদিগকে অন্য মনুষ্য হইতে ভেদ করা যাইতে পারে।

ব্লুমেনবেক সাহেব প্রাণিবিদ্যা এবং শারীরবিদ্যা বা দেহতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিয়া, মনুষ্য জাতির ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি পশ্চা-

লিখিত পাঁচপ্রকার প্রধান শ্রেণীতে মনুষ্যজাতিকে বিভাগ করিয়াছেন যথা—ককেশীয়, মোগলীয়, ইথীয়োপীয়, আমেরিক এবং মালয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঃ———

প্রাণিবিদ্যা।

আশ্চর্য্য শক্তিসম্পন্ন জগৎপাতা জগদীশ্বরের মহিমাচন্দ্রের সুবিমল জ্যোতি দর্শন করিয়া চিত্তচকোরকে পরিতৃপ্ত করিতে সকলেরই বাসনা;—বাসনা সিদ্ধির উপায়ও চারি দিকে বিদ্যমান রহিয়াছে। বিস্তৃত সাগরবারির নিলিমা-দর্শন কর, মন নাচিয়া উঠিবে; অসংখ্য তারকাজালের চিত্তচমৎকারিণী জ্যোতিঃপুঞ্জ অবলোকন কর,হৃদয়ের ভক্তিসিন্ধু উচ্ছসিত হইয়া উঠিবে; এবং অনু-বীক্ষণ সহকারে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটানুগণের সংখ্যাবধারণে প্রবৃত্ত হও শিরোদেশ বিঘুর্ণিত হইয়া যাইবে। এক দিকে সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি জন্তুদিগের দুর্দ্ধর্ষ বিক্রম ও জিঘাংসা প্রবৃত্তির বিষয় বিবেচনা করিলে যে প্রকার চমকিত হইতে হয়, ছাগ, মেষ প্রভৃতি ভীরুস্বভাব প্রাণিগণের দুর্ব্বলতা ও মৃদু প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে আবার সেই প্রকার দয়ার্দ্র হইতে হয়। বস্তুতঃ প্রাণিগণের প্রকৃতি ও গঠন প্রণালী প্রকৃতির যে প্রকার অনির্ব্বচনীয় শক্তির পক্ষে সাক্ষ্য দান করিতেছে, এমন আর কিছুই নহে। এক্ষণে আমরা জন্তু সংসারে প্রবেশ করিয়া প্রকৃতির এক এক খানি মহিমাচিত্র প্রকটিত করিয়া মনের ক্ষোভ কথঞ্চিৎ নিবারণ করিব।

আমরা চারিদিকে যে সমস্ত পদার্থ দেখিতে পাই, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি চেতন, ও অবশিষ্টগুলি অচেতন। চেতন পদার্থ সকল নশ্বর; অচেতন পদার্থ অবিনশ্বর।

পদার্থবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতগণ যাবতীয় পদার্থসমূহকে স্থূলরূপে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন যথা;—জান্তব, উদ্ভিজ্জ ও খনিজ বা আকরিক।

যে সকল পদার্থ জান্তব বলিয়া পরিগণিত, তাহাদের কতকগুলির বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম লক্ষিত হইয়া থাকে যথা;—প্রথমতঃ-যে যে পদার্থের রাসায়নিক সংযোগে তাহাদের দেহ গঠিত, তাহাদের মধ্যে অঙ্গারক, উদজান, অম্লজান ও যবক্ষারজান

প্রধান। এই সমস্ত রূঢ় পদার্থ মিশ্রিত শরীর জলীয় পদার্থে পরিপুরিত, সুতরাং ধ্বংস হইবার কিঞ্চিৎ কাল পরেই পচিতে থাকে।

দ্বিতীয়তঃ উহাদের দেহে নানাবিধ সুকোমল ও সুসম্পন্ন যন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এমত প্রকার কতকগুলি জীব আছে যে তাহাদের ঐ সমস্ত যন্ত্রের একটিও নাই।

তৃতীয়তঃ উহারা খনিজ পদার্থের ন্যায় দেহের উপরি ভাগে কোন পদার্থ বিশেষের সংযোগ দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত না হইয়া, ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যাদি অন্তরস্থ বা উদরস্থ করিয়া শরীর বর্দ্ধন করে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, ইহাদের জন্ম, বৃদ্ধি, হ্রাস ও ধ্বংস, এই কয়টি ধর্ম্মেরই সজ্ঘটন হইয়া থাকে।

আকরিক বা খনিজ পদার্থ সকল অন্য পদার্থ হইতে জন্ম গ্রহণ করে না, জন্তুদিগের মত ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যাদি অন্তরস্থ করিয়া পরিবর্দ্ধিত হয়। ইহাদের মধ্যে কোন কোনটি হয়ত একটিমাত্র রূঢ় পদার্থের যোগে উৎপন্ন এবং কোন কোনটি বা দুই তিনটিমাত্র রূঢ় পদার্থ দ্বারা বিরচিত। প্রথম প্রকারের উদাহরণ ইংলণ্ডীয় স্বর্ণ ও শেষোক্ত প্রকারের লবণ, চূর্ণপ্রস্তর প্রভৃতি।

বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ প্রাণিক্ষেত্র হইতে উদ্ভিদ ক্ষেত্রের বিভিন্নতা দেখাইতে গিয়া স্থানে স্থানে মহাশঙ্কটে পড়িয়াছেন। পৃথিবীতে এমত কতকগুলি প্রাণী আছে যে হঠাৎ তাহাদিগকে দেখিলে উদ্ভিদ বলিয়া ভ্রম জন্মে। পুরুভুজ নামে এক প্রকার কীট আছে তাহাদের আকৃতি অবিকল উদ্ভিদের ন্যায়। স্পঞ্জ নামক পদার্থ যাহা ব্যবহৃত হয়, উহাকে অনেকে প্রবাল নামক জীবের পঞ্জর বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন। কিন্তু প্রবালের ধর্ম্ম ঠিক উদ্ভিদের ন্যায়। উহারা চিরকাল একস্থান অবরোধ করিয়া অবস্থিতি করে, আর উহাদের যে কোন প্রকার চলচ্ছক্তি আছে তাহারও কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। প্রবাল জীবদিগের ন্যায় যন্ত্রণা বোধ করে না। কিন্তু উহাদের কয়েকটি ধর্ম্ম, বৃক্ষের ন্যায় হইলেও আকৃতি জন্তুর শরীরের অনুরূপ। এই সকল কারণ বশতঃ উহারা জন্তু কি উদ্ভিদ তাহা স্থির করা সুকঠিন। নিম্ন শ্রেণীস্থ জন্তু হইতে নিম্নশ্রেণীস্থ উদ্ভিদদিগের নির্ব্বাচন করা কঠিন হইলেও উচ্চ শ্রেণীস্থ উদ্ভিদের নির্ব্বাচন করা অতি সহজ ব্যাপার। শেষোক্ত জন্তুদিগের শরীরে যে প্রকার শিরা সমূহ দেখিতে পাওয়া যায় উদ্ভিদের সে সকল কিছুই নাই। ঐ শেষোক্ত প্রকার উদ্ভিদের, জন্তুদিগের মত স্বেচ্ছানুসারে গতায়াত করিবারও সামর্থ নাই এবং কোন প্রকার দ্রব্যাদি ভক্ষণ করিবার ও সাধ্য নাই। প্রাণিদিগের পাঁচটি বাহ্যেন্দ্রিয়ের মধ্যে একটিও উচ্চ জাতীয় উদ্ভিদে লক্ষিত হয় না। উদ্ভিদগণ যে সমস্ত পদার্থ অন্তরস্থ

করিয়া জীবন ধারণ করে, উহা জন্তুদিগের উদরের ন্যায় কোন নির্দ্দিষ্ট আধারে গমন করে না। উদ্ভিদের আহার জলীয় পদার্থ। উচ্চশ্রেণীস্থ জন্তু ও উদ্ভিদের মধ্যে যে যে পৃথক পৃথক ধর্ম্ম উপলব্ধি হয়, নিম্নশ্রেণীর জন্তু ও উদ্ভিদের সে প্রকার কিছুই নাই। এই দুই প্রকার পদার্থের বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়।

নিম্নশ্রেণীস্থ জন্তুদিগের কতক গুলির ধর্ম্ম উদ্ভিদের ন্যায়। উহাদের পাকযন্ত্র নাই, শিরা প্রণালী নাই এবং ইচ্ছামত গমনাগমনেরও শক্তি নাই,। কিন্তু ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ কোন বিষয়ে পরাঙ্মুখ নহেন। তাঁহারা অনেক অনুসন্ধানের পর উভয় শ্রেণীর পার্থক্য নিরূপণ করিয়াছেন, যথা ;——

১। উদ্ভিদগণ অচেতন পদার্থ হইতে শরীর পোষক পদার্থ গ্রহণ করে, ঐ সকল পদার্থের মধ্যে জল, (কার্ব্বনিক্ এসিড্) এবং অঙ্গারকাম্ল প্রধান। আমরা উদ্ভিদ্ হইতে চিনি, শ্বেতসার প্রভৃতি পদার্থ প্রাপ্ত হই। বৃক্ষগণ নানা পদার্থ উৎপাদন করে কিন্তু জন্তুগণ নানা পদার্থ ধ্বংস করে।

২। উদ্ভিদগণ অঙ্গারকাম্ল শরীরস্থ করিয়া উহার অম্লজান ভাগ ত্যাগ করে এবং কার্ব্বণ ভাগ দ্বারা জীবিত থাকে।

কিন্তু জন্তুদিগের মধ্যে উহার বিপরীত ব্যাপার দেখা যায়, উহারা অম্লজান ভাগ শরীরে রাখে এবং অঙ্গারক ভাগ পরিত্যাগ করে। অম্লজান বায়ু জন্তুদিগের জীবন স্বরূপ কিন্তু উদ্ভিদ্দিগের কাল স্বরূপ, এবং অঙ্গারক উদ্ভিদের পক্ষে অমৃত এবং জন্তুর পক্ষে বিষ।

পণ্ডিতগণ এই প্রকারে জীব ও উদ্ভিদের পার্থক্য সংস্থাপন করিয়াছেন। এক্ষণে উদ্ভিদদিগকে পরিত্যাগ করিয়া জন্তুদিগের বিষয় বিবেচনা করা যাইবেক। প্রথমতঃ উহাদের শ্রেণী বিভাগ বিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখিয়া পরে স্বতন্ত্র শ্রেণীস্থ জীব দিগের বিষয় বিবৃত হইবেক। পূর্ব্বকালিন পণ্ডিতগণ জন্তুদিগের আকার গত সৌশাদৃশ্য দেখিয়া প্রাণী বিভাগ করিয়া ছিলেন। কিন্তু এ প্রকার প্রণালীকে বৈজ্ঞানিক প্রণালী বলা যায় না। তাঁহারা কতক গুলি জন্তুকে পশু বলিয়াছেন, এবং পশুর লক্ষণ 'চতুষ্পদ জন্তু' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের এই লক্ষণ বৈজ্ঞানিক বলিয়া ধরিলে ভেক্ ও টিকটীকি প্রভৃতিকে পশু বলিতে হয়। কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতগণ জন্তু বিভাগ প্রণালী অন্য প্রকারে সমাধা করিয়াছেন। তাঁহারা প্রথমতঃ মানব জাতিকে শ্রেষ্ঠ শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। ইতর জন্তু সকল মানব জাতি অপেক্ষা যে যে কারণে নিকৃষ্ট তাহা লিখিত হইতেছে।

মনুষ্যের ধর্ম্ম প্রবৃত্তি বুদ্ধিবৃত্তি ও বিচার শক্তি আছে অথাৎ যাহাদের এই সকল

গুণ আছে তাহারাই মনুষ্য বলিয়া পরিগণিত। নিকৃষ্ট জন্তুদিগের ঐ সমস্ত গুণের কিছুই নাই কেবল মনুষ্যের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি মাত্র অধিকার করিয়া আছে এবং কথঞ্চিৎ বুদ্ধি বলে আপন আপন আবশ্যক মত কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে। যদি মানব জাতির কেবল মাত্র নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি গুলি থাকিত তাহা হইলে উহারা ইতর জন্তু হইতে কোন অংশেই শ্রেষ্ঠ হইতে পারিত না। জন্তু সমুহ চারি প্রধান ভাগে বিভক্ত, অংশুকায়, কোমলাঙ্গ, গ্রন্থিল ও সমেরু।

জন্তু বিভাগের একটী তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

নির্মেরু প্রাণী।

১ম রাজ্য—প্রথম প্রাণী।

১ম শ্রেণী মুখহীন।
২য় শ্রেণী জড়পাদ।
৩য় শ্রেণী আনুবীক্ষণিক কীটাণু।

২য় রাজ্য—গভীরান্ত্র।

১ম শ্রেণী পাকস্থল্যেকদেহ।
২য় শ্রেণী পাকস্থল্যন্যদেহ।

৩য় রাজ্য—দ্বিছিদ্র।

১ম শ্রেণী শূকরচর্ম্মী।
২য় শ্রেণী আভ্যন্তরিক।

৪র্থ রাজ্য—দ্বিছিদ্র।

(ক) বিভাগ পৃথক্‌চলিতাঙ্গ।
১ম শ্রেণী দর্ব্বীকীটাদি।
২য় শ্রেণী জলৌকাদি।
৩য় শ্রেণী নলাকৃতি।
(খ) বিভাগ যুক্তপাদ।
৪র্থ শ্রেণী কর্কটাদি।
৫ম শ্রেণী লূতাদি।
৬ষ্ঠ শ্রেণী শতপাদ।
৭ম শ্রেণী কীটাদি।

৫ম রাজ্য—কোমলাঙ্গ।

(ক) বিভাগ কোমলাঙ্গাদি।
১ম শ্রেণী সমুদ্র শৈবাল।
২য় শ্রেণী কঠিন ত্বক।
৩য় শ্রেণী হস্তপাদ।
(খ) বিভাগ কোমলাঙ্গ।
৪র্থ শ্রেণী কুম্ভাকৃতি।
৫ম শ্রেণী শম্বূকাদি।
৬ষ্ঠ শ্রেণী দ্বিপক্ষ।
৭ম শ্রেণী শিরপাদ।

সমেরু প্রাণী।

৬ষ্ঠ রাজ্য—সমেরু।

(ক) বিভাগ মৎস্যাবয়ব।
১ম শ্রেণী মৎস্যাদি।
১ম জাতি বেঙাচিবৎ।
২য় জাতি কোষচঞ্চু।
৩য় জাতি পূর্ণাস্থি।
৪র্থ জাতি সপ্রভ।
৫ম জাতি তন্তুচঞ্চু।
৬ষ্ঠ জাতি দ্বিনিশ্বাস।

২য় শ্রেণী—জলজীবী।

১ম জাতি	সর্পাকৃতি।
২য় জাতি	মৎস্যাকৃতি।
৩য় জাতি	লিপ্তগণ্ড।
৪র্থ জাতি	দন্তানুবীক্ষণিক।
(খ) বিভাগ	বিহগ সরীসৃপদেহী

৩য় শ্রেণী—সরীসৃপ।

১ম জাতি	কূর্ম্মাদি।
২য় জাতি	সর্পজাতি।
৩য় জাতি	সরীসৃপজাতি।
৪র্থ জাতি	কুম্ভীরাদি।

৪র্থ শ্রেণী—বিহঙ্গ।

১ম জাতি	সন্তরণশীল।
২য় জাতি	চলনশীল।
৩য় জাতি	ধাবনশীল।
৪র্থ জাতি	বিদারণশীল।
৫ম জাতি	আরোহণক্ষম।
৬ষ্ঠ জাতি	উৎপতনক্ষম।
৭ম জাতি	মৃগব্যশীল।
(গ) বিভাগ	স্তন্যপায়ী।

৫ম শ্রেণী—স্তন্যজীবী।

১ম জাতি	দ্বিপুরোদন্তী।
২য় জাতি	দ্বিগর্ভ।
৩য় জাতি	দন্তহীন।
৪র্থ জাতি	দন্ত কর্ণ চুচুকহীন।
৫ম জাতি	তিমিধর্ম্মী।
৬ষ্ঠ জাতি	সক্ষুর।
৭ম জাতি	গণ্ডারবৎ।
৮ম জাতি	শুণ্ডধর্ম্মী।
৯ম জাতি	মাংসাদ।
১০ম জাতি	তীক্ষ্ণদন্তী।
১১শ জাতি	করপক্ষ।
১২শ জাতি	কীটভুক্।
১৩শ জাতি	চতুর্হস্ত।
১৪শ জাতি	দ্বিহস্ত।

(ক্রমশঃ)

ফুলের কথা।

যদি তোমাকে কেহ জিজ্ঞাসা করে, জগতের উৎকৃষ্ট পদার্থ কি? তখন তুমি কি বলিবে;—বিকসিত কুসুম না;—তোমার প্রিয়তমার নব-যৌবন? কিন্তু তোমার প্রিয়তমা তোমার চক্ষে যত ভাল লাগে, অন্যের চক্ষে তত না লাগিতে পারে? ফুল সকলের চক্ষেই সমান লাগে, তবে তাঁর যৌবনটি মন্দ নহে প্রশংসনীয় ও অনেকের চক্ষেই ভাল লাগিতে পারে; এ কথায় তুমি বেশ সন্তুষ্ট হইলে না; আমাকে ফুলের পক্ষপাতী ও অরসিক বলিয়া তোমার ধারণা হইল। কি করিব? কিন্তু এক জন সুরসিক সুকবি যুবক যিনি যুবতীর মর্ম্ম বেশ বুঝেন, যুবতীর আদর করেন, যুবতীর নামে গলিয়া যান? তাঁহার হস্তেই তোমার প্রিয়তমার নবযৌবন ও একটি বিকসিত পুষ্প সমর্পণ করিয়া দেখ, তিনি কাহার কত আদর করেন ও কাহাকেই বা ভাল বলেন? কিন্তু তাই বলিয়াই যে,

বদেশী বা এক জন লম্পটের হস্তে তোমার সর্ব্বস্ব ধন সমর্পণ করিতে আমি অনুমোদন করিতেছি ;—এমৎ নহে। তোমার ধন, তুমিই বল এখন কার হস্তে তোমার প্রিয়তমাকে ফুলের সঙ্গে সমর্পণ করা যাইতে পারে ?

যদি পুরাতন কোন লোকের দিগে দৃষ্টি কর, তবে বাল্মীকি অথবা ব্যাস হইতে আর সুকবি অথচ সুরসিক লোক পাইবে না। কিন্তু দুই জনই বৃদ্ধ আবার তপস্বী, স্ত্রীলোকের মর্ম্মও বুঝেন না আদরও করেন না। সোণার প্রতিমা সীতা কিন্তু বাল্মীকি আর সীতাকে কষ্ট দিতে বাকি রাখেন নাই ; পদে পদে তাঁহাকে কাঁদাইয়াছেন, এক দিনের জন্যও সীতার সুখ দেখিতে তিনি ভাল বাসিতেন না, রাক্ষস, বানর প্রভৃতির চরিত্রে যাঁর চিত্র পরিপূর্ণ ; তার হস্তে তোমার প্রিয়তমা ? আবার গোলাপ ফুল ;—

ব্যাসদেব শত শত নায়ক নায়িকার অভীষ্টসিদ্ধি করিয়াছেন বটে, কিন্তু তোমার প্রিয়তমা—আমাকে, আমার—শ্যামকে, শ্যামের—গোপালকে দেওয়াই তাঁহার কর্ম্ম, ব্যভিচারের উপর তাঁহার বিদ্বেষের গন্ধও ছিল না ; কাজে কাজেই কে তাঁহার হস্তে একটি যুবতী দিয়া দোষের ভার গ্রহণ করিতে পারে।

অবরোহ প্রণালীতে আরও কিছু দূর অতিক্রম করিয়া সুরসিক সুকবি কালিদাসকে দেখ, তবেই তুমি সন্তুষ্ট হইবে। তিনি এক জন যুবতীপ্রধান-লোক, যুবতীর পক্ষপাতী, স্ত্রীলোকের যৌবন তার চির-পরিচিত এবং তাঁহার কাব্য সকলও রস-প্রধান। ছন্দ লিখিতে লিখিতেও তিনি বলেন "ঘনকুচ-যুগ্মে শশি-বদনাসৌ"। সুখ দুঃখবিহীন নির্গুণ পদার্থকে তিনি মোক্ষ বলেন না মদকল মদিরাক্ষীর নীবি মোক্ষকেই তিনি মোক্ষ বলেন, তাঁহাকেই এ বিষয়ের মীমাংসা করিতে দেওয়া তোমার উচিত। কিন্তু ফুলের সঙ্গে যুবতীর ভাল-মন্দের বিচার করিতে দিলে তিনি কি বলেন ;—বলিতে পারি না।

এখন তোমার পূর্ণযৌবনা প্রিয়তমা, আর একটি ফুটন্ত ফুল তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া দেখ! তিনি কার আদর করেন ও কাহাকেই বা ভাল বলেন। তবে তুমি বলিতে পার যে, যখন তাঁহার কাছে যুবতী নাই তখন আমি আমার প্রিয়তমাকে তাঁহার নিকট বসাইতে পারিব না। একথা মন্দ নহে। আমি সময় বাছিয়া দিতেছি ;—

যখন তিনি অন্তর্জ্জগৎ ও বহির্জ্জগতকে হস্তের মুষ্টি মধ্যে আনিয়াছেন, চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া, তাহার সর্ব্বস্বধন শকুন্তলার যৌবন চিত্রিত করিতেছেন। এবং শকুন্তলাকে সহকার পাদপের পুরোবর্ত্তিনী করিয়াছেন। প্রিয়ম্বদার প্রণয় সম্ভাষণে তাহাকে হাসাইতেছেন এবং দুষ্মন্তের মুখে "অধরঃ-কিসলয়রাগঃ

কোমলবিটপানুকারিণৌ বাহূ” এইমাত্র বলিয়াই, বিস্ফারিত নয়নে আবার নবযৌবনা শকুন্তলার প্রতি চাহিয়া আছেন; তখন তোমার পূর্ণযৌবনা প্রিয়তমা আর একটি বিকসিত গোলাপ তাহার সম্মুখে রাখিলে; তিনিও দেখিলেন এবং বলিয়া উঠিলেন;—“কুসুমমিব লোভনীয়ং যৌবনমঙ্গেষু সন্নদ্ধং”। এই কথাতেই তোমার প্রশ্নের মীমাংসাও করিলেন। শকুন্তলার যৌবনকে তিনি ফুলের মত লোভনীয় বলিলেন;—শকুন্তলার যৌবন অপেক্ষা ফুল তাঁহার চক্ষে আরও ভাল লাগিল; তবেই বুঝিতে হইবে যে, তোমার প্রিয়তমাকে তিনি ফুলের মত সুন্দরী বলিলেন না।তাই বলি একটি ফুটন্ত ফুলের মত কি তোমার প্রিয়তমা সুন্দরী?

ভূমণ্ডলের কতস্থানে কত রকমের ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে, কত ভাবভঙ্গির সহিত হেলিয়া দুলিয়া খেলিতেছে। নাচিতেছে, সোহাগে গলিয়া পড়িতেছে তোমাকে তোমার প্রিয়তমাকে সাজাইতেছে, মাতাইতেছে, ইচ্ছা হইলেই তুলিতেছ, প্রিয়তমার অঙ্গভূষণ রচনা করিয়া দিতেছ;—খোঁপায় দিতেছ মালা গাঁথিছ গলায় পড়িতেছ পড়াইতেছ, দিবারাত্র উঠিতে বসিতে শুইতে ফুলের সঙ্গে ক্রীড়া করিতেছ। কিন্তু ফুলের কোন্ পাপড়ীটি, অন্তরাবরণ ও কোন্‌টিকে বহিরাবরণ বলে, জিজ্ঞাসা করিলেই তোমার চিত্ত স্থির! বীজউৎপত্তির কথা তোমাকে আর বলিতে হইবেনা সে কথা আমিই বলিতেছি। প্রিয়তম! শুনিতে ইচ্ছা হয় পড় না হয় আর পড়িওনা সেও ভাল।

যেমন স্ত্রীপুরুষের সহযোগে, মনুষ্য পশু পক্ষি প্রভৃতির সন্তান জন্মিয়া থাকে, বৃক্ষলতাদিরও স্বাভাবিক উৎপত্তি ঠিক সেইরূপ, পুংকেশরের অগ্রভাগ ফাটিয়া যে রেণু বাহির হয়, তাহাই পুরুষের কার্য্য সম্পাদন করে, এবং গর্ভকেশর তাহা ধারণ করিয়া, আভ্যন্তরিক জরায়ুর কার্য্য করিয়া থাকে। বৃক্ষ লতাদির বৈজিক বিষয় অনুশীলন করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। তুমি ফুল ভাল বাস বলিয়াই তোমাকে ফুলের কথা বলিতেছি।

বৃক্ষলতাদির উৎপত্তি দুই প্রকার স্বাভাবিক ও কৌশলিক স্বভাবতঃ বীজ হইতে যে সকল বৃক্ষাদির উৎপত্তি হয় তাহাকে স্বাভাবিক, এবং মনুষ্যেরা নিজের বুদ্ধি কৌশলে যে সকল বৃক্ষাদির উৎপত্তি করিয়া থাকে, তাহাকে কৌশলিক উৎপত্তি কহে। কৌশলিক উৎপত্তি ছয় প্রকার;—জারজ, শাখাকলম, দাবাকলম, গুলকলম, চোককলম ও পত্রকলম।

সমজাতীয় দুইটি ভিন্ন ভিন্ন বৃক্ষের সংযোগে যে বীজ উৎপন্ন হয়; তাহাই জারজ বা শঙ্কর। যেমন অশ্ব ও গর্দ্দভের সহযোগে নবজাতীয় এক প্রকার অশ্বতর উৎপন্ন হইয়া থাকে, তেমনি এক সমজাতীয় পুষ্পের পুংকেশরের রেণু

অপর সমজাতীয় পুষ্পের গর্ভ-কেশরে নিক্ষেপ করিলে, তন্নিবন্ধন বীজ হইতে যে সকল বৃক্ষ জন্মিবে; তাহারা পূর্ব্বোক্ত দুইটি বৃক্ষের সমান না হইয়া, কোন না কোন অংশে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। কোন কোন বৃক্ষের এক বারে সমস্ত অংশও পরিবর্ত্তিত হইতে দেখা যায়। কাহার পত্র, পুষ্প বা বর্ণ প্রভৃতি কোন না কোন অংশ যে নূতন অবয়বে পরিণত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই, তাহা হইলেই সৃষ্টির মধ্যে নূতন উপায়ে নূতন নূতন বৃক্ষ জন্মিবার আর অসম্ভাবনা রহিল না। অনেকেই অনুমান করেন বৃক্ষলতাদির শঙ্কর উৎপত্তির প্রথা ভ্রমর বা মধুমক্ষিকা প্রভৃতি দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়া থাকিবে ইহা অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না, প্রাচীন কাব্যে কোথাও কোথাও তাহার আভাসও দেখিতে পাওয়া যায়। " কুমুদ্বতীরেণু পিসঙ্গ বিগ্রহং নিরাস ভৃঙ্গং কুপিতেচ পদ্মিনী "।

প্রিয়দর্শন তোমার প্রিয়তমা আর তরুলতার প্রতিমূর্ত্তিতে কোন প্রভেদ নাই, উভয়ই কৃশাঙ্গী, উভয়ই বিলাসভরে হেলিয়া দুলিয়া খেলিতে ভালবাসে এবং তুমি আর কালাদানা দুজনেই সমান; লোকের অন্তঃসত্ব পর্য্যন্তও বাহির করিয়া লইতে ত্রুটি কর না, সুতরাং একটি তরুলতা ও কালাদানার উপর আপনার শিক্ষা কৌশলের পরীক্ষা করাই তোমার উচিত; কিন্তু যদি তরুলতার লালফুল আর কালাদানারও লাল ফুল হয়; তবে জারজ বৃক্ষের ফুলও লাল হইবে; সুতরাং তোমার কৌশল ও পরিশ্রম সকল বিফল হইবে। তাই বলি যেন দুইটি গাছের ফুল এক বর্ণের না হয়। একটি শ্বেত ফুলের কালাদানার পুংকেশরের রেণু পালক কিম্বা অন্য কোন প্রকার কোমল বস্তুদ্বারা তুলিয়া লইয়া (অথবা ফুলটি ছিড়িয়াও লইতে পার) একটি লালফুলের তরুলতার গর্ভকেশরের উপর নিক্ষিপ্ত করিবে। কিন্তু যে পুষ্পটির গর্ভকেশরে রেণু সংযোজিত হইবে, তাহার গর্ভকেশরের অগ্রভাগ বিকশিত হইবার পূর্ব্বে তাহারই অস্ফুট পুংকেশরগুলি কাটিয়া দিতে হইবে, নতুবা স্বাভাবিক বীজের মতই হইবে। অনন্তর পূর্ব্বোক্ত রেণু সকল গর্ভকেশরের আভ্যন্তরিক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র দ্বারা বীজকোষে প্রবিষ্ট হইয়া, ঐশীশক্তির বশবর্ত্তী হইয়াই হউক, আর স্বভাবের ক্ষমতা অনুসারেই হউক, ক্রমশঃ বীজভাবে পরিণত হইবে; উক্ত বীজ হইতে যে সকল বৃক্ষাদি জন্মিয়া থাকে, তাহাদিগকেই জারজ বৃক্ষ বলে ইহাতেই পূর্ব্বোক্ত নিয়মগুলি দেখাইতে পারিবে। ইদানীং দিন দিন জারজের সংখ্যাই বাড়িতেছে।

(ক্রমশঃ)

মনোযোগ।

কালিদাস রঘুবংশের প্রারম্ভে দিলীপ রাজার বর্ণনাস্থলে কহিয়াছেন যে "তিনি অনাসক্ত হইয়া সুখ অনুভব করিতেন।" অনাসক্ত হইয়া সুখভোগ করিতে পারা সাংসারিকতার একটী সুচিহ্ন। আমাদের বলিবার অভিপ্রায় এই যে,যাহারা অনাসক্ত ভাবে কার্য্য করিতে পারে, তাহারাই সংসারে কৃতকার্য্যতা লাভ করে। লোকে সচরাচর কহিয়া থাকে যে, দাবা খেলিবার সময় কেহ কেহ এরূপ আসক্তভাবে ক্রীড়াসুখ অনুভব করে যে, তোমার ছেলেকে সাপে কামড়াইয়াছে বলিলেও সহসা সেকথা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। হয়তো অনাবেশবশে একথাও জিজ্ঞাসা করে যে, "কাদের সাপ।" বিষয়বিশেষে এরূপ আসক্তমনোযোগ হইলে নিশ্চয়ই মনুষ্যের অকল্যাণ হয় এবং কখনই সাংসারিক উন্নতি হয় না। এইজন্যই কবিরা চিরকাল দুঃখী। এইজন্যই সরস্বতীর সহিত লক্ষ্মীর বিরোধ। সরস্বতীর উপাসকেরা প্রায়ই অনাবিষ্ট হয়, কেবল সরস্বতীর উপাসনাতেই একাগ্রদৃষ্টি থাকে ও মনঃসুখ অনুভব করে, অন্যান্য সাংসারিক বিষয়ে মনোযোগ করে না। আর্কীমিডিস্ অঙ্কশাস্ত্রের একটী প্রশ্ন লইয়া এরূপ আসক্তমনোযোগ ছিলেন যে, শত্রুরা সশস্ত্রে তাঁহার সম্মুখীন হইলেও, তিনি তাহা দেখিতে পান নাই। ইহাতে তাঁহার কি লাভ হইয়াছিল? তৎক্ষণাৎ প্রাণদণ্ড হইয়াছিল। মনোযোগের আসক্তি হইলে,যেবিপদ উপস্থিত হয়,তৎসম্বন্ধে ঈষপের গল্পটী বেশ নিদর্শন। তাঁহার গল্প এই যে, একজন জ্যোতির্ব্বিৎ উর্দ্ধমুখে আকাশ দেখিতে দেখিতে চলিয়া যাইতেছিলেন, পথে একটী কূপ ছিল, তাহাতে নিপতিত হইলেন এবং চীৎকার করিয়া কহিলেন, ভাই হে, কে আছ, আমাকে উঠাও। এক কৃষক ঐপথে যাইতেছিল। সে তাঁহাকে উঠাইল এবং জিজ্ঞাসা পূর্ব্বক সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া কহিল, তুমি আকাশের সংবাদ লইয়া এত ব্যস্ত যে, যে পথে চলিয়া যাও, তাহার কোন সংবাদ রাখ নাই।

ফলতঃ যে ব্যক্তি বিষয়বিশেষে একাগ্র, নিশ্চয়ই তাহার অকল্যাণ হয়। পৃথিবীতে জন্মিয়া চারিদিকের সংবাদ রাখিতে হয়। আর্য্যজাতির অবনতির একটী প্রধান কারণ, যে, বিষয়বিশেষে বিশেষ মনোযোগ বশতঃ তাঁহারা প্রকৃত সাংসারিকতা উপার্জ্জন করিতে অক্ষম ছিলেন। ভারতবর্ষের বাসী, ভারতবর্ষেই মনোযোগ, পার্শ্ববর্ত্তী জাতিবর্গ কি করিতেছে, তাহার

ইতিহাস রাখিতেন না। ব্রাহ্মণেরা অনেকস্থলে বেদাদি লইয়া ব্যতিব্যস্ত, বাহ্যবস্তু সম্বন্ধে এত অনাদর যে, বনের মধ্যে বসিয়া একাকী তপস্যা করিতে পারিলেই, সর্ব্বাপেক্ষা তৃপ্তিবোধ করিতেন।

বিষয়বিশেষে ব্যতিব্যস্ত হইলে অন্যান্য বিষয়সম্বন্ধে মানুষের এক প্রকার অরুচি হয়। স্কুলমাষ্টারেরা, ইতিহাসের কথা হউক, সাহিত্যাদির কথা হউক, মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিতে পারেন; কিন্তু সাংসারিক কোন একটা কথা পড়িলে, প্রায়ই সেস্থান হইতে গাত্রোত্থান করিতে পারিলেই সন্তুষ্ট হন। এক এক জন লোক, দেখা যায়, পুস্তকও পড়িতেছে, বিষয়চেষ্টাও করিতেছে, গল্পও শুনিতেছে, আইন কাননের দুই একটা তর্ক বিতর্কও করিতেছে, কিছুতেই বেজার নাই। সকলের কথাই শুনিতেছে, সকলকেই সন্তুষ্ট করিতেছে। আর, এক এক জন লোক কেবল বিষয়বিশেষে আবেশ করিতে পটু,—কেবল ব্যক্তিবিশেষের সহিতই আমোদ করিতে পটু, কেবল স্থানবিশেষে অবস্থান করিতে পটু, কেবল ভোগবিশেষের আস্বাদগ্রহণেই পটু। হয়ত, ব্যক্তিবিশেষের সহিত এরূপ গাঢ় আলাপ করিতেছে যে, অন্য আগন্তুক সম্মুখে আসিলে, তাহাকে অভ্যর্থনা করিতে বিস্মৃতই হইতেছে, হয়ত অন্য ব্যক্তি সম্মুখে আসিলে তাহার প্রতি বিরক্তই হইতেছে, মনে মনে করিতেছে যে, কেন এমন সময়ে আসিল,—গল্পে এমনই আসক্ত হইয়াছে যে, হঠাৎ ছেদ হইলে বা শ্রবণকারী অপর ব্যক্তির কথায় অবান্তর মনোযোগ করিলে, বড়ই রসভঙ্গবেদনা অনুভব করিতেছে। এক এক ব্যক্তিকে দেখিয়াছি যে, নিজের কথা লইয়াই আসক্তমনোযোগ, তৎসম্বন্ধে এত জল্পনা করিতেছে যে অন্যের কথা শুনিবার অবসরই পাইতেছে না, হয়তো বলিয়াই বসিতেছে যে, "থামুন মহাশয়, আমার কথাটার শেষ হউক্।" এক এক জন লোককে দেখিয়াছি, যে, গাঢ় ভাবে গল্প করিতেছে, হঠাৎ শ্রবণকারী বিষয়ান্তরে মনোযোগ করাতে মনের মধ্যে ছট ফট্ করিতেছে, শ্রবণকারীর মনোযোগ কতক্ষণে, প্রত্যাবৃত্ত হয়, তজ্জন্য অধীর হইয়াছে। শ্রবণকারী যতক্ষণ অন্য ব্যক্তির সহিত কথা কহিতেছিল, ততক্ষণ সেও আপনার মনের সহিত কথা কহিতেছিল, এমন কি, মনে মনে নিজের কথা এরূপ গাঢ় ভাবে আলোচনা করিতেছিল যে, মধ্যে অপর ব্যক্তির সহিত শ্রবণকারীর যে কি আলাপ হইয়াছিল তাহা কিছুমাত্র শ্রবণ করিতে পারে নাই। এরূপ লোককে চৌকস্ লোক বলে না। সংসারে চৌকস্ লোক সেই, যে, সকলের কথাই শুনিতে পারে। এবং সকল দিকেই দৃষ্টি রাখিতে পারে। এইরূপ লোকেই সাংসারিক উন্নতির অধিকারী হয়।

ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে, বড় অধিক দূর যাইতে হয় না। ঈশ্বর

মানুষকে বহুবস্তুপরিবেষ্টিত করিয়াছেন, বহুবস্তুর সহিতই তাহার মন ও শরীরের সম্বন্ধ আছে। অতএব কেবল বস্তুবিশেষের প্রতি আসক্ত-দৃষ্টি হইলেই তাহার সাংসারিক শ্রেয়ঃ হইতে পারে না। সাহেবেরা এ কথাটী বেশ বুঝে। উহারা আপনাদের ছেলেদিগকে পর্য্যন্ত এইরূপ ভাবে শিক্ষা দেয়। এ বস্তুর নাম এই, এ বস্তুর এই গুণ, ইহা এইরূপে প্রস্তুত করে, ইহার সহিত এইরূপ ব্যবহার করিতে হয়, 'এইরূপ শিক্ষা সামান্য সামান্য ভাবে উহারা ছেলেদিগকেও প্রদান করিয়া থাকে। আমাদের ছেলেরা এরূপ কোন প্রশ্নই করিতে শিখে না, শিখিলেও আমরা উৎসাহ দিনা। প্রায়ই বলিয়া বসি যে, তোর ও সকল জিজ্ঞাসায় কাজ কি বাপু, জেঠামী শিখিতেছিস্ কেন? সর উইলিয়ম জোনসের জননী, জোন্‌স কোন কথা জিজ্ঞাসিলে, তাঁহাকে পুস্তকের উপর বরাত দিয়া বসিতেন, কহিতেন যে, বই পড়, তাহা হইলেই এ প্রশ্নের উত্তর পাইবে। আমরা ততদূর পর্য্যন্তও যাই না, আমরা প্রায়ই ধমক দিয়া থাকি "ছেলের মুখে বুড়োর কথা কেন" এইরূপ ভৎর্সনা করিয়া উৎসাহ ভঙ্গ করি। আমাদের অর্থাৎ বাঙ্গালীর মতটাই যেন এই, যে, যে বিষয় লইয়া ব্যস্ত, সে সেই বিষয় লইয়া ব্যস্ত থাকিলেই শোভা পায়। ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত ভট্টাচার্য্যের ব্যবসায়ই করুক্, তাহার মুখে আবার আইনের তর্ক কেন? জমিদারের গোমস্তা টাকারই তহসীল করুক্, তাহার আবার সাহিত্য পাঠ কেন, আমাদের মতটা যেন অনেকটা এইরূপ বলিয়া বোধ হয়।

রাজমন্ত্রী গ্লাড্‌ষ্টোন সাহেবকে মন্ত্রিত্বের উমেদারী অবস্থায় ইংলণ্ডের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া প্রচলিত রাজনীতির দোষাদোষ বিষয়ে নানাসময় নানাবিধ বক্তৃতা করিতে হইয়াছিল এবং তৎপূর্ব্ব মন্ত্রী বিকন্স-ফিল্‌ডকে পদচ্যুত করিবার নিমিত্ত অসংখ্য উপায় উদ্ভাবন ও অসংখ্য লোককে দলভুক্ত করিতে হইয়াছিল, এমন কি, তাঁহার দিবারাত্র আহার নিদ্রা ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু যখন সংবাদপত্রে প্রকাশ হইল, যে, এইরূপ অনবসর সময়েও তিনি মধ্যে মধ্যে যে সকল কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে এক খানি অতি স্বল্পকায় পুস্তক হইয়াছে, তখন আমরা মনে মনে চমৎকৃত হইয়াছিলাম। নিতান্ত সদ্ভাবেই যে চমৎকৃত হইয়াছিলাম, তাহা বলিতে সাহস করি না, কিছু অসদ্ভাবও ছিল। অর্থাৎ, আমরা তাঁহাকে তাঁহার কবিতাপ্রিয়তার জন্য মনে মনে বিশুদ্ধ ভক্তি করিতে পারি নাই, কিছু পরিহাসও করিয়াছিলাম। লোকটার খেপামিও মন্দ নয়, এত ঝঞ্ঝাটের মধ্যেও কাব্যরস, এইরূপ ভাবনা, বোধ হয়, আমাদের মনে হইয়াছিল।

কিন্তু এরূপ ভাবনা অন্যায়। কেননা, যে আমরা এরূপ ভাবনাকে স্থান দি, সে আমরা যে অবশ্যই সাংসারিক উন্নতি সম্বন্ধে গ্লাড্‌ষ্টোন অপেক্ষা অনেক নীচ, তাহার প্রমাণ তাঁহার মন্ত্রিত্বপদই প্রদান করিতেছে।

কেহ হয় তো বলিতে পারেন যে, সার্‌ আইজাক্‌ নিউটন তো এক জন বড় লোক ছিলেন, অথচ তাঁহার মনোযোগ বিষয়বিশেষে এরূপ আবিষ্ট হইত, যে, পরিজনেরা তাঁহার সম্মুখে আহার আনিয়া ধরিলেও, তিনি অনেক সময়ে দেখিতে পাইতেন না। এ বিষয়ে আমাদের এইমাত্র বক্তব্য যে, নিউটন্‌ দিবারাত্রই ঐরূপ আবিষ্ট থাকিতেন, এরূপ নহে। তিনি গবর্ণমেণ্টের চাকরীও করিতেন, লোকসমাজে যাতায়াতও করিতেন, বিষয় কার্য্যে বুদ্ধিমত্তাও দেখাইতেন। অথচ রচনা সম্বন্ধে যখন আবিষ্ট হইতেন, তখন আবিষ্ট হইতেন। আমরা সেই মনোযোগেরই নিন্দা করিতেছি, যে মনোযোগ উপস্থিত বিষয়কে পরিত্যাগ করিয়া অনুপস্থিত বিষয়ে আসক্ত থাকে। আমাদের কথা এই, যখন যে বিষয় সম্মুখীন হইতেছে, তখন সেই বিষয়ে মনোযোগ কর। মিলটন হও, কবিতাও লেখ, অথচ, পার্লেমেণ্টের কাজও কর। এডিসন হও, প্রবন্ধও লেখ, অথচ সেক্রেটারীর কাজও কর। মিল্‌ হও, পলিটিকেল ইকনমিও লেখ, অথচ ইণ্ডিয়ান্‌ হাউসের কাজও দেখ। মেকলে হও, বক্তৃতাও লেখ, অথচ লেজিসলেটিভ্‌ কাউন্‌সিলের ড্রাফ্‌টও কর। বাস্তবিক দেখিতে গেলে, বড় বড় গ্রন্থকার যত, তাহারা প্রায়ই বড় বড় রাজসংসারের বড় বড় কর্ম্মচারী।

আর, আমাদের সংস্কারই এই যে, যে সকল গ্রন্থকার কেবল পুস্তকগতবিদ্য, তাহাদের চিন্তাশক্তি পরিমার্জ্জিত হয় না এবং রচনায় মিতভাষিতাও হয় না। লোকবৃত্তির বিশেষ পরিশীলন না থাকিলে, বহুভাষিতা দোষ হয়। দেখ, গোল্ড্‌স্মিথের সকল কথা নির্দ্দোষ হয় না এবং সকল কথার ওজন থাকে না। তথাপি, শিক্ষার প্রথা উৎকৃষ্ট বলিয়া ইংলণ্ডের লোকেরা পুস্তকাভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গেই অনেক বিষয়ে বহুদর্শন লাভ করে। সুতরাং ইংলণ্ডের কোন গ্রন্থকার পুস্তকস্থবিদ্য হইলেও, তাঁহার লেখায় নিতান্ত অসাংসারিক ভাবের পরিচয় হয় না। কিন্তু আমাদের সাধারণ সমাজ ইংলণ্ডের ন্যায় বিষয়জ্ঞানশিক্ষার স্থল নহে।

আমাদের সংস্কারই এই যে, লেখক বিষয়জ্ঞানসম্পন্ন না হইলে, তাঁহার লেখায় সহৃদয়তা থাকে না। সুতরাং তাহা সমাজে কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারে না। আমরা সংস্কৃত আলঙ্কারিকদিগের গ্রন্থে বহুতর কাব্যের উল্লেখ দেখিতে পাই, সে সকল কাব্য এখন বর্ত্তমান নাই। আমাদের বোধ হয় যে, সে সকল কাব্যের

অধিকাংশই অব্যবসায়ী ভট্টাচার্য্য পণ্ডিতের লেখা, সুতরাং সহৃদয়তার অভাবে সমাজের উপযোগী না হওয়াতে, ক্রমে ক্রমে হতাদর ও বিলুপ্ত হইয়াছে। দেখ, ব্যবস্থাপক মুনিদিগের লেখা বহু পুরাতন হইলেও জীবিত আছে। ইহার কারণ এই যে, রাজসংসারের সহিত ব্যবস্থাপক মুনিমাত্রেরই প্রায় সম্বন্ধ ছিল। রাজসংসার বিষয়বিজ্ঞানের আকর, পাঠক এইমাত্র স্মরণ করিলেই আমাদের সিদ্ধান্তের অনুমোদন করিতে পারিবেন। বাল্মীকিও কবি, ব্যাসও কবি। কিন্তু ব্যাসের সহৃদয়তা অধিক, সংসারের সহিত ব্যাসের সম্পর্কও অধিক। দেখ, ব্যাসদেব মহাভারতও লিখিতেন, আবার দুর্য্যোধন প্রভৃতির সভাতেও অনুপস্থিত হইতেন না। অর্জ্জুন ও অশ্বত্থামার বাণে বাণে ঝগড়া লাগিয়াছে, ব্যাসদেব সেখানেও মীমাংসা করিতেছেন। নির্জ্জন গহনে অতিকঠোর তপস্যাও করিতেছেন, আবার বিচিত্রবীর্য্যের অন্তঃপুরের সংসার কার্য্যও নির্ব্বাহ করিতেছেন। কাশীনির্ম্মাণ প্রভৃতি অতিদুষ্কর রাজকার্য্যেও শিবপ্রভৃতির সহিত তাঁহার প্রতিযোগিতা দেখা যায়। নব্য কবিদের মধ্যেও দেখ। প্রথমতঃ কালিদাস, ইনিতো বিক্রমাদিত্যের সভাসদ ছিলেন। বররুচি প্রভৃতি অন্যান্য কয়েক জন বিখ্যাতনামা পণ্ডিতও ঐ সভায় কর্ম্মচারী ছিলেন। মাঘ ও ভারবি ও তত্তৎকালের রাজাবিশেষের রাজমন্ত্রী ছিলেন। বিশ্বনাথ কবিরাজ একজন ভাল আলঙ্কারিক। তিনিও রাজমন্ত্রী ছিলেন। এইরূপ অনুসন্ধান করিলে, প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, যে সকল সংস্কৃতগ্রন্থকারের পুস্তক অদ্যাপি জীবিত আছে, তাঁহারা প্রায়ই বড় লোক অর্থাৎ বড় বড় লোকের বড় বড় কর্ম্মচারী ছিলেন। অর্থাৎ তাঁহাদের বিষয়জ্ঞান ছিল। ফলতঃ, শুদ্ধ ঘরে বসিয়া লিখিলে, অর্থাৎ সংসারের সংবাদ না জানিয়া লিখিলে, সে লেখা সংসারীর অনুমোদিত হয় না। সে লেখা অবশ্যই কিছু না কিছু অসহৃদয় হয়। বাঙ্গালি গ্রন্থকারদের মধ্যেও অনুসন্ধান করিয়া দেখ। পুরাতন কবিদিগের মধ্যে ভারতচন্দ্রের বিশেষ নাম আছে, ইনি কৃষ্ণচন্দ্র রাজার কর্ম্মচারী ছিলেন। বর্ত্তমানে বিদ্যাসাগর মহাশয় একজন বিখ্যাত গ্রন্থকার। লোকবিজ্ঞান ও বিষয়জ্ঞান সম্বন্ধে ইহাঁর অবশ্য অল্প যশ নাই। ইনি ইংরাজ ও বাঙ্গালী বহুবিধ লোকের চিত্ত পরিজ্ঞান করিয়াছেন। দেখ, দীনবন্ধু বাবু ও বঙ্কিম বাবু। ইহাঁরাও রাজসংসারের কর্ম্মচারী এবং বিশেষ গৌরবান্বিত কর্ম্মচারী, সন্দেহ নাই। বাবু রমেশচন্দ্র দত্তকেও দেখ। ইহাঁর বিষয়জ্ঞান যতই বাড়িতেছে, লেখাও তত ভাল হইতেছে; বাবু অক্ষয় কুমার দত্ত— ইহাঁর রচনায় বিশেষ সহৃদয়তা আছে এবং ইনি অবশ্য নিতান্ত অসাংসারিক বলিয়া পরিচিত নাই। বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায়, অঙ্গুরীয় বিনিময় ভিন্ন ইহাঁর কোন

বিশেষ রচনা দেখি নাই, কিন্তু কোন রচনায় সহৃদয়তার অভাবও দেখি নাই। বরং আমাদের ইহাই মনে হয় যে, সাংসারিক উন্নতির দিকে অতিরিক্ত মনোযোগ না থাকিলে, ইনি একজন সামান্য গ্রন্থকার হইতেন না। যে সকল লেখায় ইনি বিশেষ মনোযোগ দিয়াছেন, তন্মধ্যে অধিকাংশই ইংরাজী রিপোর্ট এবং আমরা জানি যে, ঐ সকল রিপোর্টের রচনা অতি উৎকৃষ্ট। কাদম্বরীলেখক তারাশঙ্কর, ইঁহার লেখাও অতি উৎকৃষ্ট। ইনি প্রথম বয়সেই একজন রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন, লেখকতা সম্বন্ধে ইঁহারও যথেষ্ট প্রশংসা আছে। যদিও ইনি শিক্ষাবিভাগের লোক,কিন্তু সাংসারিক বিচক্ষণতা সম্বন্ধেও ইঁহার স্বল্প নাম নাই। দেখ, বান্ধবের সম্পাদক কেমন উৎকৃষ্ট লেখেন। দেখ, বঙ্গদর্শন কেমন হৃদয়গ্রাহী, কিন্তু দেখ, আর্য্যদর্শনের রচনা একটু গোল্ডস্মিথের মত। ভারতীর লেখাও ভাল, কিন্তু বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বহুগুণসম্পন্ন হইলেও যে, একটু উন্মনা ও অসাংসারিক, তাহা আমরা তাঁহার সহস্র পক্ষপাতী হইলেও স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারি না। অন্যান্য অনেক লোকেও অনেকপ্রকার মাসিক পত্র বাহির করিয়া নিরস্ত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা যে বিশেষ সাংসারিক লোক, তাহা আমরা জানিতে পারি নাই।

ফলতঃ, আমরা সাংসারিক মনোযোগের এত পক্ষপাতী যে, আমরা সময়ে সময়ে এত দূরও মনে করিয়া থাকি যে, বোপদেব রাজকর্ম্মচারী অর্থাৎ বিষয়জ্ঞানী না হইলে, তাঁহার রচিত মুগ্ধবোধ এত সংক্ষেপের উপর অত সর্ব্বাঙ্গীন হইত না। আমাদের এত দূরও মনে হয়, যে, ইউক্লিড নিশ্চয়ই বিষয়বিশারদ ছিলেন। নতুবা তিনি ওরূপ মিতভাষিতা ও সরলতা কিরূপে শিক্ষা করিলেন। অসাংসারিক লোকদের রচনায় নিশ্চয়ই জড়তা ও আড়ম্বর প্রকাশ হইয়া থাকে এবং বিশেষ একটা কায়দা কানন থাকে না। দেখ, সাধারণতঃ এসিয়াটিক্ রিসার্চের লেখকগণ—ইহাদের মধ্যে কয় জন লোক ছাঁকা ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত? যে সর-উইলিয়ম জোন্স উক্ত সোসাইটীর প্রবর্ত্তক, তিনিই তো একজন বিখ্যাত রাজ-কর্ম্মচারী।

কিন্তু আমাদের বোধ হয় যে, সাংসারিকতা রচনাসম্বন্ধে সহস্র উপযোগী হই-লেও, রচনার গভীরতা পক্ষে অনুপযোগী। অত্যন্ত সাংসারিক হইব অথচ যখন রচনা লিখিব, তখন বাহ্য জগৎ একেবারেই মন হইতে তিরস্কৃত করিতে পারিব, এরূপ আশা, বোধ হয়, করা যায় না। এইজন্য আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, সাংসারিকের রচনা প্রাঞ্জল, পরিমিত, সুসন্নিবিষ্ট, সুপ্রতিষ্ঠিত ও নিরাড়ম্বর হইলেও, হয়তো, গম্ভীর হইতে পারে না। লেখক ধ্যানমগ্ন হইয়া

রচনা করিতে পারিলে, লেখার যে গভীরতা ও অবিচ্ছিন্নতা হয়, সাংসারিক-লোকের রচনায় সেরূপ হইতে পারে কি না, সে বিষয়ে আবার সন্দেহ আছে। ডিসরেলির নভেল পড়, গ্লাডষ্টোনের বক্তৃতা পড়, লর্ড লিটনের কবিতা পড়, বোধ হইবে, লেখা যেন ভাসা ভাসা হইতেছে। মনোযোগ একতাড়া চলিলে, অর্থাৎ অবিচ্ছেদে চলিলে, লেখা, স্রোতের ন্যায়, বহমান হয় এবং পাঠককে ভাসাইয়া লইয়া যায়। সে শক্তি কথিত মহাশয়দিগের লেখায় আছে কি না, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। পার্লেমেন্টের বক্তামাত্রেরই ভাষা যেন এইরূপ ভাসা ভাসা বোধ হয়। যেকলে এবিষয়ে যাহা কহিয়াছেন, তাহা এস্থলে উদ্ধার করিলে, যথেষ্ট হইবে। তিনি গ্লাড্‌ষ্টোনের চর্চ্চ এণ্ড ষ্টেট নামক প্রবন্ধের উল্লেখ করিয়া কহেন যে, "হাউস্ আব্ কমন্স সভায় উন্নতি লাভ করিতেছেন এরূপ একজন নব্যলোকের কলম হইতে রাজনীতি সম্বন্ধে গভীর রচনা বাহির হইয়াছে, ইহা সুখের বিষয়।" একজন রাজব্যবসায়ীকে, না ভাবিয়া, না পড়িয়াই, কথা কহিতে হইবে এবং কার্য্য করিতে হইবে। হয়তো প্রস্তুত বিষয়ের তিনি কোন সংবাদই রাখেন না, তথাপি তাঁহাকে বক্তৃতা করিতেই হইবে। তাহাতে যে কৃতকার্য্যতা হইবে না এরূপ নহে, যদি তাঁহার সাহস থাকে, তবে তিনি অবশ্য দেখিতে পাইবেন যে, এরূপ অজ্ঞাত বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াও কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা আছে।

(ক্রমশঃ)।

শ্রীযশোদা নন্দন সরকার।

(প্রকীর্ণাংশ)

আর্য্যজাতির জ্ঞানবিজ্ঞান।

যে জাতি যে পরিমাণে উন্নত, সেই জাতি সেই পরিমাণে আত্মবিষয়ে জ্ঞানবান্ ইহা স্থির সিদ্ধান্ত। এক সময়ে আর্য্যজাতি পৃথিবীর মধ্যে উন্নতির চরম সীমায় আরোহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের আত্মবিষয়ে জ্ঞানেরও ঐপ্রকার উন্নতির পরাকাষ্ঠা উপস্থিত হইয়াছিল। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে, আত্মজ্ঞানই উন্নতির হেতু এবং আত্মবিস্মৃতিই অবনতির মূল ভিত্তি। অর্থাৎ, যখনকোন জাতি সহসা নীচ হইতে উচ্চ অবস্থায় উন্নীত হয়, তখন ইহা বুঝিতে হইবে, যে, সেই জাতির আত্মজ্ঞানের অধিকার হইয়াছে। আবার, উচ্চ হইতে নীচ অবস্থায় অবনীত

হইলে, অথবা, চির কালই পশুপক্ষ্যাদি ইতর প্রাণীর ন্যায় অবনত অবস্থান করিলে, ইহাই বুঝিতে হইবে, যে, আত্মজ্ঞানের অভাব হইয়া, আত্মবিস্মৃতির আবির্ভাব হইয়াছে। মানবসংসারে এ বিষয়ের শত শত দৃষ্টান্ত বা নিদর্শনের অভাব নাই। পৃথিবীর অতীত ও বর্ত্তমান সমুদায় ইতিহাসই এ বিষয়ের সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে। এতদ্ভিন্ন, মানুষের দৈনন্দিন ঘটনাও পর্য্যালোচনা করিলে, ইহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে ভাবিয়া এস্থলে আমরা বর্ত্তমান ইংরাজদিগকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ গ্রহণ করিতে অভিলাষ করি। ইংরাজ জাতি বর্ত্তমানে যেপ্রকার উন্নতির উচ্চসোপানে আরোহণ করিয়াছে, তাহাতে,অনেক বিষয়ে ইহাদিগকে দেবাংশ বলিলেও, বোধহয়, উপহাসাস্পদ হইতে হয় না। আর্য্যনীতিজ্ঞগণ দেবতার সহিত মনুষ্যের প্রভেদ নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন মনুষ্যের নিমেষ আছে, দেবতার নিমেষ নাই; মনুষ্যের মৃত্যু হইয়া থাকে, দেবতার মৃত্যু নাই, মনুষ্যের জরা আছে, দেবতা অজর এবং মনুষ্য পার্থিব, দেবতারা স্বর্গীয়। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে, নিমেষ, মৃত্যু, জরা ও পার্থিবতা এই কয়টীই মনুষ্যত্বের লক্ষণ। ব্যাস ও বশিষ্ঠ প্রভৃতি তত্বদর্শী মহর্ষিগণ কহিয়াছেন কোন বিষয়ের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম পরিদর্শনের অভাবকেই নিমেষ বলে। এই নিমেষ, আত্মজ্ঞানের প্রধান অন্তরায়। মানুষের মন ইন্দ্রিয়ের অনুসরণে আসক্তিবন্ধন পূর্ব্বক ক্ষণে ক্ষণে যে আত্মবিস্মৃত হয়, তাহাই নিমিষের প্রধান চিহ্ন। শিশুশরীর এই নিমিষের প্রধান আশ্রয়। এই জন্য আত্মবিস্মৃত ব্যক্তিদিগকে আর্য্য ঋষিগণ শিশু বা বালপ্রকৃতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এবং প্রসঙ্গতঃ ইহাও উপদেশ করিয়াছেন, শিশুকাল হইতেই যাহাতে এই নিমেষ বা অতাত্বিকতার দমন হয়, তদ্বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। এবং তজ্জন্য আত্মবিষয়ে জ্ঞানবান্ সুশিক্ষিত গুরুর শিক্ষাধীনে বালককে নিযুক্ত করা অবশ্য কর্ত্তব্য পরম ধর্ম্ম। বর্ত্তমানে ইংরাজ জাতির যেরূপ এবিষয়ে দৃঢ়তা ও একনিষ্ঠতা দেখিতে পাওয়া যায়, সেরূপ, বোধ হয়, আর কোন জাতিতেই সম্ভব নহে। এইজন্য ইহারা অনেকাংশে ভূদেবতা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। কিন্তু বিজ্ঞানের ইতিহাস বা সভ্যতার ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে, দেখিতে পাওয়া যায়, ইংরাজেরা যে যে উপায়ে সভ্য ও উন্নত হইয়াছে, তত্তৎ উপায়ের অতি স্বল্প অংশই তাহাদের নিজের বুদ্ধি ও বিদ্যাবলে আবিষ্কৃত বা উদ্ভাবিত। অথচ, তাহারা যাহাদের নিকট ঐ সকলের অধিকাংশ সংগ্রহ বা সঙ্কলন করিয়াছে, উন্নতি বিষয়ে অনেকাংশেই তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এইস্থলে একথা বলিলে, বোধ হয়, অসঙ্গত

হইবে না, যে, এক জন সুপ্রসিদ্ধ জর্ম্মন্ পণ্ডিত বলিয়াছেন, বর্ত্তমান সময়ে ইংরাজ জাতির ভাষা এরূপ সুমার্জ্জিত, সুসংস্কৃত ও সুসমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে যে, আর্য্যজাতির পরিকলিত সংস্কৃত ভাষা ভিন্ন পৃথিবীর আর কোন ভাষাই ইহার সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে না। অথচ এই ভাষার শব্দাদি অধিকাংশই অন্য ভাষা হইতে সংগৃহীত। অন্যান্য বিষয়েও তাহারা এইরূপে অন্যের নিকট ঋণী। কিন্তু বস্তুতঃ সেরূপ বোধ হওয়া সহজ নহে। একমাত্র নির্নিমেষতাই ইহার কারণ। অর্থাৎ, তাহাদের চক্ষুতে সামান্য ধূলা-মাটীও অমূল্য স্বর্ণরেণু বলিয়া বোধ হয়। এইরূপ প্রবাদ আছে, কোন স্থানে ভস্ম দেখিলেও, তাহারা তাহা পরিত্যাগ না করিয়া, যদি তাহার অভ্যন্তরে রত্ন থাকে, এই ভাবে তাহার অনুসন্ধান করে। অথবা, অঙ্গারের মধ্যে যে হীরক আছে, কে তাহা বলিয়া দিল? দারুণ কালকূটের মধ্যেও যে সঞ্জীবনী শক্তি বাস করে, তাহাই বা কে বলিয়া দিল? বোধ হয়, নিমেষশূন্যতাই এই সকল বলিয়া দিবার একমাত্র হেতু। ইংরাজজাতি এই নির্নিমেষতার ক্রীত দাস। সেই জন্য তাহারা দেবাংশ বলিয়া পরিগণিত।

তাহারা বাল্যকাল হইতেই এই নির্নিমেষতা অভ্যাস করে। এইজন্য তাহাদের শিশুগণও অনেকাংশে আমাদের দেশীয় যুবাগণের সমান। আমাদের দেশীয় শিশুগণের ত তাহাদের সহিত তুলনাই হয় না। ইহা একপ্রকার সিদ্ধান্ত বাক্য যে, উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্তের বলবত্তা অধিক ও অপরিহার্য্য। বিশেষতঃ, লোকে প্রধান ব্যক্তি যেপ্রকার অনুষ্ঠান করে, অপ্রধানেরা তাহার অনুসরণ করিয়া থাকে। সুতরাং, শিশুকাল হইতেই বাঙ্গালীর চরিত্র পরিণামভ্রষ্ট হইয়া থাকে, ইহাতে সন্দেহ কি? পিতা মাতা অপেক্ষা বাল্যকালের শিক্ষাগুরু, বোধ হয়, আর কেহই হইতে পারে না। সুতরাং পিতা মাতার যাহা কিছু দোষ, সমস্তই শিশুতে সংক্রামিত হইয়া থাকে। আমাদের প্রধান দোষ চঞ্চলতা। তাত্ত্বিকতা বা নির্নিমেষতার অভাবই চঞ্চলতার কারণ। এইজন্য, আমাদের উন্নতি সুদূরপরাহত হইয়াছে, এইজন্য আমরা আত্মার উৎকর্ষসাধনে ততদূর কৃতকার্য্য হইতে পারি না এবং এইজন্য, শতবৎসরেরও অধিক হইল, ইংরাজের অধীনে থাকিয়া আমরা প্রকৃত উন্নতির পথ পরিচয় করিতে পারিলাম না। বলিতে কি, এই চঞ্চলতা দোষেই আমাদের সকল বিষয়েই পিতা পুত্রেও অনৈক্য উপস্থিত হইয়া থাকে। আজি দশ জনে প্রতিজ্ঞা করিয়া, দেশের উন্নতির জন্য একটী সভা করিলাম, কালি সহসা পরস্পর অনৈক্য ঘটিয়া, পদ্মানদীর বেগে যেন তাহাকে কোথায় ভাসাইয়া দিল, আর চিহ্ন পর্য্যন্তও দেখিতে পাওয়া

যায় না। অন্যান্য সকল বিষয়েও এইরূপ। দুঃখের বিষয়, এ বিষয়ে ছোট বড় প্রভেদ নাই। এম্ এ প্রভৃতি অত্যুচ্চ উপাধিধারী সুশিক্ষিত হইতে পাঠশালার তালপত্রধারী বর্ণজ্ঞানশূন্য শিশু পর্য্যন্ত, সকলেরই প্রায় সমান ভাব ও সমান মতি-গতি, বলিলে বোধ হয়, অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু ইহা বোধ হয়, কাহাকে বলিতে হইবে না, যে, যে ব্যক্তি সর্ব্বদা সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম পরিদর্শন বা পরিকলন করে, তাহাকে সহসা কোন বিষয়ে ঠেকিতে বা ঠকিতে হয় না। প্রত্যুত, শাণ দ্বারা লৌহের ন্যায়, সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম পরিদর্শন দ্বারা বুদ্ধির একপ্রকার চাকচিক্য উপস্থিত হইয়া থাকে, যাহাতে, কোন বিষয়ই সামান্য ও বিশেষ আকারে প্রতিফলিত না হইয়া থাকিতে পারে না।

পুনশ্চ, মণ্ডর প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ নীতিকারগণের মতে জ্ঞানের অভাবকেই প্রধানতঃ মানুষের মৃত্যু বলিয়া থাকে। মহর্ষি ব্যাসদেবেরও এই মত। জ্ঞানশব্দের প্রকৃত অর্থ, সামান্য ও বিশেষরূপে কোন বিষয় বুঝা। সুতরাং, জ্ঞান দ্বিবিধ, সামান্য জ্ঞান ও বিশেষ জ্ঞান। শিশুগণের যে জ্ঞান, তাহাকে সামান্য জ্ঞান এবং যে জ্ঞানে পরোক্ষ অপরোক্ষ সকল বিষয়েরই হৃৎপ্রতীতি হইয়া, আত্মার সহিত ঈশ্বরের সাক্ষাৎ সম্পন্ন হয়, তাহাকে বিশেষ জ্ঞান অর্থাৎ বিজ্ঞান বলিয়া থাকে। এই বিজ্ঞানের অভাবই মৃত্যু। সমুদায় ইন্দ্রিয়ের নিরোধ হইয়া, চৈতন্যের লোপ হওয়াই মৃত্যুর প্রধান লক্ষণ। বিজ্ঞানের অসদ্ভাবেও এইপ্রকার অবস্থা উপস্থিত হইয়া থাকে। ফলতঃ মধুমক্ষিকা চিরকালই এক নিয়মে মধুক্রম নির্ম্মাণ করিতেছে; বাবুই পক্ষী চিরকালই সমক্রমে আপনার কুলায় প্রস্তুত করিতেছে; বীবর চিরকালই সেইভাবে নদীতীরে স্বকীয় বাসগৃহ রচনা করিতেছে, ঊর্ণনাভ চিরকালই সদৃশ বিধানে জাল গঠন করিতেছে এবং পক্ষিগণ চিরকালই পূর্ব্বানুক্রমে উড্ডয়নাদি করিতেছে। কোন কালেই কোনরূপে এসকল অর্থে তাহাদের উন্নতি নাই। এই সকল সামান্য জ্ঞানের লক্ষণ। সেইরূপ, মানুষ যদি চিরকালই সমান ভাবে আহার বিহার, শয়ন ও উপবেশনাদি করে, শিশ্নোদরপরিতৃপ্তিতেই যদি তাহার ইহলোকের যাবৎ প্রয়োজন সম্পন্ন হয়, অথবা, মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া, অভ্যাস বা অনুকরণ বলে ভাত, কাপড়, ডাল, মাছ, ইত্যাদি কতিপয় সামান্য বিষয়জ্ঞান সংগ্রহ করিয়া সমভাবে যদি তাহার বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্য সকল অবস্থাই অতীত হইয়া যায়; অথবা স্বর ও ব্যঞ্জনাদি বর্ণমালার অভ্যাস সহায়ে শিশুবোধাদি কতিপয় গ্রন্থ পাঠেই মানব-জীবন পর্য্যবসিত হয়, তাহা হইলে, পশু পক্ষ্যাদি ইতর প্রাণীর সহিত তাহার আর বিশেষ কি রহিল? অথবা, মানুষ যদি চিরকালই মানুষের দাস হইয়া, তাহারই

দুটা রচিত কথা দেববাক্যবৎ মুখস্থ বা উদরস্থ করিয়া সংসারযাত্রায় প্রবৃত্ত হয়, তাহাহইলে, ভারবাহক ইতর পশুর সহিত তাহার পার্থক্য সম্ভাবনা কোথায়? তত্ত্বদর্শী মনীষিগণ বলিয়াছেন, তাহাকেই বালকের অবস্থা কহে, যে অবস্থায় অবস্থিত হইলে, ইন্দ্রিয়সত্বেও নিরিন্দ্রিয় জড়ের ন্যায়, নিতান্ত অনুন্নত পরাধীন জীবন যাপন করিতে হয়।

বার্হস্পত্য সংহিতায় এই জ্ঞানের স্বরূপ অতি বিশদরূপে নির্ণীত হইয়াছে। যথা—

একদা দেবরাজ ইন্দ্র বৃহস্পতির প্রিয় শিষ্য বেদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন্! জ্ঞানের স্বভাব কি?"

বেদ কহিলেন, "দেবরাজ! জ্ঞানের স্বভাব এই, সে কখন ক্ষুণ্ণ, অবসন্ন ও কুণ্ঠিত হয় না। সে ভস্মের মধ্যেও স্বর্ণরেণু দেখিতে পায়, বিষের মধ্যেও প্রাণের স্থিতি অবলোকন করে, শূন্যের মধ্যেও জীবলোক আবিষ্কার করিয়া থাকে, অঙ্গারের মধ্যেও বর্ণবৈচিত্র দেখিতে পায়, উল্কার মধ্যেও বিপুল শোভা দর্শন করে এবং রোগের মধ্যেও সুখের আবাস দেখিতে পায়।

এখানে প্রকারান্তরে জ্ঞানের বিশেষ পরিণাম বিজ্ঞানের স্বরূপ প্রদর্শন করা হইয়াছে। অর্থাৎ ইয়ুরোপীয়েরা যাহা শতকথায় বলিয়াছেন, বেদ এক কথায় তাহা প্রমাণ করিলেন।

বেদ পুনরায় কহিলেন, "জ্ঞানের স্বভাব 'ইন্দ্রজাল ও মায়াবিস্তার'। এবং ফল ও পরিণাম অবিচ্ছিন্ন নির্ম্মল প্রীতি।" ভাষ্যকার সংক্ষেপে এই বাক্যের এইপ্রকার অর্থ করিয়াছেন "শোকের মধ্যেও সুখ, মৃত্যুর মধ্যেও অমৃত, বিপদের মধ্যেও সম্পদ, অনিষ্টের মধ্যেও অভীষ্ট, অনর্থের মধ্যেও অর্থ ইত্যাদি আবিষ্কার করা জ্ঞান ব্যতীত আর কাহার সাধ্য হইতে পারে? ইহারই নাম ইন্দ্রজাল ও মায়াবিস্তার।"

আনন্দগিরি প্রভৃতি পরবর্ত্তী যতিগণ ইহারই আভাস লইয়া বলিয়াছেন, "যাঁহারা অহোরহ জ্ঞানের সেবা করেন, তাঁহারাই জানেন, তাঁহারা কেমন আশ্চর্য্যতা, নূতনতা, বিচিত্রতা, অপূর্ব্বতা ও অদৃষ্টপূর্ব্বতার মধ্যে সর্ব্বদাই বাস করিয়া থাকেন।"

পদ্মপুরাণে ইহারই অনুবাদ করিয়া বলা হইয়াছে, "জ্ঞানী পুরুষ বিজনে বাস করিলেও, সজনে বাস করেন, শত্রুমধ্যে থাকিলেও যেন মিত্র সমাজে অবস্থিতি করেন, দুঃখ মধ্যেও সুখে অধিষ্ঠিত হয়েন, এবং পৃথিবীতে থাকিলেও স্বর্গীয় অর্থাৎ মানুষ হইলেও দেবতা।"

মেরুতন্ত্রে ইহারই প্রসঙ্গক্রমে এই প্রকার নির্দ্দেশ করা হইয়াছে "জ্ঞানের গতি

অতি বিচিত্র। অর্থাৎ জ্ঞানী পুরুষ দরিদ্র হইলেও ধনী, আবার ধনী হইলেও দরিদ্র'; উন্নত হইলেও অবনত, আবার অবনত হইলেও উন্নত; তেজস্বী হইলেও শান্ত, আবার শান্ত হইলেও তেজঃপুঞ্জ এবং সামান্য হইলেও অসামান্য, আবার অসামান্য হইলেও সামান্য" ইত্যাদি।

বাস্তবিক, মেরুতন্ত্রে অতি অমূল্য উপদেশ সন্নিহিত হইয়াছে। সংসারে যাহা কিছু অহঙ্কার, অভিমান, তৎসমস্ত প্রায় ধন হইতেই প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। তাদৃশ অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়া, আপনাকে দরিদ্র জ্ঞান করা সামান্য জ্ঞানের কার্য্য নহে। সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও সুপ্রসিদ্ধ শাস্ত্রী জন্‌সনের সুপ্রসিদ্ধ রাসেলাস এক জন সুপ্রসিদ্ধ রাজার বংশধর ছিলেন। তিনি মনে করিলে, অনায়াসেই পিতার অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইতে পারিতেন। কিন্তু জ্ঞানের উপচয়ে তিনি যখন সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, লোকে যাহাকে ঐশ্বর্য্য বলে, বস্তুতঃ তাহাই প্রকৃত নির্ধনতা অর্থাৎ তাহাই নিতান্ত নিষ্কিঞ্চন দরিদ্রের অবস্থা। আশ্চর্য্যের বিষয়, জনসনের অনেক পূর্ব্বে মেরুতন্ত্রে এইপ্রকার উপদিষ্ট হইয়াছে। তথাপি আমাদের কৃতবিদ্য সমাজের অনেকেই তাহার নামগন্ধও জানিতে চাহেন না।

পুনশ্চ, ইংরাজী নীতিকারগণের মতে, বিনয় সদ্‌গুণের অলঙ্কার সম্পাদন করে। অর্থাৎ সহস্র সদ্‌গুণ থাকুক, বিনয় না থাকিলে, তাহার শোভা হয় না। উইলিয়ম রবার্ট চেম্বর্স মরালক্লাসবুকে এইরূপ উপদেশ ন্যস্ত করিয়া, আমাদের সহৃদয়-সমাজে অনেক প্রশংসা লইয়াছেন। কিন্তু চেম্বর্সের অনেক পূর্ব্বে আমাদের মেরুতন্ত্রে "উন্নত হইলেও অবনত" ইত্যাদি বাক্যে ঐরূপ উপদেশের চূড়ান্তসীমা প্রদর্শিত হইয়াছে। বিলাতের ইণ্ডিয়া হাউসে সে দিবস এক জন বিদেশীয় পর্য্যটক (ট্রাভেলার্) ভারতবর্ষের কথাপ্রসঙ্গে যথার্থই বলিয়াছেন যে, "সমুদায় ভারতবাসীর কথা বলিতে পারি না, আমি যাহাদের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক করিয়াছি, সেই বাঙ্গালী বাবুরা ঘরের খবর কম রাখেন, ইহাই তাঁহাদের উন্নতির প্রধান অন্তরায়।" তিনি আরও বলেন যে, ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য আর কি হইতে পারে, যে, কৃতবিদ্য বাঙ্গালী সমাজ, যাঁহাদের উপর দেশের উন্নতি সম্পূর্ণ নির্ভর করে, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই, বিদেশীয় হইবার যেমন ইচ্ছা, দেশীয় হইবার সেপ্রকার ইচ্ছা নাই, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অথচ, তাঁহারা প্রথম বাল্যকাল হইতেই বিদেশীয় গ্রন্থে অধ্যয়ন করিয়াছেন যে, ময়ূরের পুচ্ছধারী কাক পদেপদেই অপদস্থ ও অপমান হইয়া থাকে" ইত্যাদি।

যাহা হউক, বৃহস্পতির শিষ্য বেদ পুনরায় ইন্দ্রকে কহিলেন, "মহর্ষি সত্যতপাঃ অতিশয় জ্ঞানী ছিলেন। জ্ঞানের বিশেষ স্বভাব এই, মনকে সর্ব্বদাই পূর্ণ কৌতুক ও পূর্ণ আমোদে অভিভূত রাখে।"

মহর্ষি বেদব্যাস শান্তিপর্ব্বে সংকেতে ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "সংসারের গুরু লঘু, ক্ষুদ্র বৃহৎ, সকল বস্তুই উল্লিখিত কৌতুক ও আমোদ বহন করে। কীট হইতে হস্তী, রজঃকোদ হইতে পর্ব্বত, খদ্যোত হইতে চন্দ্র এবং স্ফুলিঙ্গ হইতে কুণ্ডীভূত অগ্নি, ইত্যাদি এ বিষয়ের নিদর্শন। যাহার জ্ঞান নাই, সে পূর্ণচন্দ্র দেখিলে, খদ্যোতে স্বীয় কৌতুক প্রতিবিদ্ধ করে। কিন্তু জ্ঞানীর স্বভাব বিপরীত। তিনি উভয়ত্রই সমান কৌতুক ভোগ করিয়া থাকেন। এইজন্য মহর্ষি শততপা নির্ব্বিকার চিত্তে বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রী, যুবা, মত্ত, প্রমত্ত, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ সকলেরই সহিত সমান প্রীতি অনুভব করিতেন। একদা তিনি বালক সম্প্রদায়ে মিলিত হইয়া, বদ্ধ ও গাঢ়চিত্তে তাহাদের অনুরূপ ক্রীড়ায় মগ্ন আছেন, এমন সময়ে, মৃগয়াবিহারী মহারাজ সুধর্ম্মা সহসা তথায় সমাগত হইলেন এবং তদবস্থ ঋষিকে দর্শন করিয়া, প্রণাম পূর্ব্বক সস্মিতের ন্যায়, কহিলেন, ভগবন্! অদ্য বাল্যক্রীড়ার সার্থক্য হইল। যেহেতু, আপনার ন্যায়, মহাভাগ পুরুষও তাহাতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

"ঋষি মহারাজের গূঢ় শ্লেষ বুঝিতে পারিয়া, সমুচিত বাক্যে উত্তর করিলেন, ভগবান সনক যে জ্ঞানগীতা প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা, বোধ হয়, আপনার পরিজ্ঞাত নাই। তিনি এইরূপে জ্ঞানের বিষয়ে গান করিয়াছেন 'জ্ঞান আদর্শ সন্ধান করে, অজ্ঞান অনুলিপি আলোড়ন করে; জ্ঞান উপাদান পরিকলন করে, অজ্ঞান অনিদান আলোচনা করে; জ্ঞান কারণ গবেষণা করে, অজ্ঞান কার্য্য মাত্র সঙ্কলন করে; জ্ঞান মূলভাগ পর্য্যবেক্ষণ করে, অজ্ঞান উপরিমাত্র ভ্রমণ করে, এবং জ্ঞান আদি মীমাংসা করে, অজ্ঞান আভাস পরিদর্শন করিয়া থাকে। অথবা, জ্ঞান অগ্নি, অজ্ঞান ধূম; জ্ঞান আলোক, অজ্ঞান অন্ধকার; জ্ঞান মহা স্বাস্থ্য, অজ্ঞান মহাব্যাধি, জ্ঞান মহা বিভব, অজ্ঞান মহাদারিদ্র্য, জ্ঞান চক্ষু, অজ্ঞান অন্ধতা, জ্ঞান মহাদীপ্তি, অজ্ঞান নিবিড় ছায়া এবং জ্ঞান পূর্ণ কৌমুদী, অজ্ঞান কৃষ্ণনিশা।'

"সত্যতপা পুনরায় কহিলেন, 'মহারাজ! ঈশ্বর কি জন্য কৌতূহল বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন? কি জন্য জিজ্ঞাসার উদয় হইয়া থাকে, তাহা কি তুমি সন্ধান কর? আর, তুমিও একদা বালক ছিলে। পরে যৌবনদশায় উপনীত হই-

য়াছ। মানুষমাত্রেরই এই ক্রম। সে অগ্রে বালক, পরে যুবা, পরে প্রৌঢ়, অনন্তর বার্দ্ধক্যে অবতীর্ণ হয়। অতএব, বাল্যই তাহার আবির্ভাব এবং আবির্ভাব পরিকলন করাই প্রধান কর্ত্তব্য। যাহার বাল্যকাল সদ্‌বিষয়ের অনুসরণে অতিবাহিত হয়, তাহার যৌবনাদি অবস্থা প্রায়ই মন্দ হয় না, ইহা সনাতন নিয়ম। মনুষ্যের অধিকাংশ জ্ঞানই বাল্যকালে অর্জ্জিত হয়। স্ফুলিঙ্গ হইতেই মহাবহ্নি প্রাদুর্ভূত হয়, যে ব্যক্তি ইহা অবগত, সে কখন বালককালের নিন্দা করে না।'

"সত্যতপাঃ পুনরায় কহিলেন, মধুমক্ষিকা যেরূপ সকল পুষ্পেই বিচরণ করিয়া মধু সংগ্রহ করে, তদ্রূপ, জ্ঞানলিপ্সু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, সকল বিষয় পরিকলনে প্রবৃত্ত হইবেন।" .

ভাষ্যকার ইহার এইপ্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "এক পুষ্প হইতে মধু আহরণ করিলে, তাহার লোকপ্রসিদ্ধ মিষ্টতা সঞ্চিত হইবার সম্ভাবনা নাই; সেইরূপ, নিত্য এক বিষয়ের গবেষণা ও যোগবিয়োগ পরিকলন বা সম্পাদন করিলে, জ্ঞানের কখনও পরিপাক হয় না। দেখ, সৃষ্টির কোন বস্তুই আদিম, মৌলিক, প্রাথমিক বা রূঢ় নহে। পরস্পরের যোগবিয়োগে পরস্পরের নির্ম্মাণ ও বিনির্ম্মাণ হইয়াছে। তাহাতেই তাহাদের দৃঢ়তা, স্থিতিশীলতা ও পরিণামশালিতা লক্ষিত হয়। জ্ঞানের বিষয়েও এইরূপ। অর্থাৎ, বহু বিষয়ের দর্শন, শ্রবণ ও যোগবিয়োগ না করিলে, কখন জ্ঞান সঞ্চরিত, পরিণত ও বলিষ্ঠ হয় না। এক বিষয় হইতে যাহা প্রাদুর্ভূত হয়, তাহাকে জ্ঞান বলে না, শুদ্ধ দৃষ্টিমাত্র বা জড়দৃষ্টি কহিয়া থাকে।"

"সত্যতপাঃ পুনরায় কহিলেন, শাস্ত্রের সকল শাখাই অধ্যয়ন করিবে, তবে শাস্ত্রী হইবে; বিদ্যার সকল বিভাগ আলোচনা করিবে, তবে বিদ্বান্ হইবে, এবং রসবস্তুর সকল অঙ্গ যথাসাধ্য জ্ঞানগোচর করিবে, তবে প্রকৃত রসিক বা ভাবুক হইবে। যেমন শুদ্ধ বেদ পড়িলে বৈদিক বলে, শাস্ত্রী বলে না; সেইরূপ, এক বিষয়ের দর্শী হইলে, জ্ঞানী বলে না, একদর্শী কহিয়া থাকে। যাহার দুই চক্ষু নাই, সে অন্ধ; এক চক্ষু নাই, সে কাণ; দৃষ্টির সরলতা নাই, সে কেকর; কিন্তু যাহার দুই চক্ষুই বর্ত্তমান, তাহাকে সামান্যতঃ চক্ষুষ্মান্ বলে। আবার, প্রকৃত দর্শন করিলে, প্রকৃত চক্ষুষ্মান্ বলিয়া থাকে। জ্ঞান বিষয়েও এইরূপ। অর্থাৎ, যে ব্যক্তির বাহ্যজ্ঞান আছে, অন্তর্জ্ঞান নাই, সে অন্ধজ্ঞানী; যাহার অন্তরজ্ঞান আছে, বাহ্যজ্ঞান নাই, সে অর্দ্ধজ্ঞানী, যাহার অন্তর বাহ্য উভয় জ্ঞান আছে, সে শুদ্ধ জ্ঞানী; আর যাহার বাহ্য অতিবাহ্য

ও অন্তর অর্থাত্তর সকল জ্ঞানই আছে, তাহাকেই সত্য বা প্রকৃত জ্ঞানী কহিয়া থাকে। ঐরূপ সত্যজ্ঞানীর অন্যতর নাম বিজ্ঞ ও তত্ত্বজ্ঞ, অথবা, বিজ্ঞানদৃশ্বা ও পারদৃশ্বা।

"মহারাজ! এই কারণেই আমি বালকের সহিত, যুবার সহিত, বৃদ্ধের সহিত ও ভবাদৃশ ব্যক্তির সহিত, ফলতঃ সকল অবস্থার লোকের সহিত মিশ্রিত হইয়া, বিবিধ জ্ঞানের আলোচনা করি। বিশেষতঃ, মনুষ্য অপেক্ষা পশু, পক্ষী ও কীটাদি ইতর জীবের সহিত আমার অধিক ঘনিষ্ঠতা। কেননা, মনুষ্য অপেক্ষাও অনেক বিষয়ে উহাদের শ্রেষ্ঠতা লক্ষিত হয়। দেখ, মনুষ্য অনায়াসে আকাশে উড়িয়া, দিগ্‌বিদিগ্ বিচরণ পূর্ব্বক আহার আহরণ ও বহুদর্শন জন্য প্রীতি সঙ্কলন করিতে সক্ষম হয় না। কিন্তু ঐ ক্ষুদ্রকলেবর চাতকপক্ষী তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়া থাকে। সে সামান্য গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ বিষয়ে মনুষ্য অপেক্ষাও স্বাধীন। অধিকন্তু, রোগ হইলে, সে আপনিই আপনার চিকিৎসা করে, আবার তাহার রোগও মনুষ্যের ন্যায়, সচরাচর সুলভ বা দুশ্চিকিৎস্য নহে। সে শীত বাত রৌদ্র বৃষ্টি অনায়াসেই সহ্য করে, গহনে গহনে বিচরণ পূর্ব্বক কদাচ আগমনপথ বিস্মৃত হয় না এবং অত্যুন্নত পর্ব্বত, অতি বিস্তৃত মরু ও অপার সমুদ্রও বিচরণ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। মনুষ্য বিনা সাহায্যে ইহার কিছুই করিতে সমর্থ হয় না। দেখ, মনুষ্য অতি ক্ষুদ্র চটক অপেক্ষাও কত অন্ধ ও কত দুর্ব্বল; অথচ মনুষ্যের অহঙ্কার ও অভিমানের শেষ নাই। আমি এইজন্য অভিমান ত্যাগ করিয়া চটকাদির সহিত মিলিত হই এবং তত্তৎবিষয়ের জ্ঞানশিক্ষা করিয়া থাকি।"

ইংরাজীতে সুপ্রসিদ্ধ 'গ্রেস টেল' নামক গ্রন্থের প্রথমেই এইপ্রকার উপদেশের ছায়া প্রাপ্ত হওয়া যায়, অথবা তুলনায় সমালোচন করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আমাদের বিলক্ষণ ধারণা আছে, আর্য্যজাতির জ্ঞানবিজ্ঞানের তুলনা নাই। আর্য্যগণই জ্ঞানের প্রথম আবিষ্কর্ত্তা, এ কথা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সুপ্রসিদ্ধ বৈদিকশাস্ত্র ইহার প্রথম প্রমাণ, পঞ্চতন্ত্র প্রভৃতি দ্বিতীয় প্রমাণেরও সংখ্যা নাই।

সে যাহা হউক, "সত্যতপাঃ পুনরায় বলিলেন, মহারাজ! এই যে পরমাণুবৎ অতি ক্ষুদ্র রক্তকীট বিচরণ করিতেছে, মনুষ্যের ন্যায় ইহারও আহারলিপ্সা, বিহার-লিপ্সা ও বাসলিপ্সা আছে। তৎসমস্তই ইহার স্বাধীন ভাবে সম্পন্ন হইয়া থাকে। বৃহৎকায় বৃহদ্‌বুদ্ধি মানুষ কখন স্বপ্নেও এরূপ করিতে সমর্থ হয় না। ঐ দেখ, হরিণগণ দলবদ্ধ হইয়া, পরস্পর সদ্ভাবে কেমন বিচরণ করিতেছে।

উহাদের শরীর কেমন হৃষ্ট পুষ্ট, মুখ কেমন প্রফুল্ল, চলন কেমন সহজ ও নির্ব্বিঘ্ন, বিহার কেমন আমোদ ও হর্ষপূর্ণ; এবং আকার কেমন উল্লসিত!

(ক্রমশঃ)।

শ্রীরোহিণী নন্দন সরকার।

দীপশিখা।

দহ্যমান গ্যাসকে শিখা কহা যায়। যে সকল অগ্নিশিখা আলোক বিকিরণ করিবার নিমিত্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তৎসমস্ত কঠিন, তরল এবং গ্যাসযুক্ত দহ্যমান দ্রব্য হইতে উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ যাহা হইতে আমরা শিখা উৎপন্ন করিতে ইচ্ছা করি, সে দ্রব্য যদি কঠিন হয়, তাহাহইলে প্রথমতঃ তরল হইবে; তরল অংশ গ্যাসরূপে পরিণত হইয়া, পরে সেই গ্যাস প্রজ্বলিত হইলে, শিখা উৎপন্ন হইবে।

মমের বাতি জ্বালিলে দেখিতে পাওয়া যায়, শিখার উত্তাপে বাতির কঠিন কিয়ৎ-অংশ দ্রব ও তরল হইয়া শিখার নিম্ন ভাগে একত্রিত হয়। পরে সেই তরল অংশ কৈশিকাকর্ষণ (১) দ্বারা বাতির পলিতার উর্দ্ধদেশে যায় এবং শিখার উত্তাপে গ্যাস রূপে পরিণত হইয়া প্রজ্বলিত হইতে থাকে। অতএব ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ যে, মোম-বাতিতেকঠিন, তরল ও গ্যাস এই তিন অবস্থাই বিদ্যমান রহিয়াছে। এইরূপ কোন তৈলের আলোক পরীক্ষা করিলে, আমরা দেখিতে পাই, ইহাতে কঠিন অংশ নাই। সুতরাং এস্থলে কার্য্য দ্বিতীয় অবস্থাতেই আরম্ভ হয়। তৈলের আলোতে তরল তৈল অংশ উত্তাপিত হইয়া গ্যাস হয় এবং সেই গ্যাস জ্বলিতে থাকে। তৈলের আলোতে তরল ও গ্যাস এই দুই অবস্থায়ই বিদ্যমান।

কলিকাতার রাস্তার গ্যাস পরীক্ষা করিলে প্রথম দুইটী অবস্থা অর্থাৎ কঠিন ও তরলভাব পরিলক্ষিত হয় না, কেবল শেষ অবস্থা অর্থাৎ গ্যাস দেখিতে পাওয়া যায়। গ্যাসের আলোকে গ্যাস প্রজ্বলিত হইয়া আলোক প্রদান করে বলিয়া পলিতার প্রয়োজন নাই। তৈলের তরল অংশ পলিতার সহিত জ্বালাইলে গ্যাস উৎপন্ন হয়, সেই কারণে প্রদীপে পলিতার প্রয়োজন অপরিহার্য্য।

---

(১) জড়বিজ্ঞান দেখ। (Capillary attraction.)

এইরূপে বাতি, তৈল ও গ্যাসের আলো পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে সকল দ্রব্য আমরা আলোকের জন্য ব্যবহার করি, তাহা উত্তাপের দ্বারা গ্যাসে পরিণত না হইলে, প্রজ্বলিত শিখা প্রাপ্ত হইতে পারি না। এইজন্যই উত্তাপের সাহায্যে [illegible] গ্যাসকে শিখারূপে অভিহিত করা হইয়াছে।

সকলেই দেখিয়াছেন, শিখা সকল সময়েই ঊর্দ্ধগামী অর্থাৎ তাহার অগ্রভাগ সকল সময়েই ঊর্দ্ধমুখ আছে, কখন অধোগামী হয় না, ইহার কারণ এই শিখার নিকটস্থ চতুর্দ্দিকের বায়ু উত্তাপে লঘু হইয়া ঊর্দ্ধগামী হয় এবং সেই সঙ্গে শিখাকেও ঊর্দ্ধদিকে লইয়া যায়। (এই সন্নিবেশিত চিত্র দেখিলেই বায়ুর গতি স্থির করিতে পারা যায়)।

শিখা প্রজ্বলিত রাখিতে হইলে, নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে উত্তাপের প্রয়োজন। সেই উত্তাপের হ্রাস হইলেই শিখা নির্ব্বাণ হইয়া যায়। অনেকগুলি দ্রব্যের দ্বারা উত্তাপ অতি শীঘ্র সঞ্চালিত করা যায়। সুতরাং সেই সকল বস্তু শিখার নিকট লইয়া গেলে শিখা হইতে উত্তাপ হরণ করে এবং তৎক্ষণাৎ শিখা নির্ব্বাণ হইয়া যায়। একটা লৌহদণ্ডের অগ্রভাগে এক খণ্ড কাগজ জড়াইয়া অগ্নিতে ধরিলে, কাগজ অনেক বিলম্বে দগ্ধ হয়, কিন্তু কাষ্ঠ খণ্ডে কাগজ জড়াইয়া ঐরূপ করিলে, তৎক্ষণাৎ জ্বলিয়া উঠে। ইহার কারণ এই, লৌহ পরিচালক এবং কাষ্ঠ অপরিচালক। লৌহদণ্ডের অগ্রভাগে যে কাগজ থাকে, তাহা অগ্নিতে প্রবেশ করাইলে, কাগজ উত্তাপিত হইতে না হইতেই, সকল উত্তাপ লৌহের সর্ব্বাঙ্গে পরিচালিত হয়। সুতরাং কাগজ জ্বলিতে বিলম্ব হয়, কিন্তু কাষ্ঠলগ্ন কাগজের উত্তাপ কাষ্ঠের সকল অংশে পরিচালিত হইতে পারে না। তজ্জন্য কাগজ উত্তাপিত হইয়া জ্বলিয়া উঠে। যদি এক খণ্ড তাম্রের তার অঙ্গুরীয়ের ন্যায় জড়াইয়া শিখার উপর দেওয়া যায়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ আলোক নির্ব্বাণ হইয়া যায় অর্থাৎ উত্তাপের হ্রাস হয়। কিন্তু ঐ অঙ্গুরীয় পূর্ব্বে উত্তাপিত থাকিলে ঐরূপ ঘটিবে না।
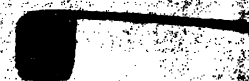
প্রদীপ বাতাসে নির্ব্বাণ হয় কেন? বায়ু প্রবল হইয়া শিখা হইতে উত্তাপ হরণ করে; সুতরাং শিখা প্রজ্বলিত থাকিতে পারে না। সূক্ষ্ম তারে নির্ম্মিত একখানা জাল একটা গ্যাস পাইপের উপর রাখিয়া যদি জালের উপরিভাগের গ্যাস জ্বালাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে সেই জাল কিছু দূর ঊর্দ্ধে তুলিলেও গ্যাস জালের উপরেই জ্বলিতে থাকে, নিম্নে জ্বলিতে পারে না। কারণ এই তারের জাল এত শীঘ্র উত্তাপ পরিচালন করিয়া লয়, যে, নিম্নের [illegible]-

যোগী উত্তাপ পায় না। কাজে কাজেই নিম্নের গ্যাস প্রজ্বলিত হইবে না। এক খণ্ড কর্পূর এই জালের উপর জালটিকে দিয়া উলটাইয়া ফেলিলে, ঐ কর্পূরের শিখা নিম্নে জ্বলিতে থাকে, উপরে যায় না। এই উপায় অবলম্বন করিয়া সার হম্ফ্রে ডেভি (Sir Humphrey Davy) এক লণ্ঠন প্রস্তুত করেন। ইহার উপরিভাগ লৌহ জালে আবৃত। এই লণ্ঠন আবিষ্কারের পূর্ব্বে কয়লার খনিতে অনেক দুর্ঘটনা ঘটিত। উক্ত খনিতে স্বভাবতঃ যে সকল দহ্যমান গ্যাসের উৎপত্তি হয়, তাহা অগ্নি সংস্পর্শে তৎক্ষণাৎ জ্বলিয়া উঠে ও বিকট শব্দসহকারে চারি দিক ফাটিতে থাকে। ইহা নিবারণ করিবার জন্য ডেভি এই লণ্ঠন প্রস্তুত করেন। দহ্যমান গ্যাস লণ্ঠনমধ্যে প্রবেশ করিয়া অগ্নি স্পর্শে জ্বলিতে থাকে কিন্তু সেই শিখা বাহিরে উত্তাপাভাবে আসিতে পারে না। এই জাল অধিক উত্তাপিত হইবার পূর্ব্বে লণ্ঠন তৎস্থান হইতে অন্তরিত করা উচিত। জাল অধিক উত্তপ্ত হইলে বাহিরের ও অভ্যন্তরের উত্তাপ সমান হয়; বাহিরের সমস্ত গ্যাস জ্বলিয়া উঠে এবং ভয়ঙ্কর শব্দে ফাটিতে থাকে ও কয়লার খনি ছারখার করিয়া ফেলে।
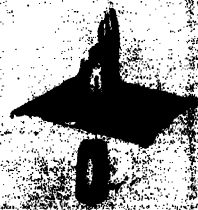
শিখার সমস্ত অবয়ব (Structure) তিন স্তবকে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

১ম, সর্ব্ব মধ্যস্থ কৃষ্ণবর্ণ স্তবক। এই স্থানে তরল তৈল হইতে বাষ্প প্রস্তুত হইয়া একত্র হইয়া থাকে। একটী কাঁচের নল দ্বারা এই গ্যাস বাহিরে আনাইয়া জ্বালাইতে পারা যায়। এখানকার উত্তাপ অত্যন্ত অল্প।

২য়, দীপ্যমান স্তবক। ইহা সকল অপেক্ষা আলোকময়। কোন শীতল বস্তু দ্বারা এই স্থান স্পর্শ করিলে, তাহার উপর ঝুল জমিয়া যায়।

৩য়, অদীপ্যমান স্তবক। এই স্থানের উত্তাপ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। দ্বিতীয় কটিবন্ধে অঙ্গার অম্লজানের সহিত না মিলিয়া কঠিন অবস্থাতেই থাকে এবং অধিক উত্তাপিত হইয়া আলোককে দীপ্তিমান করে। তৃতীয় অংশে এই সকল অঙ্গার বাহিরের অম্লজানের সহিত মিলিয়া যায়। তজ্জন্য আলোক অধিক দীপ্তিমান হয় না।

অনেকেই বলেন যে, অঙ্গার কঠিন রূপে নির্গত হইয়া উত্তাপে শ্বেতবর্ণ ধারণ-

জলিয়া শিখাকে দীপ্তিমান করে। কিন্তু ডাক্তার ফ্রান্‌ক্‌ল্যাণ্ড বিশেষ অনুসন্ধানের পর স্থির করিয়াছেন, কঠিন অঙ্গার দ্বারা শিখা দীপ্যমান হয় না। তিনি বলেন, গাঢ়তর উদকাঙ্গারক (Hydro Carbon) বাষ্প হইতে এই দীপ্তি নির্গত হয়। অত্যন্ত উত্তাপ সহকারে এই সকল উদকাঙ্গারক বাষ্পরূপে পরিণত হয়, এই বাষ্প অগ্নিসম্পর্কে অত্যন্ত দীপ্তিমান হইয়া শিখাকেও দীপ্যমান করে। তিনি আরও বলেন, অগ্নিশিখাতে অনেকপ্রকার গ্যাস আছে। ইহার বাষ্প অত্যন্ত গাঢ় এবং উত্তপ্ত হইলে আলো অধিকতর দীপ্তিমান হয়।

আবার কেহ কেহ বলেন যে, শিখাতে অঙ্গার কঠিন অবস্থায় উপস্থিত থাকে বলিয়া আলোর উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি হয়। উদাহরণ স্বরূপ যদি একটা উজ্জ্বল দীপ শিখার উপর এক খণ্ড চীনের বাসন ধরা যায়,তৎক্ষণাৎ তাহাতে অঙ্গার জমিয়া যায়। কিন্তু যে সকল আলোকে অঙ্গার কঠিন অবস্থায় না থাকে, তাহাতে এই অঙ্গার পাওয়া যায় না। একটা স্পিরিট্ ল্যাম্পের উপর এক খণ্ড বাসন ধরিলে তাহাতে কাল দাগ হইবে না। কারণ, এই আলোক হইতে অঙ্গার নির্গত হইবামাত্র অম্লজানের সহিত মিশিয়া যায়। আবার কেরোসিন তৈলের আলো চিমনির মধ্যে না থাকিলে অঙ্গার অত্যন্ত জন্মে। এবং শিখার অঙ্গার অধিক উত্তাপ অভাবে অম্লজনের সহিত মিশিতে পারে না। কিন্তু চিম্‌নির ভিতর থাকিলে, সমস্ত অঙ্গার দগ্ধ হইয়া যায়। কতকগুলি গ্যাস হইতে যে শিখা উৎপন্ন হয় তাহা অদীপ্যমান। তাহা হইতে কোন অঙ্গার পাওয়া যায় না। অথবা তাহাতে অঙ্গার কিছুমাত্র নাই, যেমন অম্লজান ও উদজান শিখা। কিন্তু এই শিখার সংস্পর্শে থাকিলে, কঠিন দ্রব্য দীপ্যমান হইয়া উঠে; ইহার সাক্ষ্য স্বরূপ এক খণ্ড চুণ শিখায় ধরিলে, ঐ চুণ উত্তপ্ত হইয়া তাড়িতালোকের ন্যায় দীপ্যমান হয়।

শিখা প্রজ্বলিত রাখিবার জন্য অম্লজান আবশ্যক করে। স্বভাবতঃ বায়ুই অম্লজানের প্রধান আকর। সুতরাং বায়ুর অভাব হইলে, আলোক জ্বলিতে পারে না। বায়ুর সমাগম অল্প হইলেও আলোক ভাল রূপে জ্বলে না। অম্লজান অভাবে সম্পূর্ণ দহন ক্রিয়া সম্পন্ন হয় না। কেবল ঝুল অর্থাৎ অঙ্গার নির্গত হইতে থাকে। আবার বায়ুসমাগম অত্যন্ত অধিক হইলে আলোক উজ্জ্বলরূপে জ্বলিতে পারে না। শিখার উত্তাপের হ্রাস হওয়াতে, অসম্পূর্ণ দহনক্রিয়া হইয়া থাকে। এবং অঙ্গার ও দুর্গন্ধ নির্গত হয়।

একটা আবদ্ধ গৃহের মধ্যে প্রবল অগ্নি প্রজ্বলিত করিলে প্রচুর অম্লজান অভাবে

ভাগ অত্যুজ্জ্বল হয় না। ঘর শীঘ্রই অঙ্গারকাম্লে পরিপূর্ণ হয় ও অঙ্গারকাম্ল দহনের সহযোগিতা না করিয়া বরং শিখার শীঘ্রই উজ্জ্বলতা হ্রাস করে। আবার সেই ঘরের মধ্যে যদি অধিক লোক থাকে, তাহা হইলে আরও শীঘ্র অঙ্গারক অম্লে পরিপূর্ণ হয়। বায়ু অভ্যন্তরে দুই প্রকারে অঙ্গারকাম্ল নির্গত হইয়া থাকে। প্রথমতঃ প্রজ্বলিত শিখা হইতে, দ্বিতীয়তঃ প্রশ্বাস কালে মনুষ্যগণের ফুস ফুস হইতে। মনুষ্য এবং শিখা তাহাদিগের স্থায়িত্বের জন্য গৃহমধ্যস্থ আবদ্ধ বায়ু হইতে সমস্ত অম্লজান গ্রহণ করে এবং ঘর আবদ্ধ থাকায়, বাহিরের বায়ু প্রচুররূপে প্রবেশ করিতে পারে না বলিয়া মনুষ্যের স্বাস্থ্যের বিশেষ হানি হইতে থাকে। কিন্তু যদি ঘরের বায়ু গমনাগমনের পথ সকল খোলা থাকে, তাহা হইলে, অঙ্গারকাম্ল ঘর হইতে বহির্গত হইয়া যায় এবং পরিষ্কৃত বায়ু ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে। দ্বার এবং জানালার উপরি ভাগ দিয়া বায়ু গৃহমধ্যে প্রবেশ করে এবং অঙ্গারাম্ল বায়ু অপেক্ষা অনেক গুরু বলিয়া নিম্ন ভাগ দিয়া বহির্গত হইতে থাকে। অনেকেই মনে করিতে পারেন যে,অঙ্গারকাম্ল বায়ু অপেক্ষা ভারি,তথাপি কেন গৃহ হইতে বাহির হইয়া যায়। গ্যাসের ঐরূপ বিকিরণ ক্ষমতা আছে। যদি দুইটী ভিন্ন ভিন্ন আপেক্ষিক গুরুত্ব বিশিষ্ট গ্যাস একত্র করা যায় এবং যদি গুরুতর গ্যাস নিম্নে থাকে, তথাচ অল্প সময়ের মধ্যে এই বিকিরণ ক্ষমতা বলে একটী আর একটীর সহিত মিশিয়া যায়। এই জন্য অঙ্গারকাম্ল গ্যাস বায়ু অপেক্ষা গুরু হইলেও বাহিরের বায়ুর সহিত মিলিয়া যায়। ঘরের মধ্যে অধিক দীপ জ্বালিলে এবং লোকসমাগম হইলে, বাহিরের বায়ু যাহাতে গৃহমধ্যে আসিতে পারে, তজ্জন্য সকলের বিশেষ যত্নবান হওয়া উচিত। বায়ু গৃহমধ্যে প্রবেশ করে এবং অঙ্গারকাম্ল তথা হইতে নির্গত হয়, এ কথা অগ্নিশিখা দ্বারা বিশেষরূপে প্রমাণ করা যায়। দ্বারপথের চৌকাটের উপর একটী জ্বলন্ত দীপ এবং দ্বারপথের উপরি ভাগে আর একটী দীপ রাখিলে, দেখিতে পাওয়া যায় যে, নিম্নের দীপশিখা বহির্ভাগে নত হয় এবং উপরের দীপশিখা অন্তর্ভাগে নত হয়। ইহার দ্বারা এই দুই গ্যাসের স্রোত পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন দিকে যাইতেছে, তাহা বিশেষরূপে দেখা যায়।

অঙ্গারকাম্ল দহনের সহায়তা করে না; একটী অঙ্গারকাম্লপূর্ণ বোতল একটী দীপশিখার উপর অধোমুখে ধরিয়া থাকিলে, অঙ্গারকাম্ল শিখার উপর পতিত হইয়া তৎক্ষণাৎ নির্ব্বাণ করিয়া ফেলিবে।

একটী বাতি উপরে এবং অপরটী তাহার কিছু নিম্নে রাখিয়া যাহাতে বাহি-

রের বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে এরূপ ভাবে একটী দেয়াল গিরির ফানুশ দিয়া (তাহার যে দিক পিতল দিয়া বাঁধান সেই দিক কাক এবং গালার দ্বারা উত্তম রূপে আবদ্ধ করিতে হইবে) আবরিত করিলে, দেখিতে পাইবে যে, দুইটী বাতি উজ্জ্বলরূপে জ্বলিতেছে, অল্প সময় মধ্যে নিম্নের বাতির উজ্জ্বলতার হ্রাস হইয়া আসিবে। ক্রমে ধূম ও অঙ্গার নির্গত হইতে থাকিবে এবং এই সময়ের মধ্যে উপরের শিখাও হীনপ্রভ হইতে আরম্ভ হইবে। পরে নিম্নের আলোক এবং কিয়ৎক্ষণ পরে উপরের শিখাও নির্ব্বাণ হইয়া যাইবে। ইহার কারণ নিম্নে প্রকটিত হইল।
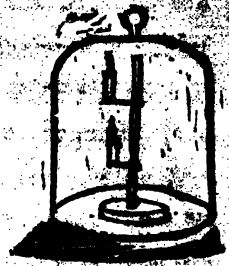
শিখা হইতে নির্গত অঙ্গার অম্লজানের সহিত মিশিয়া অঙ্গারকাম্ল উৎপন্ন হয়, অল্প সময় মধ্যে আবদ্ধ অম্লজান নিঃশেষিত হইয়া থাকে এবং অঙ্গারকাম্ল ফানুশের অধোভাগে একত্র হইতে থাকে। তজ্জন্য প্রথমতঃ নিম্নের শিখা নির্ব্বাণ হইয়া যায়, পরে যখন সমস্ত অম্লজান নিঃশেষিত হইয়া ফানুশের অভ্যন্তরে অঙ্গারকাম্লে পরিপূর্ণ হয়, তখন উপরের আলোকও নির্ব্বাণ হইয়া যায়।

শিখা হইতে যে সকল পদার্থ উৎপন্ন হয়, তন্মধ্যে জল ও অঙ্গারকাম্ল প্রধান। শিখা হইতে নির্গত অঙ্গার ও উদজান গ্যাস উভয়ই ভিন্ন ভিন্ন অংশে অম্লজানের সহিত মিশিয়া অঙ্গারকাম্ল ও জল উৎপাদন করে।

ভিন্ন ভিন্ন তৈল অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন প্রদীপ ব্যবহৃত হয়। কতকগুলি তৈল অত্যন্ত গাঢ় *। সেই সকল তৈলের উপরিভাগেই পলিতা জ্বালাইয়া দেওয়া যাইতে পারে, তাহাতে তৈল জ্বলিয়া উঠে না। কিন্তু কতকগুলি তৈল অত্যন্ত তরল; অগ্নি সংস্পর্শেই জ্বলিয়া উঠে; তজ্জন্য শিখা হইতে তৈল কিঞ্চিৎ অন্তরে রাখিতে হয়। সেই নিমিত্ত কেরোসিন তৈলের উপর পলিতা রাখিয়া জ্বালাইতে পারা যায় না। এই তৈল অগ্নিস্পর্শে তৎক্ষণাৎ জ্বলিয়া উঠে এবং সময়ে সময়ে উহা দ্বারা অনেক বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে। তজ্জন্য কেরোসিন তৈল জ্বালাইবার প্রদীপে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তৈল, শিখা হইতে অনেক অন্তরে থাকে, পলিতার দ্বারা নিম্ন হইতে তৈল শোষিত হইয়া শিখার নিকট লইয়া যায়। আজ কাল আমাদের দেশে কেরোসিন তৈল অল্প মূল্যে পাওয়া যায় বলিয়া প্রায় সকলেই ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু চিমনিবিহীন প্রদীপে এই তৈল জ্বালাইলে বিশেষ হানি হইবার সম্ভাবনা। কারণ, সকলেই দেখিয়াছেন, টিনের কিম্বা অন্য পদার্থ নির্ম্মিত পাত্রে

* যথা নারিকেল ও রেড়ী।

চিমনি না দিয়া কেরোসিন্ জ্বালাইলে আলোক বিশেষরূপে পরিষ্কৃত হয় না, বরং অত্যন্ত অধিক পরিমাণে ধূম নির্গত হয়।

কিন্তু চিমনিবিশিষ্ট পাত্রে জ্বালাইলে আলোক অত্যন্ত উজ্জ্বল হয় এবং কোনরূপ দুর্গন্ধ ও ধূম নির্গত হয় না। তাহার কারণ এই যে, টিনের পাত্রের আলোকে অসম্পূর্ণ দহনক্রিয়া হইয়া থাকে, তজ্জন্য অধিক পরিমাণে অঙ্গার নির্গত হয়; কেন না, শিখা অত্যন্ত অধিক বায়ুর সংস্পর্শে থাকে বলিয়া, তাহার উত্তাপ বৃদ্ধি হয় না এবং উত্তাপ অল্প হওয়ায় ক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন হয় না, অধিক বায়ুর সংস্পর্শে থাকিলে শিখার উত্তাপের পরিমাণ বিশেষরূপে হ্রাস হইয়া থাকে, সুতরাং চিম্‌নি ব্যতীত কেরোসিন তৈল জ্বালান উচিত নহে; কারণ এই সকল অঙ্গার আমাদিগের ফুস ফুস মধ্যে প্রবেশ করিয়া নানারূপ পীড়ার বীজ বপন করে। কিন্তু চিম্‌নি দিয়া এই তৈল জ্বালাইলে সম্পূর্ণ দহনক্রিয়া সম্পন্ন হয়। সকলেই দেখিয়াছেন যে, কেরোসিন ল্যাম্পের কলের নিম্নভাগে কতকগুলি ছিদ্র আছে, সেই ছিদ্র দিয়া প্রবলবেগে বায়ু প্রবেশ করিয়া শিখার সহিত মিলিত হয়। অম্লজানের সহিত অঙ্গার মিলিত হওয়াতে সম্পূর্ণ দহনক্রিয়া সম্পন্ন এবং আলোকের ও উত্তাপের বিশেষ বৃদ্ধি হয়। যদি আমরা ক্ষুদ্র ছিদ্রগুলি হাত দিয়া বন্ধ করি, তৎক্ষণাৎ আলোকের উজ্জ্বলতা হ্রাস হয়, এবং ধূম নির্গত হইতে থাকে। কারণ, তাহাতে বায়ুর গতি রোধ হইয়া যায়।

আবার, চিমনির উপরিভাগে এক খানা কাগজ রাখিলে, পূর্ব্ববৎ উজ্জ্বলতার হ্রাস হয় ও ধূম নির্গত হয়। ইহার কারণ এই, উৎপন্ন গ্যাস সকল উত্তাপিত হইয়া বায়ুর সহিত চিমনির ঊর্দ্ধ মুখ দিয়া নির্গত হইয়া থাকে। সুতরাং সেই মুখ আবৃত করিলে তাহাদিগের গতি রোধ করা হয়। এই গ্যাস সকল আবার বহির্গমনের জন্য নিম্নাভিমুখে গমন করে। তাহাতে, নিম্নের ছিদ্র দিয়া যে বায়ু আসিতেছিল তাহার আগমন বন্ধ হইয়া যায়, সুতরাং বায়ু অভাবে আলোক ভাল রূপে জ্বলিতে পারে না। এইরূপে অধিকক্ষণ চিমনির মুখ বন্ধ রাখিলে, বায়ুর অভাব হয়। বায়ুর অভাবে অঙ্গারিকায় শিখার উপর চাপিয়া পড়ে, তাহাতেই আলোক নির্ব্বাণ হইয়া যায়।

শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

চার্লস্ রবর্ট ডারুইন।

এই প্রস্তাবের শীর্ষে যে মহাপুরুষের নাম সন্নিবেশিত হইল, তাঁহার মৃত্যু-সংবাদে সমস্ত সভ্য জগৎ ক্ষুব্ধ ও মর্ম্মে আহত হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। ডারুইন একজন প্রভূত-ধীশক্তিসম্পন্ন বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত ছিলেন। স্যার আইজাক নিউটনের পর এরূপ প্রতিভাশালী পণ্ডিত বোধ হয় আর জন্মগ্রহণ করেন নাই। মহামতি নিউটন সমগ্রজড়জগদ্ব্যাপী মাধ্যাকর্ষণনামক যে মহানিয়ম আবিষ্কার করেন, সূক্ষ্মদর্শী ডারুইন কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত সমগ্র-জীব-জগদ্ব্যাপী পরিণতিবাদ (Theory of Evolution) তাহার তুলনায় কোন অংশেই হীন নহে। এরূপ অসাধারণ মনুষ্যের সংক্ষিপ্ত জীবনী অনেকের আদরণীয় হইবে, সন্দেহ নাই।

চার্লস্ রবর্ট ডারুইন ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড দেশের অন্তঃপাতী শ্রুজবেরী নগরে (Shrews bury) জন্মগ্রহণ করেন। ডারুইনের পিতা চিকিৎসাব্যবসায়ী ছিলেন, এবং তাঁহার পিতামহ ডাক্তার ইরাস্মস্ ডারুইন (Dr. Erasmus Darwin) একজন প্রতিষ্ঠালব্ধ কবি ও প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ছিলেন। পৌত্র যে মতকে পূর্ণাবয়ব ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া জগতে অতুল কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। পিতামহও সেই মতের একজন প্রথম পোষক ছিলেন। ডারুইনের মাতা মৃৎপাত্রাদিনির্ম্মাতা সুবিখ্যাত শিল্পী জোসায়া ওয়েজ্‌উডের * কন্যা। অতএব ডারুইনের পিতৃকুল ও মাতৃকুল উভয়ই বিজ্ঞানানুরাগী ছিল।

বাল্যাবস্থায় ডারুইন কিছু দিন শ্রুজবেরি নগরস্থ এক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নানন্তর ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ১৬ বৎসর বয়ঃক্রম কালে, স্কটলণ্ডের রাজধানী এডিনবরা নগরে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার্থ প্রেরিত হয়েন। সেই সময়েই তাঁহার প্রাণীবিদ্যানুশীলনে বিশেষ অনুরাগের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। তাহারই অনতিদীর্ঘকাল মধ্যে ডারুইন উত্তরাধিকার সূত্রে যথেষ্ট সম্পত্তির অধিকারী

* জোসায়া ওয়েজ্‌উড্ মৃৎপাত্রাদি নির্ম্মাণ সম্বন্ধে বিশেষ উন্নতি করিয়াছিলেন। আজি কালি ঔষধালয় মাজে যে পাথরের খল ব্যবহৃত হয়, তাহা "ওয়েজ্‌উড্ মরটার" (Wedgewood mortar) নামেই বিখ্যাত।

বয়ঃকালে, চিকিৎসাবিদ্যার অধ্যয়নে বিরত হয়েন। তৎপরে শিক্ষার্থী হইয়া তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন এবং তথায় ১৮৩১ সালে বি, এ, উপাধি ও ১৮৩৭ সালে এম্, এ, উপাধি প্রাপ্ত হয়েন।

১৮৩১ সালে, অর্থাৎ যে বৎসর তিনি বি, এ, উপাধি প্রাপ্ত হয়েন, সেই বৎসরই তিনি প্রথম বৈজ্ঞানিক কার্য্যে ব্রতী হয়েন; এবং সেই শুভক্ষণ হইতেই তাঁহার মহীয়ান্ মতের সূত্রপাত হয়। ঐ বৎসর আবহবিজ্ঞান (Meteorology) বিশারদ কাপ্তেন ফিট্জরয় (Fitzroy) "বীগ্‌ল্" (Beagle) নামক জাহাজে পৃথিবী প্রদক্ষিণার্থ সমুদ্র যাত্রা করিবার পূর্ব্বে আপনার সমভি-ব্যাহারে এক জন প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত লইবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় ডারুইন আহ্লাদে তাঁহার সহিত যাইতে সম্মত হয়েন। ছয় বৎসর কাল ডারুইন ঐ জাহাজে থাকিয়া পৃথিবীর নানাস্থানের প্রাণিতত্ত্ব ও ভূতত্ত্বের পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হয়েন। ১৮৩৭ সালে ঐ জাহাজ ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিলে, সমুদ্র পরিভ্রমণ কালে ডারুইন যে সকল বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব সংগ্রহ করেন, তাহা সাধারণের পাঠো-পযোগী করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলেন *। এই গ্রন্থখানির লেখা অতীব প্রাঞ্জল ও মনোহর, অথচ বিজ্ঞানগভীর। ইহাতে নানাজাতীয় পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদির চরিত্র বর্ণনা; ভূকম্প, অগ্ন্যুৎপাত, সামুদ্রিক নীহারস্তূপ, প্রভৃতি নৈসর্গিক ব্যাপারের বিবরণ, প্রবালদ্বীপ নির্ম্মাণ প্রণালী ও অন্যান্য ভূতত্ত্ব বিষ-য়ক অভিনব প্রবন্ধাবলি, প্রভৃতি অনেক বিষয় লিখিত আছে। এই গ্রন্থ পাঠ করিলেই বুঝা যায় যে, কোন নৈসর্গিক ব্যাপারই সুনিপুণ পরিদর্শকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে নাই। ইংলণ্ডে প্রত্যাগমনের পর ডারুইন আরও অনেকগুলি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন এবং তৎসমস্তই তাঁহার সমুদ্রযাত্রার ফল। এই সকল গ্রন্থাদি প্রণয়নকালে জীবজগতের বর্ত্তমান ও ভূত কালের অবস্থায় তুলনায় বর্ণোৎপত্তি, (অর্থাৎ পশ্বাদির ও বৃক্ষলতাদির পর-স্পর প্রভেদ ও জাতি বিভাগ) সম্বন্ধে অনেক অভিনব ভাব, ডারুইনের গভীর-চিন্তাশীল মনে উদিত হয়। কিন্তু ডারুইন তাঁহার সেই সকল ভাব ব্যক্ত করিবার জন্য ব্যগ্র হয়েন নাই। তিনি প্রকৃত পণ্ডিতের উপযুক্ত সতর্কতা ও সাবধানতার সহিত স্বীয় মতের তন্ন তন্ন বিচার না করিয়া, তাহা সাধারণের গোচর করিতে

* Journal of Researches with the Netural history and Geology of the Countries visited during the Voyage of H. M. S. Beagle round the World.

একান্ত অনিচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু একটি অদৃষ্টপূর্ব্ব ঘটনার পরবশ হইয়া তাঁহাকে "বর্ণোৎপত্তি" সম্বন্ধে তাঁহার মত ১৮৫৮ সালে অগত্যা প্রকাশ করিতে হইয়াছিল। তৎকালে আল্ফ্রেড্ ওয়ালেস্ (Alfred Wallace) নামা কোন প্রাণীতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত প্রশান্ত মহাসাগরস্থ মালেই (Malay Islands) দ্বীপপুঞ্জের প্রাকৃতিকতত্ত্বানুশীলনে ব্রতী ছিলেন। তিনি তত্রস্থ প্রাণিতত্ত্ব পর্য্যালোচনাপ্রসঙ্গে বর্ণোৎপত্তি সম্বন্ধে ডারুইনের অনুরূপ মত স্থির করিয়াছিলেন, এবং তদ্বিষয়ে এক প্রবন্ধ লিখিয়া, ইংলণ্ডের বিজ্ঞানসভাবিশেষে পঠিত হইবার জন্য স্বদেশে প্রেরণ করেন। কিন্তু ডারুইনের আবিষ্কৃত মত ইহার বহু পূর্ব্বে স্যর চার্লস লায়েল (Sir Charles Lyall) ও ডাক্তার হুকর (Dr. Hooker) নামক বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতদ্বয়, সবিশেষ অবগত ছিলেন, তাঁহাদেরই উত্তেজনায় ডারুইন ও ওয়ালেস উভয়ের প্রবন্ধই একত্রে পঠিত হইতে ডারুইন সম্মত হয়েন।

১৮৫৮ সালের ১লা জুলাই রাত্রিতে ঐ দুই প্রবন্ধই লিন্নীয়ান সোসাইটী (Linnæan Society) নামক বিজ্ঞান সভায় পঠিত হয়, এবং সেই ১লা জুলাই ডারুইনের বর্ণোৎপত্তিবিষয়ক মতের শুভ জন্ম দিন বলিয়া গণনা করিতে হইবে, যদিও তাঁহার "বর্ণোৎপত্তি" (Origin of Species) নামধেয় মহান্ গ্রন্থ তাহার প্রায় এক বৎসর পরে প্রকাশিত হয় কিন্তু ঐ গ্রন্থের উপক্রমণিকাভাগে ডারুইন জীব-জগতের বর্ণোৎপত্তি সম্বন্ধে তাঁহার মতপরিবর্ত্তনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিয়াছেন। কিরূপে সাগর পর্য্যটনকালে নানা দেশের নানাজাতির জীবোদ্ভিদাদির জাতি ও বর্ণ বৈচিত্র দেখিয়া তিনি মুগ্ধ ও সেই বৈচিত্রের মূল কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েন এবং অবশেষে কিরূপে ১৮৩৭ সাল হইতে বিংশতি বৎসরকাল গভীর গবেষণায় ব্যাপৃত থাকিয়া ১৮৫৮ সালে প্রথম তাঁহার সুপরিণত "পরিণতিবাদ" মত (Theory of Evolution) সাধারণের গোচর করেন ইত্যাদি বিষয় ই হাতে লিখিত আছে। তাঁহার পরিণতিবাদ মতের মূল কথা এই যে, আমরা বর্ত্তমান কালে পৃথিবীতে প্রাণী ও উদ্ভিদগণের যেরূপ অগণিত জাতি বংশ ও বর্ণ লক্ষিত করি, তাহারা আদিতে ঐরূপ জাতি, বংশ বা বর্ণে বিভক্ত হইয়া আবির্ভূত হয় নাই। তাহারা যুগ যুগান্তর পূর্ব্বে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট জীব ছিল; ক্রমে কাল সহকারে অনুকূল অবস্থার বলে শারীরিক ও মানসিক উন্নতি প্রযুক্ত উৎকৃষ্টতর জীবরূপে পরিণত হইয়াছে। জীবোদ্ভিদাদি যে প্রণালিতে এই রূপে পরিণতি প্রাপ্ত হয়, তৎসম্বন্ধে ডারুইন তিনটি কারণ নির্দ্দেশ করেন। প্রথম, প্রাকৃতিক নির্ব্বা

চন (Natural Selection) দ্বিতীয়, রাক্ষস বিগ্রহ বা * জীবার্থ সংগ্রাম (Struggle for Existence) এবং তৃতীয়, যোগ্যের জয় (Survival of the Fittest)। কাল সহকারে জীবোদ্ভিদাদির অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে এবং তৎপ্রযুক্ত আবশ্যকীয় অঙ্গের স্ফূর্ত্তি ও অনাবশ্যকীয় অঙ্গের অবনতি হয়। এইরূপ প্রাণীগণের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির স্ফূর্ত্তি ও উন্নতি হওয়ার নাম "ভূতনিরুক্তি বা প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন"। প্রাণিবর্গ স্ব স্ব জীবন রক্ষার্থ ও জীবন ধারণোপযোগী আহার আহরণার্থ প্রতিনিয়তই পরস্পর বিরোধী; এইরূপ বিরুদ্ধভাব, কি প্রাণী জগতে কি উদ্ভিদ জগতে সর্ব্বত্রই লক্ষিত হয়; এবং তাহাকেই "জীবার্থ সংগ্রাম" বলিয়া ডারুইন উল্লেখ করিয়াছেন। এই জীবার্থ সংগ্রামে, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন প্রসাদে শরীর গঠনের প্রকৃষ্ট উন্নতি প্রযুক্ত যে জীব বিশেষ যোগ্যতালাভ করিয়াছে সেই জীবই জয়ী হইবে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ প্রাণিগণের উচ্ছেদ ও যোগ্যের স্থায়িত্ব সাধিত হইবে। ইহাই ডারুইনের "যোগ্যের জয়"।

১৮৫৯ সালের পর ডারুইন যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তৎসমুদায়ই তাঁহার বর্ণোৎপত্তি বিষয়ক মতের প্রমাণ সংগ্রহ মাত্র। এই সকল গ্রন্থে এত ভূরি পরিমাণে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, যে তিনি আর কিছুই বাঞ্ছনীয় রাখেন নাই। মনুষ্যের উৎপত্তি, বৃক্ষ লতাদির গতি শক্তি, গৃহ পালিত জীবোদ্ভিদের পরিবর্ত্তন, পুষ্পাদির গঠন বৈচিত্র, প্রভৃতি নানা বিষয়ের সূক্ষ্ম তত্ত্ব সকল উদ্ভাবন করিয়া তাঁহার পরিণতিবাদ † মতের যাথার্থ স্থাপন করিয়াছেন। (Origin of Species) গ্রন্থ প্রকাশের পর, ১৮৬২ সালে Fertilization of Orchids. ১৮৬৮ সালে Variation of Animals and Plants under Domestication; ১৮৭১ সালে Descent of Man; ১৮৭২ সালে Expression of the Emotions; ১৮৭৫ সালে Movements and Habits of Climbing Plants, ঐ বৎসরেই Insectivorous Plants; ১৮৭৬ সালে Effects of Cross and Self Fertilization in the Vegetable Kingdom; ১৮৭৭ সালে Different Forms of Flowers on Plants

---

* আর্য্য জাতির প্রণীত পুরাণশাস্ত্রে এই ভূত নিরুক্তি ও রাক্ষস বিগ্রহাদির সংক্ষেপে ও গূঢ়রূপে উল্লেখ আছে। উহার অন্তর্গত "ভূত সর্গ" পাঠ করিলে ইহা জানিতে পারা যায়।

† পদ্মপুরাণাদিতেও মনুষ্যকে নবম বা শেষ সৃষ্টি বলা হইয়াছে অর্থাৎ ভগবান্ স্রষ্টা পুরুষ অগ্রে পশু পক্ষী ও উদ্ভিদাদির সৃষ্টির পর মনুষ্যের সৃষ্টি করিয়াছেন; ইত্যাদি লিখিত আছে। (স)

of the same species; ১৮৮০ সালে Powers of Movement in plants; এবং অবশেষে ১৮৮১ সালে Formation of Vegetable mould through the Action of Worms প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহা ব্যতীত অনেক বৈজ্ঞানিক পত্রে নানা প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ডারুইনের প্রচারিত গ্রন্থাবলির মধ্যে "বর্ণোৎপত্তি (Origin of Species) ও "মনুষ্যের উৎপত্তি (Desent of Man) নামধেয় গ্রন্থদ্বয়সম্বন্ধেই অনেক সুতর্ক ও কুতর্ক উঠিয়াছিল এবং অদ্যাপি তাহা সমাপ্ত হইয়াছে বলা যায় না। হীন প্রাণী বিশেষ, সম্ভবতঃ বানর জাতীয় কোন প্রাণী হইতেই মনুষ্যের উৎপত্তি হইয়াছে, ডারুইন তাঁহার মনুষ্যের উৎপত্তি বিষয়ক গ্রন্থে এই মত অকাট্য প্রমাণ সহ প্রচার করাতে অনেক স্থূলদর্শী ব্যক্তির ব্যঙ্গোক্তি ও নিন্দাবাদের পাত্র হইয়াছিলেন। কিন্তু গুণিগুণাগ্রগণ্য ডারুইন কখন সে সকল প্রলাপ বাক্যের প্রতিবাদ করিয়া তাঁহার উন্নত মস্তিষ্কের অপব্যয় করেন নাই; তিনি কখন বৃথা বাগ্‌বিতণ্ডায় কালাতিপাত করেন নাই। তবে যে সকল বিজ্ঞ ব্যক্তি সুতর্ক করিয়া তাহার মতের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের যুক্তি তিনি যত্নের সহিত বিচার করিয়া সদুত্তর প্রদানে প্রয়াস পাইয়াছেন এবং কচিৎ তাঁহার মত পরিবর্তনও করিয়াছেন।

ডারুইনের অমূল্য জীবন একমাত্র বিজ্ঞানানুশীলনেই অতিবাহিত হইয়াছে। তিনি কখন কোন বিদ্যালয়ের অধ্যাপনা বা অন্য কোন সাধারণ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন নাই। আধুনিক ভূতত্ত্ব বিদ্যার নেতা ও নিয়ন্তা স্যর চার্ল্‌স্‌ লায়েলের ন্যায়, ডারুইনকেও কখন উদরান্নের জন্য ভাবিতে হয় নাই। এরূপ সৌভাগ্য অনেক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতের ঘটিয়া উঠে না। ডারুইনের যে, তাদৃশ সৌভাগ্য সম্মিলিত হইয়াছিল, তাহা জগতের সৌভাগ্য বলিতে হইবে। তন্নিবন্ধনই ডারুইন আজীবন কায়মনোবাক্যে বিজ্ঞানের উপাসনাকার্য্যে ব্রতী থাকিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার অসামান্য বিদ্যাবত্তার সমাদরার্থ ১৮৭৭ সালে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে এল, এল, ডি উপাধি প্রদান পূর্ব্বক সম্মানিত করেন; অথবা তিনি তদুপাধি গ্রহণে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান বর্দ্ধন করেন।

ডারুইন যৌবন কাল হইতেই সময়ে সময়ে এক ক্লেশকর পীড়ায় অভিভূত হইতেন; এবং যে সময়ে ঐ রোগে আক্রান্ত হইতেন, তখন কিয়ৎকালের জন্য তাঁহাকে এক কালে শয্যাশায়ী থাকিতে হইত। তাহার উপর অনবচ্ছিন্ন বিজ্ঞানানুশীলনে তাঁহার বিশেষ স্বাস্থ্যহানি হইয়াছিল। এবং এই দুই কারণ বশতঃ তাঁহার জীবিতকালের কতকটা হ্রাস হইয়াছিল সন্দেহ নাই। ৭৩ বৎসর বয়ঃক্রম

কালে তাঁহার কেণ্ট্ শায়ারের নিভৃত আবাসে গত ১৯শে এপ্রেল তারিখে তিনি মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন।

ডারুইন এক বৃহৎ পরিবার রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পত্নী ও পাঁচ পুত্র এবং দুই কন্যা জীবিত আছেন। তাঁহার পুত্রগণ সকলেই কৃতবিদ্য ও কৃতকর্ম্মা।

আমরা উপসংহারে ডারুইনের ধর্ম্মমত সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি। অনেকে ডারুইনকে নাস্তিক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু আমরা বলি, তাঁহারা একান্ত ভ্রান্ত। ডারুইন্ তাঁহার Origin of Species গ্রন্থের উপসংহার ভাগে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ডারুইনের সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরে বিশ্বাস ছিল; এবং তাঁহার পরিণতিবাদ ঈশ্বরের মহিমা খর্ব্ব না করিয়া বরং বর্দ্ধন করিয়াছে। আমরা ইহার পোষক বংশোৎপত্তি গ্রন্থ Origin of Species হইতে দুইটী অংশ প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম:—

"There is grandeur in this view of life, with its several powers having been originally breathed by the Creator into a few forms or into one; and that, whilst this planet has gone cycling on according to the fixed law of gravity, forms so simple a beginning endless forms, most beautiful and most wonderful, have been and are being evolved ....Authors of the highest eminence seem to be fully satisfied with the view that each species has been independently created. To my mind it accords better with what we know of the laws impressed on matter by the Creator, that the production and extinction of the past and present inhabitants of the world should have been due to secondary causes, like those determining the birth and death of the individual. When we view all beings not as special creations, but as the lineal descendants of some few beings which lived long before the first bed of the Cambrian system was deposited, they seem to me to become ennobled."

(ক্রমশঃ)।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ ধর।

আর্য্যজাতির ব্যাকরণশাস্ত্র।

কাহারও প্রশংসায় অত্যুক্তি করিতে নাই, করিলে মনুষ্যত্বের হানি হয়। মানুষকে দেবতা বলিতে নাই, কেননা, বলিলে উনবিংশ শতাব্দীর কটাক্ষভঙ্গী সহ্য করিতে হয়। নতুবা আমরা আর্য্যজাতির ব্যাকরণশাস্ত্রের প্রশংসা করিতে গিয়া হয় তো রাগবশে অত্যুক্তি করিয়া ফেলিতাম, হয় তো পাণিনি ও বোপদেবকে দেবতা বলিয়া ফেলিতাম্।

অঙ্কশাস্ত্রের ত্রৈরাশিক শিখিলে ত্রৈরাশিকের সমুদায় অঙ্কই কসিতে পারা যায়, গুণ ভাগ শিখিলে গুণ ভাগের সমুদায় অঙ্কই কসিতে পারা যায়। কিন্তু একই নিয়মে গুণ ভাগ ও ত্রৈরাশিক কসিতে পারা যায় না, উহাদের ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম আবশ্যক করে। সংস্কৃত ব্যাকরণের শব্দপরিচ্ছেদে যে নিয়ম করা হইতেছে, ধাতু পরিচ্ছেদেও তাহাই খাটিতেছে। যথা "ভি পরে হ স্থানে ঢ় হয়"। এস্থলে 'ভি'র অর্থ এইরূপ করা হইতেছে যথা "ভৌ পরে যৎকার্য্যং বক্ষ্যতে তৎ লের্ইসে ধো ঝ্ সে স্যাৎ"। অর্থাৎ ভি পরে যে কার্য্য বলা হইবে, শব্দ পরিচ্ছেদে তাহা হস্ পরে এবং ধাতুপরিচ্ছেদে ঝস্ পরে হইবে। হস্ অর্থাৎ সমুদয় ব্যঞ্জন বর্ণ, ঝস্ অর্থাৎ বর্গের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, ও চতুর্থ বর্ণ এবং শ, স, ষ। এখন পাঠক বিবেচনা করুন, সংস্কৃত ভাষায় দুই সহস্রের অধিক ধাতু আছে এবং ১৮০টী প্রত্যয় যোগে অধিকাংশ ধাতুরই পদ স্থির হইয়া থাকে। ইহাতে কত পদ হয়? অথবা শুধু এই কয়েকটী প্রত্যয় নহে, শতাধিক তদ্ধিত প্রত্যয় আছে; ব্যাকরণকার যখন লক্ষণ করিয়াছিলেন যে, ঝস্ পরে ধাতুর হ স্থানে ঢ় হয়, তখন অবশ্য তাঁহাকে এই সমস্ত পদ একে একে মনোমধ্যে উপস্থিত করিয়া পরীক্ষা করিতে হইয়াছিল। শুধু তাহাই নহে, তিনি দেখিলেন যে, শব্দপরিচ্ছেদেও ঝস্ পরে হ স্থানে ঢ় হইতেছে, তবে শব্দপরিচ্ছেদে কিঞ্চিৎ বিশেষ এই যে, সেস্থলে বর্গের পঞ্চমবর্ণ ও হ, য, ব, র, ল এই কয়েকটি বর্ণ পরেও হ স্থানে ঢ় হইতেছে। অন্ততঃ দ্বাদশ বৎসর নিমীলিত নয়নে ধ্যান না করিলে, এ সকল আলোচনা শেষ করা কঠিন বলিয়া বোধ হয়। শব্দ ও ধাতুর 'ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান' দিব্য চক্ষে না দেখিতে পাইলে, এ সকল সিদ্ধান্ত করা কঠিন বলিয়া বোধ হয়। এইনিমিত্তই এ সকল ব্যাপার সুসভ্যতম উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগেও বিস্ময়ের বিষয় হইয়া রহিয়াছে।

এই নিমিত্ত কেহ কেহ ইহাও সন্দেহ করেন্ যে, হয়তো সংস্কৃত ভাষায় আগে ব্যাকরণ ও পরে পদনির্ম্মাণ ও ভাষাবিস্তার হইয়াছিল। তাঁহাদের মতে কোন ভাষাতেই সকল ধাতুর সকল পদের প্রয়োগ হয় না, অল্পসংখ্যক ধাতুই সর্ব্বদা প্রযুক্ত হয়, পরে ভাষাবৃদ্ধি সহকারে নূতন ধাতুর বৃদ্ধি হইতে থাকে—যেমন বাঙ্গালা ভাষায় নিবেদিতেছি প্রভৃতি পদ সম্প্রতি ঘটিয়াছে। তাঁহাদের মতে পুরাকালে গুরুভক্তি ও পূর্ব্বপুরুষভক্তি অধিক ছিল, পর পর কালের লেখকেরা নূতন নূতন ক্রিয়াপদের আবিষ্কার কালে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৈয়াকরণিকদিগের অনুরচন করিয়া গিয়াছেন মাত্র। আর একপ্রকার মত এই যে, পাণিনি কতকগুলি পদের স্বয়ং সৃষ্টি করেন্। তিনি অনুমান করিয়া দেখিলেন 'বড় জোর' এতগুলি ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হইতে পারে, তিনি দেখিলেন্ যে আর ক্রিয়া না হইলেও চলিবে। তিনি সমুদায় পদই ভিন্ন ভিন্ন সূত্রের অন্তর্গত করিয়া রাখিলেন। পরবর্ত্তী লোকেরা ঐ সকল ক্রিয়াপদ ব্যবহার করিয়া আসিতে লাগিলেন্। ফলতঃ পাণিনির পর সংস্কৃত ভাষায় যত গ্রন্থ হইয়াছে, কাহাতেই পাণিনির সূত্রের বিপরীত পদ নাই! ইহাতে বোধ হয় যে, সংস্কৃত ভাষা যতদূর প্রধাবিত হইতে পারে, পাণিনি তাহা স্থির করিয়া ভাষাকে লক্ষণবদ্ধ করিয়াছিলেন।

পাণিনি মাহেশ সূত্র অবলম্বন করিয়া ব্যাকরণ নির্ম্মাণ করেন্। যেমন ভারতবর্ষের কাব্য ও নাটক সকল প্রায়ই মহাভারত বা রামায়ণের কোন না কোন গল্প অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে, সেইরূপ সংস্কৃত ভাষার সমুদায় ব্যাকরণই মাহেশের সূত্র অবলম্বন করিয়া লিখিত। মাহেশের প্রথম সূত্র কোন বৈয়াকরণই লঙ্ঘন করিতে পারেন নাই। প্রথম সূত্র যথা;—

অ, ই, উণ্। ঋ, ৯ক্। এ, ওঙ্। ঐ, ঔচ্। হ, য, ব, রট্। লণ্। ঞ, মঙ্ ণ, নম্। ঝ, ভঞ্। ঘ, ঢ, ধষ্। জ, ব, গ, ড, দশ্। খ, ফ, ছ, ঠ, থ, চ, ট, তব্। ক, পয়্। শ, ষ, সর্। হল্।

যে ব্যক্তি ভাষার ছেদ বিচ্ছেদ করিয়া তাহা হইতে বীজ স্বরূপ বর্ণমালার প্রথম আবিষ্কার করেন্, তাঁহার যে চাতুরী, যিনি প্রথমে সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রথম সূত্র আবিষ্কার করেন, তাঁহার চাতুরী অপেক্ষা ন্যূন বলিয়া বোধ হয় না। আমাদের ইহাও সন্দেহ হয় যে, যিনি প্রথম সূত্র রচনা করেন, তিনিই সংস্কৃত বর্ণমালার প্রথম সৃষ্টি করেন। উক্ত সূত্রটীর গঠন এই রূপ, যে কোন দুই অক্ষরের নাম করিলে সেই দুই অক্ষর ও তাহাদের অন্তর্গত সমুদায় অক্ষর বুঝাইবে; যথা অক্ বলিলে অ, ই, উ, ঋ, ৯ (হ্রস্ব ও দীর্ঘ); এঙ বলিলে এ, ও; ঐচ বলিলে ঐ, ঔ, মাত্র বুঝাইবে অর্থাৎ ক্, ঙ্, চ্ ইৎ, বুঝিতে হইবে। এইরূপ অচ্ বলিলে

সমুদায় স্বরবর্ণ, হল্ বলিলে সমুদায় ব্যঞ্জন বর্ণ, ঞঙ্ বলিলে সমুদায় বর্গের পঞ্চম-বর্ণ ইত্যাদি বুঝাইবে। আর্য্যেরাই বোধ হয় সর্ব্ব প্রথমে স্থির করেন যে, বর্ণদিগের সাজাত্য আছে এবং ঐরূপ সাজাত্য ক্রমে এক বর্ণস্থানে অপর বর্ণের ব্যবহার হয়। বলা হইয়াছে যে, হ পরে চর্ স্থানে জশ্ হয়। এস্থলে চর্—চ, ট, ত, ক, প এবং জশ্—জ, ড, গ, ড, দ। এখন বুঝিতে হইবে যে, হ পরে থাকিলে চ স্থানে জ, ট স্থানে ড, ত স্থানে দ, ক স্থানে গ এবং প স্থানে ব হয়। কিন্তু চ স্থানে দ হয় না বা ট স্থানে জ হয় না ইত্যাদি। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে সাজাত্য ক্রমে এইরূপ হয়। এখন যে যে বর্ণ যে বর্ণের সজাতি তাহা বলা হইতেছে। যথা

ক খ গ ঘ ঙ ইহারা সজাতি। এইরূপ
চ ছ জ ঝ ঞ ,, ,,
ট ঠ ড ঢ ণ ,, ,,
ত থ দ ধ ন ,, ,,
প ফ ব ভ ম ,, ,,

এইরূপ অন্যান্য বর্ণের সাজাত্যও স্থির করা হইয়াছে। আরও স্থির করা হইয়াছে যে, সজাতি বর্ণ সকল এক স্থানোচ্চারিত অথবা একস্থানোচ্চারিত বলিয়াই ইহারা সজাতি।

এই সকল কারণে পণ্ডিতেরা স্থির করেন যে, সংস্কৃত ভাষার বর্ণমালা সাতিশয় উৎকৃষ্টরূপে সজ্জিত। অন্যান্য ভাষার বর্ণমালা এরূপ সুসজ্জিত নহে। ইংরাজীতে a. b. c. d. ইত্যাদি ক্রমে বর্ণমালা সজ্জিত হইয়াছে, উহাদের পর্য্যায় ক্রম নাই, যেখানে যাহা ইচ্ছা বসান হইয়াছে, সাজাত্যক্রম রক্ষা করা হয় নাই। গ্রিম প্রভৃতি কোন কোন ইউরোপীয় পণ্ডিত যেরূপ লিখিয়াছেন, তাহাতে এরূপও বোধ হয় যে, দেশভেদে ভাষার প্রভেদ বর্ণ-সাজাত্য ক্রমে সংস্থিত হইয়াছে যথা পিতৃ = Father, এস্থলে দেখ, প স্থানে ফ হইয়াছে এবং ত স্থানে দ হইয়াছে অর্থাৎ পিতৃশব্দের সংস্কৃত ও ইংরাজীতে প্রভেদ হইয়াছে বটে কিন্তু ঐ প্রভেদ বর্ণ সাজাত্য ক্রমে সংস্থিত হইয়াছে—প স্থানে ফ হইয়াছে, ত স্থানে দ হইয়াছে, কিন্তু প স্থানে ক, গ প্রভৃতি বিসদৃশ বর্ণের বিনিবেশ হয় নাই। কেহ কেহ এতদূর পর্য্যন্তও বলিতে চাহেন যে, অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পৃথিবীর সমুদায় ভাষাই এইরূপ মূলতঃ এক, কেবল জল বায়ু ও দেশ ভেদে উচ্চারণ প্রকার ভেদ বশতঃ এক বর্ণের স্থানে তজ্জাতীয় অপর বর্ণ বসিয়াছে। স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় যে, বাঙ্গালা দেশের কোন কোন অঞ্চলে হ স্থানে অ, ভ স্থানে ব এইরূপ করিয়া শব্দ উচ্চারিত হয়—বস্তুতঃ হ এবং অ, ভ এবং ব সজাতীয়। এই

সিদ্ধান্তের সমর্থন করিবার নিমিত্ত কেহ কেহ অনুমান করেন যে, মানবজাতি যেহেতু সর্ব্বত্রই একরূপ মন ও একইরূপ শরীরাদি ধারণ করেন, এবং ভাষা যেহেতু মনোগত ভাবের রূপ বা চিত্রমাত্র, সেই হেতু ঐরূপ বর্ণ সর্ব্বত্রই একবিধ, অতএব ভাষা অবশ্য সর্ব্বত্রই এক হওয়া উচিত; তবে যদি বল যে, এক বলিয়া আপাততঃ প্রতীয়মান হয় না কেন? তাহার উত্তর এই যে, জিহ্বা ও শ্রবণের কোন প্রকার ভেদ বশেই ঐরূপ প্রতীয়মান হইতেছে না। এই মতের বাদীরা প্রমাণ করিতে চান যে, দেখ, একজন ইংরাজকে 'ক' উচ্চারণ করিতে বল, সে খ উচ্চারণ করিবে, সে মনে করিবে যে বাস্তবিক 'ক'ই উচ্চারণ করিতেছি। আবার তুমি ক স্থানে খ উচ্চারণ কর, সে প্রতিবাদ করিবে। ইহাতে অবশ্য বুঝিতে হইবে যে, বাঙ্গালী ও ইংরাজে জিহ্বা ও শ্রবণের কোন না কোন প্রকার প্রভেদ রহিয়াছে।

যাহা হউক, এক্ষণে আমরা পুনর্ব্বার প্রস্তুত বিষয়ে অবতরণ করিতেছি। পূর্ব্বে অ, ই, উণ প্রভৃতি যে সকল লক্ষণ করা হইয়াছে, সেগুলি এরূপ কৌশলে রচিত যে, প্রকাণ্ড সংস্কৃত ব্যাকরণের সর্ব্বস্থলেই প্রযুক্ত হইয়াছে। সন্ধি পরিচ্ছেদেও বলা হইতেছে যে অমুক অমুক বর্ণ স্থানে অণ্ হয়, ধাতু পরিচ্ছেদেও বলা হইতেছে যে অমুক বর্ণ স্থানে অণ্ হয়, অর্থাৎ কোন স্থলেই সংজ্ঞা পরিবর্ত্ত করিবার আবশ্যকতা হয় নাই। আপাততঃ দেখিলে বোধ হয় যেন বিধাতা সংস্কৃত ভাষার পূর্ব্বাপর স্বয়ং গঠন করিয়া দিয়াছেন। এরূপ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ স্থানে পুনঃ পুনঃ এক বর্ণের উপস্থিতি দেখিলে কাহার মনে বিস্ময়ের উদয় না হয়? কতকগুলি বর্ণের যেন একপ্রকার অনুল্লঙ্ঘনীয় সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়, যেমন ই, ও য, উ ও ব, ঋ ও র। সন্ধি ও শব্দ পরিচ্ছেদে প্রায়ই দেখা যায় যে ই স্থানে য, উ স্থানে ব এবং ঋ স্থানে র হইতেছে; ধাতুপরিচ্ছেদে প্রায়ই দেখা যায় যে য স্থানে ই, ব স্থানে উ এবং র স্থানে ঋ হইতেছে। বর্ণবিশেষ পরে থাকিলেই ঐরূপ হইয়া থাকে, যেমন ক্ত প্রত্যয় পরে স্বপ, বচ, যজ, বপ, বহ, বে, ব্যে, হ্বে, বদ, বস, শ্বি ধাতুর ব স্থানে উ এবং য স্থানে ই হয় অর্থাৎ স্বপ+ক্ত=সুপ্ত, বচ+ক্ত=উক্ত, বপ+ক্ত=উপ্ত ইত্যাদি। যেমন রসায়ন সংসারে এক বস্তুর সন্নিকর্ষে অপর বস্তুর বিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবিনী, সংস্কৃত সাহিত্যেও সেইরূপ এক বর্ণের সন্নিকর্ষে বর্ণান্তরের বিক্রিয়া ঘটিয়া থাকে; সুতরাং আমাদের পুনঃ পুনঃ এই কথাই মনে হয় যে, যেন পরামর্শ করিয়া সংস্কৃত ভাষা রচনা করা হইয়াছিল।

(ক্রমশঃ)।

শ্রীযশোদানন্দন সরকার।

আর্য্যজাতির ব্যাকরণশাস্ত্র।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

কোন কোন স্থলে বাস্তবিক পরামর্শের চিহ্নও দেখিতে পাওয়া যায়, সে সে স্থলে বোধ হয় যেন মুনিরা সভা করিয়া পরস্পরের মতামত লইয়াছিলেন। যেমন কাহারও কাহারও মতে কোন কোন বর্ণের দ্বিত্ব হয়, এস্থলে বলা হইতেছে যে "ত্রিপ্রভৃতিষু শাকটায়নস্য" অর্থাৎ শাকটায়ন মুনির মতে ইন্দ্র প্রভৃতি তিন বা ততোধিক যুক্ত বর্ণস্থলে বিকল্পে দ্বিত্ব হয় যথা ইন্দ্র বা ইনদ্র। আবার "সর্ব্বত্র শাকল্যস্য" অর্থাৎ শাকল্য মুনির মতে কোনস্থলেই দ্বিত্ব হয় না। যথা অর্ক, ব্রহ্মা ইত্যাদি। পরে বলা হইয়াছে, যে "দীর্ঘাদাচার্য্যাণাং" অর্থাৎ আচার্য্য পাণিনির মতে দীর্ঘ স্বরের পর দ্বিত্ব হয় না, যথা দাত্র, পাত্র ইত্যাদি।

সংস্কৃত ব্যাকরণের উৎপত্তির সম্বন্ধে প্রবাদ এই যে, ব্যাকরণ না থাকাতে বৈদিক ও লৌকিক ভাষার অনর্থ সম্ভাবনা আন্দোলন করিয়া সনকাদি মুনিগণ একত্র হইয়া মহেশ্বরের নিকট আবেদন করিলেন; মহেশ্বর এক মনে এক ধ্যানে নৃত্য করিতে-ছিলেন, নৃত্যাবসানে মুনিগণকে সমবেত নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাদের বাঞ্ছা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত 'নয় বার ও পাঁচ বার' অর্থাৎ চৌদ্দ বার ডমরু বাজাইলেন, তাহা-তেই পূর্ব্বোক্ত চতুর্দ্দশটী সূত্রের উৎপত্তি হইল। এই গল্প আরও অনেক দূর গিয়াছে, কিন্তু সে সকল আমাদের বলিবার আবশ্যক নাই। আমরা এক্ষণে সিদ্ধান্তকৌমুদীকার ভট্টোজীদীক্ষিত ও মুগ্ধবোধকার বোপদেবের কথঞ্চিৎ বিবরণ করিয়া উপসংহার করিব।

পাণিনি যতদূর লিখিয়াছেন, তাহার পর আর সংস্কৃত ব্যাকরণের বৃদ্ধি হয় নাই, বরং হ্রাসই হইয়াছে। সিদ্ধান্তকৌমুদী পাণিনিরই রূপান্তর মাত্র; উহাতে পাণি-নিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিবার চেষ্টামাত্র করা হইয়াছে; কিন্তু আমাদের মতে যেমন একদিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়াছে, তেমনি অপর দিকে ভয়ঙ্কর বিশৃঙ্খলতা ঘটিয়াছে। পাণিনি রীতিমত পরিচ্ছেদ বিভাগ করিয়া যান নাই, ভট্টজী তাহা করিয়াছেন। কিন্তু ভট্টজী পাণিনির এখানকার সূত্র ওখানে এবং ওখানকার সূত্র এখানে আনি-য়াছেন, অথচ পরস্পর আকাঙ্ক্ষা রাখা হইয়াছে। ঐ আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত পাঠককে একবার প্রথম পৃষ্ঠা, একবার শেষ পৃষ্ঠা এইরূপ করিয়া উল্টাইয়া

যাইতে হয়। পাণিনির প্রথম অধ্যায়ের প্রথম ছেদের নবম সূত্র ভট্টজীর প্রথম অধ্যায়ের একাদশ সূত্র, কিন্তু পাণিনির অষ্টম অধ্যায়ের চতুর্থপাদের ৫৮ সূত্র ভট্টজীর প্রথম অধ্যায়ের দ্বাদশ সূত্র। অথচ পাণিনির অষ্টম অধ্যায়ের চতুর্থপাদের ৫৭ সূত্র না পড়িলে, তাঁহার ৫৮ সূত্রের ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ হয় না। সুতরাং সিদ্ধান্তকৌমুদী পাঠ করিতে হইলে, পাঠককে বিষম বিপদগ্রস্ত হইতে হয়। ভট্টজী আর একটু পরিশ্রম করিলে আমাদের মত হীনবুদ্ধি পাঠকের সুবিধা হইতে পারিত। তিনি যদি প্রত্যেক সূত্রকে সম্পূর্ণ ও স্বতন্ত্র করিয়া যাইতেন, তাহা হইলেই সুবিধা হইত। যথা 'পতির্বা' এস্থলে "পতির্মুনিবৎ বা ষষ্ঠীযুক্তঃ" অর্থাৎ ষষ্ঠ্যন্ত পতি শব্দ বিকল্পে মুনিবৎ হয়, যথা ক্ষেত্রস্য পতিনা। এস্থলে দেখুন 'পতির্বা' বলা হইয়াছে, অথচ দুই তিন শত পৃষ্ঠার পূর্ব্বে "মুনিবৎ ষষ্ঠীযুক্তঃ" এইরূপ আছে, তাহারই অনুবৃত্তি রক্ষা করা হইয়েছে। ফলতঃ এই সকল কারণে সিদ্ধান্তকৌমুদীর পাঠকালে দারুণ গোলযোগ বোধ হয়।

বোপদেব সংস্কৃত ব্যাকরণকে যেরূপ সংক্ষিপ্ত করিয়াছেন তৎপূর্ব্বে আর কেহ সেরূপ করিয়া যান নাই। যথা, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৈয়াকরণেরা "ইকো যণচি" এবং "এচো যবায়াবঃ" দুই সূত্র করিয়াছেন, বোপদেব এস্থলে "যণায় বায়া বো চীচঃ" এক সূত্রে শেষ করিয়াছেন। বোপদেবের আর এক গুণ এই যে, অন্যান্য ব্যাকরণের স্থলে স্থলে টীকাকারদিগকে সংলগ্নতা রক্ষা করিতে হইয়াছে, কিন্তু বোপদেব আপনার ব্যাকরণের সমুদায় স্থলই প্রায় সুসংলগ্ন করিয়াছেন। কিন্তু আমরা একথা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে, যদি সিদ্ধান্ত কৌমুদীকার আপনার সূত্রগুলি স্বতন্ত্র ও সম্পূর্ণ করিয়া যাইতেন, তাহা হইলে, বোপদেবের মুগ্ধবোধ অনাবশ্যক বলিয়া বোধ হইত। যেমন "হোঢ়ঃ" অর্থাৎ হ স্থানে ঢ হয়, এস্থলে যদি কৌমুদীকার "হোঢো ঝলি" এইরূপ কহিতেন, তাহা হইলে তাঁহার সূত্রটী স্বতন্ত্র ও সম্পূর্ণ হইতে পারিত।

ফলতঃ বোপদেব অসাধারণ শক্তি সম্পন্ন হইলেও, আমরা এমন কথা বলি না যে পাণিনি প্রভৃতি তাঁহার অপেক্ষা শক্তি সম্পন্ন নহেন। যদি পাণিনি সোপান প্রস্তুত না করিতেন, তবে বোধ হয়, ওরূপ কৌশলের সহিত ব্যাকরণমঞ্চে আরোহণ করা বোপদেবের সহজ হইত না। অন্যান্য ব্যাকরণকারেরা যে চেষ্টা করিলে বোপদেবের ন্যায় সংক্ষেপে লিখিতে না পারিতেন, তাহাও আমাদের বোধ হয় না। অথচ তাঁহারা যে করেন নাই, তৎপক্ষে আমাদের সন্দেহ এই যে, পাণিনির প্রতি গাঢ় ভক্তি বশতই তাঁহারা সাহস করেন নাই; পাছে সমাজে হতাদর হইতে হয়, এই জন্য তাঁহাদিগকে পাণিনির অনেক সূত্রই অবিকল রক্ষা করিতে হই-

য়াছে। বোপদেব এই কুসংস্কার সর্ব্ব প্রথমে দমন করিয়াছিলেন, তিনি সমুদায় সূত্রই স্বয়ং লিখিয়াছেন এবং যথেচ্ছ লিখিয়াছেন্।

অতএব আমরা যদি বোপদেবের প্রশংসা করি, তবে পাঠক এরূপ বুঝিবেন না, যে পাণিনি প্রভৃতির অপ্রশংসা করিতেছি, অথবা তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক ইহাই বুঝিয়া লইবেন যে, ঐ প্রশংসা অন্যান্য সংস্কৃত বৈয়াকরণদিগকেও (সম্পূর্ণ না হউক ভূয়িষ্ঠরূপে) অর্শিতেছে।

বোপদেব ধাতু পরিচ্ছেদে অসাধারণ পারকতা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার "ঙিদ পিত্রঃ" ও "কিৎ ঠিটাপং" সূত্র আমাদের চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। কোন্ কোন্ প্রত্যয়ের ঙ্ ইৎ গিয়াছে, কোথায় ক্ ইৎ গিয়াছে তাহা আমাদিগকে তাঁহার ধাতু পরিচ্ছেদের সর্ব্বত্রই লক্ষ্য রাখিতে হয়, নতুবা বিষম গোলযোগ হইয়াপড়ে। বোপদেব দেখিলেন যে, কতকগুলি প্রত্যয় পরে একই রূপ কার্য্য হয়, তিনি তাহাদিগকে তিন প্রধান ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন যথা ক্ ইৎ, ঙ ইৎ ও শ্ ইৎ। কোন কোন প্রত্যয়ের সহিত ক্, ঙ বা শ যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। (যেমন ক্ত প্রত্যয়) কিৎ, ঙিৎ, শিৎ ভিন্ন অন্যান্য প্রত্যয়ও আছে, যথা বকারেৎ, ষকারেৎ ইত্যাদি। স্থল বিশেষে একবার বলা হইয়াছে যে, যে প্রত্যয়ের অমুক বর্ণ ইৎ যায়, তদ্দ্বারা অমুক কার্য্য হয়। যেমন ককারেৎ প্রত্যয় পরে ধাতুর গুণ হয় না ইত্যাদি। অনন্তর ধাতু বিশেষের প্রতি প্রত্যয় বিশেষ প্রয়োগ করা হইয়াছে। দুই এক স্থলে দেখিতে একপ্রকার আমোদ বোধ হইয়া থাকে। যথা ভূক্কিপ্ = ভূৎ। এখন দেখা যায় যে, ক্কিপ্ প্রত্যয়ের ক্, ব্, ই এবং প্ সমুদায়ই ইৎ যায়, সুতরাং কিছুই থাকে না, তবে ভূৎ হইল কিরূপে? ইহার উত্তর এই যে, স্থল বিশেষে বলা হইয়াছে যে ককারেৎ প্রত্যয় পরে অগুন ও প কারে প্রত্যয় পরে হ্রস্বান্ত ধাতুর উত্তর 'ৎ' হয়। কিন্তু এস্থলে ইম্ হইবার সম্ভাবনা ছিল; কিন্তু বকারেৎ প্রত্যয় পরে তাহা হইতে পারে না। কৃদন্ত পরিচ্ছেদের অধিকাংশ প্রত্যয়ই এইরূপ। যথা কনিপ্ প্রত্যয়ের বন্ থাকে; বিচ্ প্রত্যয়ের কিছুই থাকে না; খি প্রত্যয়ের ই; টক্, শ,ণ,ড,অন্ প্রত্যয়ের অ এবং ক্যপ্ ও ঘ্যণ,প্রত্যয়ের য থাকে।

বোপদেবের সহিত আমাদের বিশেষ কি, তাহা পাঠক একটী সামান্য উদাহরণেই বুঝিতে পারিবেন। ধাতু পরিচ্ছেদে যে দ্বিসহস্রাধিক ধাতু আছে, বোপদেব তাহাদের ভূত,ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান গণনা করিয়া কথা কহিয়াছেন, তোমার আমার মত লোকের সহসা মনে হয় যে, হয়তো এস্থলে এরূপ সূত্র না হইয়া অনরূপ হইলেও দোষ হইত না। কিন্তু সাবধান, ওরূপ কথা মুখে আনিও না, ওরূপ চিন্তা মনেও করিও না। বোপদেব যেস্থলে 'অ বলিয়াছেন' সেস্থলে 'আ' বলিও না;

পদে পদে শঙ্কা ও সম্ভ্রম করিয়া কথা কহিও। এক্ষণে যে সামান্য উদাহরণটীর কথা বলিয়াছিলাম তাহা এই ;—

মুগ্ধবোধ ধাতু পরিচ্ছেদের কোন কোন স্থলে বলিয়াছেন যে (মনে কর যেন) ঋ স্থানে অর হয়, আর কোন স্থলে হয়তো বলা হইয়াছে যে ঋর গুণ হয়। পাঠক হয়তো এই স্থলে তাড়াতাড়ি কহিবেন যে "ঋ স্থানে গুণ হয়" বলাও যা, আর "ঋ স্থানে অর হয়" চলাও তা—অতএব বোপদেব উভয়স্থলে একরূপ সূত্র করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা নহে। পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও তারা-নাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় নিজ নিজ ব্যাকরণের যঙ্‌লুক্‌ প্রত্যয় পরিচ্ছেদে যেরূপ বিপদে পড়িয়াছেন, তাহা দেখিলেই দিব্য জ্ঞান হইতে পারে। বোপদেব যঙ্‌লুক্‌ প্রকরণে এইরূপ কহিতেছেন ;—

যঙ্‌ প্রত্যয়ের নাম করিয়া দ্বিত্বাদি যে যে বিশেষ কার্য্যের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে যঙ্‌লুক্‌ পরে সে সকলই হয়।

"আমি এপর্য্যন্ত 'অগুণ' সগুণ" বা 'অবৃদ্ধি' 'সবৃদ্ধি' এইরূপ নাম করিয়া যদি কোনস্থলে গুণ বা বৃদ্ধি হউক্‌ এইরূপ কহিয়া থাকি, তবে সে সূত্র যঙ্‌লুকে খাটিবে না, তবে যদি 'গুণ' বৃদ্ধি শব্দের উল্লেখ না করিয়া গুণ বৃদ্ধি করিয়া থাকি, তবে সে সূত্র যঙ্‌লুকে খাটিবে।"

"আমি বিশেষ বিশেষ ধাতুর নাম করিয়া আমার ব্যাকরণে এপর্য্যন্ত যদি কোন কার্য্য করিয়া থাকি, তবে সেই সেই ধাতু যঙলুগন্ত হইলে তাহার উত্তর সেই সেই কার্য্য বিকল্পে হইবে।" ইত্যাদি।

যদি বোপদেব এই কয়েকটী কথা বলিতে না পারিতেন, তবে যঙ লুগন্ত প্রকরণে তাঁহাকে সমুদয় ধাতু পরিচ্ছেদের সমুদয় গুণ বৃদ্ধি সূত্র পুনরাবৃত্তি করিতে হইত। বিদ্যাসাগর ও তর্কবাচস্পতি মহাশয় দেখিলেন যে, তাঁহারা ধাতু-পরিচ্ছেদে যথেচ্ছ বাক্‌বিন্যাস করিয়া আসিয়াছেন, সুতরাং যঙ্‌লুক্‌ প্রকরণ সংক্ষেপে হইবার যো নাই। এইজন্যই বোধ হয়, বিদ্যাসাগর মহাশয় কৌমুদীতে যঙ লুগন্তের বিবরণ করেন নাই, বাচস্পতি মহাশয় তাঁহার লিখিত আশুবোধ ব্যাকরণে কহিয়াছেন যে "অপ্রসিদ্ধত্বাৎ নোদাহৃতম্‌" অর্থাৎ যঙ লুক্‌ পরিচ্ছেদ অপ্রসিদ্ধ বলিয়া উদাহরণ করা হইল না।

এ স্থলে আমাদের একটি অপ্রাসঙ্গিক কথা মনে হইতেছে, ব্যাকরণ বা শাস্ত্র মীমাংসা স্থলে আমাদের দেশীয় বড় বড় পণ্ডিতেরাও গোলমাল করিয়া থাকেন। ইংরাজেরা এ বিষয়ে আমাদের গুরুতুল্য আদরণীয়। "ইংরাজের অসরলতা রাজ-নীতিতে, কিন্তু সরলতা শাস্ত্রে" বোধ হয় এরূপ কথা অম্লান মুখে বলা যাইতে

পারে। তাঁহারা কোন শাস্ত্রের কোন স্থলেই তর্ক করিয়া ফাঁকী দিবার চেষ্টা করেন নাই, বা অস্ফুট ভাবিতা প্রকাশ করেন নাই, যে স্থলে তাঁহারা না বুঝিতে পারেন, সে স্থলে স্পষ্টস্বরে আপনার অপারকতা প্রকাশ করিয়া থাকেন এবং সরল মনে মীমাংসার চেষ্টা করিয়া থাকেন। ইহার একটী উদাহরণ দেখাইতেছি ;—

বোপদেব বলেন যে, দুর্ধী শব্দ প্রধী শব্দের ন্যায়, অন্যান্যেরা বলেন যে, সুধী শব্দের ন্যায়। এবিষয়ে আমাদের দেশীয় পণ্ডিতবর তারানাথ তর্কবাচস্পতি ও বিদ্যাসাগর মহাশয়েরও বিবাদ দেখা যায়। "শুদ্ধধী" ও "বৃশ্চিক ভী" শব্দ লইয়াও পণ্ডিতেরা বিবাদ করিয়া থাকেন, কেহ বলেন সুধী শব্দের ন্যায়, কেহ বলেন প্রধী শব্দের ন্যায়। ইহার কারণ এই যে, আদিতে অব্যয় শব্দ বা কারক থাকিলে, তাহা প্রধীর ন্যায় হয় এবং যেহেতু শুদ্ধধী ও বৃশ্চিক ভী শব্দের আদিতে কারক আছে, সেইহেতু উহারা প্রধীর ন্যায়। অথচ একজন প্রসিদ্ধ ভাষ্যকার এক স্থলে কহিয়াছেন যে "বৃশ্চিকভিয়া পলায়মানস্ত সর্পস্ত মুখে পতনমিব" এস্থলে দেখ, বৃশ্চিক ভী শব্দ সুধী শব্দের ন্যায় প্রয়োগ করা হইয়াছে। কোলব্রুক কহেন, "শুদ্ধধী" পরমধী, দুর্ধী, বৃশ্চিকভী ও তদ্রূপ অন্যান্য সর্ব্বদা প্রচলিত শব্দ সুধীর ন্যায়, অন্যান্য কারকাদি বা অব্যয়াদি শব্দ প্রধীর ন্যায়, এরূপ মীমাংসায় কি দোষ হয়।" আমার বোধ হয় বলিতে পারি যে, কিছুই দোষ হয় না। ফলতঃ শাস্ত্র মীমাংসাস্থলে সাহেবদের বিশেষ একটু মহিমা আছে।

শ্রীযশোদানন্দন সরকার।

আর্য্যজাতির ন্যায়শাস্ত্র।

ন্যায়বিজ্ঞান ন্যায়শাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র, ন্যায়দর্শন ও অক্ষপাদদর্শন বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহাতে অন্বীক্ষণ অর্থাৎ অনুমানপ্রণালী প্রদর্শিত হইয়াছে, এজন্য ইহাকে আন্বীক্ষিকী শাস্ত্রও বলে। ন্যায়শাস্ত্র গোতম মুনির প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ। বাৎস্যায়ন, কাত্যায়ন, উদয়ন, হরিদাস, রামভদ্র, গঙ্গেশ, বর্দ্ধমান, মণিমিশ্র, যজ্ঞপতি, মণি, প্রভাকর, পক্ষধর, রঘুনাথ, মথুরানাথ, ভবানন্দ, জগদীশ, গদাধর প্রভৃতি অশেষধীশক্তিসম্পন্ন মহামান্য পণ্ডিতগণ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়া এই দর্শনের অনেক উন্নতিসাধন করিয়াছেন। কিন্তু এক দিকে তাঁহারা যেমন উন্নতি করিয়াছেন, অপর দিকে তেমনই কুটিল ও

দুর্ব্বোধ করিয়া তুলিয়াছেন। মহামুনি গোতমের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা হেতুকই হউক, বা তাঁহার ভ্রম হওয়া অসম্ভব এই বুদ্ধি হেতুকই হউক, বা মুনি-মতের সহিত অনৈক্য হইলে স্বীয় মতে সাধারণের অশ্রদ্ধা জন্মে এই আশঙ্কা বশতই হউক, কেহই তাঁহার মতের বিরোধে কিছুই বলিতে চান নাই। কেহ কেহ বা যাহার ব্যাখ্যা করিতেছি, তদনুসারে চলাই কর্ত্তব্য, অথচ প্রতিভা প্রস্ফুরিত সত্যার্থ সকল অপ্রকাশিত রাখাও অকর্ত্তব্য, এই বিবেচনায় মূলমতের সহিত নিজ মতের যোগ দিয়া গিয়াছেন। কেহ কেহ বা ঠিক বিরুদ্ধ বলিতে গিয়াও, স্বীয় বাক্য যে গোতম বাক্যের অনুবাদমাত্র, ইহা প্রদর্শন করিতে বিশেষ আয়াস স্বীকার করিয়াছেন। এই সকল কারণেই ন্যায়শাস্ত্র ক্রমশঃ কুটিল ও দুর্ব্বোধ হইয়া উঠিয়াছে। ইহার উপর আবার আধুনিক নৈয়ায়িকেরা স্বীয় পাণ্ডিত্যপ্রদর্শনের নিমিত্ত অনর্থক অবচ্ছেদাবচ্ছিন্ন ও ভাবাভাব প্রভৃতি শব্দের আড়ম্বরে স্বীয় বাক্যকে দুর্ব্বোধ করিতে পারিলেই, আপনাদিগকে চরিতার্থ বোধ করিয়া থাকেন। যাহা হউক, এই সকল ব্যক্তির টীকা টিপ্পনী সম্বলিত ন্যায়শাস্ত্রের মত প্রকাশ করিতে গেলে, বিষম দুরূহ হইয়া পড়িতে পারে, একারণ এস্থলে কেবল মূলন্যায়ের সংক্ষেপমাত্র করিয়া পাঠকগণকে প্রদর্শন করিব।

সংস্কৃত অন্যান্য দর্শনের ন্যায় ন্যায়দর্শনও অবরোহ প্রণালীতে লিখিত হইয়াছে। কিন্তু আরোহ প্রণালী ব্যতীত কখনই বিজ্ঞানের উন্নতি হইতে পারে না। যাহাই হউক, তাঁহারা এইরূপেও যেপ্রকার উন্নতি সাধন করিয়াছেন, তাহা অতি আশ্চর্য্য। বিশেষতঃ আত্মজ্ঞানবিষয়ে তাঁহারা যে উন্নতিলাভ করিয়াছেন তাহা অদ্যাপি সভ্যজাতিদিগের অনুলঙ্ঘনীয় হইয়া রহিয়াছে।

হিন্দুরা সমুদায় কার্য্যই প্রধানতঃ ধর্ম্ম ও মোক্ষ উদ্দেশে করিতেন। ন্যায়শাস্ত্রও মোক্ষোদ্দেশে রচিত হইয়াছে। ন্যায়শাস্ত্র আলোচনা করিলে পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান হয় ও সেই তত্ত্বজ্ঞানহেতুক মোক্ষ হয়। এইজন্য গ্রন্থকার গ্রন্থের প্রথম সূত্রেই মোক্ষকে তাঁহার গ্রন্থচর্চ্চার পরম ফল বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। যথা—"প্রমাণ প্রমেয় সংশয় প্রয়োজন দৃষ্টান্ত সিদ্ধান্তাবয়ব তর্ক নির্ণয় বাদ জল্প বিতণ্ডা হেত্বাভাসচ্ছল জাতিনিগ্রহ স্থানানাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ।" অর্থাৎ প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থান এই ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান হেতুক মুক্তিলাভ হয়।

ন্যায়দর্শন পাঁচ অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রতি অধ্যায়ে দুই দুইটি করিয়া অংশ

আছে। সেই অংশগুলির নাম আহ্নিক। প্রথমাধ্যায়ের প্রথমাহ্নিকে প্রমাণাদি নয়টী পদার্থের লক্ষণ, ও দ্বিতীয় আহ্নিকে বাদ প্রভৃতি অপর সাতটী পদার্থের লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে সংশয়-পরীক্ষা* ও প্রমাণচতুষ্টয়ের অপ্রামাণ্য শঙ্কা নিরাকরণ এবং দ্বিতীয় আহ্নিকে অর্থাপত্তি প্রভৃতির অনুমানে অন্তর্ভাব প্রদর্শিত হইয়াছে। তৃতীয়াধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয় ও অর্থ এই চারিটী প্রমেয় পদার্থের পরীক্ষা হইয়াছে। ইহার দ্বিতীয় আহ্নিকে বুদ্ধি ও মনের বিষয় লিখিত হইয়াছে। চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথমাংশে প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব, ফল, দুঃখ ও অপবর্গ এই কয়টী বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে এবং দ্বিতীয় অংশে দোষ-নিমিত্তকত্ব ও অবয়বাদি নিরূপণ অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান পরীক্ষা করা হইয়াছে। ন্যায়ের পঞ্চমাধ্যায়ে যে দুই আহ্নিক আছে, তাহার প্রথমটীতে জাতি পদার্থের বিভাগ ও দ্বিতীয়টীতে নিগ্রহস্থানের প্রভেদ নির্ণীত হইয়াছে।

যদ্দ্বারা যথার্থরূপে বস্তুনির্ণয় করা যায় তাহার নাম প্রমাণ। প্রমাণ চারিপ্রকার। প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ। ঐ চারিটি প্রমাণ দ্বারা যথাক্রমে প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি ও শাব্দবোধ এই চারিপ্রকার প্রমিতি অর্থাৎ জ্ঞান জন্মে। নয়নাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও মানস দ্বারা বস্তুর যে তাত্ত্বিক জ্ঞান হয়, তাহার নাম প্রমিতি। প্রত্যক্ষ প্রমিতি ছয়প্রকার; ঘ্রাণজ, রাসন, চাক্ষুষ ত্বাচ, শ্রাবণ ও মানস। গন্ধ ও তদ্গত সুরভিত্ব অসুরভিত্বাদি জাতির যে ঘ্রাণ দ্বারা প্রত্যক্ষ তাহার নাম ঘ্রাণজ প্রত্যক্ষ, মধুরাদি রস ও তদ্গত জাতি যে মধুরত্বাদি তাহার যে রসনা দ্বারা প্রত্যক্ষ তাহার নাম রাসন। রক্ত পীতাদি রূপ, রূপ-বিশিষ্ট দ্রব্য, রক্তত্ব পীতত্বাদি জাতি, রূপবিশিষ্ট দ্রব্যের ক্রিয়া এবং যোগ্যবৃত্তি সমবায়াদির যে চক্ষুর দ্বারা প্রত্যক্ষ, তাহাকে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ বলা যায়। উদ্ভূত শীত উষ্ণ প্রভৃতি, স্পর্শ ও তাদৃশ স্পর্শবিশিষ্ট দ্রব্যের যে ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ, তাহার নাম ত্বাচ। বল্লভাচার্য্যের মতানুসারে গুরুত্বেরও ত্বাচ প্রত্যক্ষ হয়। নব্য মতানুসারে বায়ু, পরিমাণ ও একাদি সংখ্যারও স্পার্শন প্রত্যক্ষ হয়। শব্দের ও শব্দগত বর্ণত্ব ধ্বনিত্ব প্রভৃতি জাতির যে শ্রবণ দ্বারা প্রত্যক্ষ তাহার নাম শ্রাবণ প্রত্যক্ষ এবং আত্মার, আত্মাতে স্থিত সুখ দুঃখাদি গুণের ও সুখত্ব দুঃখত্বাদি জাতির যে মন দ্বারা প্রত্যক্ষ তাহার নাম মানস প্রত্যক্ষ। বাচস্পতিমিশ্রের মতে আত্মার পরিমাণ ও একত্ব সংখ্যারও মানস প্রত্যক্ষ হয়।

* কোন বিষয় স্বীকার করিতে যে যুক্তি উপন্যাস করা যায় তাহাকে তাহার পরীক্ষা কহা যায়। সংশয় এই অতিরিক্ত পদার্থ স্বীকার করিবার যুক্তিকে সংশয়-পরীক্ষা বলা যায়।

ব্যাপ্য পদার্থ দর্শনে যে ব্যাপক পদার্থের জ্ঞান তাহাকে অনুমিতি কহিয়াছেন। যে পদার্থ থাকিলে যে পদার্থের অভাব না থাকে,তাহাকে তাহার ব্যাপ্য বলা যায়, যে পদার্থ না থাকিলে যে পদার্থ না থাকে, তাহাকে তাহার ব্যাপক বলা যায়। কোন স্থানেই বহ্নি ব্যতিরেকে ধূম থাকে না এজন্য ধূম বহ্নির ব্যাপ্য, ও যে স্থানে ধূম থাকে, সে স্থানে বহ্নির অভাব থাকে না বলিয়া বহ্নি ধূমের ব্যাপক। এই জন্য লোকে পর্ব্বতাদিতে ধূম দেখিয়া বহ্নির অনুমান করিয়া থাকে। অনুমান তিনপ্রকার, পূর্ব্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট। কারণদর্শনে কার্য্যের অনুমানকে পূর্ব্ববৎ বা কারণলিঙ্গক অনুমান কহে, যেমন মেঘদর্শনে বৃষ্টির অনুমান। কার্য্য দর্শনে কারণের অনুমানকে শেষবৎ বা কার্য্যলিঙ্গক কহা যায়। যেমন নদীর বৃদ্ধি দর্শনে বৃষ্টির অনুমান। কারণ ও কার্য্য ব্যতিরিক্ত কেবল ব্যাপ্যবস্তু দর্শনে যে অনুমিতি হয়, তাহাকে সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান কহা যায়। যেমন আকাশে পূর্ণচন্দ্র দর্শন করিয়া শুক্লপক্ষের অনুমান, ক্রিয়াকে হেতু করিয়া গুণের অনুমান এবং পৃথিবীত্ব জাতিকে হেতু করিয়া দ্রব্যত্ব জাতির অনুমান।

শক্যার্থবোধনে শব্দের যে শক্তি আছে, তাহার পরিচ্ছেদকে উপমিতি কহে। যেমন গো শব্দের শক্যার্থ গোরু; এই গোরু অর্থ বুঝাইতে গো শব্দের শক্তি আছে, যে ব্যক্তি গবয় দেখে নাই তাহাকে "গবয় প্রায় গো সদৃশ, কেবল তাহার গলকম্বল নাই" ইত্যাদি প্রকারে বুঝাইলে যে গবয় শব্দের শক্তি পরিচ্ছেদ হয় তাহা উপমিতি। শব্দ দ্বারা যে বোধ হয় তাহার নাম শাব্দবোধ। শব্দ প্রমাণ দ্বিবিধ, দৃষ্টার্থক ও অদৃষ্টার্থক। শব্দের অর্থ প্রত্যক্ষ অর্থাৎ শব্দ যাহাকে বুঝাইতেছে, সেই বস্তু নয়নাদি দ্বারা প্রত্যক্ষ করিলে যে বোধ হয়, তাহাকে দৃষ্টার্থ শাব্দবোধ কহে, যেমন "দেখ রাম, হরি অতি সুন্দর" ইহা শুনিয়া হরির সৌন্দর্য্য প্রত্যক্ষ করিলে রামের যে বোধ হয় তাহা দৃষ্টার্থশাব্দবোধ কিন্তু "রাম বনে গিয়াছেন" ইহা শুনিয়া যে শাব্দবোধ হয় তাহাকে অদৃষ্টার্থ শাব্দবোধ বলা যায়।

দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় ভেদে বৈশেষিক ও অন্যান্য গ্রন্থকার মতে পদার্থ ছয়প্রকার। কোন কোন মতে অভাবও পদার্থ মধ্যে গণনীয়। টীকাকারদের মধ্যে কেহ কেহ শক্তি ও সাদৃশ্যকেও পদার্থ মধ্যে গণনা করিয়াছেন এবং কেহ কেহ অধিকরণত্ব, তত্ব ও সম্বন্ধত্বকেও অতিরিক্ত পদার্থ বলিয়া স্বীকার করেন। বৈশেষিকেরা কেবল প্রত্যক্ষ ও অনুমানকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতে উপমান ও শব্দ প্রত্যক্ষের অন্তর্গত। উহাদিগকে পৃথক প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই। (ক্রমশঃ)।

শ্রীপ্যারীমোহন সেন।

ককেশীয়।

মোগলীয়।

ইথীয়োপীয়।

আমেরিক।

মালয়।

জাতি তত্ত্ব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

১। ককেশীয়। ইহাদের বর্ণ শ্বেতরক্ত বা পিঙ্গল বা দুইয়ের অন্তর্গত কোন বর্ণ; চুল কাল অথবা উজ্জ্বল ধূষরবর্ণ এবং প্রায়ই কোমল ও তরঙ্গিত। মুখ ডিম্বাকার ও সরল, ললাট উন্নত ও সুপ্রশস্ত, করোটি প্রায়ই বৃহৎ, নাক টিকল, ওষ্ঠাধর ক্ষুদ্র ও অপ্রশস্ত। অঙ্গসৌষ্টবও সৌন্দর্য্যের পারাকাষ্ঠা এবং মনোবৃত্তি ও বুদ্ধি অতি চমৎকার। ইহাদিগের মধ্যে শিল্পকলা, শাস্ত্রচর্চ্চা, ধর্ম্মানুষ্ঠান, স্বদেশানুরাগ প্রভৃতি মনুষ্যের মহত্বসাধনকারী তাবৎ বিষয়েরই নিরতিশয় উন্নতি হইয়াছে এবং প্রতিভা-প্রভাবে অত্যাশ্চর্য্য নানাকাণ্ড ইহাঁরা সৃষ্টি করিয়াছেন। এরূপ বোধ হয় যে, ইহাঁরাই ভবিষ্যতে অখণ্ড ভূমণ্ডল করতলস্থ করিয়া ধরাধামের নিঃসপত্ন অধিবাসী হইবেন। গঙ্গা হইতে আটলাণ্টিক সাগর পর্য্যন্ত এই সুবিস্তৃত ভূভাগের মধ্যস্থ যাবতীয় জাতি, অর্থাৎ ফিন ব্যতীত যাবতীয় প্রাচীন ও অর্ব্বাচীন ইউরোপীয় জাতি; আসিয়ার উচ্চ শ্রেণীস্থ হিন্দু জাতি; পারসীয়, আসীরিয়, আরবীয়, য়িহুদী, ফিনিসীয়, আসিয়া মাইনর প্রদেশীয় ও ককেশস প্রদেশীয় জাতি এবং আফ্রিকাখণ্ডের মিশরীয়, আবিসিনীয় ও মুর জাতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

২। মোগোলীয়। বর্ণ শ্বেত পীতাভ, কোথাওবা রক্ত পীতাভ বা সুপক্ক কমলালেবুর ন্যায়, চুল ঈষৎ পীতবর্ণ দীর্ঘ, অকুঞ্চিত ও অতরঙ্গিত, কচিৎ বা তরঙ্গিতও দেখা যায়, শ্মশ্রুলোম বিরল, চক্ষুর তারা কাল, নাসিকা প্রশস্ত ও হ্রস্ব, কপোলাস্থি প্রশস্ত, প্রসারিত ও কূর্ম্ম পৃষ্ঠাকৃতি, করোটি প্রায় চতুষ্কোণের ন্যায় দেখায়, ললাটদেশ আনত। বুদ্ধিবৃত্তিতে ইহারা কোন প্রকারেই হীন নহে তবে ইহাদের করণী অপেক্ষা অনুকরনী প্রতিভা অধিক প্রসিদ্ধ। এই গুণেই ইহারা এত উন্নতিশীল হইয়া সাহিত্য ও শিল্পে বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছে। কিন্তু ইহারা সম্পূর্ণ সাধুচরিত নহে। তুরস্ক ও তাতার জাতি মোগল জাতির অন্তর্গত। ফিন ও লাপ্লাণ্ডার বাসিদিগকে কোন আদিম মোগল জাতির অবশেষ বলিয়া বোধ হয়।

৩। ইথিয়োপীয় বা আফ্রিক। কৃষ্ণবর্ণ শরীর ও উর্ণায়ুর ন্যায় কেশ দ্বারাই

ইহাদিগকে চেনা যায়। ইহাদের ললাট আনত, ললাটের উৰ্দ্ধভাগ পশ্চাৎ দিকে ও নিম্ন ভাগ সম্মুখের দিকে অগ্রসর, নাক মোটা ও চেপটা, ঠোঁট পুরু ও বাহিরের দিক কিঞ্চিৎ উল্টান। হটেন্‌টটেরা, ভারতীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসী ও ক্রীতদাসরূপে যাহারা আমেরিকায় নীত হইয়াছিল তাহাদের বংশীয়গণ; মিশরীয় প্রভৃতি কয়েক জাতি ব্যতীত সমুদায় আফ্রিকাবাসী কাফ্রিগণ এই শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট।

৪। আমেরিক। এস্কাইমো ভিন্ন আমেরিকার সমুদায় অধিবাসী এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহাদের শরীর তাম্রবর্ণ, কেশ দীর্ঘ, কৃষ্ণবর্ণ ও বিরল, শ্মশ্রু নাই বলিলেও হয়, চক্ষু বসা, তারা কৃষ্ণবর্ণ, ললাটের উৰ্দ্ধভাগ পশ্চাৎ দিকে আনত। তাহারা যত্ন করিয়াও ললাটের আকার এরূপ করে, কপোলাস্থি উচ্চ, নাসিকা টিকল ও শুক পক্ষীর ন্যায় ঈষবক্র, করোটি ক্ষুদ্র, ইহার উপবিভাগ মিছরির কুঁদোর ন্যায় ক্রমশঃ অপ্রশস্ত ও পশ্চাদ্ভাগ চেপ্টা, ওষ্ঠাধর প্রসারিত ও স্থূল, শরীর নাতিদীর্ঘ ও অবয়ব সমষ্টির পরস্পর সামঞ্জস্য থাকাতে সৌষ্ঠব সম্পন্ন।

৫। মালয়। ইহাদের শরীর ধূম্রবর্ণ, চুল খসখসে কাল, ওষ্ঠাধর প্রসারিত, নাসিকা হ্রস্ব ও প্রস্থত। উহার মূলভাগ বসা, মুখ চেপটা ও প্রশস্ত, উপরিভাগের দন্তাবলীর আধারাস্থি তির্য্যক্‌স্থত ও দন্তপঙ্‌ক্তি তির্য্যঙ্মুখ হয়। করোটি উৰ্দ্ধ প্রস্থত, চতুষ্কোণ অথবা মণ্ডলাকার, ললাট আনত ও প্রশস্ত। সাধারণতঃ বলিতে গেলে ইহাদের প্রকৃতি নিকৃষ্ট। ইহারা কার্য্য-তৎপর ও সমুদ্র যাত্রাদিতে নিতান্ত অভিলাষী, ইহারা বিলক্ষণ কার্য্যদক্ষ। বোর্ণিয়ো, জাবা, সুমাত্রা, সমস্ত ফিলিপাইন দ্বীপ, নিউজিলণ্ড, মাদাগাস্কারের কিয়দংশ ও অনেকগুলি পলিনেসীয় দ্বীপ এই জাতির নিবাস ভূমি।

ব্লুমেনবেক মানবজাতিকে এইরূপ পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। কুবির উহাদিগকে ককেশীয়, মোগলীয়, ও ইথিয়োপীয় এই তিন ভাগে বিভক্ত করেন। ডক্টর প্রিচার্ড ও লাথাম ভিন্ন মত অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মতে মানবজাতির নিম্নলিখিতরূপ ভেদ হইতে পারে। যথা;—

মোগল জাতি।

এই ভাগ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। আসিয়া, পলিনেসিয়া ও আমেরিকার অধিবাসিগণ এই জাতির অন্তর্গত। মধ্য আসিয়ার অধিবাসী মোগল শ্রেণীর সদৃশ বলিয়াই এই জাতির নাম মোগল হইয়াছে। ইহাদের সাধারণ লক্ষণ যথা;—মুখ বিস্তৃত ও সমতল, মস্তক প্রশস্ত ও চতুবস্র, কপাল নিম্ন, গাল উচ্চ, চক্ষু

প্রায়ই ঘোর ও কটাক্ষ-দৃষ্টি-সংযুক্ত; বর্ণ অসিত অগ্রম, চুল দণ্ডায়িত; বিরল ও কৃষ্ণবর্ণ। ইহাদের ভাষায় প্রায়ই বিভক্তি নাই। ইতিহাসে ইহাদের যে সকল কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে যে ইহাদের দ্বারা মানব জাতির কখন কখন শারীরিক ও বৈষয়িক ক্ষতিবৃদ্ধি ঘটিয়াছে এরূপ কথা বলিতে পারাযায়, কিন্তু তদ্দ্বারা তাহাদের মানসিক এমন কিছু ভাল মন্দ হয় নাই। মোগলজাতি নিম্নলিখিত কয়েক সম্প্রদায়ে বিভক্ত:—

ক। চীন সম্প্রদায়। চীন, তিব্বত, আনাম, শ্যাম, কাম্বোজ ও বর্ম্মাদেশের অধিবাসিগণ এই সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। ইহাদের ভাষায় সমাস বা বিভক্তি নাই। দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত। চীনবাসিদের বাঁকা চাহনি দেখিবামাত্র চিনিতে পারা যায়।

খ। টুরেণীয় সম্প্রদায়। ইহারা বহুবিস্তৃত ও চারি শাখায় বিভক্ত যথা:— মোগলীয়, তুঙ্গুসীয়, তুরস্কীয় ও উগ্রীয়। ইহাদের ভাষায়, ভিন্ন ভিন্ন শব্দের যোগে একপ্রকার বিভক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের আকার প্রকৃত মোগলের ন্যায়। তুরস্কেরা লীনানদী ও ওখটস্ক সাগরের চতুঃপার্শ্বে বাস করিয়া থাকে। তুরস্কের অধিবাসী তুর্কীদিগের মস্তক গোলাকার, মুখ ডিম্বাকার, নয়ন সুগঠিত এবং শ্মশ্রু লম্বিত। একদিকে নরওয়ে দেশ, অন্য দিকে ইনিসী নদী, উত্তর সাগরের কুলবর্ত্তী এই সুবিস্তৃত ভূখণ্ডে উগ্রীয়েরা বাস করিয়া থাকে। হঙ্গেরীয়বাসীরাও এই জাতির অন্তর্গত। ইয়ুরাল পর্ব্বত ও বল্‌গা নদীর দুই ধারে উগ্রীয়েরা বাস করিয়া থাকে। ফিনলাণ্ড, লাপলাণ্ড, সুইডেন্ ও নরওয়ের অধিবাসীরাও এই জাতির অন্তর্ভূত।

গ। দ্বৈপ-মোগল সম্প্রদায়। ভারত ও প্রশান্ত সাগরের অন্তর্গত দ্বীপ-সমূহে এই জাতি বাস করিয়া থাকে। কেবল মরিসস্ বোর্‌বোঁ, সিংহল, মালদ্বীপ, জাপান ও তন্নিকবর্ত্তী কয়েকটী দ্বীপ ইহাদের অধিকৃত নহে। মালাক্কা ভিন্ন, মহাদেশের অন্য কোন অংশে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় না। দ্বৈপ মোগলেরা দুই ভাগে বিভক্ত; মালেয় ও কাফ্রীয়। মালেয়েরা পীত, শ্যাম বা ধূসর বর্ণ; ইহাদের চুল কাল, লম্বা ও খাড়া। কাফ্রীয়েরা বিশুদ্ধ কাফ্রিদের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, চুল প্রায়ই লম্বা ও খাড়া, অথবা কুঞ্চিত পশমের ন্যায়। ইহারা মালেয়দিগের অপেক্ষা অসভ্য। ইহারা নিউগিনি, অষ্ট্রেলিয়া, টাস্‌মানিয়া, নিউআয়ারলাণ্ড এবং নিউকায়ারলাণ্ড ও নিউকালিডোনিয়ার মধ্যবর্ত্তী দ্বীপপুঞ্জে বাস করে। ধুবরেরা সুমাত্রা, বর্ণিও, জাবা, মলক্কা ও দক্ষিণ সাগরস্থ দ্বীপাদিতে বসতি করে। মালেয়েরা সাহসিক ও বাণিজ্যানিপুণ, এই নিমিত্ত

ইহাদিগকে "পূর্ব্বফিনিসীয়" কহিয়া থাকে। পলিনেসিয়ার মোগলেরা এই সম্প্রদায় ভুক্ত। ইহারা আকার ও গঠনে ইউরোপীয়দিগের অনেক সদৃশ।

ঘ। পাঠক শুনিয়া বিস্মিত হইবেন সন্দেহ নাই যে, যে ককেশীয়েরা সৌন্দর্য্যের আধার ও ইউরোপীয়েরা এতদিন যে জাতির অন্তর্গত বলিয়া পরিগণিত হইত, ভাষা সাদৃশ্যে তাহারা মোগল জাতির অন্তর্গত বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

ঙ। কোরিয়া জাপান, ও কামাস্কাট্কার অধিবাসিগণ পঞ্চম শ্রেণীর অন্তর্গত।

চ। আমেরিক মোগল। বেরিং প্রণালীর এপারে এস্কিমস্ নামক মোগল জাতি বাস করে, আমেরিকার অধিবাসীরা তাহাদেরই সজাতীয়। ইহাতে বোধ হইতেছে যে আমেরিকা আসিয়ারই উপনিবেশ। কিন্তু আমেরিকদিগের বৈসাদৃশ্য আছে। ইহারা দেখিতে ঠিক মোগল নহে। মোগলদিগের নাক প্রায়ই খাঁদা, কিন্তু ইহাদের নাসিকা দীর্ঘ ও আনত। বর্ণ তাম্রবৎ ও আকার উন্নত।

ছ। ভারতীয় মোগল। ভারতবর্ষ, কাশ্মীর, সিংহল, মালদ্বীপ, লাক্কাদ্বীপ ও বালুকাস্থানের অধিবাসিরাও মোগল জাতির অন্তর্গত। ভারতীয় মোগলেরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণীর বর্ণ ঈষৎ শ্যাম এবং মুখশ্রী প্রায় কাফ্রিদের সদৃশ। অপর শ্রেণীর বর্ণ ঘনশ্যাম, অথবা ঈষৎ গৌর এবং আকার প্রকার ও মুখের ভাব ইউরোপীয়দের সদৃশ। প্রথমেরা দাক্ষিণাত্যে ও দ্বিতীয়েরা আর্য্যাবর্ত্তে বাস করিয়া থাকে। আর্য্যাবর্ত্ত বাসীদের ভাষা সংস্কৃতমিশ্র ও সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন। ধর্ম্ম বিষয়ে ইহারা ব্রাহ্মণ সদৃশ। দাক্ষিণাত্যের তামিলেরা আর্য্যাবর্ত্তবাসী মোগলদিগকে আপনাদের আদর্শভূত জ্ঞান করে। ইহাদের ভাষায় সংস্কৃত শব্দ অল্পই আছে।

মহোপাধ্যায় লাথাম কহিয়াছেন যে আফ্রিকার অধিবাসী সমুদায় জাতিকেই কাফ্রি বলা যায়। বলিলে আশ্চর্য্য বোধ হইবে যে, সাইবিরীয়ার অধিবাসীরাও এই জাতির অন্তর্গত। ভাষার সাদৃশ্যেই এইরূপ আমাদিগকে বিচার করিতে হইতেছে। ভাষার সাদৃশ্য না থাকিলে আমরা কখনই এরূপ বিচার করিতে পারিতাম না। কাফ্রিদের গাল উচ্চ, কপাল নিম্ন, নাক খাঁদা। মস্তক ক্ষুদ্র এবং চওড়া অপেক্ষা লম্বায় অধিক। নয়নের ভাবে প্রায়ই কটাক্ষ নাই। বর্ণ ঘোর কৃষ্ণ, বিশুদ্ধ শ্বেত বর্ণ প্রায়ই লক্ষিত হয় না। চুল কুঞ্চিত, পশমের

ন্যায়; কিন্তু প্রায়ই খাড়া বা পাতলা নহে। ভাষায় প্রায়ই বিভক্তি নাই। ইহাদের ত্বক্‌চ্ছেদ অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে। ইহারা সাত ভাগে বিভক্ত।

ক। নিগ্রো বা বিশুদ্ধ কাফ্রি। ইহাদের এই সকল লক্ষণ অতিরিক্ত পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়;—গাত্র কৃষ্ণবর্ণ ও তৈলাক্তবৎ, চুল পশমের ন্যায়, গাল পুরু, নাক থাঁদা, ঠোঁট পুরু। ইহাদের সকলেরই এই এক প্রকার ভাব। সেনিগাল হইতে বেবুন পর্য্যন্ত পশ্চিম আফ্রিকার ভূখণ্ড মধ্যে সোদা দেশ এবং নীল নদীর উত্তরবর্ত্তী ভূভাগ ইহাদের অধ্যুষিত। সংক্ষেপে বলিতে হইলে সমুদায় আফ্রিকার অধিবাসী ঘোর কৃষ্ণ নহে, বরং তাহারা এ বিষয়ে আরব ও অষ্ট্রেলিয়াবাসীদের অনেকটা কাছাকাছি বলিতে পারা যায়।

খ। কাফ্রী। বিশুদ্ধ কাফ্রীদের আকারে যেরূপ অবয়বগত সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাদের গঠনে সেরূপ নাই, এইমাত্র প্রভেদ। উত্তরে বিষুব রেখা, দক্ষিণে বসন্তরেখা মধ্যে আফ্রিকার ভূখণ্ডে ইহারা বসতি করিয়া থাকে।

প্রাকৃতিক প্রভেদ।

আবরণ ত্বক্।

কৃষ্ণকায় জাতীয়েরা পৃথিবীর উষ্ণতম প্রদেশে বাস করে। তাহাদের কৃষ্ণ ত্বক্ ও শারীরিক গঠন দেশীয় প্রকৃতির উপযুক্ত। প্রচণ্ড রৌদ্রে শয়ন করিয়া থাকিলেও কৃষ্ণকায়দের পীড়া হয় না, কিন্তু শ্বেতকায় জাতীয়েরা ঐরূপ রৌদ্রে থাকিলে তাহাদের গাত্রে ফোস্কা হইয়া উঠে। প্রখর রৌদ্রে পরিশ্রম করিলেও কৃষ্ণকায়দের কিছুই হয় না, কিন্তু শ্বেতাঙ্গেরা সেরূপ করিলে মৃতকল্প হইয়া পড়ে। এই কারণেই ঐরূপ কার্য্যের নিমিত্ত নিগ্রোরা আফ্রিকাখণ্ড হইতে আমেরিকার উষ্ণতম ইউরোপীয় উপনিবেশ সমূহে নীত হইয়াছিল। লারিবার্ড হোম এবিষয়ের বিশেষ তত্ত্বানুসন্ধান করিতে গিয়া যখন দেখিলেন যে, কৃষ্ণকায় জাতীয়েরা নিশ্চয়ই শুভ্রকায়দিগের অপেক্ষা অধিক তাপ সহ্য করিতে পারে, তখন তিনি এককালে বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন। তিনি ইহার কোন কারণ অনুসন্ধান করিতে পারেন নাই, কিন্তু ডাক্তার জান্.ডবি অবশেষে এবিষয়ে কৃতকার্য্য হইলেন। তিনি কহেন যে, কৃষ্ণকায়দিগের শিরাভ্যন্তরে এত শীঘ্র শীঘ্র রক্ত প্রবাহিত হয় যে, তজ্জন্য তাহাদের শরীর হইতে শীঘ্র শীঘ্র ঘর্ম্মবারি নিঃসৃত হইতে থাকে। এই ঘর্ম্মবারিই তাহাদের শরীর শীতল করে। ইহাদ্বারা যে, কেবল শরীরের উপরিভাগমাত্র শীতল করে এমত নহে, ইহাদ্বারা শরীরের অন্তঃভাগে আগত

রক্ত শীতল হইয়া যখন পুনরায় হৃৎপিণ্ডাভিমুখে গমন করে, তখন ঐ শীতল রক্ত সংযোগে অভ্যন্তর ভাগও শীতল হয়। সুতরাং রৌদ্র তাহাদের তাদৃক্ কষ্টকর হয় না। ডাক্তার গ্রবর, ডেবি সাহেবের এই মত উদ্ধার করিয়া বলেন যে, যদি উক্ত কটিবন্ধ প্রদেশীয় লোকেরা এরূপ প্রকৃতি প্রাপ্ত না হইত, যদি রৌদ্রতেজঃ ঘর্ম্মবারি দ্বারা প্রতিহতবীর্য্য না হইয়া তাহাদের শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারিত, তাহা হইলে তাহাদের শরীর কখনই এই প্রখর আতপ সহ্য করিতে পারিত না। কৃষ্ণকায়দিগের কৃষ্ণ ত্বক্ যেমন অধিক রৌদ্রতেজ আকর্ষণ করে, সেইরূপ তাহাদিগকে শীঘ্র শীতলও করে। অতএব তাহাদের ত্বকের এই আকর্ষণ শক্তি অমঙ্গলের নিমিত্তই হইয়াছে। উষ্ণদেশের আতপ সহ্য করিতে হইবে বলিয়াই পরমেশ্বর তাহাদিগকে কৃষ্ণবর্ণ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে ইহাদের কৃষ্ণবর্ণের গুণে যেমন দিবসে অধিক পরিমাণে রৌদ্রতাপ আকৃষ্ট হয় সেইরূপ রাত্রিকালে তাপ নির্গত হইয়া তাহাদের শরীর শুক্লকায়দিগের অপেক্ষা অধিক শীতল হয়। এই জন্যই উহারা রাত্রিকালে নৃত্য-গীতাদি আমোদ ও ক্রিড়া কৌতুক করিতে ভাল বাসে।

আমাদের সর্ব্বশরীর যে আবরণ দ্বারা আবৃত তাহার নাম আবরণ ত্বক্। এই ত্বকের ঠিক নীচে স্পর্শজ্ঞানের দ্বারস্বরূপ শিরাপূর্ণ যে দ্বিতীয় আবরণ আছে তাহার নাম ইন্দ্রিয়-ত্বক্। সকল জাতিরই ইন্দ্রিয়ত্বক্ একরূপ। শরীরের স্বাভাবিক বর্ণ ও ক্রোধ লজ্জাদি হেতুক মুখাদির রক্তিমা আবরণ ত্বগাবৃত, এই ইন্দ্রিয় ত্বকের শিরা সমূহ হইতে প্রতিভাত হইয়া থাকে। আবরণ ত্বকের বিশেষ কোন বর্ণ নাই বটে তথাপি যদি উহা ঘন ও অস্বচ্ছ হয় তাহা হইলে শিরাসমূহ দৃষ্টিগোচর হয় না। সুতরাং এরূপ স্থলে শরীরের বর্ণ ফিকা দেখায়।

আবরণত্বক্ ইন্দ্রিয়ত্বকের রক্ষণার্থ কেবল আচ্ছাদন হইয়া আছে। ইহা শিরা রহিত ও অসার। আবরণত্বক্ স্পর্শজ্ঞানের কারণ নহে, ইহা বহুস্তর ও বহুছিদ্র সংবলিত। স্তরের সংখ্যা গায়ের সর্ব্বত্র সমান নয়। ছিদ্রগুলি ইন্দ্রিয়ত্বকের উপরিভাগে ব্যাপ্ত হইয়া উঠে। আবরণত্বকের মূলভাগ রসসংবলিত হইয়া অবস্থিতি করে। ঐ ছিদ্রগুলি প্রথমতঃ গোলাকার হয়, পরে নীচের আনুক্রমিক শারীরিক প্রক্রিয়া দ্বারা ক্রমশঃ যত উপরিভাগ পর্য্যন্ত বিসারিত হয় ততই ক্রমশঃ বর্দ্ধিত ও বিস্ফারিত হইয়া দৃশ্যমান ত্বক্‌রূপে পরিণত হয়। অবশেষে প্রায়ই মূলের সহিত সম্পর্ক রহিত ও উপরিভাগের মলস্বরূপ উৎক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। ত্বক্ যত উপরিভাগে উঠিতে থাকে, ততই শৃঙ্গবৎ স্বচ্ছ ও কঠিন হয়। কঠিন ত্বক্‌কে, ইহার নিম্নস্থিত অপেক্ষাকৃত কোমল ও অস্বচ্ছ যে

নূতন স্তর (যাহা এক সময়ে [illegible] বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল) তাহা হইতে পৃথক্ করা যাইতে পারে।

আবরণ ত্বকের অনেক ছিদ্রে এক প্রকার বর্ণ থাকে। ইহাই শ্বেতাঙ্গ জাতীয়দের পিঙ্গলতার ও নিগ্রোদিগের শ্যামলতার কারণ। আবরণ ত্বকের প্রায়ই নিম্নতর স্তরে থাকাতে ঐ বর্ণের জ্যোতিঃ শরীরের উপরিভাগে ক্রমশঃ ম্লান হইয়া আসিলেও এককালে নিষ্প্রভ হইয়া যায় না। কৃষ্ণত্বক্‌জাতীয়দের মধ্যে ব্যক্তিবিশেষে বর্ণের বিভিন্নতার কারণ কি তাহা নির্ণয় করা দুরূহ, তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, এই প্রকার বিভিন্নতা জাতিভেদ সূচক নহে, কেবল ব্যক্তিভেদে ঐ বর্ণের গাঢ়াগাঢ়তার অল্পাধিক্য মাত্র। ফলতঃ প্রত্যেক জাতির মধ্যেই এইরূপ একই বর্ণের নানাবিধ বৈলক্ষণ্য দেখা যায়। ডাক্তার মর্টন্ কহেন যে, যদিও তাম্রবর্ণ হওয়াতে আমেরিকদের সকলকেই প্রায় এক রঙ্গের বলিয়া বোধ হয় তথাপি উহাদের মধ্যে ব্যক্তিভেদে বর্ণগত বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি প্রকৃত কৃষ্ণবর্ণ পর্য্যন্ত দেখা গিয়া থাকে। শুভ্রাঙ্গ আমেরিকারা দক্ষিণ আমেরিকার উত্তরাংশে বাস করে।

কেশ ও তারামণি।

কেশ আবরণ ত্বকের পরিণত অংশ বিশেষ ব্যতীত আর কিছুই নহে। আবরণ ত্বকের সহিত ইহার প্রকৃতিগত কোন বিভিন্নতা নাই। আবরণ ত্বক্ যেমন শিরারহিত, কেশও তেমনি শিরারহিত, আবরণ ত্বক্‌কে যেমন ইন্দ্রিয় ত্বক্ হইতে পৃথক করা যাইতে পারে, কেশকেও তেমনি ইন্দ্রিয় ত্বক্ হইতে পৃথক করা যাইতে পারে। আবরণ ত্বক্ যেমন ইন্দ্রিয় ত্বকের ছিদ্রে মূল সন্নিবিষ্ট করিয়া তাহা হইতে পুষ্টি প্রাপ্ত হয়, কেশও সেইরূপ ইন্দ্রিয় ত্বকের অন্তর্গত কেশ-ভূমির মধ্যে মূল সন্নিবেশ করিয়া তাহা হইতে পুষ্টি প্রাপ্ত হয়। চর্ম্মগত বর্ণ বিভেদের ন্যায় ইহাদেরও বর্ণ বিভেদ ছিদ্রস্থ বর্ণদ্বারা হইয়া থাকে। তবে যে সকল কেশমূল মজ্জাতে অবস্থিত তাহাদেরই বর্ণ তত্রত্য বর্ণ অনুসারে হইয়া থাকে। শোকাদিতে হঠাৎ যে কৃষ্ণকেশের শুক্লতা হইয়া যায় তাহার কারণ অদ্যাপি সুচারুরূপে নির্ণীত হয় নাই।

আমরা যেরূপ ত্বক্ ও কেশের বর্ণ বিভেদের কারণ নির্দ্দেশ করিলাম, চক্ষুর তারামণির বর্ণ বিভেদের কারণও ঠিক তদনুরূপ। তারামণির বর্ণ স্বীয় আধারের উপরিভাগে বা তারকাবরণের নীচে সংলিপ্ত বর্ণানুসারে মরকত, পাংশুল, পিঙ্গল, ধূমল বা কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে। সামান্যতঃ কহিতে গেলে, শরীর শুভ্রবর্ণ হইলে কেশ ধূসরবর্ণ ও চক্ষু মরকত দ্যুতিবিশিষ্ট হয় এবং কৃষ্ণবর্ণ হইলে কেশ ও

চক্ষুও কৃষ্ণবর্ণ হয়। যদিও এ নিয়মের ব্যত্যয় দৃষ্টি হয় তথাপি মোগল, ইউ-রোপীয়, মালয় ও আমেরিক জাতীয় লোকদিগের মধ্যে দৃষ্টি করিলে শতকরা নিরনব্বইটীতে এই নিয়ম খাটিয়া থাকে। কিন্তু ভাষাতত্ত্ববিদেরা যাহাদিগকে ককেশীয় বলিয়া এক শ্রেণীর মধ্যে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন তাহাদের মধ্যে এ নিয়মের অনেক ব্যত্যয় দেখিতে পাওয়া যায়।

যাহারা আলবাইনো বলিয়া বিদিত তাহাদিগের চক্ষুরাদির বর্ণগত যে বৈলক্ষণ্য দেখা যায় সে কেবল তাহাদিগের শারীরিক বৈকল্য নিবন্ধন মাত্র। লোহিত চক্ষু ও শুক্লকেশই ইহাদের প্রধান লক্ষণ, তবে যে ইহাদের মধ্যে এ লক্ষণেরও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ই র বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, সে কেবল তাহা-দের ভিন্ন ভিন্ন জাতিত্ব নিবন্ধন। ফলতঃ প্রায় প্রত্যেক দেশেই এরূপ লক্ষ-ণাক্রান্ত লোক দেখিতে পাওয়া যায়। যে সকল লোকের তারকাবরণের নীচে কোন বর্ণ না থাকে তাহাদিগের চক্ষুস্থ রক্তবাহী শিরাসমূহ সহজেই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ঐ সকল রক্তবাহী শিরার রক্তিমা হেতুই তাহাদের চক্ষু রক্ত-বর্ণ দেখায়। তারকাবরণের নিম্নে যে বর্ণ থাকে যে তদ্দ্বারাই চক্ষুর আলোক সহ্য করিবার ক্ষমতা জন্মিয়া থাকে, আলবাইনোদিগের তারকায় সে বর্ণ নাই সুতরাং তাহাদিগের চক্ষু সাতিশয় দুর্ব্বল হইয়া থাকে। কৃষ্ণবর্ণ আল-বাইনোদিগের কেশ মেষলোমের ন্যায় সূক্ষ্ম ও শুভ্র এবং দেহ শ্বেতবর্ণ, এ কারণ তাহাদিগকে শ্বেতকায় নিগ্রো বলা যায়। ডেরাইম নামক ডমরু মধ্যে তাম্রবর্ণ জাতি বাস করে তন্মধ্যে অনেক আলবাইনো দেখা যায়। তাহাদের শরীর দুগ্ধের ন্যায় শুভ্র ও এক প্রকার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম লোম দ্বারা আবৃত, তাহাদের কেশ শুভ্র ও চক্ষু রক্তবর্ণ। তাহারা চন্দ্রালোক ভাল বাসে এবং রাত্রিকালে সংসারের যাবতীয় কার্য্যকলাপ সম্পাদন করিয়া থাকে। তাহারা সূর্য্যের আলোক সহ্য করিতে পারে না, ইহার প্রখরতায় তাহাদের চক্ষু জলে ভাসিয়া যায়, সুতরাং দিনের আলোকে তাহারা দেখিতে পায় না। আলবাইনো-দিগের এবংবিধ বৈশিষ্ট দ্বারাই ত্বকের, কেশের ও চক্ষুর বর্ণের পরস্পর সম্বন্ধ এবং বর্ণোৎপত্তির এক কারণতা, এই দুইটি বিষয় অত্যাশ্চর্য্যরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে।

(ক্রমশঃ)।

কি শিখিব?

কবি বলিবে কাব্য, বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞান, ঐতিহাসিক বলিবে ইতিহাস। এইরূপ সকলে আপন আপন রুচির অনুরূপ বিষয় সকল শিক্ষা করিতে আদেশ করিবেন। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই, কাহার কথা রাখিব?

কাব্য সংসারে দৃষ্টিপাত করিলে, ভবভূতি, কালিদাস, সেক্ষপীর, মিলটন প্রভৃতি অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন প্রতিভাশালী কবিগণ আমাদিগের নয়নগোচর হন ও প্রাণমন আকৃষ্ট করেন। তখন আর ইচ্ছা হয় না যে, সুগন্ধপরিপূরিত প্রাণমন সুশীতলকারী কবিত্বকানন পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাই বা অন্য ক্ষেত্র কর্ষণ করি। পৃথিবীর এমন কি সুখ আছে, যাহা আমরা সেক্ষপীরের হামলেট্ ও কালিদাসের শকুন্তলার সহিত বিনিময় করিতে পারি? কবিত্বকাননে যাঁহারা কখন প্রবেশ করেন নাই, তাঁহারা কাব্যের মোহিনীশক্তি হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়াই উহা উপেক্ষা করিতে পারেন। কিন্তু যাহাদিগের হৃদয়রাজ্যে একবার ঐ সুধারস প্রবেশ করিয়াছে, তাহারা চিরজীবনের মত মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছেন। এমন পাষাণ-হৃদয় কাহার আছে, যাহা কাব্যের করুণ রসে না গলিয়া যায়? এইত গেল কাব্যের কথা।

তারপর বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে কাহার হৃদয় না শিহরিয়া উঠে। পূর্ব্বে যে ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে আসিতে হইলে ছয় মাস লাগিত, আজি তাহা পনের দিনের পথ। ঈদৃশ দুর্গম পথ কে সুগম করিল? বিজ্ঞান। কবি কালিদাস যাহা কল্পনা চক্ষে দেখিয়াছেন, আজি তাহা কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। ইন্দ্র মদনকে স্মরণ করিলেন, অমনি বসন্ত সখা আসিয়া উপস্থিত হইল। টেলিগ্রাফ আজ, ইন্দ্র কেন, যে কোন ব্যক্তিরই মনোরথ পূর্ণ করিতে পারে। টেলিগ্রাফের সৃষ্টিকর্ত্তা কে? বিজ্ঞান।

কবি ভারতচন্দ্র যাহা হাসিতে হাসিতে লিখিয়া গিয়াছেন,

"কাঞ্চীপুর বর্দ্ধমান ছ মাসের পথ।
ছয় দিনে উত্তরিল অশ্ব মনোরথ॥"

আজি রেলওয়ে তাহা হাঁসিতে হাঁসিতে কার্য্যে পরিণত করিয়াছে। বিজ্ঞান বলেই এ সমস্ত ঘটিয়াছে। যে বিজ্ঞানের এত গুণ, সে কার অনাদরের সামগ্রী হইতে পারিবে?

পাঠক মহাশয়! আসুন, একবার ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, কে বলিয়া দিল রোম এক কালে পৃথিবীর অধীশ্বর ছিল—আবার শেষে অসভ্য গথদিগের দ্বারা পরাজিত হইয়া চূর্ণদর্প হইল? সকলেই বলিবে ইতিহাস। ইতিহাস আমাদিগকে অনেক মহামূল্য নীতি শিক্ষা দিয়া থাকে। আমরা ইতিহাসের মুখে শ্রবণ করিয়াছি, জগদ্‌বিখ্যাত নেপোলিয়ন বোনাপার্ট সামান্য অবস্থায় কর্সিকা দ্বীপে জন্ম গ্রহণ করেন, স্বীয় প্রতিভাবলে ফ্রান্সের সম্রাট পদে অধিষ্ঠিত হন, সার্দ্ধ ইউরোপ আপনার কর কবলিত করিয়া ইংলণ্ডের সিংহাসন পর্য্যন্ত কম্পান্বিত করিয়াছিলেন, শেষে ওয়াটার্লু সমরক্ষেত্রে ডিউক অফ্‌ ওয়ালিংটন কর্ত্তৃক পরাজিত হইলেন। জগতের সমস্ত প্রিয়বস্তু পরিত্যাগ করিয়া জীবনের শেষ দিন তাঁহাকে সেণ্টহেলেনা দ্বীপে অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল। অসীম অহঙ্কারের যে কি পরিণাম তাহা নেপোলিয়নের জীবন চরিত আমাদিগকে শিক্ষা দেয়। জন কয়েক মাত্র ইংরাজ বণিক ভারতে বাণিজ্য করিতে আসিয়া আজ সমগ্র ভারতের অধীশ্বর, ইহা পাঠ করিয়া ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার ফল আমরা শিক্ষা করি (১)।

(১) ইতিহাস, বলিলে সাধারণে যাহা বুঝিয়া থাকেন উপরে ইতিহাস সেই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এখনকার ঐতিহাসিকগণের ধারণা যে, যে ইতিহাস সামাজিক ইতিহাস নহে, তাহা ইতিহাস নামের অযোগ্য। তাহাদিগের মতে ইংলণ্ডের বা ভারতবর্ষের যে সকল ইতিহাস বিদ্যালয় সমূহে পঠিত হয়, সেই গুলির দ্বারা ইতিহাসের উদ্দেশ্য অতি অল্প পরিমাণেই সাধিত হইয়া থাকে। সে গুলি রাজাদিগের জীবনচরিত মাত্র, রাজা দয়ালু বা নির্দ্দয়, কাপুরুষ বা সাহসী, জ্ঞানী বা অজ্ঞ, বুদ্ধিমান বা নির্ব্বোধ এই সমস্ত অসার কথায় পরিপূর্ণ। রাজার খেয়াল হইল যুদ্ধ বাধিল, প্রজাদিগের রক্তশোষণ করিয়া যুদ্ধের ব্যয় যোগান হইল, দেশ উৎসন্ন যাইল, যুদ্ধে জয়লাভ হইল, রাজার গৌরব বাড়িল কিন্তু সমাজের—যে সমাজ রাজার হস্তে আপনার সুখ দুঃখের গুরুভার ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া রহিয়াছে, যে সমাজের অন্নে তিনি প্রতিপালিত হইতেছেন,—সেই সমাজের কি হইল? আর কি হইবে! সমাজ নিস্ব নিস্তেজ হইয়া পড়িল। যে ইতিহাস কেবল রাজাদিগের জীবন-চরিত, মন্ত্রীদিগের ষড়যন্ত্র, সৈন্যাধ্যক্ষদিগের দুর্দ্ধর্ষ সাহস বিবরণে পরিপূর্ণ, সেরূপ ইতিহাস পাঠে সমাজের অপকার ভিন্ন কোন উপকারের সম্ভাবনা নাই।

কোন্ শুভক্ষণে ইংরাজদিগের মনে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বীজ আরোপিত

এইরূপে আমরা যে দিকেই নয়ন ফিরাই, সেই বস্তুই আমাদিগের আদরের সামগ্রী বোধ হয়। এরূপ অবস্থায় কি করি? কাব্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি সকল বিষয়ে একজনের প্রতিপত্তি লাভ করা দুরূহ। কেহ কেহ রুচির বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করেন। কাব্যে যাঁহার রুচি তিনি কাব্যের আলোচনা করেন, দর্শনে যাঁহার প্রবৃত্তি তিনি দর্শন লইয়া ব্যতিব্যস্ত। বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞান ও ঐতিহাসিক ইতিহাস লইয়া শশব্যস্ত। রুচির বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতে আমরা পরামর্শ দিতে পারি না, কারণ রুচি কুপথে সুপথে উভয়েই লইয়া যাইতে পারে। আমাদিগের উচিত, উপকারিতার প্রতি দৃষ্টি রাখা। যে বিদ্যা অধিক উপকারে আইসে, সেই বিদ্যাই শিক্ষণীয়। মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে কি কি কার্য্য এবং কি কি শিক্ষা লাভ করিতে হয়, আসুন, তাহাই পর্য্যালোচনা করি।

শিক্ষা তিন প্রকার—প্রথম শিক্ষা শরীর রক্ষা ও শরীর পালন; দ্বিতীয় শিক্ষা ধনোপার্জ্জন দ্বারা আবশ্যকীয় অভাব মোচন, তৃতীয় শিক্ষা সন্তান পালন। যখন শিশু, জানি না, অগ্নির কি গুণ, দীপশিখার সুবর্ণময় জ্যোতিঃ দেখিয়া শিখায় হস্ত নিক্ষেপ করিলাম, হস্ত পুড়িয়া গেল, অনির্ব্বচনীয় যন্ত্রণা পাইলাম, কাঁদিয়া উঠিলাম, শিখিলাম অগ্নির দাহ কারিতা ক্ষমতা আছে। যখন একটু বয়প্রাপ্ত হইলাম, পুষ্করিণী জলে ঝাঁপ দিলাম, নিমগ্ন হইলাম, পার্শ্বস্থ এক ব্যক্তি আমার প্রাণ রক্ষা করিল, শিখিলাম, অধিক জলে যাইলে

হইয়াছিল, কি রূপেই বা সেই স্বাধীনতার বীজ অঙ্কুরিত হইয়া আজিকার (Commons) সাধারণ সভারূপে পরিণত হইয়াছে, কীদৃশ সাহসের সহিত সময়ে সময়ে ইংরাজ সমাজ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বিরোধী রাজার মস্তকচ্ছেদন করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই; কিরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া কতকগুলি লোকে সমবেত হইয়া স্বাধীনতা রক্ষার নিমিত্ত স্বদেশের, আত্মীয় কুটুম্বের, বন্ধু বান্ধবের মায়ায় জলাঞ্জলি দিয়া, হিংস্র জন্তুসমাকুল অরণ্যময় বিদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিতেও পরাঙমুখ না হইয়া অধ্যবসায় সহকারে সেই অরণ্যময় প্রদেশকে আজি স্বাধীনতার সর্ব্বোচ্চ মঞ্চ করিয়াছে—এই সমস্তের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ যে পুস্তকে পাওয়া যায়, সেই পুস্তকই যথার্থ ইতিহাস নামের যোগ্য। এরূপ ইতিহাস বিজ্ঞানানুমোদিত, প্রকৃত বৈজ্ঞানিক নিয়মের উপর স্থাপিত। এরূপ ইতিহাসের চর্চ্চাও যাহা, বিজ্ঞান চর্চ্চাও তাহা। সেইরূপ ইতিহাসের চর্চ্চায় নিরুৎসাহ করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে।

ডুবিয়া যাইতে হয়, ক্রমশঃ আরো শিখিলাম, অধিক জলে যাইতে হইলে সন্তরণ শিখিতে হয়, সন্তরণ কৌশল জানিলে নৌকা নিমগ্ন হইলেও প্রাণ রক্ষা পাওয়া যায়। আগ্রহ সহকারে সন্তরণ কৌশল শিক্ষা করিতে লাগিলাম। এ সকল বিষয় পুস্তক পাঠ করিয়া শিখিতে হয় না। প্রকৃতিই আপনা আপনই এই সকল শিক্ষা দিয়া থাকেন। আত্মরক্ষার কতক গুলি সামান্য সামান্য নীতি আমরা স্বভাবের নিকট শিখিতে পাই, তারপর বিজ্ঞানের সাহায্য লইতে হয়। তাই বলিয়া পাঠকবর্গ মনে করিবেন না, বিজ্ঞান অপ্রাকৃতিক। বিজ্ঞান প্রকৃত সত্যের উপরি স্থাপিত, তবে সকলেই এই সকল প্রকৃতির নিয়ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। অত্যন্ত প্রতিভাশালী ব্যক্তিই এই সকল বুঝিতে পারেন ও অন্যকে বুঝাইতে পারেন। মানবের সর্ব্ব প্রথমে আত্মরক্ষার নিয়মগুলি শিখিতে হয়, তজ্জন্য বিজ্ঞানের আশ্রয় লওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়, কিন্তু দুঃখের বিষয়, ব্যবসায়ী ডাক্তার ভিন্ন এই সকল বিষয় প্রায় কেহই পাঠ করেন না। মনে করুন্ হঠাৎ ঘটনাক্রমে আপনার পরিবারস্থ কোন ব্যক্তির বিসূচিকা রোগ হইল। পল্লিগ্রামে আপনার বসতি, ডাক্তার পাইলেন না, সেক্সপীর, মিলটন, কালিদাস আপনার কণ্ঠস্থ, কিন্তু এই কালব্যাধির কি উপশম করিবেন ভাবিয়াই অস্থির। পৃথিবীর সমগ্র কবিমণ্ডল একত্রিত হইয়া আপনার আত্মীয়কে রক্ষা করিতে পারিল না। আপনার প্রিয়ভ্রাতা বা আত্মীয় চিরজীবনের মত আপনাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল। আপনি হা হতোস্মি করিতে লাগিলেন। সেই অবস্থায় বুঝিতে পারিলেন যে, আপনি বৃথা পণ্ডশ্রমে আপনার সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। কাব্য আলোচনায় যে প্রকৃত কোন উপকারই সম্ভবে না, তাহা বুঝিতে পারিলেন। এ কথায় অনেকেই আমার উপর রাগ করিবেন, সন্দেহ নাই। চির পূজিত, আদৃত কবিগণকে সিংহাসনচ্যুত করিতে যাইতেছি ইহাপেক্ষা স্পর্দ্ধার বিষয় আর কি হইতে পারে। কিন্তু উপকারিতার প্রতি আমি দৃষ্টিপাত করিতে বলিতেছি। একবার মনোমধ্যে ভাবিয়া দেখ, কিসে অধিক উপকার হয়। কাব্য অধিক সুমিষ্টতর উচ্চ দরের হইতে পারে, অভূতপূর্ব্ব স্বর্গীয় সুখ অনুভব করাইতে পারে, মনকে উন্নত, আভ্যন্তরিক তেজে তেজীয়ান করিতে পারে, তাহা আমি অস্বীকার করি না, কিন্তু নির্ভীক চিত্তে বলিতে পারি দৈনিক কার্য্যে কাব্য বিজ্ঞানের সম উপকারী কখনই নহে। কাব্য চর্চ্চা করিবে করিও, সমস্ত জীবন মিলটন বা কালিদাসের চরণে উৎসর্গ করিবে করিও কিন্তু বলিও না যে উহা বিজ্ঞানের মত উপকারী। স্বাস্থ্যরক্ষা ও অকস্মাৎ বিপদ পাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে বিজ্ঞান ভিন্ন আর উপায় নাই। কবি হউক, দার্শনিক হউক, ঐতিহাসিক হউক আর

যেই হউক সকলকেই স্বাস্থ্যরক্ষা কেন, জীবন রক্ষা করিতে হইলে বৈজ্ঞানিক নিয়ম সকল অবশ্যই পালন করিতে হইবে। তাই বলিয়াই আমরা সকলকেই ডাক্তার হইতে উপদেশ করি না। আমাদিগের ইচ্ছা ও অনুরোধ যেন সকলেই বিশেষতঃ যাঁহারা বিদ্বান বলিয়া প্রসিদ্ধ তাঁহারা যেন মোটামুটি কতকগুলি বৈজ্ঞানিক নিয়ম জানিয়া রাখেন, হঠাৎ বাটীর কোন ব্যক্তি সাংঘাতিক রোগগ্রস্ত হইলে তাঁহাদিগকে যেন হস্ত পদ শূন্যের ন্যায়, সহসা অবসন্ন হইতে না হয়।

এক্ষণে, জীবন ধারণের কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে বিবেচনা করা যাউক। আজকালি অর্থোপার্জ্জন দ্বারা সচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিবার মত দুরূহ ব্যাপার আর দেখিতে পাওয়া যায় না। বি এ, এম এ, পাশ করিয়া ৩০ টাকার চাকুরির জন্য লালায়িত হইয়া বেড়াইতে হইবে ইহাপেক্ষা আর দুঃখের বিষয় কি হইতে পারে? যদি কোন উপায়ে আমাদের স্বচ্ছন্দে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহিত করিবার সম্ভাবনা থাকে, সে উপায় বিজ্ঞান। বি এ, এম, এ, উপাধিধারী হইয়া এক মাত্র অর্থাৎ চাকুরির পথে বিচরণ করা ভাল দেখায় না। আসুন সকলে আমরা নূতন স্বাধীন পথ অবলম্বন করি, বিজ্ঞানের সাহায্যে কাপড়ের কল স্থাপন, চিনি পরিষ্করণ, গ্যাস করণ, কাগজ, কলম, দেশালাই ও সাবান প্রস্তুত করণ কার্য্যে ব্যাপৃত হই। আসুন আমরা সকলে বিজ্ঞানের বলে স্বদেশের উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করি ও মরুভূমি সদৃশ পতিত ভূমিকে শস্য ক্ষেত্রে পরিণত করি। চাকুরিই একমাত্র লক্ষ্য থাকিলে আমাদের অনেককে অনাহারে প্রাণ হারাইতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট কত লোককে চাকুরি দিবেন? যিনিই বি এ, এম এ, পাশ করিবেন তাঁহারই একটি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটী চাই, নহিলে তাহার চলে না, তাঁহার মান সম্ভ্রম থাকে না, তাঁহার বিদ্যার ও পরিশ্রমের উপযুক্ত প্রতিদান হয় না। সবে মাত্র ২৫০টী ডেপুটী মাজিষ্টেটী ও ৩০০ আন্দাজ মুন্সফী চাকুরী। বৎসর বৎসর ২৫ বা ৩০টী চাকুরি খালি হয়। আর বৎসর বৎসর বি এ, এম এ, বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সর্ব্বশুদ্ধ অন্ততঃ ১০০ বা ১২৫ র কম কখনই হইবে না। ২৫ জন ভাল চাকুরি পাইলেন, বাদ বাকি (অধিকাংশ) যাঁহারা রহিলেন তাঁহাদিগের কি গতি? দিগাপতি প্রভৃতি (H. C. E) এন, সি, ই বিদ্যালয়ের ৫০৲ টাকা বেতনের হেড্ মাষ্টারি। (৫০ টাকায় চাকুরি আরম্ভ ৫০৲ টাকায় শেষ)। জিজ্ঞাসা করিলে গবর্ণমেণ্টের দোষ দেন, বলেন আমাদিগের সহায় নাই তাই, আমাদের ভাল হইল না। মনে করুন, আপনাদের সকল সহায় থাকিল, আপনাদের সকলকেই ডেপুটী মাজেষ্টারীর জন্য মনোনীত করা হইল, কিন্তু

চাকুরি সবে ২৫টী খালি। আপনারা ১০০ বা ১২৫ জন প্রার্থী, কাজে কাজেই ২৫ জন চাকরি পাইলেন। ১০০ বা ৭৫ জন পড়িয়া রহিলেন, আবার এক বৎসর গড়াইয়া গেল, আবার ২৫টী খালি হইল, কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে গত বৎসরের ৭৫ বা ১০০ বকেয়া ছাড়া নূতন ১০০ বা ১৫০ ইউনিভার্সিটি (University) হইতে (Graduate). গ্রাডুয়েট্ বহির্গত হইলেন। ২৫ বা ৩০ জন আবার চাকুরি পাইলেন, আবার ১৫০ বা ২২০ জন পড়িয়া রহিলেন। এরূপে ক্রমে ক্রমে প্রার্থীদল বাড়িতে লাগিল। তাঁহারা করেন কি? কাজে কাজেই ৫০্ টাকা বেতনে দিগাপতির হেড্ মাষ্টারি করিতে বাধ্য হইলেম।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও মুন্সেফি ভিন্ন আমাদিগের শিক্ষিত সম্প্রদায়েরা আরও দুই এক পথে বিচরণ করিয়া থাকেন, যথা ইঞ্জিনিয়ারি, ডাক্তারি ও ওকালতি। প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। যিনি বি এল, পাশ করেন, তিনিই আলিপুরে ওকালতি করিতে বহির্গত হন। তাহার আশা উচ্চ কিন্তু বহুদর্শিতা কিছুই নাই। পৃথিবীর তিনি কিছুই জানেন না। মনে মনে আশা করিয়া বহির্গত হইলেন তাঁহাকে সকলে আদর করিয়া ওকালতি করিতে দিবে, টাকা আপনি আপনি তাঁহার হস্তে আসিয়া পড়িবে। কিন্তু পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল, সকল আশা দূরীভূত হইল, পৃথিবী বিষময় বোধ হইতে লাগিল। তথাচ আলিপুর ত্যাগ করিয়া তিনি অন্যত্র যাইতে পারিবেন না। কলিকাতা তাঁহার জন্ম ভূমি। কেমনে জন্মভূমি—মাতৃভূমি—প্রিয়ার আবাসভূমি, বাল্যের সহচর বন্ধুদিগকে পরিত্যাগ করিয়া তিনি বাঁকুড়ায় যাইতে পারিবেন। যদিও নিশ্চয় জানেন, বাঁকুরায় যাইতে পারিলে তাঁহার পসার জন্মিতে পারে (কারণ তথায় উকীল সংখ্যা অল্প) তথাচ স্বদেশ ও মাতৃভূমি ত্যাগ করিতে পারিলেন না। মাতা, ভগিনী, প্রাণের প্রেয়সী সকলেই বলিল "এখানে ১০ টাকা ভাল তবু বিদেশে ২০০ টাকা ভাল নয়" এই কথা তাঁহার প্রাণে লাগিল, হৃদয়ের সহিত মিশাইয়া গেল। বাল্যে, যৌবনে ইংরাজি পুস্তক সমূহ পাঠ করিয়া যে অধ্যবসায়, সহিষ্ণুতা, আত্মত্যাগ, ও আত্মদমন প্রভৃতি শিক্ষা করিয়াছিলেন, সে সমস্ত ভাসিয়া গেল। তিনি বালকের মত ক্রন্দন করিয়া বলিলেন "না আমি কোথাও যাইতে পারিব না, অদৃষ্টে ধন মান থাকে এই খানে বসিয়া হইবে।" এইরূপ কেহই আপনার দেশ ত্যাগ, দেশ কেন গ্রাম ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে ইচ্ছুক নহেন। এক দিকে আলিপুর কলিকাতা ও হুগলি প্রভৃতি আদালতে উকিলদিগের দাঁড়াইবার স্থান নাই, অপর দিকে আসাম অঞ্চলে উপযুক্ত উকিল নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এক দিকে প্রাচুর্য্য, অন্যদিকে অভাব।

ওকালতি সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, ডাক্তারি সম্বন্ধেও তাই। এই দুই পথের বিদেশ গমনরূপ কষ্ট সহ্য করিতে পারিলেও তবু কতকগুলি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের গতি হয় কিন্তু আরও অনেক বাকি পড়িয়া থাকে। তাহাদিগের অদৃষ্টে কি হইবে? বাণিজ্য, কৃষি, ও কাপড় প্রভৃতির কল স্থাপন ভিন্ন আর উপায় নাই। স্বাধীন বাণিজ্য করিবার ক্ষমতা আজও আমাদিগের হয় নাই। যদি কিছু পরিমাণে হইয়া থাকে, তাহা অশিক্ষিতদিগের, সুশিক্ষিতদিগের হয় নাই। জিজ্ঞাসা করি, কয়জন সুশিক্ষিত বাঙ্গালি ব্যবসায়ী বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন? বোধ হয় একজনও নয়। বাঙ্গালি দাসত্ব ভিন্ন অন্য কোন বৃত্তি অদ্যাপিও শিক্ষা করিতে পারে নাই। ১০০ টাকার চাকুরি পাইলে আপনি অনেক সুশিক্ষিত বাঙ্গালিকে পোর্টবেয়ারে যাইতে দেখিতে পাইবেন, কিন্তু বোধ হয়, অশিক্ষিত অজ্ঞ সম্প্রদায় ভিন্ন কেহই অধিক লাভের আশয়ে কোন স্বাধীনবৃত্তি অবলম্বন করিয়া বাটীর একপদ বাহিরে অগ্রসর হইতে চাহিবে না। অশিক্ষিতাবস্থায় আমাদিগের যে ধৈর্য্য, অধ্যবসায় ও স্বাধীনবৃত্তিপ্রিয়তা ছিল, শিক্ষিত অবস্থায় সে গুলি লুপ্ত হইতেছে বলিলে নিতান্ত অত্যুক্তি দোষে দূষিত হইতে হয় না। জলপাইগুড়িতে চাকুরি পাইলে বোধ হয় অনেক এম এ, বি এল তথায় যাইতে পরাঙ্মুখ হইবেন না, কিন্তু স্বাধীন ওকালতি বৃত্তি অবলম্বন করিয়া সমধিকলাভের আশয়েও অনেকে প্রবাস গমনে কুণ্ঠিত হইবেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। ইংরাজি পুস্তকসমূহ পাঠে কি আমাদিগের কোন উপকার সাধিত হইতেছে না? কেন, বলিতে পারি না। ইংরাজেরাতো চাকরিপ্রিয় নন, স্বাধীন বৃত্তি, স্বাধীন চিন্তাস্রোত ত তাহাদিগের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইতেছে, তথাচ ইংরাজি সাহিত্য পাঠ করিয়া আমরা এত নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিয়াছি কেন? প্রকৃত স্বাধীন বৃত্তি ও স্বাধীন চিন্তা বক্তৃতা, পুস্তক রচনা ভিন্ন অন্যত্র পরিলক্ষিত হয় না কেন? বক্তৃতা ও পুস্তক রচনা অলস কল্পনার ফল এবং অলস কল্পনা আমাদিগের প্রচুর পরিমাণে আছে বলিলেও বলা যাইতে পারে। কিন্তু স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বন ও স্বাধীন পথে বিচরণ ক্রিড়াশীল কল্পনার ফল। তাহা আমাদিগের নাই ও অদ্যাপি হয় নাই বলিলে বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। স্বাধীন পথে বিচরণ করিতে কবে আমরা শিক্ষা করিব জানি না। কখন যে শিখিব এমন আশাও করি না। আমরা হিতোপদেশের একটী শ্লোকের মর্ম্ম অত্যন্ত সূক্ষ্ম রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে শিখিয়াছি।

"যো ধ্রুবাণি পরিত্যজ্য অধ্রুবাণি নিষেবতে।
ধ্রুবাণি তস্য নশ্যন্তি অধ্রুবং নষ্টমেবহি॥"

চাকুরির আয় নিশ্চিত। মাসিক ৫০।৬০ টাকা আসিবে। ইহার লোকসান নাই এবং লাভ আছে, কালে মাহিনা বৃদ্ধি হইতে পারিবে। চাকুরির আয় নিশ্চিত জানিয়া আর অনিশ্চিত লাভের আশয়ে আমাদিগের মস্তক বিঘূর্ণিত করিতে ইচ্ছা হয় না, কিন্তু ক্রমে যে দিন আসিতেছে ও আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাতে বোধ হয় উৎকৃষ্ট এম এ, বি এল ৫০।৬০ টাকার চাকুরি পাইবেন না, তখন কি করিবেন জানি না। যাঁহারা ইউক্লিডের কঠিন কঠিন সম্পাদ্য বুঝিতে ও বুঝাইতে পারেন, আশ্চর্য্যের বিষয়, তাঁহারাও চাকরি ভিন্ন জীবন ধারণের অন্য কোন পথ বাহির করিতে পারেন না। সেক্সপীর, মিলটনকে বিদায় দিয়া কেন আমাদিগের দেশে জাতীয় ধনাগম নীতির (Political Economy) চর্চ্চা হয় না। তাহা হইলে যে আমরা ব্যবসায় শিখিতে পারিব। দেশালাই, ছুঁচ, সুতা প্রভৃতি বিক্রয়ের যৎসামান্য দোকান করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারা যে ২৫।৩০ টাকা চাকরীর অপেক্ষা অধিক মান্যের ও গৌরবের বিষয় এইটা আমরা কবে শিখিব? আমাদিগের শিক্ষিত সম্প্রদায় মধ্যবিদ দোকানদারদিগকে অনেকটা প্রকাশ্য ভাবে না হউক মনে মনে ঘৃণা করিয়া থাকেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অনেকে ভৎসনাস্থলে বলিয়া থাকেন "মূর্খ দোকানদার পেয়েছ প্রায় আর কি?" যেন দোকানদারদের অপেক্ষা মূর্খ সম্প্রদায় নাই। কিন্তু এই মূর্খ সম্প্রদায় যে সম্পাদ্য ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হইয়াছে, বলিতে দুঃখ হয়—লজ্জা হয়—আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়েরা তাহা আজও বুঝিতে পারেন নাই। আমরা অনেক আর্য্যদর্শন, বঙ্গদর্শন, বান্ধব লেখক প্রভৃতিকে সবিশেষ জানি। তাঁহারা সমাজের উন্নতি সম্বন্ধীয় অনেক অত্যুৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিয়াছেন বলিয়া প্রশংসার যোগ্য, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ না করা দুরূহ, কিন্তু তাঁহাদিগের প্রকৃত জীবনের পর্য্যালোচনা করিলে মনে অত্যন্ত কষ্ট হয়। ত্রিযামা নিশীথে কপোলে কর বিন্যাস করিয়া যিনি ভারতের অধঃপতনের কারণ অনুসন্ধান করিতে তৎপর, হায়! ভাবিলে হৃদয় শিহরিয়া উঠে, তিনি আপনার অধঃপতনের কারণ ও উন্নতির উপায় বহিষ্করণে অক্ষম ও অপারক। আগে ভাবনা, পরে কার্য্য, কোন একটী ভাব মনে উদয় না হইলে কখন কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই আমাদিগের কার্য্য করিবার সময় যদি অদ্যাপি না উপস্থিত হইয়া থাকে, তবে কবে হইবে?

(ক্রমশঃ)।

শ্রীলাঃ—

ভারতের প্রাচীন ইতিহাস।

সভ্য জাতি মাত্রেই ইতিহাসের আদর করিয়া থাকেন। কিন্তু সকল জাতিরই প্রাচীন ইতিহাস গল্পমূলক। গ্রীসের হরকুলিস ও থিসিউস, রোমের রমিউলস ও রিমস, ইজিপ্টের মেনস, চীনের আয়ুব ইত্যাদি; সকলের বিবরণ কাল্পনিক গল্পে পরিপূর্ণ। কিন্তু ভারতের ইতিহাস কেবল কাল্পনিক গল্পমূলক নহে। ভূরি ভূরি প্রস্তর খণ্ড, শিলাস্তম্ভ তাম্রফলক ও মুদ্রাদিতে বিস্তর ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। কোন দেশে এত পরিমাণে খোদিত লিপি প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। ভারতের বহুল ইতিহাস বিলুপ্ত হইয়াছে। এক এক দেশের ভিন্ন ভিন্ন ইতিহাস এত ছিল যে তাহাদের অংশের সমন্বয় হইয়া উঠা এখন সুকঠিন হইয়াছে। আবুল ফাজেল বলিয়াছেন যে এই সকল ইতিহাসের ঐক্য করিতে আমি একান্ত অসমর্থ। আমরা এককালে এক দেশের ভিন্ন ভিন্ন নামাবলি বিস্তর প্রাপ্ত হইতেছি। কিন্তু গ্রন্থ হইতে ইতিহাস সঙ্কলন করিলে পাছে ভ্রম পূর্ণ হয় এজন্য আমরা পাষাণাদিতে লিখিত ভারতের প্রাচীন বিবরণ সকল বিবৃত করিব। অশোকের সময় হইতে বহুল পাষাণ লিপি প্রাপ্ত হওয়া যায়। অশোক বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। বুদ্ধের সহিত অশোকের বিষয় এত জড়ীভুত আছে যে আমরা সর্ব্বপ্রথমে বুদ্ধ ও অশোকের স্থিতিকাল স্থির করিব।

তিন উপায় দ্বারা বুদ্ধের কাল স্থির হইতে পারে। এই বুদ্ধকেই কেহ গৌতম কেহ শাক্যসিংহ, কেহ বুদ্ধ ও কেহ শেষ বুদ্ধ কহিয়া থাকে।

১ম প্রমাণ। কল্পসূত্র মতে শেষ জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামীর ইন্দ্রভূতি ও আর দশ জন শিষ্য ছিল। খোদিত লিপিতে সেই দশ জন ও ইন্দ্রভূতির স্থলে গৌতম স্বামী বলিয়া শিষ্যদের নাম লিখিত আছে। হেমচন্দ্র স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন যে ইন্দ্রভূতি গৌতম বলিয়া কথিত হইতেন। আর এক জৈন গ্রন্থকার বলেন যে ইন্দ্রভূতির গৌতম গোত্র ছিল বলিয়া তাঁহাকে গৌতম কহিত। যাহা হউক এতদ্দারা স্থির হইতেছে যে ইন্দ্রভূতি ও গৌতম এক ব্যক্তি। হামিল্টন ডিলামেন ও কোলব্রুক বলেন যে এই গৌতমই বুদ্ধ অবতার শাক্যসিংহ গৌতম। জৈনেরা বলেন মহাবীরের মুক্তির পর ইন্দ্রভূতি ও সুধর্ম্মা স্বামী জীবিত ছিলেন, সকল জৈন গ্রন্থেরই মতানুসারে ৫২৭ পূঃ খৃঃঅব্দে মহাবীরের মুক্তি হয়। অতএব গৌতম ৫২৭ পূঃ খৃঃঅব্দে জীবিত; ২৯ বৎসর বয়ক্রম কালে

গৌতম গৃহ ত্যাগ করেন। অতএব মহাবীরের মুক্তিকালে ২৯ বৎসর অপেক্ষা তাঁহার বয়স অধিক ছিল।

২য় প্রমাণ। গয়া হইতে প্রাপ্ত পাষাণ খণ্ডে লিখিত আছে যে বুদ্ধ নির্ব্বাণের ১৮১৩ ৬.ব পরে কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণা প্রতিপদ বুধবার দিবসে এই মন্দির নির্ম্মিত হয়। কাশীস্থ প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বাপুদেব গণনা করিয়াছেন যে এই ঘটনানুসারে ৪৭৮ পূঃ খ্রীঃঅব্দে বুদ্ধ নির্ব্বাণ স্থির হয়। ৮০ বর্ষ বয়সে বুদ্ধদেব মুক্তি লাভ করেন। অতএব ৫৫৮ পূঃ খ্রীঃঅব্দে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল।

৩য় প্রমাণ। বৌদ্ধ নির্ব্বাণের ১৬২ বর্ষ পরে চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করেন। বুলরের মতে ৩২১ পূঃ খৃঃ অব্দ অবধি ৩১০ পর্য্যন্ত ইহার মধ্যে কোন সময়ে চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন। ইহার পূর্ব্বে বা পরে স্থির করিলে গ্রীক ইতিহাসের সহিত অনৈক্য হয়। অতএব বুদ্ধদেব ৪৮৩ অব্দের পূর্ব্বে বা ৪৭২ অব্দের পরে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন নাই। এতদ্দ্বারা ৪৭৮ অব্দে নির্ব্বাণ প্রাপ্তির পোষকতা হইতেছে।

ইদানীং অশোকের কাল নির্ণয় করা আবশ্যক, এক গ্রন্থমতে অশোক ৪১ বর্ষ রাজ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু মহাবংশ মতে অশোক ৩৭ বর্ষ রাজ্য করেন। এই মতদ্বয় আপাততঃ ভিন্ন বোধ হইলেও ভিন্ন নহে, অশোক সিংহাসন লইয়া ৪ বৎসর ভ্রাতৃবিবাদ করেন, চারি বর্ষের পর তিনি অভিষিক্ত হইয়াছিলেন মহাবংশে এই চারি বর্ষ ত্যাগ করাতে ৩৭ বর্ষ রাজ্য কাল হইয়াছে। মাহীন্দ পুরোহিত অশোকের ষষ্ঠ বর্ষ রাজ্য কালে নিযুক্ত হন। ১২ বর্ষের পর তিনি সিংহল গমন করেন। তখন বুদ্ধ নির্ব্বাণাব্দ ২৩৬ বর্ষ। অতএব বুদ্ধ নির্ব্বাণের ২১৯ অব্দে অশোক অভিষিক্ত হন। অর্থাৎ তিনি খৃষ্ট জন্মিবার ২৬০ বর্ষ পূর্ব্বে রীতিমত সিংহাসনে আরোহণ করেন। এক্ষণে অশোকের ইতিহাস অনুসারে তাঁহার রাজ্য-কালের ও তৎপূর্ব্বের প্রধান প্রধান ঘটনা সকল ক্রমশ প্রকাশ করা যাইবে।

বায়ু।

বায়ু সর্ব্বপ্রধান জীবনোপযোগী পদার্থ। আমরা অবিশ্রান্ত নিশ্বাস দ্বারা বায়ু গ্রহণ করিয়া জীবন রক্ষা করিয়া থাকি; এবং অল্পক্ষণের নিমিত্ত বায়ুর অভাব হইলে, জীবন সংশয় হইয়া উঠে। এই নিমিত্তই বায়ুর অপর একটি নাম অনিল (অন্—বাঁচা+ইল প্রত্যয়; অর্থাৎ যাহার দ্বারা বাঁচিয়া থাকা যায়)। প্রাণ শব্দেরও একটি অর্থে বায়ু বুঝায়। জীবন রক্ষার্থ এরূপ অবশ্য প্রয়োজ-

নীয় পদার্থ বাস্তবিকই পদার্থ বিশেষ বলিয়া সহজে আমাদিগের প্রতীতি জন্মে না। তাহার কারণ এই যে, লৌহ প্রস্তরাদি কঠিন পদার্থের কিম্বা জল-তৈলাদি তরল পদার্থের ন্যায়, বায়ু দৃষ্টিগোচর নহে। কিন্তু অদৃশ্য বলিয়া বায়ু যে পদার্থ বিশেষ নহে একথা কখনই যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। আমরা দেখিতে না পাই, অন্য প্রকারে বায়ুর অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারি। যখন মৃদু মন্দ সন্ধ্যা-সমীরে শরীর স্নিগ্ধ হইতে থাকে, অথবা যখন প্রবল ঝটিকায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি প্রহৃত হয়, তখনই আমরা বায়ুর সত্তা উপলব্ধি করি। তখন আমাদিগের গাত্রে বায়ুপ্রবাহ স্পৃষ্ট হওয়ায় স্পর্শশক্তি দ্বারা আমরা বায়ু অনুভব করিয়া থাকি। কিন্তু গ্রীষ্মাতিশয্যের সময় কোন কোন দিন সন্ধ্যা-কালে এরূপ ঘটিয়া উঠে, যে বাতাসের অভাবে প্রাণ ওষ্ঠাগতপ্রায় হইতে থাকে। গায়ে আর বাতাসের লেশমাত্র লাগে না; একটি মাত্রও বৃক্ষের পত্র নড়ে না; তরুরাজি স্থিরভাবে দণ্ডায়মান; পশু পক্ষীগণ কঠোর গ্রীষ্মে নিশ্চেষ্ট ও নিশ্চল; সমস্ত প্রকৃতি যেন স্তব্ধভাবে মূকের ন্যায় অবস্থিত। এরূপ সময়ে এক মাত্র শ্বাসকার্য্য ব্যতিরেকে বায়ু বিদ্যমান আছে বলিয়া জানিবার আর উপায়ান্তর নাই। তখন বায়ু প্রবাহিত হয় না বলিয়া—বায়ু বহে না বলিয়া—আমরা ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা বায়ু অনুভব করিতে পারি না। কিন্তু তখন যদ্যপি আমরা বেগে হস্ত সঞ্চালন করি কিম্বা পাখা দ্বারা বায়ু তাড়িত করি, তাহা হইলেই আমাদিগের গাত্রে বাতাস লাগিতে থাকে ও আমরা বায়ু আছে বলিয়া জানিতে পারি। অতএব আমরা তাহার সত্তা উপলব্ধি করিতে পারি না। বায়ু গতিশীল হইলেই অর্থাৎ বায়ু বহিলেই আমরা তাহাকে বাতাস (Wind) বলিয়া থাকি, এবং ঐ বাতাস আমাদিগের শরীরে স্পৃষ্ট হইলেই আমরা বায়ুর অস্তিত্ব উপলব্ধি করি (১)।

---

(১) আমাদিগের ত্বকের অব্যবহিত নিম্নভাগে অগণ্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শ্বেতবর্ণ সূত্রাকার পদার্থ বিদ্যমান আছে; উহাদিগকে স্নায়ু (Norve) বলে। যখন কোন বস্তু আমাদিগের দেহের কোন স্থান স্পর্শ করে, তখন তত্রস্থ স্নায়ুবৃন্দ উত্তেজিত (Irritated) হয়, এবং সেই উত্তেজনা মস্তিষ্কে নীত হয়, ও তাহা হইলেই আমাদিগের স্পর্শজ্ঞান জন্মে। কিন্তু বস্তুবিশেষের স্পর্শজ্ঞান জন্মিবার নিমিত্ত, তৎবস্তু শরীরের সহিত সংলগ্ন হইলেই যথেষ্ট হইল না;—স্নায়ুর উপর কিয়ৎপরিমাণে চাপ প্রযুক্ত হওয়া আবশ্যক। স্নায়ুর উপর কিঞ্চিৎ চাপ না পড়িলে তাহা উত্তেজিত হয় না ও আমাদিগেরও স্পর্শজ্ঞান জন্মে না। এই নিমিত্ত কোন কঠিন পদার্থ স্পর্শ করিলে, তাহা আমাদিগের স্নায়ুর উপর চাপ প্রয়োগ করে বলিয়া, আমরা তৎক্ষণাৎ তাহার স্পর্শ অনুভব করিয়া থাকি; এবং এই নিমিত্তই বায়ু প্রবাহিত হইলে অল্প বা অধিক বেগের সহিত ত্বকের নিম্নস্থিত স্নায়ু

বায়ু যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ বিশেষ তাহা উপরে সবিশেষ বিবৃত হইল। পরন্তু জড়পদার্থ মাত্রেরই বিস্তৃতি (Extension) ও গুরুত্ব (Weight) এই দুইটি প্রধান লক্ষণ বা গুণ আছে। বিস্তৃতি জড়পদার্থের নিত্য গুণ (২); অর্থাৎ জড় পদার্থ যেখানে যে অবস্থাতেই থাকুক্ না কেন, তাহা কিয়ৎ পরিমাণ স্থান ব্যাপিয়া থাকিবেই থাকিবে। "কোন জড় বস্তু বিদ্যমান আছে, অথচ কিঞ্চি- মাত্রও স্থান ব্যাপিয়া নাই, ইহা মনেও কল্পনা করা যায় না।" (৩)। গুরুত্ব জড়ের নৈমিত্তিক গুণ মাত্র; অর্থাৎ ইহা জড়ের স্বতঃসিদ্ধ গুণ নহে;—জড় পদার্থ মাত্রের যে মাধ্যাকর্ষণ গুণ (Force of Gravitation) আছে ইহা তাহারই ফল মাত্র। এখন দেখা যাউক বায়ুর বিস্তৃতি ও গুরুত্ব এই দুই গুণই আছে কি না।

প্রথম, বিস্তৃতি। সচরাচর কোন একটি পাত্র খালি থাকিলে অর্থাৎ তাহাতে পদার্থ বিশেষ না থাকিলে, আমরা তাহাকে শূন্যপাত্র কহিয়া থাকি। কিন্তু বাস্তবিক সে পাত্রটি শূন্য নহে; তাহা বায়ুতে পরিপূর্ণ। ইহা প্রমান করিবার নিমিত্ত সামান্য একটি পরীক্ষা করিলেই যথেষ্ট হইবে।

১ম পরীক্ষা। একটী কাচের গেলাস কিম্বা বোতল লও, ঐ গেলাস কিম্বা বোতলটিকে অধোমুখ করিয়া ধরিয়া একটি জলপূর্ণ টব কি জালার মধ্যে ডুবাইয়া ধর। তৎপরে ঐ গেলাস বা বোতলটিকে ঐ রূপ করিয়া অধোমুখে

সমূহকে আহত করে বলিয়া আমরা বায়ুর স্পর্শ অনুভব করিয়া থাকি। বায়ু স্থির থাকিলে, যদিও তাহা আমাদিগের শরীর স্পর্শ করিয়া, অর্থাৎ শরীরের সহিত সংলগ্ন থাকে বটে, তথাচ তাহার কিছুমাত্র বেগ না থাকায় তদ্বারা আমাদিগের ত্বক্‌স্থিত স্নায়ুর উপর কিছুমাত্র চাপ পড়ে না এবং তজ্জন্য স্নায়ু উত্তেজিত হয় না ও আমরাও ঐ স্থির বায়ু স্পর্শ অনুভব করিতে পারি না। ধূলিকণা প্রভৃতি অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও লঘু পদার্থ সকল আমাদিগের শরীরে পতিত হইলে, তাহারা স্নায়ুর উপর যথেষ্ট চাপ প্রয়োগ করে না বলিয়া, আমরা তাহাদিগের স্পর্শ অনুভব করিতে পারি না। ডারুইন (Darwin) তাঁহার (Hairs Sensitive to touch) নামক পুস্তকের এক স্থানে লিখিয়াছেন যে তিনি তাঁহার জিহ্বার অগ্রভাগে (কারণ আমাদের জিহ্বার ও অঙ্গুলির অগ্রভাগেই স্পর্শজ্ঞান সমধিক প্রবল) অতি সূক্ষ্ম যন্ত্রের দ্বারা বিভক্ত এক খণ্ড একের পঞ্চাশ ইঞ্চ পরিমিত চুল স্থাপন করিয়া তাহার স্পর্শ অনুভব করিতে পারেন নাই, যদিও তদপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্র ও লঘু চুল কণা দ্বারা ড্রসেরা (Drosera) নামক এক জাতীয় কীট ভোজী উদ্ভিদের পত্রস্থিত স্পর্শোত্তেজনীয় লোমরাজী (Insectivorous Plants) উত্তেজিত হইয়াছিল। এই কথাগুলি কেবল সাধারণ স্পর্শজ্ঞান সম্বন্ধে লিখিত হইল, শৈত্যোষ্ণতার স্পর্শজ্ঞান সম্বন্ধে নহে।

(২) জড় বিজ্ঞান দেখ। (৩) শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত পদার্থবিদ্যা।

ধরিয়া অল্পে অল্পে জল হইতে উত্তোলন করিলে দেখা যাইবে যে, তাহার মধ্যে একটু মাত্রও জল প্রবেশ করিতে পারে নাই, কেননা তাহা পূর্ব্ব হইতেই বায়ুতে পরিপূর্ণ আছে। পুনরায় ঐ বোতলটিকে অধোমুখে ধরিয়া জলমধ্যে নিমগ্ন কর; এবং তাহার পর জলের মধ্যে নিমগ্ন অবস্থাতে বোতলটিকে ঘুরাইয়া ঊর্দ্ধমুখ কর। তাহা হইলেই দেখা যাইবে যে বোতলস্থিত বায়ু ভুরভুরি কাটিয়া জল হইতে উঠিতে থাকিবে, এবং এই প্রকারে সমস্ত বায়ু নির্গত হইয়া যাইলে বোতলটি জলপূর্ণ হইবে।

এই পরীক্ষা দ্বারা প্রতীতি হইল যে বায়ুর বিস্তৃতি আছে অর্থাৎ ইহা স্থান ব্যাপিয়া থাকে। কেন না উপরি লিখিত পরীক্ষায় আমরা দেখিলাম যে পাত্রটির মধ্যে বায়ু ব্যাপ্ত ছিল বলিয়াই, তাহাতে জল প্রবিষ্ট হইতে পারে নাই। বায়ুর ব্যাপকতা প্রত্যক্ষ করিবার জন্য আমরা পাঠককে নিম্নলিখিত সহজ পরীক্ষাটিও করিতে অনুরোধ করি।

২য় পরীক্ষা। একটি কাচের গেলাস ও একটি কাচের শিশি লও। কাচের গেলাসটিকে একটি জলের টবে নিমগ্ন করিয়া জলপূর্ণ কর। ঐ জলপূর্ণ গেলাসটিকে, জলমধ্যে নিমজ্জিত অবস্থাতেই, ঘুরাইয়া অধোমুখ করিয়া ধর। পরে বাম হস্তে গেলাসটির তলা ধরিয়া, গেলাসটিকে ঐ রূপ অধোমুখে রাখিয়া, সাবধানে জল হইতে তুলিতে থাক; দেখিবে যেন গেলাসটি একেবারে জল ছাড়িয়া উঠিয়া না পড়ে—তাহার মুখ যেন একটু জলমধ্যে ডুবিয়া থাকে। তাহা হইলে দেখিবে যে গেলাসের মধ্যস্থিত জল টবে পড়িয়া যাইবে না, গেলাসের মধ্যেই থাকিবে। এইরূপ অবস্থায় গেলাসটিকে বাম হস্তে ধরিয়া, দক্ষিণ হস্তে খালি কাচের শিশিটি লইয়া ঐ জলপূর্ণ গেলাসের মুখের নিচে, টবের জলের ভিতর, ঊর্দ্ধমুখ করিয়া ধর। তাহা হইলেই ঐ শিশির মধ্যস্থ বায়ু, জল অপেক্ষা লঘু বিধায়ে, বুদ্বুদ্ আকারে উত্থিত হইয়া ঐ গেলাসের উপরিভাগে (অর্থাৎ তাহার তলার দিকে, কেননা গেলাসটি অধোমুখ করিয়া ধরা রহিয়াছে) জমিতে থাকিবেক এবং গেলাস মধ্যস্থিত জল অল্পে অল্পে টবের মধ্যে নামিয়া পড়িবে। ইহার দ্বারা দেখা গেল যে, বায়ু যে কেবল স্বতঃ স্থান ব্যাপিয়া আছে তাহা নহে, প্রয়োজন হইলে অন্য বস্তুকে স্থানচ্যুত করিয়া স্বয়ং তাহার স্থানাভিষিক্ত হয়।

(ক্রমশঃ)।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ ধর।

তত্ত্ব সংগ্রহ।

১। গত ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ইংরাজি ১৭ই মে তারিখে যে সূর্য্য গ্রহণ হয়, তাহাতে ঈজিপ্ট (মিসর) দেশ হইতে সূর্য্যের সর্ব্ব গ্রাস দেখা গিয়াছিল। গ্রহণের সময় সূর্য্যের সর্ব্ব গ্রাস হইলে সূর্য্যের প্রাকৃতিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিবার বিশেষ সুবিধা, এই কারণে ইংলণ্ড, ফ্রান্স্ ও ইটালী হইতে জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতগণ আবশ্যকীয় যন্ত্রাদিতে সুসজ্জিত হইয়া ঈজিপ্ট যাত্রা করেন। তথায় উপনীত হইলে তাঁহাদিগকে রাজ নিয়োগ অনুসারে ঈজিপ্টের বড় বড় কর্ম্মচারীগণ রাজ্যের বর্ত্তমান অবস্থার ঘোরতর গোলযোগ সত্ত্বেও, যথেষ্ট অভ্যর্থনা করেন। এই সকল জ্যোতির্ব্বেত্তাগণ গণনা দ্বারা স্থির করিয়াছিলেন যে ঈজিপ্টের রাজধানী কাইরো (Cairo) নগরের প্রায় ২০ ক্রোশ দক্ষিণে নীল নদের তীরস্থিত সোহাগ্ (Sohag) নামক স্থান হইতে সর্ব্বগ্রাস সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম রূপে দেখা যাইবে। এই নিমিত্ত সোহাগ্ এবং তাহার নিকটবর্ত্তী স্থান হইতেই ইঁহারা সূর্য্য গ্রহণ পরিদর্শন করেন। সৌভাগ্য ক্রমে ইঁহাদের কোন রূপ ব্যাঘাত ঘটে নাই। ঐ ১৭ই মে তারিখে প্রাতঃকালে যখন সূর্য্য গ্রহণ হয়, তখন আকাশ মেঘশূন্য ও বেশ পরিষ্কার ছিল। গ্রহণের পূর্ব্ব হইতেই সোহাগের রাস্তা ঘাট ও নিকটস্থ পাহাড়ের উপর একেবারে লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছিল এবং নীল নদের তীর, অভ্যাগত জ্যোতির্ব্বেত্তাগণের সম্মানার্থ আগত আমীর ওম্রাহগণের গাড়ী পাল্কীতে ছাইয়া ফেলিয়াছিল। যখন সূর্য্য গ্রহণ আরম্ভ হইল এবং অল্পে অল্পে সূর্য্যদেব রাহুগ্রস্ত হইতে লাগিলেন, প্রকৃতি ও এক অভূতপূর্ব্ব বেশ ধারণ করিতে লাগিল। আকাশ ক্রমে প্রভাহীন হইয়া ম্লান হইয়া আসিল, নীল নদের তীরস্থিত পর্ব্বত শ্রেণী ধূসর বর্ণে বিবর্ণ হইয়া গেল; এতক্ষণ নিস্তব্ধতা যেন দশ দিক ঘেরিয়া ছিল; এক্ষণে ক্রমে সেই ঘোর নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া গিয়া পাহাড় পর্ব্বত, বন, উপবন হইতে ভীতিকর ও বিস্ময় সূচক এক মহা কোলাহল উত্থিত হইল; এবং যখন সূর্য্য একেবারে অদৃশ্য হইয়া গেল তখন ভয় বিস্ময় ও তাহার সহিত কোলাহলের আর সীমা রহিল না! আশ্চর্য্যের উপর আশ্চর্য্য! যেমনি সূর্য্যদেব দৃষ্টির অগোচর হইলেন অমনি সেই মুহূর্ত্তেই সূর্য্যের সন্নিকটে এক প্রশস্ত খড়্গের আকৃতি বেশ স্পষ্ট রূপে দেখা গেল; বস্তুতঃ সূর্য্যের সর্ব্বগ্রাস প্রযুক্ত একটি নিকট স্থিত ধূমকেতু প্রকাশিত হইল। যদিও সূর্য্যের পূর্ণগ্রাস অতি অল্পক্ষণ মাত্র স্থায়ী ছিল তথাপি অনেক প্রয়োজনীয় তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে। স্পেক্ট্রস্কোপ্ (Spectrescope)

যন্ত্রের দ্বারা সূর্য্যের প্রাকৃতিক অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ ও নানা গণনাদি করা হইয়াছে। গ্রহণ কালে সূর্য্যের ও কথিত ধূমকেতুটির অনেকগুলি প্রতিমূর্ত্তি (ফটোগ্রাফ) লওয়া হইয়াছে।—Nature, June, 1882.

২। পাঠকগণ বোধ সকলে অবগত নহেন যে পোষা হস্তিনী প্রায় সন্তান প্রসব করে না; কদাচ দুই একটি পোষা হাতীর বাচ্ছা হইয়া থাকে। একজন আমেরিকার সুদক্ষ হস্তী পালক লিখিয়াছেন যে এ পর্য্যন্ত আমেরিকায় কেবল দুইটি মাত্র গৃহ পালিত হস্তিনীর বৎস জন্মিয়াছে। ঐ দুইটির মধ্যে একটি সম্প্রতি মাস চারি পাঁচ হইল প্রসব করিয়াছে; প্রসবের পর যে চমৎকার ব্যাপার ঘটিয়াছিল তাহা শুনিয়া পাঠকগণ বিস্ময়াপন্ন হইবেন। হস্তিনীটী ২০।২১ মাস গর্ভবতী থাকে; পরে প্রসবের সময় কিছু অধীর হইয়া উঠে এবং সত্বরেই প্রসব করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ নবজাত হস্তী শাবকটি গর্ভস্থিত থলিয়ার সহিত (যেমন কখন কখন মানুষের ও ঘটিয়া থাকে) ভূমিষ্ঠ হয়। ঐ থলিয়াটি বিদীর্ণ না হইলে তাহার মধ্যস্থিত করী শিশুটি বাহির হইতে পারে না। ইহা দেখিয়া হস্তিনী তাহার পিছনের পা দুইটি পরস্পরে ঘর্ষণ করিয়া প্রথমে নাড়িটি ছিঁড়িয়া ফেলিল। নাড়ি কাটা হইয়া গেলে, একবার সজোরে ঐ চর্ম্মের থলিয়াটির উপর সম্মুখের পায়ের দ্বারা আঘাত করিল। ঐরূপ করিবামাত্র থলিয়াটি শব্দ করিয়া ফাটিয়া গেল, এবং হস্তী শাবক বাহির হইয়া পড়িল; কিন্তু তখন তাহার কিছু মাত্র নিশ্বাস বহিতে ছিল না এবং সেটি একেবারে অচেতন ছিল। তথাপি হস্তিনীর স্বাভাবিক চিকিৎসা জ্ঞান ইহাতে ও পেছপাও হইবার নহে। হস্তিনী তৎক্ষণাৎ নব প্রসূত সন্তানের বুকের উপর পা দিয়া চাপিতে লাগিল। মানুষ জলে ডুবিয়া গেলে, কিম্বা অন্য কোন প্রকারে শ্বাস রোধ হইলে যেরূপে ডাক্তারেরা শ্বাস কার্য্য পুনঃ সংস্থাপন করে, ঠিক্ সেই নিয়মানুসারে হস্তিনী শাবকের পাঁজরার উপর চাপিতে লাগিল আবার ছাড়িয়া দিতে লাগিল। ক্ষণ কাল এই প্রকারে বুক চাপিতে থাকিলে শাবকটি নিশ্বাস টানিতে আরম্ভ করিল এবং তাহার জীবন সঞ্চার হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইল। এইরূপে মাতৃ যত্নে জীবন প্রাপ্ত হইয়া করীকরভটী পাঁচ ঘণ্টা পরে উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং মাতার অভিমুখে যাইয়া মস্তক উন্নত করিয়া স্তন পান করিতে আরম্ভ করিল।—Journal of comparative Madicine.

৩। পাঠকগণ শুনিয়া চমৎকৃত হইবেন যে ইংলণ্ডের হানওয়েল (Hanwell) নামক এক স্থানের পাগলা গারদের (Lunatic Asylum) পাগলেরা মিলিয়া একটি সভা স্থাপন করিয়াছে। বদ্ধ পাগলেরা (Insane) তাহাদের কৃতকার্য্যের জন্য কত দূর দায়ী, তাহা লইয়া সম্প্রতি ঐ সভার

বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে; এবং পাগল মহাশয়েরা মীমাংসা করিয়াছেন যে, বদ্ধ পাগলদিগকে তাহাদের কৃত কার্য্যের জন্য দায়ী করা উচিত। ঐ সভায় এক জন পাগল সভ্য যিনি এক বার আমাদিগের মহারাণীকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করিয়াছিলেন, তিনি বলিয়াছিলেন যে, পূর্ব্বে আর এক জন ক্ষেপা ঐ রূপ অপরাধ করিয়া অব্যাহতি পাইয়া যায়, এবং তাহাতেই তিনিও ঐ রূপ কার্য্য করিতে সাহসী হয়েন।—New York Medical Record, May 27, 1882.

৪। মোরারে মহারাজ সিন্ধিয়ায় একটি কাগজের কল আছে। ঐ কলটি ১৮৭৮ সালে বসান হয়; এটি অতি উত্তম কল। প্রায় দুই বৎসর এই কলটি চলিতেছে এবং সম্প্রতি ইহাতে যেরূপ কাগজ প্রস্তত হইয়াছে তাহাতে নিশ্চয় বলা যাইতে পারে যে, ইহা স্থায়ী হইলে দেশের বিশেষ মঙ্গলসাধন করিবে। ইহাতে অনেক রকমের কাগজ প্রস্তুত হইতেছে; এক প্রকার যে মোটা কাগজ প্রস্তুত হয়, তাহা বিলাতী প্যাকিং কাগজ অপেক্ষা অনেক শক্ত ও উত্তম। আর এক প্রকার অতি উত্তম পাতলা হলদে কাগজ লিখিবার জন্য প্রস্তুত হয়। দুই প্রকারের সাদা কাগজ তৈয়ারি হয়, একটি কিছু খস্‌খসে; আর একটি বেশ শক্ত ও পরিষ্কার। মোরারের নিকটে যে এক প্রকার বন্য ঘাস জন্মে তাহা হইতেই এই সকল কাগজ প্রস্তুত হইয়া থাকে। এক্ষণে গিরিডি হইতে কয়লা লইয়া যাইতে হয় বলিয়া খরচা অত্যন্ত বেশী পড়ে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের গবর্ণমেণ্ট অনেকটা এই কাগজ ব্যবহার করিয়া থাকেন; অন্যান্য প্রদেশেও এই কাগজের আমদানী করা খুব কর্ত্তব্য।—Indian Daily News, June 16, 1882.

৫। এ বৎসরও একটি বড় ধূমকেতু দেখা গিয়াছে। এটি আমেরিকার এক জন জ্যোতির্ব্বেত্তা গত ১৮ই মার্চ তারিখে প্রথম আবিষ্কার করেন। ইহা ভারতবর্ষে প্রথম মান্দ্রাজের মান মন্দির (Observatory) হইতে ৫ই মে তারিখে দূরবীক্ষণ দ্বারা দেখা যায়; তখন ইহা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে অর্থাৎ শেষ রাত্রে দেখা যাইত। পরে কিছু দিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায় আর দেখা যায় নাই; আবার গত ২২এ জুন হইতে সন্ধ্যার পরেই দেখা যাইতেছে। এখন পশ্চিম গগনে শুক্র (Venus) গ্রহের বাম দিকে তাহার কিছু উপরে মান্দ্রাজ হইতে শুধু চক্ষে বেশ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। ইহা ক্রমশঃ পূর্ব্বাভিমুখে সরিতেছে এবং শীঘ্র অদৃশ্য হইয়া যাইবে। গত জ্যৈষ্ঠ মাসের সূর্য্যগ্রহণের সময়, ঈজিপ্ট হইতে, সূর্য্যের পূর্ণগ্রাসের পর, তৎপার্শ্বে যে এক ধূমকেতু দেখা যায়, সে বুঝি এইটিই হইবে। (আজি কালি সন্ধ্যার পরেই পশ্চিম আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিলে যে খুব বড় ও উজ্জ্বল তারাটি দেখিতে পাওয়া যায়, উহারই নাম শুক্র গ্রহ; ইহা আকাশস্থ গ্রহ ও তারার মধ্যে সকলের অপেক্ষা উজ্জ্বল ও দেখিতে বড়।—Madras Mail, June 27, 1882.

আর্য্যজাতির ন্যায় শাস্ত্র।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

প্রমেয় পদার্থ দ্বাদশপ্রকার, যথা আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্থ, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব. ফল, দুঃখ ও অপবর্গ। যাহার চৈতন্য আছে তাহাকে আত্মা কহে, আত্মা সকল ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা, আত্মার কর্তৃত্ব না থাকিলে কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা কোন জ্ঞান বা কার্য্য হইত না। শরীরাদির চৈতন্য নাই, তাহা হইলে মৃত শরীরে চৈতন্যের উপলব্ধি হইত। যখন আমার শরীর ক্ষীণ হইতেছে আমার চক্ষু বিকৃত হইয়াছে এইরূপ সকল লোকেরই প্রতীতি হয় তখন আত্মা যে শরীর ও ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক তাহা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে। জীবাত্মা ও পরমাত্মা ভেদে আত্মা দুই প্রকার বলা যায়। মনুষ্য, গো, মহিষাদি জীবাত্মপদবাচ্য, এক মাত্র পরমেশ্বর পরমাত্মা। আত্মার পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু ও পরমাণ্বাদি দ্বারা নির্ম্মিত যে আশ্রিত বিশেষ তাহার নাম শরীর। মনুষ্যাদির শরীর পার্থিব। বরুণ লোকে জলীয় শরীর, সূর্য্যলোকে তৈজস শরীর ও পিশাচাদির বায়ব শরীর।

পৃথিবী হইতে আকাশ পর্য্যন্ত এই পাঁচ দ্রব্য ঘটিত যে এক একটি ইন্দ্রিয় তাহার নাম বহিরিন্দ্রিয়। ঐ ঐ ইন্দ্রিয় দ্বারা এক একটি অসাধারণ গুণাদির উপলব্ধি হইয়া থাকে। নাসিকা পার্থিবেন্দ্রিয়, ইহা দ্বারা গন্ধাদির, রসনা জলীয়, ইহার দ্বারা মধুর রসাদির, নয়ন তৈজস, ইহা দ্বারা রূপাদির, ত্বক বায়বীয়, ইহাদ্বারা উষ্ণ শীতস্পর্শাদির এবং শ্রোত্র আকাশেন্দ্রিয়ও ইহাদ্বারা শব্দাদির উপলব্ধি হয়। মনঃ কেবল একমাত্র অন্তরিন্দ্রিয়।

অর্থ পাঁচটী। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ। বুদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞান দ্বিবিধ ; প্রমা বা যথার্থ জ্ঞান ও অপ্রমা বা ভ্রম। যাহার যে গুণাদি আছে তাহাকে তত্তদ্গুণাদিযুক্ত বলিয়া জানাকে প্রমা কহে, যেমন স্বর্ণকে স্বর্ণ বা পিত্তলকে পিত্তল বলিয়া জানা। যাহার যে গুণাদি নাই তাহাকে সেই গুণাদিবিশিষ্ট বলিয়া জানাকে অপ্রমা ও ভ্রম কহে ; যেমন পিত্তলকে স্বর্ণ বলিয়া জানা। ভ্রমের একটি অনুগত কারণ নাই। এক এক ভ্রম এক এক দোষ জন্য ঘটিয়া থাকে। যেমন পিত্তাধিক্য দোষে শুভ্র-বর্ণকেও পীতবর্ণ দেখায়, দূরত্ব হেতু অতি বৃহৎ চন্দ্রমণ্ডলকেও ক্ষুদ্র বোধ হয়, চক্ষুতে মণ্ডূকবসাক্তত অঞ্জন লেপন করিলে বংশযষ্টিকেও সর্প বলিয়া বোধ হয়। ঐরূপ দোষ হেতুক ভ্রম ঘটিলে উহাদের নিবৃত্তি ব্যতীত সহসা যথার্থ জ্ঞান হয় না। অনুভব ও স্মরণ ভেদেও বুদ্ধি দুই প্রকার। শরীরান্তর্গত যে সূক্ষ্ম পদার্থ দ্বারা সুখ দুঃখাদির অনুভব হয় তাহার নাম মনঃ। ইহাই এক মাত্র অন্তরিন্দ্রিয়।

সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন এইগুলিকে প্রবৃত্তি কহে। দোষ তিন প্রকার। রাগ, দ্বেষ ও মোহ। তন্মধ্যে কাম, মাৎসর্য্য, স্পৃহা, তৃষ্ণা, মোহ, মায়া, দম্ভ প্রভৃতি রাগের অন্তর্গত। ক্রোধ, ঈর্ষা, অসূয়া, দ্রোহ, অমর্ষ, নির্ব্বেদ বা অভিমানাদি দ্বেষের অন্তর্গত, এবং বিপর্য্যয় সংশয় তর্ক মান প্রমাদ ভয় শোকাদি মোহের অন্তর্গত।

মরণানন্তর পুনরায় জন্মগ্রহণের আবৃত্তিকে প্রেত্যভাব কহে। মুক্তি হইলে আর প্রেত্যভাব হয় না।

যাহা, যাহা দ্বারা নিষ্পন্ন হয় তাহাকে তাহার ফল বলা যায়। যেমন শাস্ত্রচিন্তার ফল জ্ঞানলাভ। ফল মুখ্য ও গৌণ ভেদে দ্বিবিধ। চরমফল অর্থাৎ সুখ বা দুঃখ ভোগের নাম মুখ্য ফল। এতদতিরিক্ত সকল ফল গৌণ ফল। ধর্ম্ম দ্বারা সুখ ও অধর্ম্ম দ্বারা দুঃখের উৎপত্তি হয়, সুখ যাবতীয় প্রাণীর অভীষ্ট, দুঃখ সকলের অনভিলষিত। আনন্দ ও চমৎকারাদি ভেদে সুখ এবং ক্লেশাদি ভেদে দুঃখ নানাপ্রকার হইয়া থাকে। সুখ ও দুঃখের জ্ঞান হইলে সুখে ও দুঃখাভাবে ইচ্ছা হয়। সুখসাধনতা জ্ঞান হইলে সুখের উপায়ে ও দুঃখনিবর্ত্তকতা জ্ঞান হইলে দুঃখনিবৃত্তির উপায়ে ইচ্ছা জন্মে। অতএব এই ইষ্টসাধনতা যেমন চিকীর্ষার কারণ, তেমনই কৃতিসাধ্যত্বজ্ঞান ও বলবদনিষ্ট সাধনতা জ্ঞানও ইহার কারণ। আমি এই করিতে পারি এইরূপ জ্ঞানকে কৃতিসাধ্যত্ব জ্ঞান কহে। এটীতে আমার বড় অনিষ্ট হইবে এরূপ জ্ঞানের অভাবকে বলবদনিষ্টসাধনতা জ্ঞান কহে। যত্ন তিন প্রকার; প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি ও জীবনযোনি। যাহার যে বিষয়ে চিকীর্ষা হয় তাহার সে বিষয়ে প্রবৃত্তি জন্মে। যাহার যে বিষয়ে দ্বেষ হয় তাহার সে বিষয়ে নিবৃত্তি হয়, অতএব প্রবৃত্তির কারণ চিকীর্ষা ও নিবৃত্তির কারণ দ্বেষ। কিন্তু জীবনযোনি যত্ন স্বতন্ত্র প্রকার, এই যত্ন দ্বারা প্রাণীরা শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকে।

অত্যন্তদুঃখনিবৃত্তিরূপ মুক্তিকে অপবর্গ বলা যায়। এই গৃহে মনুষ্য আছে কি না এরূপ জ্ঞানকে সংশয় কহা যায়। সংশয় নানা কারণে ঘটিতে পারে। কখন কখন পরস্পর বিরুদ্ধ বাক্য শ্রবণে, কখন কখন সাধারণ ও অসাধারণ ধর্ম্ম দর্শনে হইয়া থাকে। বিশেষ দর্শনে সংশয়ের নিবৃত্তি হয়। যে বস্তুর সংশয় হয় তাহার ব্যাপ্যকে বিশেষ বলা যায়।

যে বিষয়ের উদ্দেশে যে ব্যক্তি যে বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় সেই বিষয়কে সেই ব্যক্তির সে বিষয়ে প্রবৃত্তির প্রয়োজন কহে। যেমন রন্ধন এই বিষয়ে বুভুক্ষুর প্রয়োজন ভোজন ও সূপকারের বেতন প্রাপ্তি, এস্থলে এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে ভোজন

ও বেতন গ্রহণ উহাদের যেমন রন্ধনের প্রয়োজন হইয়াছে, তেমনি রন্ধনের ফলও হইতেছে। তবে প্রয়োজন ও ফল এই দুইটি পদার্থের পৃথক নির্দ্দেশ করিবার আবশ্যকতা নাই। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে সে আশঙ্কা শীঘ্রই তিরোহিত হয়। কারণ এস্থলে এই দুই পদার্থের ঐক্য হইলেও কুপিত-ফণি-ফণাস্থিত মণির আশায় ফণায় হস্তক্ষেপাদির স্থলে এই দুয়ের বিভিন্নতা আছে। ঐ স্থলে হস্ত ক্ষেপ করিবার প্রয়োজন মণি লাভ কিন্তু ফল প্রাণ বিয়োগ। কারণ যে যে উদ্দেশ্যে প্রবৃত্তি, তাহা সিদ্ধ হউক বা না হউক, তাহাকে প্রয়োজন বলা যায়, আর অভিলষিত হউক বা না হউক যাহা যে বিষয় দ্বারা নিষ্পন্ন হয়, তাহাকে তাহার ফল কহা যায়, ইহা পূর্ব্বেই ব্যক্ত হইয়াছে।

প্রয়োজন মুখ্য ও গৌণ ভেদে দ্বিবিধ। অভিলষণীয় বিষয়ান্তরের সম্পাদক বলিয়া যে বিষয় অভিলষণীয় হয়, তাহাকে গৌণ আর তদতিরিক্ত কেবল অভিলষণীয় বিষয়কে মুখ্য প্রয়োজন কহে। সুখ ও দুঃখনিবৃত্তিই মুখ্য প্রয়োজন।

প্রকৃত বিষয়কে দৃঢ় করিবার নিমিত্ত যে প্রসিদ্ধ বিষয়ের উপন্যাস তাহার নাম দৃষ্টান্ত। এই পর্ব্বতে বহ্নি আছে, যেহেতু ইহাতে ধূম দেখিতেছি। যে যে স্থলে ধূম থাকে সেই সেই স্থলই বহ্নিমান্। যেমন রন্ধনশালা এস্থলে "যেমন রন্ধনশালা" এই অংশটী দৃষ্টান্ত।

অনিশ্চিত বিষয়ের শাস্ত্রানুসারে নির্ণয় করাকে সিদ্ধান্ত কহে। সিদ্ধান্ত চারি প্রকার। সর্ব্বতন্ত্র, প্রতিতন্ত্র, অধিকরণ ও অভ্যুপগম। যাহা সকল শাস্ত্রেই স্বীকৃত হইয়াছে তাহা স্বীকার করাকে সর্ব্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত কহে, যে বিষয় অন্য শাস্ত্রে স্বীকৃত হয় নাই, স্বীয় শাস্ত্রে তাহার স্বীকার করাকে প্রতিতন্ত্র কহে, যেমন বৈশেষিক সূত্রকারের বিশেষ পদার্থ স্বীকার। এক বিষয়ের স্বীকারে যে বিষয়ান্তরেরও স্বীকার করা হয়, তাহাকে অধিকরণ সিদ্ধান্ত ও কোন বিষয় স্পষ্ট স্বীকার না করিয়া প্রকারান্তরে তাহার স্বীকারকে অভ্যুপগম সিদ্ধান্ত কহা যায়।

বিচারের অঙ্গভূত যে বাক্য বিশেষ তাহার নাম অবয়ব। অবয়ব পাঁচপ্রকার। প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয়ন ও নিগমন।

যে বিষয়ের ব্যবস্থাপন করিতে হইবে তাহার উপন্যাসকে প্রতিজ্ঞা কহে, যেমন "এই পর্ব্বতে বহ্নি আছে" এই বাক্য। অনুমাপক হেতুর উপন্যাসকে হেতু কহে যেমন "ধূম হেতু" এই বাক্যাংশ।

উদাহরণ দ্বিবিধ, অন্বয়ী ও ব্যতিরেকী। ধূম আছে বলিয়া বহ্নি আছে বলিলে তাহার অন্বয়ী উদাহরণ এই যে "যে যে স্থানে ধূম থাকে ; সেই সেই স্থানেই বহ্নি থাকে, যেমন "রন্ধশালা" এই বাক্যটী। "যেখানে বহ্নি না থাকে সেখানে ধূমও

থাকে না, যেমন পুষ্করিণী” এইরূপ বাক্য প্রয়োগকে ব্যতিরেকী উদাহরণ কহা যায়। সর্ব্বত্রই দুইটি উদাহরণ উপন্যাসের আবশ্যকতা হয় না, একের উপন্যাসই পর্য্যাপ্ত হয়।

উপরি উক্ত উদাহরণ বাক্য দ্বারা বহ্নিতে ধূমের নিয়ত-সহচারিতা-রূপ-ব্যাপকতা পক্ষ ব্যবস্থান করিয়া প্রকৃত স্থলে প্রকৃত সাধ্য সাধক হেতুর ব্যবস্থাপনকে উপনয়ন কহে। যেমন “বহ্নির ব্যাপ্য ধূম এই পর্ব্বতে আছে” এই রূপ বাক্য।

প্রকৃত পক্ষ প্রকৃত সাধ্যের উপসংহার বাক্যকে নিগমন বলা যায়, যথা “সেই হেতু এই পর্ব্বতে বহ্নি আছে” এই বাক্য।

উপরি উক্ত প্রতিজ্ঞাদি পাঁচটি বাক্য ন্যায়ের অবয়ব বলিয়া উহাদের প্রত্যেককে ন্যায়াবয়ব ও তাহার সমষ্টিকে ন্যায়বাক্য কহে। সকল বিচারস্থলেই ন্যায় প্রয়োগ করিতে হয়। তদ্ভিন্ন কোন পদার্থ সিদ্ধ হয় না।

আপত্তিবিশেষকে তর্ক কহে। যেমন “যদি এ মানুষ হইত তবে এর হস্ত পদাদি থাকিত” ইত্যাদি বাক্য।

তর্ক পাঁচপ্রকার। আত্মাশ্রয়, অন্যোন্যাশ্রয়, চক্রক, অনবস্থা ও প্রমাণবাধিতার্থ-প্রসঙ্গ।

পরস্পর জিগীষু না হইয়া কেবল প্রকৃত বিষয়ের তত্ত্ব নির্ণয়ার্থ বাদী ও প্রতিবাদীর বিচারকে বাদ কহে। ঐ বাদবিচারে সকলে অধিকারী নহে। যাহারা প্রকৃত বিষয়ের তত্ত্বনির্ণয়ে অভিলাষী, যথার্থবাদী, প্রতারকতাদি দোষশূন্য, যথাকালে প্রকৃতোপযোগি কথনে সমর্থ, সিদ্ধান্ত বিষয়ের অপলাপ করে না এবং যুক্তি সিদ্ধ বিষয় স্বীকার করিয়া থাকে তাহারাই বাদ বিচারে অধিকারী। প্রকৃত বিষয়ের তত্ত্বনির্ণয়াংশে দৃষ্টিপাত না করিয়া কেবল জিগীষাবশত পর-মত খণ্ডন ও স্বমত ব্যবস্থাপনার্থ, যে বাদী প্রতিবাদীর বাগাড়ম্বর তাহাকে জল্প কহে। স্বমত স্থাপন হউক বা না হউক কেবল পরমত খণ্ডনার্থ, যে বাগ্‌জালারম্ভ তাহাকে বিতণ্ডা কহে। এই বিচারের অধিকারী সকলেই হইতে পারেন। বিচারের রীতি এই রূপ, প্রথমতঃ বাদীকে স্বমত সংস্থাপন করিয়া স্বমতে যে যে দোষ সম্ভবে তাহা নিরাকরণ করিতে হয়, পরে প্রতিবাদীকে বাদীকর্ত্তৃক সংস্থাপিত বিষয়ে নিজ অবোধ নিরাসার্থ ঐ বিষয়ের অনুবাদ করিয়া তাহাতে দোষারোপণ পূর্ব্বক স্বমত ব্যবস্থাপন করিতে হয়। পুনর্ব্বার বাদীকে প্রতিবাদী-কথিত বিষয়ে নিজ অবোধ নিরাসার্থ ঐ বিষয়ের অনুবাদ করিয়া স্বমতে, প্রতিবাদী দত্ত দোষের উদ্ধার পূর্ব্বক প্রতিবাদী মতে দোষের উদ্ভাবন করিতে হয় এবং পুনর্ব্বার প্রতিবাদীকেও এইরূপ করিতে হয়। এই রীতি ক্রমে বিচার করিতে করিতে যিনি স্বমতে দোষোদ্ধারে বা পরমতে দোষ প্রদর্শনে

অসমর্থ হন তিনিই পরাজিত হন। এই রীতি উল্লঙ্ঘন করিয়া যিনি বিচারে প্রবৃত্ত হন বা অযথাকালে অর্থাৎ দোষোদ্ভাবনাদির অসময়ে দোষ প্রদর্শনাদি করিতে প্রবৃত্ত হন তাঁহার ও পরাজয় হয়।

প্রকৃত বিষয়ের বাস্তবিক সাধক না হইলেও যাহাকে আপাততঃ প্রকৃত বিষয়ের সাধক বলিয়া বোধ হয় তাহার নাম হেত্বাভাস। পর্ব্বতে ধূম আছে, যেহেতু বহ্নি আছে ইত্যাদি স্থলে বহ্নিকে হেতু বলিয়া বোধ হয়। অতএব এস্থলে বহ্নির হেতুত্ব হেত্বাভাস।

বক্তা যে অর্থে যে শব্দ প্রয়োগ করেন সে শব্দের সে অর্থ গ্রহণ না করিয়া তদ্বিপ-রীত অর্থ কল্পনা দ্বারা যে মিথ্যা দোষারোপ করা তাহার নাম ছল।

অপ্রকৃত বা স্বাভিপ্রায়বাধক উত্তরকে জাতি বলা যায়। প্রতিবাদী বাদীর প্রতি-জ্ঞাত বিষয়ে দোষ দর্শাইলে যদি তিনি ঐ বিষয়কে দোষ হইতে উদ্ধার করিতে না পারিয়া তাহা পরিত্যাগ করেন তবে ঐ পরিত্যাগ, পরাজয়ের কারণ বলিয়া নিগ্রহ-স্থান শব্দে কথিত হয়।

এই ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান হইলে অর্থাৎ তাহার স্বরূপ কি ইহা বিশেষরূপে জানিতে পারিলে আত্মতত্ত্ব জ্ঞান জন্মে। সুতরাং শরীরাদিতে আত্মত্ব বুদ্ধি থাকে না। শরীরে আত্মত্ব বুদ্ধি অপগত হইলে রাগদ্বেষাদিও অপগত হয়। রাগ দ্বেষাদির নিবৃত্তি হইলে রাগ দ্বেষাদির কার্য্যও হয় না। সুতরাং ধর্ম্মকার্য্যে বা অধর্ম্ম কার্য্যে প্রবৃত্তির পুনরুৎপত্তি হয় না। ধর্ম্মাধর্ম্ম কার্য্যই জন্ম পরিগ্রহের কারণ, অতএব ধর্ম্মাধর্ম্ম কার্য্য না হইলে আর জন্ম পরিগ্রহও হয় না। যেমন কোন আশ্রয়াভাবে সাধারণের গমনাগমনাদি হয় না সেইরূপ সুখ দুঃখের আয়তন স্বরূপ শরীরাদির অভাবে তত্ত্ব-জ্ঞানীর মরণানন্তর আর সুখ বা দুঃখ কিছুই হয় না। তাঁহাদের এক কালে নিবৃত্তি হইয়া যায়। ঐ সুখ দুঃখ নিবৃত্তিকেই মুক্তি কহে।

জীবাত্মাতিরিক্ত যে এক পরমেশ্বর আছেন তদ্বিষয়ে অনুমান ও শ্রুত্যাদি প্রমাণ। কার্য্য দেখিলে কারণের অনুমান হয়, যেমন ঘট দেখিলে ঘটের কর্ত্তা কুম্ভকারের অনুমান হইয়া থাকে। এইরূপ অগম্য অরণ্যস্থ বৃক্ষাদি কার্য্য দর্শনেও তাহার প্রতি অস্মদাদির কর্ত্তৃত্ব অদর্শনে অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন পরমেশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। পরমেশ্বরের ভোগসাধন শরীর, সুখ, দুঃখ, দ্বেষাদি কিছুই নাই, কেবল নিত্য-জ্ঞান, ইচ্ছা, যত্নাদি কয়েকটি বিশেষ গুণ আছে। জীবাত্মা ভিন্ন ভিন্ন জীবশরীরে ভিন্ন ভিন্ন। যদি সকলেরই আত্মা এক হইত তাহা হইলে একের সুখে বা দুঃখে জগৎ সুখি বা দুঃখী হইত, কারণ সুখ দুঃখ আত্মার ধর্ম্ম এবং সেই একই আত্মা প্রত্যেক শরীরের অধিষ্ঠাতা। আত্মা ইন্দ্রিয়াদিরও অধিষ্ঠাতা ও যত্নাদির কর্ত্তা।

ইন্দ্রিয়গণ ইহাঁর জ্ঞানের করণ মাত্র, ইন্দ্রিয় কর্তৃত্বসম্পন্ন নয়, কারণ তাহা হইলে আমি চক্ষু, আমি কর্ণ ইত্যাদি ব্যবহার হইত এবং ঐ চক্ষুঃ প্রভৃতির বিনাশে কর্তারও বিনাশ হইত। পরন্তু যেমন একের দৃষ্ট বস্তু অপরে স্মরণ করিতে পারে না সেই-রূপ চক্ষু কর্তৃত্ব সম্পন্ন হইলে চক্ষুর নাশে পূর্ব্ব দৃষ্ট বস্তুর স্মরণ হইত না। কারণ যে পদার্থ দেখিয়াছে তাহারই স্মরণ সম্ভব, অন্যের তাহা সম্ভব নয়।

"আমি স্থূল" "আমি কৃশ" ইত্যাদি ব্যবহার দেখিয়া শরীরকেও আত্মা বলা যায় না। শরীর আত্মা হইলে ফলাফল স্বরূপ স্বর্গ নরক ভোগ হইত না। কারণ শরীরের বিনাশে আত্মার বিনাশ। আত্মার বিনাশ হইলে কে আর ফল ভোগ করিবে? স্বর্গাদিকে অলীক বলিয়াও স্বীকার করিতে পারা যায়না। কারণ তাহা হইলে ঐহিক সুখ হইতে নিবৃত্ত হইয়া লোকে যাগাদি করিতে অর্থব্যয় ও অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিত না। পরন্তু, যদি শরীরই আত্মা হইত, তবে সদ্য প্রসূত বালকের হর্ষ শোক ভয়াদি বা স্তন্য পানাদিতে প্রবৃত্তি হইত না। কারণ তৎকালে ঐ বালকের হর্ষাদির কোন কারণ নাই এবং স্তন্যপানে তাহার ক্ষুধা নিবৃত্তি হইবে তাহাও সে জানে না এবং তাদৃশ উপদেশও পায় না।

ক্রমশঃ

শ্রীপ্যারীমোহন সেন।

ঐশিক-বিজ্ঞান।

(১).

অবতরণিকা।

সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস এই যে, বিজ্ঞান বলিলেই প্রাকৃতিক বিজ্ঞান অর্থাৎ বাহ্য বা জড় প্রকৃতির বিজ্ঞান বুঝায়। চিকিৎসাতত্ত্ব, রসায়নশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র ইত্যাদিকে তাহারা বিজ্ঞান বলেন। তাহাদিগের মতে অন্তর বা আধ্যাত্মিক প্রকৃতি সম্বন্ধীয় আলোচনা বিজ্ঞান নহে। এজন্য সমাজতত্ত্ব, রাজনৈতিকতত্ত্ব বিজ্ঞান নামে আখ্যাত নয়। কিন্তু কিঞ্চিৎ অভিনিবেশপূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে প্রাকৃতিক বিষয়ের সবিশেষ জ্ঞান অর্থাৎ তাহার প্রকৃত নিয়ম রীতিমত, নিয়ন্ত্রিত রূপ ও শৃঙ্খলাপূর্ব্বক অনুসন্ধান ও নির্ণয়করণকে বিজ্ঞান বলা যায়। বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য সত্য নির্ণয় করা। অন্তরজগৎ এবং বাহ্যজগৎ উভয়ই বিজ্ঞানের আলোচনার বিষয়।

প্রকৃতি বলিলেই যে বাহ্যপ্রকৃতি বুঝাইবে এমন নহে, অন্তরপ্রকৃতিও বুঝায়, বস্তুতঃ প্রকৃতি এক—অন্তর এবং বাহ্যপ্রকৃতি দুইটী বিভাগমাত্র। এজন্য বিজ্ঞানকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ অন্তর বা আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান। দ্বিতীয়তঃ বাহ্য বা জড়বিজ্ঞান। মনস্তত্ব, নীতিতত্ব, তর্কশাস্ত্র, সমাজতত্ব, রাজনৈতিক-তত্ব, ঈশ্বরতত্ব প্রভৃতিকে আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান এবং রসায়নশাস্ত্র, চিকিৎসাতত্ব ইত্যাদিকে বাহ্যবিজ্ঞান বলা যায়। আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধে আধ্যাত্মিকবিজ্ঞানের অন্তর্ভূত ঈশ্বরতত্ব বা ঐশিক-বিজ্ঞান আলোচ্য।

সত্য নির্ণয়ই যখন বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য, তখন বুঝিতে হইবে যে সম্পূর্ণ অপক্ষ-পাতিত্ব এবং নিরপেক্ষতা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের প্রধান ধর্ম্ম। সত্য অনুসন্ধান করিতে হইলে কোনপ্রকার পক্ষপাতিত্ব, কুসংস্কার, পূর্ব্বসংস্কার প্রভৃতি সত্যানু-সন্ধান-বিরোধী ভাব ত্যাগ করা আবশ্যক, এইটী বৈজ্ঞানিক নিয়ম, বিশেষতঃ এইটী আধ্যাত্মিক জ্ঞানে প্রধান লক্ষণ। স্বাধীন এবং নিরপেক্ষভাবে অনুসন্ধান না করিলে সত্য নির্ণয় করা যায় না। পূর্ব্বসংস্কার মনে নিহিত থাকিলে মন দুর্ব্বল ও সঙ্কুচিত থাকে—বুদ্ধি স্ফূর্ত্তি পায় না। এজন্য বিবেচনায় ভ্রম জন্মে। সূক্ষ্মযুক্তি বিজ্ঞানের মূল ও ভিত্তি, কুসংস্কারবিশিষ্ট অন্ধ বিশ্বাস নহে। পাণ্ডুরোগাক্রান্ত ব্যক্তি যেমন সমস্ত হরিদ্রাবর্ণ দেখে, তেমনি কুসংস্কারাক্রান্ত ব্যক্তি সমস্তই ভ্রমময় দেখে। অতএব আমরা নিরপেক্ষ হইয়া ও কুসংস্কার পরিত্যাগ করিয়া শৃঙ্খলাপূর্ব্বক সত্য অনুসরণ করিব। নিরুপেক্ষ হইয়া আমরা ঈশ্বর অনুসন্ধান করিব।

ঈশ্বর ব্যতীত সমস্ত বিষয়েই আমরা নিরপেক্ষ ভাবে অনুসন্ধান করিয়া থাকি এবং তন্নিবন্ধন তদীয় প্রকৃতজ্ঞান যতদূর সম্ভাবনা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। যদি অন্য সমস্ত বিষয় বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের দ্বারা প্রকৃতরূপে জ্ঞাত হওয়া যায়, যদি অন্য সমস্ত বিষয়ের সত্য নির্ণয় হয়, তাহা হইলে, বাস্তবিক যদি ঈশ্বর থাকেন, তবে সেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং স্বরূপ নির্ণয় না হইবে কেন?

এতদ্দেশের লোকের এই ধারণা যে, অতি প্রাচীনকাল হইতে ঈশ্বর সম্বন্ধে যৎপরোনাস্তি আলোচনা ও তর্কবিতর্ক হইয়া আর্য্য-ঋষিগণের দ্বারা যাহা স্থির হই-য়াছে তাহাই সত্য, এক্ষণে আর আলোচনা আবশ্যক নাই। কিন্তু আমরা বলি, যে ঈশ্বর সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক নিয়মানুসারে কোনকালে সম্যক্ আলোচনা হয় নাই। বস্তুতঃ কপিল, চার্ব্বাক, পতঞ্জলি, গৌতম প্রভৃতি কতিপয় দর্শনকার ব্যতীত ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিচার কেহই করেন নাই। আর তাঁহারা যাহা বিচার করিয়া-ছেন তাহা অসম্পূর্ণ। কারণ, প্রথমতঃ, বর্ত্তমান সময়ের অন্যূন দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে তাঁহারা জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহারা কেবল ভারত বর্ষই জানিতেন, ইয়ুরোপ ও

আমেরিকার বিষয় কিছু জানিতেন না বলিলে অতুক্তি হয় না। এতদ্দেশের লোকের কি ঐশ্বরিক ভাব ছিল তাহা তাহারা জানিতেন না, অতএব তাহাদিগের ঈশ্বর সম্বন্ধে মতামত জানিতেন না। দ্বিতীয়তঃ, আর্য্য ঋষি ও দার্শনিকগণ কেবল আধ্যাত্মিক প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া ঈশ্বর সিদ্ধ বা অসিদ্ধ বলিয়া গিয়াছেন। বাহ্য বস্তু প্রদর্শিত প্রমাণ সম্যক্ উপলব্ধি হয় নাই। মনস্তত্বই তাহাদিগের ঈশ্বর নির্ণয়ের মূল ছিল, বাহ্য প্রকৃতির প্রমাণ তাহারা কচিৎ গ্রহণ করিয়াছেন। তৃতীয়তঃ, এই দুই হাজার বৎসরের মধ্যে আমেরিকার ও ইয়ুরোপীয় বিজ্ঞান কতদূর ঈশ্বর আলোচনায় সাহায্য প্রদান করিয়াছে তাহা তাহারা জানিতেন না।

ভারতবর্ষে যে সকল তর্ক আলোচনা হইয়াছিল তাহা পক্ষপাতিত্ব দোষে দূষিত, নিঃস্বার্থ ও স্বাধীনভাবে হয় নাই। আমাদিগের বেদ, উপনিষদ্, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি বহুসংখ্যক ধর্ম্মশাস্ত্রে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃস্বার্থ ও কুসংস্কারবিহীন বিচার প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। সকল গ্রন্থেই "ঈশ্বর আছেন" এইটী অগ্রে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে, এবং সেই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া সমস্ত শাস্ত্র, সমস্ত নিয়ম, লিখিত হইয়াছে, সেই বিশ্বাসের উপর সমস্ত তর্কবিতর্ক স্থাপিত হইয়াছে। সুতরাং প্রকৃত সত্য নির্ণয় হয় নাই। ঈশ্বর সাকার কি নিরাকার, ঈশ্বর ষড়গুণবিশিষ্ট বা অনন্তগুণবিশিষ্ট, বিষ্ণুপূজা শ্রেষ্ঠ না শক্তিপূজা শ্রেষ্ঠ, হিন্দুধর্ম্ম সত্য না বৌদ্ধধর্ম্ম সত্য, আতপতণ্ডুলে বিষ্ণুর সেবা হয়, না সিদ্ধতণ্ডুলে সেবা হয়, একাদশীতে অন্নভক্ষণ পাপ কি না, অমাবস্যাতে কুষ্মাণ্ডভক্ষণ নিষিদ্ধ কি না, এইরূপ অনর্থক বিষয় লইয়া অনেক তর্কবিতর্ক হইয়া গিয়াছে। প্রকৃত ও মূল বিষয় দূরে নিক্ষেপ করিয়া আনুষঙ্গিক সামান্য অনাবশ্যক বিষয় লইয়া অনেক বাগবিতণ্ডা দেখিতে পাওয়া যায়।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব—তাঁহার গুণ, পরলোক, পাপ, পুণ্য প্রভৃতি বিষয়ের বিচার করিতে আজি আমরা প্রবৃত্ত নহি। নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয়ের আলোচনা করা আমাদিগের উদ্দেশ্য।

১। লোক সাধারণের মনে বাহ্য বস্তু ও নীতি সম্বন্ধে যে কতকগুলি জ্ঞান শৈশবকাল হইতে নিহিত আছে সেগুলি সত্যবলিয়া প্রতীত ও বিশ্বস্ত হইয়া থাকে। ঐ জ্ঞানগুলি যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের দ্বারা ভ্রম বলিয়া সপ্রমাণ হইয়াছে কি না?

২। যদি বাহ্য বস্তু ও নীতি জ্ঞান বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের দ্বারা ভ্রম বলিয়া সপ্রমাণ হয়, তাহা হইলে, সাধারণ লোকবিশ্বাস্ত ঐশ্বরিক জ্ঞান ভ্রম হইতে পারে কি না?

৩। যদি ঈশ্বরসম্বন্ধীয় পূর্ব্ব-সংস্কার ভ্রান্ত হইবার সম্ভাবনা, তাহা হইলে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান দ্বারা ঐ ভ্রমকে ভ্রম প্রমাণ করা উচিত কি না এবং ভ্রম দূর করিয়া সত্য নির্ণয় করা আমাদের কর্ত্তব্য কি না ?

আমাদিগের অনেকটা ধারণা, সাধারণ সংস্কার ভ্রমাত্মক। ঐ ভ্রম যুক্তি দ্বারা সংশোধন করিতে আমরা বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা করিব। তবে আমরা যাহা বলিব, তাহা যে অভ্রান্ত, এরূপ স্পর্দ্ধা করিতে পারি না। আমাদিগের ন্যায় সামান্য লোকের পক্ষে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সপ্রমাণ বা অপ্রমাণ রূপ মহৎবিষয়ে হস্তক্ষেপ করা প্রগল্‌ভতামাত্র। ঈশ্বরসম্বন্ধে সম্যক্‌প্রকার চর্চ্চা হয় নাই বলিয়া এবং এবিষয়ের চর্চ্চায় কাহারও প্রবৃত্তি নাই দেখিয়া, আমরা এমন গুরুতর বিষয়ের আন্দোলন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমাদিগের সিদ্ধান্তে কোন দোষ বা ভ্রম হইলে, ভরসা করি যেন পাঠক ঐ ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করেন এবং সত্যনির্ণয়োপযোগী সাহায্য প্রদান করেন। যুক্তি নির্দ্দেশ না করিয়া কেবল উপহাস করিয়া উপেক্ষা করিলে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইব।

১। পূর্ব্ব-সংস্কার নিবন্ধন অনেকগুলি ভ্রম আমাদের মনে নিহিত আছে। ঐ সকল ভ্রমকে আমরা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি। কিন্তু ঐ সকল ভ্রমকে সত্য বলিয়া সপ্রমাণ করা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য নয়, উহাদিগকে ভ্রম বলিয়া প্রমাণ করা এবং প্রকৃত সত্যকে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করাই বিজ্ঞানের মুখ্য উদ্দেশ্য।

প্রথমতঃ বাহ্য-বস্তু সম্বন্ধে ভ্রম। পূর্ব্বে লোকের বিশ্বাস ছিল এবং এখনও অনেক মূর্খ লোকের এই ধারণা, যে পৃথিবী ত্রিকোণ ও সমতল; কিন্তু এক্ষণে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, পৃথিবী গোল। পূর্ব্বে বিশ্বাস ছিল যে, পৃথিবী নিশ্চল,—বিশ্বমণ্ডলের মধ্যে স্থিরভাবে রহিয়াছে এবং সূর্য্য পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে অহোরাত্র ভ্রমণ করিতেছে;—প্রাতে পূর্ব্বদিকে উদয় হইয়া সন্ধ্যার সময় পশ্চিমদিকে গমন করিয়া অস্ত যাইতেছে। কিন্তু এক্ষণে জ্যোতির্ব্বিদ্যার প্রভাবে সপ্রমাণ হইয়াছে যে সূর্য্য পূর্ব্বদিক হইতে পশ্চিমদিকে ভ্রমণ করে না,—সৌরজগতের মধ্যস্থিত আছে; পৃথিবী তাহার চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিয়া থাকে। তৎপরে ঐ পৃথিবীর ভ্রমণের কারণ নির্ণয় করিতে গিয়া অনুসন্ধানের দ্বারা বিশিষ্ট কারণ স্থির করিতে না পারিয়া অনেকে বলিতেন যে ঈশ্বর স্বয়ং পৃথিবীর গতি চালনা করেন। কিন্তু এক্ষণে বিজ্ঞানপ্রভাবে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ঐ গতির কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে এবং এ পর্য্যন্ত তাহা ভ্রান্ত বলিয়া সপ্রমাণ হয় নাই।

পৃথিবীর আদিম অবস্থায় মনুষ্য জাতির কিরূপে উৎপত্তি হইল? এ প্রশ্নের

উত্তরে খৃষ্টধর্ম্মীয়গণ বলিয়া থাকেন যে, ঈশ্বর স্বয়ং একটী পুরুষ ও একটী স্ত্রীলোক প্রথমে সৃজন করেন এবং ঐ দম্পতি হইতে মনুষ্য জাতি উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণে মহামতি চার্লস্ ডারউইন্ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, কতিপয় প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে মনুষ্যজাতি পরিণতি-প্রণালীক্রমে (Principles of Evolution) উৎপন্ন হইয়াছিল; কোন সৃষ্টিকর্ত্তা নিজ হস্ত দ্বারা তাহাদিগকে সৃজন করেন নাই।

আরও খৃষ্টিয়ানেরা বলেন যে, যীশু খৃষ্ট জন্মিবার চারিহাজার বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবী সৃষ্ট হইয়াছিল এবং এইটী পৃথিবীর প্রায় অর্দ্ধেক লোক বিশ্বাস করে, কিন্তু এক্ষণে ভূতত্ত্ববিৎ মহোদয়গণ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে খৃষ্টের অন্যূন বিশহাজার বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবী ছিল।

পূর্ব্বে লোকের বিশ্বাস ছিল যে বাহ্যবস্তু (Matter) নশ্বর, কিন্তু এক্ষণে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে—রসায়ন শাস্ত্রের অনুশীলনে স্থির হইয়াছে যে বাহ্যবস্তু অবিনশ্বর। বাহ্যবস্তু নষ্ট হয় না, কেবল রূপান্তর হয় মাত্র।

বিদ্যুৎ ও বজ্রপাত দেখিলেই সাধারণ অজ্ঞ লোক মনে করে যে ঐ দুইটী দেবরাজ ইন্দ্রের অস্ত্র শস্ত্র বিশেষ, নৈসর্গিক বা ভৌতিক ব্যাপার নয়; তিনি মধ্যে মধ্যে উহা ভূতলে নিক্ষেপ করেন। বৃহৎ একটী ঝটিকা হইলেই অমনি তাহারা বলে যে পবন-দেবের নিশ্বাস প্রশ্বাসে ঐ ঝটিকা হয়। ভূমি-কম্প হইলে তাহারা বলেন যে বাসুকি এই পৃথিবীকে স্কন্ধে করিয়া রহিয়াছেন, অধিক-কাল এ অবস্থায় থাকায় বেদনা বোধ হওয়াতে সময়ে সময়ে স্কন্ধ পরিবর্ত্তন করেন, এজন্য ভূমিকম্প হয়। তাঁহারা সূর্য্যগ্রহণ দর্শন করিয়া বলেন যে, রাহুনামা এক চণ্ডালের নিকট সূর্য্য ঋণগ্রস্ত ছিলেন। সূর্য্য ঋণপরিশোধে অক্ষম হওয়াতে রাহু তাহাকে মধ্যে মধ্যে গ্রাস করিতে যায়, এজন্য গ্রহণ হয়। স্থূল-বুদ্ধি মূর্খলোক পূর্ব্বোক্ত ভৌতিক ব্যাপারের তত্ত্বানুসন্ধানে অক্ষম হওয়ায়—ঐ নৈসর্গিক ব্যাপারের রহস্য উদ্ভেদনে অসমর্থ হওয়ায় উল্লিখিতব্যাপারের প্রকৃতকারণ নির্ণয় করিতে না পারায়—তৎপরিবর্ত্তে এইরূপ অলীক গল্প প্রকটন করিয়াছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান দ্বারা ঐ সাধারণ ভ্রান্তসংস্কার ভ্রম বলিয়া সপ্রমাণ হইয়া প্রকৃত সত্য নির্ণীত হইয়াছে।

নীতিসম্বন্ধীয় ভ্রম। বাহ্য জগৎ সম্বন্ধে যেমন, অন্তর্জগৎ সম্বন্ধেও তেমনি কতকগুলি ভ্রম-পরিপূর্ণ বিশ্বাস আছে। ঐ সকল ভ্রান্তিকে পূর্ব্বে লোক সাধারণের সত্য বলিয়া বিশ্বাস ছিল। কিন্তু এক্ষণে স্বাধীন-চিন্তা-প্রভাবে তাহা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বলিয়া প্রতীত হইতেছে। পূর্ব্বে সতীদাহ আমরা ঈশ্বরের অভিপ্রেত একটী প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান করিতাম। যে সাধ্বী স্ত্রী মৃতপতির

জলন্ত চিতায় প্রাণত্যাগ করিতেন, তাঁহাকে আমরা সতীর আদর্শ বলিয়া মনে করিতাম। যে স্ত্রীলোক বন্ধ্যা বা মৃতবৎসা বলিয়া ব্রত সঙ্কল্পে নবপ্রসূত নিঃসহায় সন্তানটীকে ভাগীরথীর স্রোতপ্রবাহে নিক্ষেপ করিত, তাহার ধর্ম্মের ও ঈশ্বরভক্তির পরা-কাষ্ঠা হইত। পূর্ব্বকালীন লোকেরা তাহাদের কোন বিশেষ অভীষ্ট সিদ্ধির উদ্দেশে ঈশ্বররূপা আদ্যাশক্তি কালিকাদেবীর অনুগ্রহ প্রার্থনা ও সন্তুষ্ট করিবার জন্য নির্দ্দোষ নিরাশ্রয় মনুষ্যকে তৎসম্বন্ধে বলিদান দিত। আমরা ঐ বলিদান পদ্ধতিকে ধর্ম্মানুষ্ঠান বলিয়া জ্ঞান করিতাম। নরহত্যাকাণ্ড শাস্ত্রানুমোদিত ছিল কি না শিশুবোধপাঠে গ্রাম্য গুরু মহাশয়ের বালকগণ পর্য্যন্ত জানিতে পারে। মহারাজ দাতাকর্ণ নারায়ণরূপী ব্রাহ্মণকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য স্বীয় প্রাণাধিক সন্তানটীকে তীক্ষ্ণ করাত দ্বারা ছেদন করিয়া খাদ্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় সন্তানকে বলিদান দিলেন কেন? ধর্ম্মবিশ্বাসের জন্য, সত্যের জন্য। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, সন্তানটীকে বলিদান দিলে নারায়ণ সন্তুষ্ট থাকিবেন, ধর্ম্মানুষ্ঠান হইবে; নতুবা এ নৃশংস কার্য্যে তিনি কখন হস্তক্ষেপ করিতেন না। কিন্তু এক্ষণে বর্ত্তমান উচ্চ সভ্যতার জ্ঞানপ্রভাবে ঐ নৃশংস হত্যাকাণ্ডের অযৌক্তিকতা সম্পূর্ণভাবে প্রতিপন্ন হইয়াছে। পূর্ব্বের ভ্রম যাহা এতদিন সত্য বলিয়া জ্ঞান ছিল তাহা এক্ষণে অসত্য বলিয়া প্রতীত হইয়াছে—পূর্ব্বের নৃশংস ব্যবহার যাহা ধর্ম্মানুষ্ঠান বলিয়া বোধ ছিল তাহা এক্ষণে অত্যন্ত নিকৃষ্ট পাপ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। যে সতীদাহ, যে নবপ্রসূত-সন্তান-বিসর্জ্জন, যে নরবলি এতদ্দেশীয় প্রচলিত ধর্ম্মানুষ্ঠান বলিয়া লোকসাধারণের জ্ঞান ও বিশ্বাস ছিল, তাহা এক্ষণে ভ্রান্তিমূলক বলিয়া জ্ঞান ও বিশ্বাস হইয়াছে—পূর্ব্বসংস্কার আদৌ উচ্ছিন্ন হইয়াছে। স্থূল কথা এই যে, পূর্ব্বসংস্কার সত্য ব্যতীত কখন মিথ্যা হইবে না এমন নহে। অজ্ঞান ও কুসংস্কার বশতঃ এবং স্বাধীন চিন্তার অভাবে পূর্ব্বে আমরা অনেকগুলি ভ্রমকে প্রকৃত সত্য বলিয়াছিলাম, কিন্তু সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানোন্নতির প্রখর কিরণে ও স্বাধীন চিন্তার অনুশীলনে ঐ ভ্রমসমূহ যুগপৎ অন্তর্হিত হইয়াছে।

এক্ষণে দেখা যাউক, ইন্দ্রিয়জ্ঞান কতদূর বিশ্বাস্য। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে প্রকৃতি এক—অন্তর ও বাহ্যপ্রকৃতি দুইটীবিভাগ মাত্র। বাহ্যপ্রকৃতির সহিত অন্তরপ্রকৃতির নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ পঞ্চ ইন্দ্রিয় মধ্যে ব্যবধান থাকিয়া বাহ্যপ্রকৃতির জ্ঞান অন্তরপ্রকৃতিতে লইয়া যায়। ইন্দ্রিয়প্রয়োজিত জ্ঞান নিশ্চয়ই সত্য হইবে, ভ্রান্তিমূলক হইবে না, এমন নহে। সত্যাসত্যের বিচার করা অন্তরপ্রকৃতির কার্য্য। বাহ্যপ্রকৃতির দ্বারা সমুদায় জ্ঞান জন্মে বটে

কিন্তু অন্তরপ্রকৃতি বিবেচনা দ্বারা তাহা সত্য বা মিথ্যা সিদ্ধান্ত করে। চক্ষু দেখিল যে সূর্য্য পূর্ব্বদিক হইতে উদিত হইয়া পৃথিবী পরিক্রমণের জন্য শনৈঃ শনৈঃ পশ্চিমদিকে গমন করিল, কিন্তু মন বৈজ্ঞানিক যুক্তি দ্বারা বলিল যে এই সিদ্ধান্ত ভ্রমপূর্ণ। বৃষ্টির পর পূর্ব্বগগনে জলধনু (Rainbow) উদয় হইল, অমনি সাধারণ লোকে বলিল যে রাম-ধনুর উদয় হইয়াছে। কিন্তু ঐ ধনু যে শ্রীরামচন্দ্রের ধনু নয়, বিজ্ঞান তাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছে। অন্তরপ্রকৃতি বাহ্যপ্রকৃতির দ্বারা প্রতারিত হয়।

অনেকের বিশ্বাস আছে যে মানসিক জ্ঞানই ভ্রমসঙ্কুল হইতে পারে। কিন্তু উপরিউক্ত পৃথিবীর গোলত্বের উদাহরণে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, চাক্ষুষ জ্ঞানও ভ্রান্ত হইবার সম্ভাবনা।

অতএব আমাদের বক্তব্য এই যে, যখন লোকবিশ্বাস্য অভ্রান্ত চাক্ষুষ-জ্ঞান ভ্রম বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে, তখন মনোবৃত্তিসম্বন্ধীয় নীতিজ্ঞান অপেক্ষাকৃত অধিকতর ভ্রম-সঙ্কুল হইতে পারে এবং সাধারণ লোকের ধর্ম্মবোধ (Religious Idea) তদপেক্ষা অধিকতর ভ্রান্তিমূলক হইতে পারে তাহার বিচিত্রতা কি? আমাদিগের বিশ্বাস ঐন্দ্রিয়জ্ঞান যুক্তির দ্বারা সংস্করণীয়। যে ইন্দ্রিয়জ্ঞান যুক্তি দ্বারা সত্য বলিয়া সপ্রমাণ হইবে সেটী সত্য এবং যেটী যুক্তিবহির্ভূত সেটী ভ্রান্ত।

আরও দেখুন, আমরা শৈশবাবধি কুসংস্কারে শিক্ষিত কি না, কুসংস্কার, আমাদের মনে সংবিদ্ধ কি না। মানবপ্রকৃতি উন্নতিশীল ; শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকৃতিই ক্রমান্বয়ে উন্নতিলাভ করে এবং উভয়ই প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে উচ্চস্থান প্রাপ্ত হইলেই ক্রমান্বয়ে অবনত হয়। বাল্যের পর যৌবন, যৌবনের পর প্রৌঢ়াবস্থা প্রাপ্ত হই—প্রৌঢ়াবস্থা শারীরিক বৃদ্ধির চরম সীমা। অন্তরপ্রকৃতিতেও এইরূপ উন্নতিক্রম আছে। বাল্যাবস্থায় আমাদের মনের ভাব যেমন থাকে তাহা যৌবনাবস্থায় উন্নতি প্রাপ্ত হয়। আবার যৌবনাবস্থায় যেরূপ মনের ভাব থাকে তাহা প্রৌঢ়াবস্থায় তদপেক্ষা উন্নতি প্রাপ্ত হয়। বাল্যাবস্থায় যে জ্ঞান স্বতঃ কিম্বা লোকসমাজ হইতে উপলব্ধ হয়, তাহার যৌবনাবস্থায় বৃদ্ধি ও সংস্করণ হয় ; যৌবনের জ্ঞান প্রৌঢ়াবস্থায় উন্নত ও সুসম্পন্ন হয়। ফলতঃ যে পরিমাণে আমাদের জ্ঞানের বৃদ্ধি হয় সেই পরিমাণে মনের সংস্করণ হয়। শৈশবাবস্থায় বৃদ্ধা পিতামহীর ক্রোড়স্থিত হইয়া যে ভূতপ্রেত, ডাইন, রাক্ষস ইত্যাদির গল্প অত্যন্ত আগ্রহপূর্ব্বক শ্রবণ করিতাম ও সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতাম, তাহা যৌবনে বা প্রৌঢ়ে জ্ঞানবৃদ্ধি বশতঃ সম্পূর্ণ অলীক বলিয়া জ্ঞান ও বিশ্বাস জন্মে। পৌর্ণমাসীতে সুদূরবর্ত্তী পূর্ণচন্দ্র নভোমণ্ডলে উদিত হইলে, বৃদ্ধা পিতামহী বলিতেন, ঐ যে চন্দ্রমধ্যস্থিত নীলবর্ণের আভা দেখিতেছ, উহা একটী বৃদ্ধা স্ত্রী বসিয়া চরকায় সূত্র প্রস্তুত করিতেছে। আর তৎ-

পার্শ্বে ঐ যে আর একটী কালীবর্ণ দাগ দেখিতেছ তাহা একটী বৃদ্ধপুরুষ কদম্বৃক্ষ-মূলে গাভিবন্ধনপূর্ব্বক দুগ্ধ দোহন করিতেছে—আর এই যে শশাঙ্কলাঞ্ছিত আকাশ-মণ্ডলে নীল, লোহিত, ধূসরবর্ণের মেঘ-রাশি দক্ষিণ হইতে উত্তরদিকে গমন করিতেছে, উহা হিমালয়শিখরস্থিত বিশাল-শাল-বৃক্ষের পত্র ভক্ষণের জন্য গমন করিতেছে। পিতামহীর এই সকল গল্প অতি আগ্রহ ও মনোনিবেশপূর্ব্বক শুনিতাম, এবং সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া বিশ্বাসও করিতাম। কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্তি সহকারে যে পরিমাণে আমাদের জ্ঞানের বৃদ্ধি ও স্বাধীন চিন্তার আবির্ভাব হইতে লাগিল, সেই পরিমাণে ঐ ভ্রান্ত বিশ্বাস, পূর্ব্ব-সংস্কার, ক্রমশ তিরোহিত হইতে লাগিল। যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতাম তাহা এক্ষণে মিথ্যা বলিয়া প্রতীয়মান হইল। পূর্ব্বোক্ত উদাহরণে স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে, বাহ্য-বস্তু ও নীতিজ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের যে কতকগুলি ভ্রান্ত বিশ্বাস ছিল, তাহা জ্ঞানের উন্নতি বশতঃ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও যুক্তি দ্বারা সম্পূর্ণ তিরোহিত হইয়াছে, এবং ঐ ভ্রমগুলি ভ্রম বলিয়া সপ্রমাণ হইয়াছে।

২। যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান দ্বারা বাহ্য প্রকৃতি ও নীতি সম্বন্ধীয় জ্ঞান যাহা পূর্ব্ব সংস্কার বশতঃ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতাম তাহা যদি ভ্রমাত্মক হইবার সম্ভাবনা, তাহা হইলে সাধারণ লোকেরও ঐশ্বরিক জ্ঞান যে ভ্রমাত্মক হইবে তাহার বিচিত্রতা কি?

৩। যদি ঈশ্বরসম্বন্ধীয় পূর্ব্ব সংস্কার ভ্রান্ত হইবার সম্ভাবনা প্রতীয়মান হইল, তবে ঐ ভ্রম সপ্রমাণ ও দূরীকরণ করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও স্বরূপ নির্ণয় করা আমাদের আবশ্যক। নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তিতে এতদ্বিষয় বিবৃত হইল।

এক্ষণে দেখা যাউক, পূর্ব্বসংস্কারজনিত আমরা যাহাকে সহজ-জ্ঞান বলি তাহার আদেশ প্রকৃত সত্যে, প্রকৃত মঙ্গলে, লইয়া যায় কি না। কেহ কেহ বলেন যে, ঐশ্বরিক জ্ঞান মানব জাতির স্বভাব সিদ্ধ (Intuitive or instinctive) মানব যখন জন্মিয়াছিলেন, তৎসঙ্গে সঙ্গে ঐ জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন। ঐ জ্ঞান স্বাভাবিক ও সহজ জ্ঞান। তাহাদিগের মতে ক্ষুৎপিপাসা প্রভৃতি ঐন্দ্রিয়জ্ঞান যেমন স্বতঃপ্রসূত, ক্রোধ ও স্নেহপ্রভৃতি রিপু সকল যেমন স্বাভাবিক, শিক্ষা বা বহুদর্শিতা জ্ঞানের ফল নহে, তেমনি ঐশ্বরিক জ্ঞান স্বাভাবিক ও সহজাত। ঐ স্বাভাবিক জ্ঞান যেমন স্বতঃসিদ্ধ ও অভ্রান্ত, ঐশ্বরিক জ্ঞানও তদ্রূপ স্বতঃসিদ্ধ ও অভ্রান্ত। স্বতঃসিদ্ধের যেমন প্রমাণ আবশ্যক নাই, স্বতঃপ্রতীয়মান ঐশ্বরিক জ্ঞানেরও তদ্রূপ। অতএব ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুসন্ধান করা বৃথা বাগাড়ম্বর মাত্র। কিন্তু আমরা দেখাইব যে, এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। ঐশ্বরিক-জ্ঞান স্বভাবসিদ্ধ কি না ইহার মীমাংসা পরে বিবৃত হইবে। তর্কী-

সুবোধে ধরিয়া লইলাম যে ঐশ্বরিক জ্ঞান স্বাভাবিক। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, ঐ স্বাভাবিক জ্ঞান ভ্রান্ত কি না। তথাহি, ঈশ্বর ব্যতীত আমাদের অন্যান্য স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান বিপথগামী ও ভ্রান্ত কি না? পশু পক্ষীদিগের স্বাভাবিক জ্ঞান যেমন একেবারে প্রকৃত সত্যে আনয়ন করে—যেটী মঙ্গলকর সেইটীতে অভ্রান্ত হইয়া আনয়ন করে, মনুষ্যের স্বাভাবিক জ্ঞান সেইরূপ কি না? পশ্বাদির দৃষ্টান্তে দেখা যায় যে, তাহাদের স্বাভাবিক জ্ঞান একেবারে সম্পূর্ণ ভাবে স্বাভাবিক-জ্ঞান-প্রদর্শিত প্রকৃত বস্তু প্রাপ্ত করিয়া দেয়। যেমন বিড়াল সম্মুখস্থিত মৎস্য ও মিষ্ট মধ্য হইতে স্বাভাবিক জ্ঞান প্রদর্শিত তাহার উপাদেয় ও স্বাস্থ্যকর খাদ্য মৎস্যই নির্ব্বাচন করিয়া ভক্ষণ করে, মিষ্ট সুমধুর হইলেও ত্যাগ করে। দুগ্ধ ও জল মিশ্রিত করিয়া হংসের সমক্ষে স্থাপন করিলে সে স্বাভাবিক-জ্ঞান-বলে জলভাগ পরিত্যাগ করিয়া অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর দুগ্ধমাত্রই পান করে, হিতকর ও ব্যবহারোপযোগী দ্রব্য নির্ব্বাচন করে। সর্পদংশিত নকুল স্বাভাবিক-জ্ঞান বলে বিবিধ ওষধি পরিব্যাপ্ত বনস্থলি মধ্য হইতে স্বীয় অভিলষিত মঙ্গলকর ওষধি নির্ব্বাচন করিয়া লয়। পশ্বাদির ন্যায় মনুষ্য স্বাভাবিক জ্ঞান দ্বারা বাহ্য ও অন্তর জগতের প্রকৃত সত্যগুলি নির্ব্বাচন করিয়া লইতে পারে কি না? যদি ঈশ্বর ব্যতীত অন্য বিষয়ে মানবের স্বাভাবিক জ্ঞান ভ্রান্ত হয়, তাহা হইলে ঈশ্বর-সম্বন্ধে আমাদের স্বাভাবিক জ্ঞান ভ্রান্ত হইবার সম্ভাবনা কি না? আমাদের বিবেচনায় স্বাভাবিক জ্ঞান আদৌ অভ্রান্ত নয় এবং তৎপ্রদর্শিত বস্তু বিনা যুক্তিতে গ্রহণীয় নয়। মনে করিলাম যে, আহার নিদ্রা, কাম ক্রোধ প্রভৃতি আমাদের স্বাভাবিক। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ভ্রান্ত কি না, তৎপ্রদর্শিত প্রকৃত বস্তুতে আনয়ন করে কি না, এবং ঐ বস্তু মানবের উপকারি কি না? ঐ জ্ঞান যাহা নির্দ্দেশ করে, যাহা আমাদের গ্রহণীয় বলিয়া দেখাইয়া দেয়—যাহা আমাদের উপকারি বলিয়া বিনির্দ্দেশ করে, তাহা প্রকৃত পক্ষে আমাদের মঙ্গলদায়ক কি না? স্বাভাবিক প্রবৃত্তি যাহা নির্দ্দেশ করে তাহা জ্ঞান ও যুক্তি দ্বারা অনুমোদিত কি না? আমরা দেখিতে পাই যে, স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ও বহুদর্শিতা জ্ঞান উভয় উভয়ের চির-বিরোধী, যেখানে স্বাভাবিক-প্রবৃত্তির বল অধিক সেখানে জ্ঞান-বল অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ-রাগ-রিপুর প্রাবল্য হইলে, আমাদের ভাল মন্দ জ্ঞান থাকে না। আবার, যেখানে জ্ঞানবল অধিক, সেখানে রিপু-বল ক্ষীণ—রাগ-রিপুর আবির্ভাব হইল, কিন্তু জ্ঞানী ও জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি অমনি হিতাহিত বিবেচনা দ্বারা রাগ সম্বরণ করিলেন। এক্ষণে দেখুন, কোন সময়ে আমাদের স্বাভাবিক জ্ঞান বিশেষ স্ফূর্ত্তি পায়—কোন সময়ে যুক্তি ও বহুদর্শিতা জ্ঞান-বল অল্প ও স্বাভাবিক জ্ঞান অধিক থাকে। আমাদের বিবেচনায় শৈশবকালই মানবের স্বাভাবিক

অবস্থা, এজন্য এই কালেই স্বাভাবিক প্রবৃত্তির প্রাবল্য, এইকালে ক্ষুৎপিপাসা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ব্যতীত, যুক্তি ও বহুদর্শিতা জ্ঞান থাকে না। অতএব দেখা যাউক, শৈশবকালে প্রবৃত্তি কিরূপ আদেশ করে এবং যেটী গ্রহণ করিতে আদেশ করে সেটী গ্রহণীয় কি না? মনে করুন, শিশুর ক্ষুধা হইল, উপযুক্ত খাদ্য সম্মুখে নাই, তৎপরিবর্ত্তে অখাদ্য আছে। মিষ্টান্নের পরিবর্ত্তে বিষবটিকা আছে, বালক কি গ্রহণ করিবে? সে ভাল মন্দ নির্ব্বাচন করিতে না পারিয়া ঐ বিষ-বটিকা উপাদেয় খাদ্য ভ্রমে ভক্ষণ করিবে। আবার দেখুন, শিশুর স্বাভাবিক স্নেহ ও ক্রোধ আছে; এক ব্যক্তি মিত্র ও আর এক ব্যক্তি শত্রু উভয়ই তাহার নিকট দণ্ডায়মান এবং উভয়ই তাহাকে আলিঙ্গন করিল। কিন্তু শিশু শত্রু মিত্র, সদাসৎ কিছুই নির্ব্বাচন করিতে পারিল না। হংস যেমন দুগ্ধ নির্ব্বাচন করিল, নকুল যেমন ওষধি নির্ব্বাচন করিল, শিশু তেমনি অভ্রান্ত হইয়া খাদ্যাখাদ্য, শত্রু মিত্র, সদসৎ কিছুই নির্ব্বাচন করিতে পারিল না। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, স্বাভাবিক প্রবৃত্তির আদেশ ভ্রান্ত ও অমঙ্গলকর হইতে পারে। স্বাভাবিক জ্ঞান যে বস্তু গ্রহণীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করে, প্রকৃতপক্ষে তাহা মঙ্গলকর ও গ্রহণীয় নয়। স্বাভাবিক জ্ঞান কোন বস্তু গ্রহণীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিল, কিন্তু ইহার সদসৎ বিবেচনা করা ঐ স্বাভাবিক জ্ঞানের কার্য্য নয়, তদ্বিবেচনা যুক্তি ও বহুদর্শিতা জ্ঞানের কার্য্য। শুদ্ধ স্বাভাবিক জ্ঞানের উপর নির্ভর করিলে ভ্রমে পতিত হইতে হয়, ঐ ভ্রম হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য যুক্তি ও বহুদর্শিতা জ্ঞানের সাহায্য আবশ্যক। স্বাভাবিক জ্ঞান ভ্রান্তিমূলক, যুক্তি তৎসংস্কারক। স্বাভাবিক ঐন্দ্রিয়-জ্ঞান ও রিপুর আদেশ যখন ভ্রান্ত ও অমঙ্গলকর হইল, সে স্থলে স্বভাবোৎপন্ন ঐশ্বরিক জ্ঞান প্রকৃত পথে লইয়া যাইবে ও তাহার আদেশ অভ্রান্ত, তাহার প্রমাণ কি? বস্তুত স্বাভাবিক কোন জ্ঞান দ্বারা প্রকৃতপন্থায় গমন করিয়া সত্য নির্ণয় করা যায় না। এজন্য ঐশ্বরিক জ্ঞান স্বভাবসিদ্ধ হইলেও প্রকৃত ঈশ্বরত্বে লইয়া যায় না—সত্যস্বরূপ-ঈশ্বরত্বে লইয়া যায় না। ঈশ্বরের সত্ত্বা ও স্বরূপ নির্ণয় করিতে হইলে, যুক্তির সাহায্য আবশ্যক।

প্রকৃতির নিগূঢ় তত্ত্ব জানাই প্রকৃত জ্ঞান। স্বাধীন চিন্তা ও নিরপেক্ষ অনুসন্ধানে উহা পাওয়া যায়। কুসংস্কার পূর্ব্বে মনে নিহিত থাকিলে নির্ম্মল জ্ঞান লাভ করা যায় না। সত্য নির্ণয় করিবার পূর্ব্বে পূর্ব্ব-সংস্কার ত্যাগ করা অত্যাবশ্যক। পূর্ব্বোল্লিখিত চন্দ্রমণ্ডলস্থিত কৃষ্ণবর্ণের উদাহরণে দেখা যায় যে, যদি ঐ কালিমা বৃদ্ধস্ত্রী বা পুরুষ বলিয়া জ্ঞান ও বিশ্বাস করি, তাহা হইলে এই স্থলেই আমাদের জ্ঞানের চরমসীমা প্রাপ্ত হয়, কারণ বিশ্বাস জ্ঞানের শেষ। যতক্ষণ অবধি আমাদের কোন বিষয়ের অস্তিত্বের বিশ্বাস না জন্মে, ততক্ষণ তদ্বিষয় আন্দোলন করি, অনুসন্ধান করি,

ও নির্ণয়োপযোগী কার্য্যক্রম অনুসরণ করি এবং তৎপর্য্যালোচনার ও অনুসন্ধানের জন্য আমাদের উপলব্ধি হয়, তদ্বিষয়ে প্রকৃত তত্ত্ব জ্ঞান হয়, সত্যে উপনীত হইতে পারা যায়। কিন্তু যদি উক্ত ভ্রান্ত জ্ঞানকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি, তাহা হইলে অনুসন্ধান প্রক্রিয়া অবরুদ্ধ হয় এবং পূর্ব্বের ভ্রান্ত বিশ্বাস থাকিয়া যায়। পূর্ব্বসংস্কার ত্যাগ করিয়া আমরা বৈজ্ঞানিক নিয়মানুসারে চন্দ্রমণ্ডলস্থিত কালীবর্ণ নির্ণয় করিতে গিয়া দেখিলাম যে, তাহা পিতামহীর উক্ত বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা মনুষ্য নয়, চন্দ্রমণ্ডলস্থিত পর্ব্বত! এইরূপ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের দ্বারা সাধারণ লোকের জ্ঞানবহির্ভূত অনেক বিষয় সত্য বলিয়া সংস্থাপন করা যাইতে পারে। এজন্য জ্ঞানবহির্ভূত ঈশ্বরতত্ত্ব আমাদের অনুশীলন করা কর্ত্তব্য।

কেহ কেহ বলেন যে, ঐশ্বরিকজ্ঞান স্বভাবসিদ্ধ, এবং ঐ জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া বিশ্বাস করিলে ঈশ্বর প্রাপ্ত হওয়া যায়। এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই, স্বভাবসিদ্ধ ঐশ্বরিক জ্ঞানের উপর বিশ্বাস করিলে ঈশ্বরকে লাভ করিতে পারা যায় কি না? সত্য-স্বরূপ ঈশ্বর উপলব্ধি হয় কি না? আবার, বিশ্বাস করিলেই সত্যে উপনীত হইতে পারা যায় কি না? বিবেচনা করা যাউক। বিশ্বাস দ্বিবিধ, স্বাভাবিক ও যৌক্তিক। যাহা মাতৃ ক্রোড় হইতে বিশ্বাস করিয়া আসিতেছি, তাহা স্বাভাবিক নামে আখ্যাত—সেই বিশ্বাসই অন্ধ বিশ্বাস। যাহা জ্ঞান ও যুক্তি দ্বারা সত্য বলিয়া প্রমাণ হইয়া বিশ্বাস হইয়াছে তাহা যৌক্তিক বা বৈজ্ঞানিক বিশ্বাস। স্বাভাবিক বিশ্বাস পূর্ব্বসংস্কারের উপর ও যৌক্তিক বিশ্বাস প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। পূর্ব্ব-সংস্কারাদি যদি ভ্রান্ত হয়, তাহা হইলে, স্বাভাবিক বিশ্বাস ভ্রান্ত এবং সত্য হইলে, সত্য। যুক্তিতে যদি ভ্রম থাকে তাহা হইলে যৌক্তিক বিশ্বাস ভ্রান্ত, ভ্রম না থাকিলে অভ্রান্ত। উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে যে পূর্ব্ব-সংস্কার ভ্রমসঙ্কুল অতএব স্বাভাবিক বিশ্বাস ভ্রমসঙ্কুল। বাল্যকাল হইতে বিশ্বাস আছে যে আকাশ-স্থিত মেঘ-রাশির উপর হস্তী শুণ্ড দ্বারা ভূতলে জল সিঞ্চন করে, এজন্য বৃষ্টি হয়। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখুন, বাস্তবিক কি ঐ হস্তী বারিবর্ষণ করে? হস্তী ব্যতীত বৃষ্টি-বর্ষণের অন্য কোন বিশিষ্ট কারণ কি নাই? বৈজ্ঞানিক যুক্তি তাহা কি আবিষ্কার করিতে পারে নাই? রিক্ত ভাণ্ডারে অর্থ আছে বলিয়া বিশ্বাস করিলে কি বাস্তবিক তাহার মধ্যে ধন মিলিবে? অদ্য বৃষ্টি হইবে না বলিয়া বিশ্বাস করিলে বাস্তবিক কি বৃষ্টি বন্ধ থাকিবে? তাহা কখনই নয়। যদি বিশ্বাসের উৎপত্তিস্থল সুযুক্তি হয় তাহা হইলে যেটী যুক্তিতে ও বিচারে স্থির-সিদ্ধান্ত হইবে, সেইটীই সত্য ও গ্রহণীয়। প্রাগুক্ত বিষয় দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, বিশ্বাস দ্বারা ঈশ্বরের উপলব্ধি হয় না। বিশ্বাস দ্বারা প্রকৃত সত্যে উপনীত হওয়া যায় না। নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক যুক্তি আবশ্যক।

সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস এই যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক, অনুসন্ধান ও সমালোচনা করা ঈশ্বরের-অবজ্ঞা বা ঈশ্বর-নিন্দা (Blasphemy), অতএব তৎসম্বন্ধে তর্ক করা পাপ—ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুসন্ধান ধর্ম্মবিরুদ্ধ। ঐ বিশ্বাসটী সম্পূর্ণ ভ্রান্তি-মূলক। জগৎ-পিতা পরমেশ্বর মানবজাতির পিতা, তাঁহার অস্তিত্ব গুণ ও মহিমার কথা বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি ও বিশ্বাস করিতেছি। কিন্তু চক্ষু দ্বারা যেমন বাহ্য প্রকৃতি দর্শন হয়, সেইরূপ ঈশ্বর কখন আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হন নাই। জ্ঞানচক্ষু দ্বারা যেমন অন্তরপ্রকৃতির স্পষ্ট উপলব্ধি হয়, সেইরূপ কখন আমরা তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে পারি নাই। ঈশ্বরসম্বন্ধে আমাদের মনোবৃত্তি কুজ্ঝটিকা-বৃত হইয়া আছে। প্রখর জ্ঞান-সূর্য্যের দ্বারা ঐ অজ্ঞান-কুজ্ঝটিকা পরিষ্কার করিতে কি পাপ? কি দোষ? ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের অনেকগুলি অন্ধ বিশ্বাস আছে। ঈশ্বরের অস্তিত্বে আমরা অন্ধ বিশ্বাস করিয়া আসিতেছি, কিন্তু যদি বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও সদ্যুক্তি দ্বারা তাঁহার অস্তিত্ব স্পষ্ট প্রতিপন্ন করিতে পারি, এবং তাঁহার গুণ ও মহিমা স্পষ্ট সিদ্ধান্ত করিতে পারি, ইহা অপেক্ষা অধিক আনন্দের বিষয় আর কি হইতে পারে? যে ঈশ্বর বিশ্বমণ্ডলের রচয়িতা বলিয়া বিখ্যাত, যিনি পরমকরুণাময় পিতা, তাঁহার অস্তিত্ব যদি বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান দ্বারা সপ্রমাণ করিতে পারা যায় তদপেক্ষা সৌভাগ্যের বিষয় আর কি আছে? বাস্তবিক যদি তিনি থাকেন তাহা হইলে তাঁহার অস্তিত্ব ও স্বরূপ অবশ্যই উপলব্ধি হইবে। আমাদের বিবেচনায় তাঁহার অস্তিত্ব সপ্রমাণ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য, প্রকৃত ধর্ম্ম। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ইহাকে কর্ত্তব্য ধর্ম্ম মনে না করিয়া আমরা ঈশ্বরের অবজ্ঞা বলিয়া তাচ্ছল্য করি, ধর্ম্মকার্য্য বলিয়া বিবেচনা না করিয়া পাপকর্ম্ম বলিয়া মনে করি। মনে করুন, একটী শিশু মাতৃগর্ভ হইতে নিঃসৃত হইবামাত্র তদীয় পিতা মাতা উভয়েই অন্তর্হিত হইলে, পিতা মাতা কোথায় গেলেন, শিশু জানে না। হয়ত পিতা মাতা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, কিম্বা নিরুদ্দেশ হইয়া জীবিত আছেন। শিশু অপরের প্রতিপালিত হইয়া বয়ঃপ্রাপ্ত হইল এবং তৎসঙ্গে বিদ্যা ও জ্ঞান লাভ করিল। উদ্ভিদ যেমন মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন হয়, তেমনি সে পিতা মাতা ব্যতীত জন্মগ্রহণ করে নাই। অন্য লোকের ন্যায় সেও পিতা মাতা হইতে উৎপন্ন। পিতা মাতার অদর্শন হেতু মন ব্যগ্র হইল। পিতা মাতাকে অনুসন্ধান করা, তাঁহারা জীবিত আছেন কি কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন তাহা স্থির করা, তাহাদিগকে প্রাপ্ত হওয়া, তাহাদিগের পবিত্র সহবাস উপভোগ করা সন্তানের কি কর্ত্তব্য নয়? তাহাতে কি পিতা মাতার অবজ্ঞা করা হয়? তাহাতে কি পাপ জন্মে? যদি ঈদৃশ অবস্থায় পার্থিব পিতার অস্তিত্ব অনুসন্ধান আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও ধর্ম্ম বলিয়া

জ্ঞান হইল, তাহা হইলে, যিনি জগৎপিতা, তাঁহার অস্তিত্ব তত্ত্বের অনুসন্ধান ও উপলব্ধি করায় পাপ বা অধর্ম্ম কি ?

(ক্রমশঃ)।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

আর্য্যজাতির জ্ঞান-বিজ্ঞান।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

বিজ্ঞানের আলোচনা করিলে, অহঙ্কার ও অভিমান চূর্ণ হইয়া মনের যে নির্ম্মলতা,প্রশস্ততা ও উন্নতি জন্মে, এখানে সংকেতে তাহাই প্রদর্শন করা হইল। বাস্তবিক, মানুষ যতই পরিচ্ছদপরিপাটী বিধান করুক, প্রজাপতির সৌন্দর্য্য কখন পর্য্যুদস্ত করিতে পারিবে না। অপার ও অসীম সাগরপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইয়া, চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিলে, যখন মন তাহার সীমাধারণে সমর্থ না হইয়া, ব্যাঘ্রভয়ভীত ক্ষুদ্র-কুক্কুরের ন্যায়, পুনরায় স্বীয় স্থানে প্রত্যাবৃত্ত হয়, তখন, আপনাআপনি নিতান্ত ক্ষুদ্র ভাবিয়া দুর্ব্বল মানুষের অবশ্যই অভিমান চূর্ণ হইয়া যায়, সন্দেহ নাই।

"সত্যতপা পুনরায় কহিলেন, জ্ঞানের সংগ্রহ ও পরিপাক করাই যাহার উদ্দেশ্য, সে সকল স্থলে ও সকল সমাজে বিচরণ করিবে। এবং ঈশ্বর কোন্ বস্তুকে কি অভিপ্রায়ে, কি নিয়মে, কিরূপ উপাদানে নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং আমাদের সহিত সেই অভিপ্রায়াদিরই বা কতদূর সম্পর্ক বা দূরভাব, তৎসমস্ত যথাতত্ত্ব আলোচনা করিবে। এইরূপ আলোচনায় সুখের সীমা নাই। জ্ঞানী ব্যক্তির প্রফুল্লতার যে কোনকালেই ক্ষয় হয় না, ইহাই তাহার কারণ। তিনি পৃথিবীকে নিত্য নূতন অবলোকন করেন, এবং তজ্জন্য নিত্য নূতন প্রীতিভোগ করিয়া থাকেন। প্রত্যেক মনুষ্যের মন, বৃত্তি, প্রবৃত্তি ও কার্য্য ; প্রত্যেক বৃক্ষের ফল, কুসুম, শাখা, প্রশাখা ও পত্র ; প্রত্যেক পশুর আকারপ্রকার, স্বভাব, চলন ও গতি ইত্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খ সন্ধান করা তাঁহার স্বভাব। ফলতঃ, ঈশ্বরের সৃষ্টি অনন্ত। এক ব্যক্তির যাবজ্জীবন সন্ধানেও তাহার শেষ হয় না। সুতরাং, জ্ঞানী ব্যক্তির কোনকালেই অবসর নাই। নিষ্কর্ম্মা বসিয়া থাকিলে, অথবা চিন্তার উপযুক্ত সামগ্রী না পাইলে, মনে যেরূপ বিরক্তির সঞ্চার হয়, এরূপ আর কিছুতেই নহে। সেইরূপ, প্রতিদিন পুনঃ পুনঃ এক বিষয়ে ব্যাপৃত হইলেও, মন আপনা হইতেই বিরক্ত ও ব্যাকুল হইয়া উঠে।"

"বৃহস্পতি স্বয়ং বলিয়াছেন, জ্ঞানের অভাবই সাক্ষাৎ অসুখ। ক্রমাগত অন্ধকারে বিচরণ করিলে, দৃষ্টির ব্যাঘাত বশতঃ মন যে আহত হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? এইজন্যই বিষয়সেবী অজ্ঞানী পুরুষ যেন সর্ব্বদাই অন্ধকারার, অন্ধকূপে অথবা অন্ধগুহায় বাস করিয়া থাকে। কোনকালেই তাহার মনের বিকাস সম্পন্ন হয় না। সত্য বটে, অভ্যাসবশে কালসহকারে উহা সহ্য হইয়া যায়, কিন্তু তাহাকে জড়াবস্থা ভিন্ন আর কিছুই বলিতে পারা যায় না। জড়ের যেমন বোধশক্তি নাই, তাহাদেরও তেমন ভালমন্দ বিচারশক্তি নাই। অতএব কাষ্ঠলোষ্ট্রাদির সহিত তাহাদের বিশেষ কি? তাহারা যে কথা কহে, গমন করে, তাহা, মায়াজীবীর দারুময়ী পুত্তলিকার তত্তৎক্রিয়ার ন্যায়, নামমাত্র ও অর্থশূন্য। সে যাহা বলে, তাহার সারবত্তা নাই, যাহা করে তাহার ঔচিত্য নাই এবং যাহা ভাবে তাহার পরিণাম নাই। কিন্তু জ্ঞানীর বাক্য, কার্য্য ও চিন্তা সমুদায়ই প্রশস্ত ও পরিণামসহ এবং ব্যবহার ও উদ্দেশ্যে পরিপূর্ণ। ইহাও জ্ঞানী অজ্ঞানীর অন্যতর বিশেষ। অথবা, জ্ঞানী মনুষ্যশরীরে দেবতা, অজ্ঞানী মনুষ্যশরীরে পশু। জ্ঞানী সাক্ষাৎ গৌরব, অজ্ঞানী মূর্ত্তিমতী লঘুতা এবং জ্ঞানী সাক্ষাৎ বিশুদ্ধি, অজ্ঞানী তাহার বিরোধীভাব।"

"রাজর্ষি বৃহদশ্ব অসামান্য প্রভাববলে অখণ্ডমেদিনীমণ্ডলের একচ্ছত্র প্রভু হইয়াছিলেন। তজ্জন্য তিনি নিরতিশয় উদ্ধত হইয়া, যথেচ্ছ ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইলে সমস্ত প্রজালোকে বিদ্রোহী হইয়া, তদীয় প্রাণসংহারের মন্ত্রণা করিতে লাগিল। তাহাতে তিনি তপোবনে পলায়নপূর্ব্বক গুরুদেবের শরণাপন্ন হইয়া, সমুচিত যুক্তি জিজ্ঞাসা করিলে, তদীয় গুরু মহর্ষি লোমপাদ মৃদুবচনে কহিলেন, বৎস! বিজ্ঞানের সেবা কর, তাহাতে সমদর্শিতা অভ্যস্ত হইলে, আশু উদ্ধার লাভ করিবে। কারণ, জ্ঞানী পুরুষ পিতার ন্যায়, সকলেরই ভক্তিশ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। এই পৃথিবী যদি শুদ্ধ একজনেরই ভোগ্যা হইতেন, তাহা হইলে সত্যপুরুষ পরমাত্মা কখনই ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীর নির্ম্মাণ করিতেন না। জ্ঞানের উদ্রেক হইলে, চন্দ্রোদয়ে পৃথিবীর ন্যায়, মনুষ্যের হৃদয় অতিমাত্র আলোকিত হয়। সে, সেই দিব্য আলোকে সুস্পষ্ট দেখিতে পায়, একজনের সুখসচ্ছন্দে জীবনযাপন করিবার জন্য যাহা প্রয়োজন, তাহার পরিমাণ অতি অল্প। সেই পরিমাণের অতিরিক্ত সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেই, আত্মার ব্যাঘাত হইয়া থাকে। এই ব্যাঘাত নানা প্রকারে সংঘটিত হয়। আকাঙ্ক্ষার ক্ষয় ব্যতিরেকে এবিষয়ে পরিহারপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। ঐ দেখ, একমাত্র সামান্য দূর্ব্বার উপরি চারিটী কীট কেমন সদ্ভাবে বিচরণ করিতেছে, প্রথমে একটী, অনন্তর তিনটী ইহার আশ্রয় লয়। অন্য আর একটী আসিয়া আগমা

হইতেই ফিরিয়া গিয়াছে। আমি একতান হৃদয়ে এতক্ষণ ইহাই দেখিতেছিলাম। এবং ভাবিতেছিলাম, ঈশ্বরের ব্যবস্থা ও মীমাংসা কি বিস্ময়াবহ! এবং সামান্য কীটেরও যে জ্ঞান আছে, মনুষ্যের তাহা নাই। মানুষ সমস্ত পৃথিবীর জন্য লালায়িত ও বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। অথচ, সামান্য গ্রামমাত্রেই তাহার ন্যায়, শত শত জীবন অনায়াসে পোষণ করা যাইতে পারে। এইজন্যই মনীষিগণ কহিয়াছেন, মানুষের জীবনে ভূত, প্রেত, রাক্ষস ও পিশাচাদির অংশ আছে। সে যে সময়ে সময়ে বিষয়লোভে অন্ধ হইয়া, হত্যা করে, হত্যাবৎ জুগুপ্সিত অনুষ্ঠান করে, এবং আত্মবিপরীত কার্য্য সকলেও প্রবৃত্ত হয়, ইহাই এবিষয়ে প্রমাণ। ইহারই নাম অজ্ঞানের প্রধান লক্ষণ।"

অতএব তুমি জ্ঞানের অনুবর্ত্তী হইয়া, নিশ্চয় অবধারণা কর যে, আদিতে একপিতা হইতে সকলের জন্ম হইয়াছে। অতএব জীবমাত্রেই পরস্পর আত্মীয়। যে ব্যক্তি জ্ঞানের প্রশস্ত পন্থা অবলম্বনপূর্ব্বক উল্লিখিত স্বভাবসিদ্ধ ভ্রাতৃভাবের উদ্ধার ও আলোচনা করে, সে নিঃসন্দেহ সকলের প্রিয় হয়। ফলতঃ, তুমি জ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়া সর্ব্বজীবে আত্মবৎ বুদ্ধি স্থাপন করিলে, দেখিতে পাইবে, সমুদায় সংসার তোমার বন্ধু ও অনুগত হইয়াছে। রাজর্ষি শবলাশ্ব অতিশয় জ্ঞানী ছিলেন। এবং সমদর্শিতার সহায়তায় সংসারের এরূপ হৃদয়গ্রাহী ও সকলের এরূপ প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন যে, শরীররক্ষী না লইয়াই, একাকী পদব্রজে যদৃচ্ছা বিচরণ করিতেন। যেখানে যাইতেন, তত্রত্য প্রজাগণ পরম অভীষ্টের ন্যায় তাঁহার পূজা ও সম্ভাবণ করিত।'

"অথবা জ্ঞানের স্থান স্বর্গে, অজ্ঞানের স্থান নরকে; জ্ঞানের স্থান শান্তিতে, অজ্ঞানের স্থান উদ্বেগে; জ্ঞানের স্থান স্বস্তিতে, অজ্ঞানের স্থান অসুখে; জ্ঞানের স্থান সাক্ষাৎ উন্নতিতে, অজ্ঞানের স্থান সাক্ষাৎ অধঃপাতে; জ্ঞানের স্থান মুক্তিতে, অজ্ঞানের স্থান চিরবন্ধনে; জ্ঞানের স্থান সম্পদে, অজ্ঞানের স্থান বিপদপরম্পরায়; এবং জ্ঞানের স্থান স্বভাবে, অজ্ঞানের স্থান সঙ্কটে।"

এই বলিয়া বৃহস্পতিশিষ্য বেদ নিবৃত্ত হইলে, ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্রহ্মন্! বিজ্ঞানের স্বরূপ পুনরায় সবিস্তার কীর্ত্তন করুন।"

বেদ কহিলেন, "জ্ঞান বিজ্ঞান উভয়ে সরস্বতীর মানসপুত্র। ঐ জ্ঞান বিজ্ঞানের জ্যোতিঃ এরূপ প্রকাশবিশিষ্ট যে, তদ্দ্বারা পরোক্ষ অপরোক্ষ সকল বিষয়ই সুস্পষ্ট লক্ষিত হইয়া থাকে। এই চক্ষু চক্ষু নহে, জ্ঞান বিজ্ঞানই প্রকৃত চক্ষু। যাহার এই জ্ঞান বিজ্ঞানরূপ চক্ষু নাই, সেই ব্যক্তিই অন্ধ। সংসার তাহার পক্ষে নিবিড় অন্ধকার। অন্যের কথা দূরে থাক, সে আপনার বিষয়েই অন্ধ। তাহাকে দাসের

স্থায়, বদ্ধের স্থায়, রুদ্ধের স্থায়, বন্দীর স্থায়, নিতান্ত পরাধীন হইয়া, যাবজ্জীবন অতিকষ্টে সংসারপথে পদচালনা করিতে হয়। ভয়, সন্দেহ, মোহ ও আশঙ্কা, প্রভুর স্থায়, নিয়ন্তার স্থায়, তাহার উপরি অসীম কর্তৃত্ব বিস্তার করে। ঈশ্বরের বিহিত এই মনোহারিণী সৃষ্টিও তাহার পরিপন্থিনী বলিয়া বোধ হয়। সে আপনার ছায়া দেখিয়াও ভীত ও সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। সান্নিপাতিকরোগীর স্থায় তাহার বাক্য সকল প্রলাপময়; মদিরামত্তের স্থায় তাহার কার্য্য সকল উন্মাদময়; পক্ষাহতের স্থায়, তাহার কার্য্যশক্তি অবসাদময়; সর্পদষ্টের স্থায় তাহার বুদ্ধিবৃত্তি প্রমাদময়; আসন্নমৃত্যুর স্থায় তাহার চিত্তবৃত্তি মোহময় এবং জ্বালাবিদ্ধের স্থায়, তাহার জিহ্বা দুর্নিবার জড়তাময়। উপদেবতা তাহার অধিষ্ঠাতা, জড় তাহার ইষ্টদেবতা এবং আকাশের নীল পীতাদি ক্ষণিক চিহ্নসকলও তাহার অদৃষ্টের নিয়ন্তা হইয়া থাকে।

"ব্যাসশিষ্য সুমন্ত বলেন, 'সে স্বপ্ন ও কল্পনাজাত বিষয় সকলও সত্য বলিয়া বোধ করে এবং তজ্জন্য যুগপৎ শোকে ও হর্ষে অভিভূত হয়। মহর্ষি অক্ষপাদ বলেন, স্বাধীন ও প্রশস্তচিত্তে শয়ন ভোজন প্রভৃতি অবশ্য কর্ত্তব্য বিষয় সকলও সম্পাদন করা তাহার পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠে। গ্রহগণ প্রতিদিন উদিত ও অস্তমিত হইতেছে; ধূমকেতু সর্ব্বদাই আকাশপথে যাতায়াত করিতেছে; সূর্য্য ও চন্দ্রের রাহুমুখে প্রবেশ ও পরিবেশ স্বভাবসিদ্ধ; মেঘ হইলেই বিদ্যুৎ বিস্ফুরিত হইয়া থাকে, ইত্যাদি প্রাকৃতিক সমুদায় ঘটনাই তাহার ভয়, উদ্বেগ ও চিন্তার বিষয় হইয়া থাকে। মহামতি মহর্ষি গৃৎসপাদ বলেন, অসত্তে সদ্ভ্রম, মিথ্যায় সত্যবোধ এবং ছায়ায় বস্তুজ্ঞান তাহার স্বভাবসিদ্ধ লক্ষণ। চন্দ্রে কলঙ্ক, মৃণালে কণ্টক, সমুদ্রে লবণতা, ইত্যাদি দর্শন করিয়া তাহার স্পষ্ট প্রতীতি হয়, বিধাতা স্বয়ং দোষময়; সেইজন্য তাঁহার সৃষ্টিও সর্ব্বদা অনর্থময়। এই সকল কারণে দুর্ভাগ্যের স্থায়, তাহার আশা ও আশ্বাস বদ্ধমূল হয় না; অবিশ্বস্তের স্থায়, তাহার আত্মজ্ঞান প্রস্ফুরিত হয় না; দুর্দৈবগ্রস্তের স্থায়, তাহার শান্তি উপজাত হয় না; কালকবলিতের স্থায়, তাহার বুদ্ধি প্রসন্ন হয় না; হতাশ্বাসের স্থায়, তাহার সৎপ্রবৃত্তি সঞ্চরিত হয় না; গ্রহাবিষ্টের স্থায়, তাহার মোহজাল নিরাকৃত হয় না; জড়ের স্থায়, তাহার চেতনা সমুদিত হয় না এবং অজ্ঞানবিদ্ধের স্থায় তাহার দুষ্প্রবৃত্তি বিগলিত হয় না। পাপ তাহাকে যেন বন্ধু ভাবিয়া আলিঙ্গন করে, বিষয়প্রীতি যেন আত্মীয় ভাবিয়া পরিগ্রহ করে, সংসারমমতা যেন প্রণয়ী ভাবিয়া পরিচর্য্যা করে, ইন্দ্রিয়সেবা যেন স্বকীয় ভাবিয়া আশ্রয় করে এবং মিথ্যাবুদ্ধি যেন মিত্র সুহৃৎ ভাবিয়া সর্ব্বদা আনুগত্য করে। সে যেন চিরকাল অন্ধকার হইতে অন্ধকারে, গহ্বর হইতে গহ্বরে, প্রান্তর হইতে প্রান্তরে এবং জঙ্গল

হইতে জঙ্গলে, পেচকের ন্যায়, সর্পের ন্যায়, ভেকের ন্যায়, অথবা সিংহব্যাঘ্রাদি ইতর পশুর ন্যায়, বাস করিয়া থাকে। তাহার আত্মা অশুচির ন্যায়, দেহ অপবিত্রের ন্যায়, মন নরকের ন্যায় এবং প্রবৃত্তি শ্মশানভূমির ন্যায়, সংসারের কোনরূপ ব্যবহারে আসিতে পারে না। সে যেমন জন্মের পূর্ব্বে অন্ধকারাস্বরূপ জননীগর্ভে বাস করিয়াছিল, জন্মের পরও সেইরূপ অন্ধ ও বদ্ধ অবস্থায় যাবজ্জীবন অবস্থান করিয়া থাকে। তাহার অজ্ঞানরজনীর প্রভাত নাই, মোহনিদ্রার অবসান নাই, প্রমাদরূপ বাল্যক্রীড়ার বিরাম নাই; এবং আত্মবিস্মৃতিরূপ সান্নিপাতিক জ্বরের বিশ্রাম নাই। সে যেমন আসিয়াছে, সেইরূপেই গমন করে, কেবল পর্ব্বত-প্রস্তরাদিবৎ বর্দ্ধিত হয় মাত্র। ভাবিয়া দেখিলে, জড়ের সহিত তাহার কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। জড়ের যেমন অন্তর বা বাহ্যজ্ঞান নাই, তাহারও সেইরূপ কিছুই নাই। সে জড়ের ন্যায়, আলোক প্রভৃতি সম্ভোগ করেমাত্র। তাহার স্থিতি বা মৃত্যুতে, সংসারের কোনরূপ ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। সত্য বটে, সে হস্তপদ ও চক্ষু প্রভৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু দারুময়ী পুত্তলিকার ন্যায়, তৎসমস্ত আড়ম্বর ও শোভামাত্র। সরস্বতী স্বয়ং অভিশাপ দিয়াছেন, যাহারা বিজ্ঞানের পরিচর্য্যায় পরাঙ্মুখ হইবে, তাহাদের বিদ্যাবুদ্ধি ও শিক্ষাদি সমুদায় নিষ্ফল হইবে।'

"বৃহস্পতি বলেন, 'সমুদায় সৃষ্টিই বিজ্ঞানময়। কার্য্যকারণময়ী অলৌকিক শক্তি ঐ বিজ্ঞানের লক্ষণ। এবং পরম পুরুষার্থময় বৈরাগ্য উহার চরম ফল। মনুষ্য উহা জানিলে দেবদেহ ও দেববুদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তখন সামান্য তৃণগুচ্ছে মদমত্ত গজরাজ ও সামান্য কেশসূত্রে পর্ব্বতরাজকেও বন্ধন করিতে তাহার শক্তি জন্মিয়া থাকে। লঘুতর বাষ্পযোগে গগনসাগর বিলোড়ন ও ভূধর সদৃশ মহাকায় ভারবান্ পদার্থ সকলকেও শূন্যে তৃণের ন্যায় উড্ডীন করা দুঃসাধ্য হয় না। যাহা সামান্য দৃষ্টিতে ক্ষুদ্র ও মহৎ বলিয়া প্রতীত হয়, অদ্ভুত ও অলৌকিক বলিয়া অনুমিত হয়, দুঃসাধ্য ও দুর্ব্বিলঙ্ঘ্য বলিয়া বিনির্ণীত হয়, বিজ্ঞানের নেত্রে তাহা অতি সূক্ষ্ম পরমাণুর ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া থাকে। বিজ্ঞানী পুরুষ স্পষ্টই দেখিতে পান, লোকে যাহাকে বহুমূল্য বা অমূল্য রত্ন বলিয়া, সবিশেষ আদর ও বহুমান প্রদর্শন করে তাহা দগ্ধ অঙ্গারাদি অতি ঘৃণ্য ও জঘন্য পদার্থ হইতে ভিন্ন নহে। এই জন্য লোষ্ট্রে ও কাঞ্চনে, চন্দনে ও পুরীষে, শত্রু ও মিত্রে তাঁহার অভেদদৃষ্টি আপনা হইতেই প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। এই সাগরাম্বরা মেদিনী, মনুষ্য যাহাকে অসীম বলিয়া কল্পনা করে, এবং যাহার এক এক ক্ষুদ্র অংশের জন্য প্রাণত্যাগ পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়া থাকে, বিজ্ঞানীর বিশাল চক্ষে ব্রহ্মাণ্ডের পরিগণনায় তাহা অণুরও অণু বলিয়া প্রতীত হয় না।'

"বৎসরাজপুত্রী সুমতি স্বীয় পুত্র সত্যকেতুকে অর্থলোভে অধীর দেখিয়া কহিয়াছিলেন, 'বৎস! তুমি সরস্বতীর প্রিয়পুত্র মহাপ্রভাব বিজ্ঞানের সেবা কর; অনর্থময়ী অর্থলালসা তোমাকে আর ঘূর্ণায়মান করিতে পারিবে না। বিজ্ঞানের আশ্রয় লইলে, সুস্পষ্ট দেখিতে পাইবে, ধন অতি জঘন্য ও সঙ্কটময়। যে পদার্থ যেরূপ, তাহা প্রায় তদনুরূপেই লাভ, প্রাপ্ত ও অধিষ্ঠিত হইয়া থাকে। কেন না, কার্য্য কারণের অনুগামী। পর্ব্বতগহ্বর, নদীবালুকা, শ্ববৃত্তিসেবা, প্রতারণা, চৌর্য্য ও দস্যুবৃত্তি, ইত্যাদি সঙ্কটসঙ্কুল জঘন্য স্থল ও উপায় সকল ধনের উৎপত্তি, প্রাপ্তি ও অবস্থিতি স্থান। এইজন্য ধন বিবিধ অনর্থের উৎপাদন করে। গুরুদেবমুখে বারম্বার শ্রবণ করিয়াছি, ভগবতী বসুন্ধরা মনুষ্যের ভারে নিতান্ত কাতরভাবাপন্না হইয়া, সবিনয়ে পিতামহগোচরে আত্মত্রাণ প্রার্থনা করিলে, তিনি কহিয়াছিলেন, আমি সৃষ্টি করিয়া, কখন সংহার করিতে পারি না। এ বিষয়ে সর্ব্বসংহর ভগবান্ রুদ্রই তোমার প্রমাণ। বসুন্ধরা কহিলেন, তবে, আমারে কেন বিনাশ করিতেছেন? পিতামহ অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া, নিয়তির সৃষ্টি ও প্রেরণা করিলেন। নিয়তি কহিলেন, যেহেতু, মনুষ্য সৃষ্টিসংবন্ধে আমার ভ্রাতা, সেইহেতু, নিমিত্ত বা উপলক্ষ ব্যতিরেকে তাহাকে কদাচ সংহার করিতে পারিব না। তখন পিতামহ লক্ষ্মীকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, তোমাকে নিয়তির সহায় হইতে হইবে। তাহাতে, পরম মায়াবিনী লক্ষ্মী আপনার অংশে নিধনানাম্নী মায়ার সৃষ্টি করিলেন। দুর্বুদ্ধি মনুষ্য উহাকেই ধন বলিয়া থাকে। লক্ষ্মী সাক্ষাৎ নারায়ণের অংশভাগিনী। তাঁহার আবিষ্কৃত মায়া সহজে অবগত হওয়া বা অতিক্রম করা কাহারও সাধ্য নহে। দেবগণও এবিষয়ে পরিহার স্বীকার করিয়া থাকেন। বৎস! তুমি বিজ্ঞানের সেবা কর, আমার বাক্যার্থ সম্যক্ প্রতীতি করিবে।'

"সুমতি পুনরায় কহিলেন, 'বৎস! প্রকৃতি স্বয়ং অভিশাপ দিয়াছেন, যে ব্যক্তি যে পরিমাণে বিজ্ঞানসেবায় পরাঙ্মুখ, সে সেই পরিমাণে পরাধীন হইবে। আবার, যে ব্যক্তি যত পরাধীন, তাহার সুখসাচ্ছন্দ, আশা, উৎসাহ ও জীবনপ্রভৃতিও ততই ক্ষণভঙ্গুর ও অচিরস্থায়ী হইবে। মনুষ্যের কথা দূরে থাক, সামান্য তৃণ লতাদিরও এবিষয়ে পরিহার নাই। দেখ, বৃক্ষ তৃণাদি অরণ্যাদিতে স্বয়ং যেরূপ সতেজে বর্দ্ধিত হয়, মনুষ্যাদির আশ্রয়ে আসিলে, কখনই সেরূপ সমৃদ্ধিসম্পদ লাভ করিতে পারে না। পশুপক্ষ্যাদি গুহাকোটরাদিতে বিচরণ বা অবস্থান করিয়া, যেপ্রকার দীর্ঘজীবন বা সুখসাচ্ছন্দ্য সম্ভোগ করে, স্বর্ণের পিঞ্জরাদিতেও বদ্ধ হইলে, কদাচ সেপ্রকার আনন্দাদি অনুভব করিতে পারে না। এই সকল পর্য্যালোচনা করিলে,

স্বাধীনতাই জীবন এবং পরাধীনতাই মৃত্যু বলিয়া উপলব্ধি হয়। বৎস! স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখ, বৃক্ষলতাদির মূল ও মনুষ্যের হস্তপদ প্রভৃতি কিজন্য কল্পিত হইয়াছে, এবং কিজন্য শাখা প্রশাখা ও বুদ্ধিপ্রভৃতির সৃষ্টি হইয়াছে? ফলতঃ, পরাধীনতা অমানুষকল্পিত বন্ধনস্বরূপ, অরোগকল্পিত বিকারস্বরূপ, অদণ্ডকল্পিত কারাস্বরূপ এবং অভূতকল্পিত শাপস্বরূপ। মনুষ্যকল্পিত পাশাদি দ্বারা হস্তপদাদিই বদ্ধ হইয়া থাকে, মন বা ইচ্ছাপ্রভৃতি কথন বদ্ধ হইতে পারে না; কিন্তু পরাধীনতা সকল বন্ধনের হেতু। যাহারা অহোরহ প্রভুর দ্বারে সেবা করে, তাহাদের হস্তপদপ্রভৃতি যেরূপ বিনা শৃঙ্খলে বদ্ধ, মনোরথ ও ইচ্ছাপ্রভৃতিও সেইরূপ বিনাপাশে সংযত দেখিতে পাওয়া যায়। আমি বারম্বার বলিতেছি, তুমি বিজ্ঞানের সেবা কর, স্বাধীনতা আপনা হইতেই তোমাকে আশ্রয় করিবে। সংসারে মহান্ পদার্থমাত্রেই স্বাধীন। সেইজন্য, তাহাদের তেজের সীমা নাই। জল, অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত।'

মহাভাগ শুক্রাচার্য্য বলিয়াছেন, "যাহার স্বাধীনতা নাই, তাহার মোক্ষ নাই। যাহার মোক্ষ নাই, তাহার ঈশ্বরপ্রাপ্তি নাই। স্বাধীনতা জীবনীশক্তি সমুদ্দীপিত করে। নদীপ্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত। স্রোতস্বিনী পর্ব্বতপ্রভৃতি হইতে নির্গত হইয়া, যে দিকে আপনি প্রবাহিত হয়, কোন রূপে তাহার পরিবর্ত্ত করিয়া দিলে, সেই প্রবাহ কালসহকারে রুদ্ধ হইয়া যায়। কুল্যা বা কৃত্রিম নদী সকল এই কারণেই বহুদিনস্থায়িনী হইতে পারে না। মেঘ বলবান্ হইয়া, কোনরূপে প্রতিচ্ছন্ন করিলে, সর্ব্বভুবনপ্রকাশক দিবাকরও মলিন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন। চন্দ্র স্বয়ং স্বাধীন নহেন, দিবাকরকিরণের অনুপ্রবেশ বশতঃ তাঁহার ঐরূপ জ্যোতিঃ লক্ষিত হয়। এইজন্য সূর্য্যের ন্যায় তাঁহার নিত্য উদয় দেখিতে পাওয়া যায় না। একমাত্র স্বার্থপরিত্যাগই স্বাধীনতার হেতু। যাহার আশা নাই, বাসনা নাই, কাম নাই এবং তজ্জন্য ক্রোধ, হিংসা ও দ্বেষাদিরও সম্ভাব নাই, কে তাহাকে বন্ধন করিতে পারে?"

'অগ্নি ভস্মাচ্ছাদিত হইলেও, অনাস্কন্দ্য, সূর্য্য মেঘান্তরিত হইলেও নমস্য এবং জল পঙ্কশেষ হইলেও, পরম পরিগ্রাহ্য হইয়া থাকে। স্বাধীনতামূলক মাহাত্ম্যই ইহার কারণ। এইজন্য বারবার বলিতেছি, বিজ্ঞানের সেবা করিয়া স্বাধীন হও। তাহা হইলে, দেখিতে পাইবে, তোমার এই দেহ নবীকৃত এবং আত্মা ও বুদ্ধিও নবীকৃত হইয়াছে। অধিকন্তু, তৎসমকালেই তোমার দৃষ্টি প্রভৃতিও নবীকৃত হইয়াছে, স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিবে। শুকদেব তাণ্ডরি বলিয়াছেন, "যাহাদের এই মর্ত্ত্যলোকে মর্ত্ত্যদেহে অবস্থিতি করিয়া, চন্দ্রলোকে, সূর্য্যলোকে, নক্ষত্রলোকে

এবং অন্যান্য লোকসমুদায়ে পর্য্যটন করিবার অভিলাষ আছে, তাহারা বিজ্ঞানের সেবা করিবে। বিজ্ঞান সহায় হইলে, মৃত্যুও সহসা আক্রমণ করিতে পারে না। বিজ্ঞানপ্রভাবে চক্ষু এরূপ তেজঃপুঞ্জ হয় যে, সূর্য্য ও চন্দ্র এবং পর্ব্বত ও পরমাণুও সমভাবে দর্শন করিতে পারা যায়। হস্ত এরূপ দৃঢ় হয় যে, সমুদ্র ও সরোবর, গৃহ ও মেরুশৃঙ্গ, বন ও উদ্যান, আকাশ ও ধরাতল সমভাবে আলোড়ন ও অবগাহন করিতে পারা যায়। ত্বক্‌ এরূপ অলৌকিক শক্তিবিশিষ্ট হয় যে, অগ্নি ও জল, সূচি ও তূলিকা, ভস্ম ও চন্দন, সমভাবে স্পর্শ করিতে পারা যায়। জিহ্বা এরূপ নবীকৃত হয় যে, বিষ ও অমৃত, কটু ও তিক্ত সমভাবে আস্বাদ গ্রহণ করিতে পারা যায়। ফলতঃ, বিজ্ঞানপ্রভাবে লোকের সমুদায় ইন্দ্রিয় ও সমুদায় বৃত্তিই কামপ্রভাব, কামরূপ ও কামগতি হইয়া থাকে। অথবা বিজ্ঞানের গতি সত্যের দিকে, অভিমুখতা স্বর্গে, দৃষ্টি তমঃপারে এবং অভিলাষ প্রকৃতিতে। বিজ্ঞান বরদাতা ও রক্ষাকর্ত্তা। অতএব তুমি তাহার সেবা কর।

(ক্রমশঃ।)

শ্রীরোহিণীনন্দন সরকার।

চার্লস্ রবার্ট ডারুইন্‌। *

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

আমরা ডারুইনের জীবনের ঘটনাপরম্পরা সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছি এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চরিত্রেরও কতকটা আভাস পাওয়া গিয়াছে। এক্ষণে তাঁহার চরিত্রসম্বন্ধে আরও গুটিকতক কথা বলিবার অভিলাষ আছে।

সুধীশ্রেষ্ঠ ডারুইন্‌ সকল গৌরবের স্থলীভূত এই উনবিংশ শতাব্দীর পণ্ডিতসমাজের অগ্রণী ছিলেন, বলিলে তাঁহার অপরিমেয় চিত্তোৎকর্ষের যথোচিত পরিচয় হইল না। ডারুইনের চিত্তসৌভাগ্য তাঁহার অতুল পাণ্ডিত্যেই নিঃশেষিত হয়

---

* গত সংখ্যায় প্রসঙ্গক্রমে ডারুইনের বর্ণোৎপত্তি বিষয়ক মতের যে অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন (Natural Selection) ও যোগ্যের জয় (Survival Of the Fittest) এই দুইটীকে স্বতন্ত্র বলিয়া উল্লেখ করা গিয়াছে; কিন্তু বাস্তবিক ইহারা স্বতন্ত্র নহে,—ইহারা উভয়ে একই প্রণালীর নামান্তর মাত্র; তবে শেষটীকে প্রথমটির ফল বলিলেও বলা যায় এবং [illegible] বলিয়া আমরা দুইটিকে স্বতন্ত্র করিয়া উল্লেখ করিয়াছিলাম।

নাই ; তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে দয়াদাক্ষিণ্যাদি মনোবৃত্তিও সমুচিত স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছিল, এবং তাহাতেই তাঁহার জীবন এক অনির্ব্বচনীয় কোমল গম্ভীর শোভায় শোভিত হইয়াছে। ডারুইনের জীবনে অনেক সৌন্দর্য্য ও গৌরবের বিষয় আছে ; কিন্তু তৎসমুদায়ের মধ্যে তাঁহার চরিত্রসৌন্দর্য্যই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ডারুইন্ অমানুষী বুদ্ধিবৃত্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিলেও তাঁহার বিনয়াবনত ভদ্রতাই তাঁহার চরিত্রের সর্ব্বোজ্জ্বল ভূষণ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। এই মহাভাগের সুগভীর জ্ঞান ও ধর্ম্মানুমত সৌজন্য অতিসংক্ষেপে বর্ণন করিতে হইলে, ইংরেজিতে (Sublime) বলিলেই যথেষ্ট হইতে পারে, এবং বাঙ্গালায়, কথার অসম্ভাবপ্রযুক্ত, 'ঋষিতুল্য' বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে বোধ হয় অযথা হয় না। * বাস্তবিকই ডারুইনের চরিত্রমাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে সংসারে যাহা কিছু মহৎ ও যাহা কিছু সুন্দর তৎসমুদায়ের একত্র সমাবেশ কল্পনা করা আবশ্যক। যদি হিমালয়ের বপুর্গৌরব কিম্বা মহাসমুদ্রের প্রশান্ত-গাম্ভীর্য্যের সহিত ফল-ভর-নত পাদপের বিনম্রভাব ও প্রফুল্ল-মুখকান্তি শিশুর চিত্তসৌকুমার্য্য একাধারে সম্মিলিত হওয়া সম্ভাবিত হয়, তাহা হইলে ডারুইনের অপূর্ব্ব চরিত্রের কতকটা আভাস পাওয়া যাইতে পারে ;—নতুবা এরূপ চরিত্র বর্ণনাতীত। †

সত্যান্বেষণই ডারুইনের জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল ; এবং এই মহাব্রত পালনার্থ তিনি শুদ্ধসত্য ব্যতিরেকে আর কিছুরই প্রতি লক্ষ্য রাখেন নাই। বিজ্ঞানচর্চ্চা দ্বারা তিনি কখন পার্থিব উন্নতির প্রত্যাশা রাখেন নাই ; স্বার্থসিদ্ধি কিম্বা আত্মগরিমা তাঁহাকে বিজ্ঞান পথের পথিক করে নাই ;—কেবল একমাত্র সত্যের অনুরোধেই তিনি বিজ্ঞানের অনুসরণ করিয়াছিলেন। এই নিমিত্তই তাঁহার সত্যানুসন্ধানপদ্ধতি এক নূতন পথগামী হইয়াছে। ইনি যে কোন তত্ত্বের অনুশীলনে

* "It is impossible to convey in words any adequate conception of a character which in beauty as in grandeur can only, with all sobriety, be called sublime." —*Nature*, May 18th 1882.

† "Whatever is great and whatever is beautiful in human nature found in him so luxuriant a development, that no place or chance was left for any other growth, and in the result we beheld a magnificence which, unless actually realized, we should scarcely have been able to imagine. Any attempt, therefore, to describe such a character must be much like an attempt to describe a splendid piece of natural scenery or a marvellous work of art ; the thing must itself have been seen if any description of it is to be understood."—*Nature*, May 18th 1882.

প্রবৃত্ত হইয়াছেন প্রথমে সেই বিষয়ে কতদূর কি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা সবিশেষ জ্ঞাত হইবার চেষ্টা করিয়াছেন ; এবং তৎসম্বন্ধে স্বীয় পর্য্যবেক্ষণের ফল প্রকাশকালে তাঁহার পূর্ব্বগত পণ্ডিতগণের উদ্ভাবিত তত্ত্বাবলি যথাযথ বিবৃত করিয়াছেন। পাছে তাঁহার নিজের উদ্ভাবিত সত্যের গৌরবহানি হয় বলিয়া তিনি কখন অন্যের আবিষ্কৃত তত্ত্বের সমুচিত সমাদর করিতে ত্রুটি করেন নাই। তিনি যখনই কোন বিষয়ে পূর্ব্বে কোন ব্যক্তি তাঁহার অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছে বলিয়া জানিতে পারিয়াছেন, তখনই তাহা পরমপ্রীতির সহিত স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার কৃত (Origin of Species) গ্রন্থের গোড়ায় তিনি বর্ণোৎপত্তিবিষয়ক মতের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সন্নিবেশিত করিয়াছেন, এবং তাহাতে তাঁহার পূর্ব্বে বাফন্ (Buffon) হইতে আরম্ভ করিয়া অন্যূন পঞ্চবিংশতি জন পণ্ডিতের তাঁহার সদৃশ মতপ্রকাশ করার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা যে কেবল তাঁহার উদারতা ও সত্যপ্রিয়তার পরিচায়ক তাহা নহে, আমাদের বোধ হয়, ইহা তাঁহার প্রকৃতির একটি বদ্ধমূল সংস্কারের ফল ; তাঁহার পরিণতিবাদ দর্শনের অন্যতম প্রমাণ। জীবজগতে যেমন সহসা কোন নূতন ও প্রকৃষ্ট জীবের উৎপত্তি সম্ভাবিত নহে বলিয়া তাঁহার হৃৎপ্রতীতি জন্মিয়াছিল, ভাবজগতেও সেইরূপ কোন অভিনব প্রশস্তভাবের এককালীন উদ্ভব অস্বাভাবিক বলিয়া তাঁহার নিশ্চয় জ্ঞান ছিল। নরহত্যাকারী মহাপাপাচারী রত্নাকর ক্রৌঞ্চমিথুনের দুর্দ্দশা সন্দর্শনে কাতর হইয়া নিমেষ মধ্যে কবিকুল-গুরু বাল্মীকি রূপে পরিণত হইয়াছিলেন, অথবা স্বচ্ছন্দে উদ্যানবিহারী নিউটন একটিমাত্র ফল বৃক্ষচ্যুত হইতে দেখিয়া বিপুলকায় মাধ্যাকর্ষণের আবিষ্কার করিয়াছিলেন, বলিয়া যে লোকপ্রবাদ প্রচলিত আছে, তাহা কেবল কবিকল্পনাপ্রসূত অলীক উপকথা ভিন্ন আর কিছুই নহে। কোন একটি মহাকাব্য কি মহাদর্শন এক দিনে উৎপন্ন হয় না। বহুকাল হইতে বহুজন দ্বারা ইহার শরীরপুষ্টি সাধিত হইতে থাকে, এবং যথাকালে একজন প্রতিভা সম্পন্ন ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়া ইহাকে নূতন লাবণ্যে বিভূষিত করেন। ডারুইনের পরিণতিবাদ সম্বন্ধেও ঠিক্ তাহাই ঘটিয়াছে। তাঁহার বহুপূর্ব্ব হইতে অনেক চিন্তাশীল পণ্ডিত স্ফুট বা অস্ফুটরূপে জীবোৎপত্তি সম্বন্ধে তাঁহার মতের সদৃশ মতপ্রকাশ করিয়াছিলেন ; যদিও তাহার পূর্ণবিকাশ ডারুইনের প্রতিভা ব্যতিরেকে সাধিত হয় নাই। এইরূপে মত বিশেষের পুষ্টিসাধন, ও পরে পূর্ণবিকাশ, পরিণতিবাদমূলক সাধারণ নিয়ম বলিয়া ডারুইন্ সম্পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন। তাহাতেই আমরা বলিয়াছি, ডারুইন্ যে, তাঁহার পূর্ব্বগত পণ্ডিতগণের আবিষ্কৃত তত্ত্বাবলি প্রীতির সহিত স্বীকার করিয়াছেন, তাহা কেবল তাঁহার উদারতার পরিচয় নহে, তাহা তাঁহার প্রকৃতির একটি বদ্ধমূল সংস্কারের ফলও বটে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সত্য আবিষ্কার করাই ডারুইনের জীবনের মূল উদ্দেশ্য এবং তজ্জন্য তিনি পরিশ্রম স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত ছিলেন না। আমাদিগের মনে রাখা উচিত যে, তাঁহার বর্ণোৎপত্তিবিষয়ক মত দ্বাবিংশতি বৎসরের (১৮৩৭-১৮৫৯) নিরবচ্ছিন্ন পরিশ্রমের ফল; এবং তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত একাদি-ক্রমে তিনি উহারই তথ্যানুসন্ধানে নিযুক্ত ছিলেন। সেই হেতু তাঁহার পরি-ণতিবাদ দর্শনের কোথায় কি অসম্পূর্ণ আছে তাহা তিনি স্বয়ং যতদুর অবগত ছিলেন, ততদুর আর কেহই অবগত ছিলেন না। ফলতঃ তাঁহার পরিণতিবাদ মতপ্রকাশের পর অনেক সুযোগ্য প্রাণিতত্বজ্ঞ পণ্ডিত তৎসম্বন্ধে নানা আপত্তি উত্থাপন করেন; কিন্তু ডারুইন্ সেই সমুদয়ের পূর্ব্বসূচনা করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য সেই সকল আপত্তি খণ্ডন করা তাঁহার পক্ষে বিশেষ কঠিন ব্যাপার হয় নাই। তথাপি তাঁহার মত সম্বন্ধে যে অনেক আপত্তি উঠিবার সম্ভাবনা ছিল ইহা তিনি পুনঃ পুনঃ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন, এবং উত্থাপিত আপত্তি সকলের যথোচিত মীমাংসা করিতেও ত্রুটি করেন নাই। *

ডারুইনের ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় অপরিমেয়; ফলতঃ, জগতে যে কেহ যে কোন বিষয়ে কৃতার্থতা লাভ করিয়াছে, তাহারই ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের সীমা নাই। কথিত আছে এক দিবস মহাত্মা নিউটন তাঁহার পাঠগৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে তাঁহার কুকুর প্রদীপ উল্টাইয়া ফেলিয়া দেওয়ায় তাঁহার টেবিল স্থিত কাগজ পত্র সমুদয় পুড়িয়া গিয়াছে; ঐসকল কাগজ পত্রে তাঁহার বহুদিনের বহু আয়াসের গণনার ফল লিখিত ছিল। ইহাতে ধীর প্রকৃতি নিউটন কিছুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ না করিয়া অজ্ঞান কুকুরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"তুমি আজ আমার সমূহ ক্ষতি করিয়াছ"।—এই বলিয়া পুনরায় সেই সমুদায় দুরূহ বিষয়ের অঙ্কপাত করিতে বসিলেন। এতদ্দ্বারা এই মহাত্মা এক কালে ধৈর্য্য, অধ্যবসায়, ক্ষমা প্রভৃতি অশেষ সদ্‌গুণের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন। বলিতে পারি না ডারুইনের ঐ সকল

* তাঁহার মত সম্বন্ধে যে কোন আপত্তি উঠিতে পারে কিম্বা উঠিয়াছিল তৎসমুদায়ের একটী স্বতন্ত্র বিচার তাঁহার Origin of Species গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে এবং সেই স্থলে তিনি লিখিয়াছেন—"Long before the reader has arrived at this part of my work, a crowd of difficulties will have occurred to him. Some of them are so serious that to this day I can hardly reflect on them without being in some degree staggered.........That many and serious objections may be advanced against the theory of descent with modification through variation and natural selection, I do not deny. I have endeavoured to give them their full force."

সদ্গুণ ঠিক সেই পরিমাণে ছিল কিনা ; কিন্তু ইঁহার অনুশীলন প্রণালী আলোচনা করিলে, ছিল না বলিয়া কখনই বোধ হয় না। কতক্ষণে একটি ক্ষুদ্র মক্ষিকা মধুলোভে অন্ধ কিম্বা রূপে বিমুগ্ধ হইয়া একটি পুষ্প হইতে পুষ্পরেণু বহন করিয়া অপর একটি ফুলবধূকে ফলবতী করিতেছে ; কি রূপে সকলের পরিত্যক্ত অরণ্য লতা ধীরে ধীরে আপনার সুকোমল দেহ নিকটস্থ বৃক্ষাদিতে জড়াইয়া জড়াইয়া তুলিতেছে, আবার নিষ্ফলযত্ন হইলে অন্যত্র আশ্রয়ের পন্থা দেখিতেছে ; কি প্রকারে ড্রসেরা (Drosera) কিম্বা ডাইওনীয়া (Dionæa) মূঢ়মতি পতঙ্গ কুলকে আকৃষ্ট করিয়া তাহাদের প্রাণবধপূর্ব্বক উদরসাৎ করিতেছে ; ইত্যাকার যে কোন অদ্ভুত ব্যাপারের রহস্য ভেদে ডারুইনকে নিযুক্ত দেখিনা কেন, সর্ব্বত্রই তাঁহার অমিত ধৈর্য্য ও অসঙ্কুচিত অধ্যবসায়ের পরিচয় পাওয়া যায়।

ডারুইনের সৌজন্যের বিষয় আমরা প্রথমেই উল্লেখ করিয়াছি। ইঁহার সৌজন্য সমাজবন্ধনপ্রয়োজিত আয়াস সিদ্ধ সৌজন্য ছিল না। ইঁহার সৌজন্য প্রকৃতিগত অকৃত্রিম সৌজন্য। * ইনি সুগভীর জ্ঞানী হইলেও বালকের ন্যায় সরলমতি ছিলেন। একজন মহামহোপাধ্যায় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের সহিত তিনি যেরূপ ভাবে কথোপকথন করিতেন, সামান্য একজন নব্য ব্যক্তি যে এখনও বিজ্ঞানের বর্ণমালা শিখিতে পারে নাই, তাহার সহিতও তিনি সেইরূপ প্রীতি ও সহৃদয়তার সহিত কথোপকথন করিতেন। ইহা দেখিয়া নবাগত ব্যক্তি বিস্মিত হইয়া মনে করিতেন যে এতদ্রূপ বিনীত আচরণ বুঝি কৃত্রিম হইবে। কিন্তু বাস্তবিক ইহাতে কৃত্রিমতার লেশ ছিলনা ; ইহা তাঁহার অহঙ্কারশূন্যতার ফল মাত্র। তিনি পণ্ডিত সমাজের মহাগুরু হইয়াও কখন আপনাকে বড় বলিয়া জানেন নাই।

ডারুইনের দয়ারও শেষ ছিল না। তিনি অন্যের কার্য্যে সহায়তা করিতে ভাল বাসিতেন, এবং উপদেশ দ্বারা নব্য বৈজ্ঞানিকের জ্ঞান লালসা বর্দ্ধন করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিতেন। ইঁহার গুরুভক্তিও অচলা ছিল ; ইঁহার লিখিত একখানি পত্রে ইঁহার শিক্ষাগুরু সুবিখ্যাত প্রোফেসর হেন্স্লোর (Professor Henslow) যে স্তুতিবাদ করিয়াছেন তাহাতে যুগপৎ ভক্তি, স্নেহ ও কারুণ্য রস ঢালিয়া দিয়াছেন। (১৮ই মে তারিখের Nature দেখ।)

ইঁহার সুগভীর জ্ঞান, সুকোমল প্রকৃতি, অশেষ অকৃত্রিমতা ও দয়া এবং

* "In him the man of science and the philosopher were subordinate to the gentleman",—*Nature.*

প্রকৃতিসিদ্ধ অহঙ্কারশূন্যতা দেখিয়া কাহার মন না ভক্তিরসে আর্দ্র হয়। এরূপ সুন্দর চরিত্রচ্ছবি জগতে কয়টি মিলিয়া থাকে!

শ্রীনগেন্দ্রনাথ ধর।

তত্ত্বসংগ্রহ।

১। অতিসুন্দর ও মধুর কমলালেবুর ছাল যে, কোন কীটাদির আবাসভূমি একথা বোধহয়, কেহ স্বপ্নেও মনে করেন না। কিন্তু বাস্তবিক কমলালেবুর ছালের উপর Coccus বংশীয় একপ্রকার কীটাণু স্বচ্ছন্দে জ্ঞাতিবন্ধুতে পরিবেষ্টিত হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। কমলালেবুর ছালের প্রতি বিশেষ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে তাহার চারিদিকে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কটারঙ্গের দাগ (Brownish scarlet spots) দেখিতে পাওয়া যাইবে। ঐরূপ একটি কটারঙ্গের বিন্দু, ছুঁচের অগ্রভাগ দিয়া সহজেই খুঁটিয়া লওয়া যায়, এবং যাঁহার একটি সামান্য রকমের অনুবীক্ষণ যন্ত্র (Microscope) আছে, তিনি সূচ্যগ্রস্থিত বিন্দুটুকু লইয়া অনুবীক্ষণের সম্মুখে স্থাপিত করিয়া তাহার প্রতি নিরীক্ষণ করিলে দেখিতে পাইবেন, বহুসংখ্যক অতিক্ষুদ্র সাদা সাদা বাদামে (Oval) আকারের ডিম্ব থাড়াভাবে অবস্থিত আছে এবং হয়তো তাহার মধ্যে দুই চারিটি ডিম্বভেদ করিয়া কীট-সন্ততি বাহির হইতেছে। ডিম হইতে বাহির হইবার পরেই স্ত্রীকীটাণুগুলির ছয়টি পা ও দুইটি লম্বাচুলের ন্যায় শুঁড়ো দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু পাখা থাকে না; ইহারা শীঘ্র-কমলালেবুর ত্বকে শোষক দাড়া (Sucker) বিদ্ধ করিয়া আহার্য্য রস টানিতে থাকে, এবং সেস্থান হইতে আর অন্যত্র গমন করে না; সেইখানেই ডিম্ব প্রসব করে এবং অবশেষে জরাজীর্ণ হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। পুরুষাকার কীটাণুগুলি কিছুকাল গুটীর মধ্যে (Chrysalis) থাকিয়া পরে বাহির হইয়াই উড়িয়া যায়। ইহাদের পাখাগুলি ইহাদের দেহ অপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ লম্বা; ইহাদের প্রত্যেকের চারিটি করিয়া চক্ষু ও দুইটি শুঁড়ো আছে, এবং ইহারা এতক্ষুদ্র যে, যখন উড়িতে থাকে তখন দৃষ্টিগোচর হয় না। আমাদের পাঠকদিগের মধ্যে যাঁহার অনুবীক্ষণযন্ত্র আছে, তিনি কিয়ৎক্ষণ কমলালেবুর ছাল লইয়া পরীক্ষা করিলে পরম প্রীতিলাভ করিবেন, সন্দেহ নাই।

——(Chambers's Journal, June, 1882).

২। বহুজ্ঞ "হিন্দুপেট্রিয়ট" আমাদের দেশে তামাকুর চাষ, বিজ্ঞান অনুমত

বিধি-অনুসারে, বহুলরূপে প্রবর্ত্তিত হওয়া বিধেয় বলিয়া পুনঃ পুনঃ মতপ্রকাশ করিয়াছেন। পেট্রিয়ট বলেন যে তামাকুর চাষে ৫০ একার (অর্থাৎ প্রায় ১৫০ বিঘা) ভূমিতে ন্যূনকল্পে খরচ খরচাবাদে বাৎসরিক ২০০০৲ টাকা আয় হইতে পারে, অর্থাৎ মাসে প্রায় পৌনে দুইশত টাকা। ইহাতে একজন সুশিক্ষিত ভদ্রসন্তান কিছু মূলধন লইয়া অনায়াসে জীবিকানির্ব্বাহ করিতে পারেন; এবং জমির পরিমাণ বাড়াইতে পারিলে আরও সুবিধা হয়, সন্দেহ নাই। আকের চাষও যে বিশেষ লাভজনক তৎসম্বন্ধে সম্প্রতি উক্ত পত্রে একপ্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট হইতে যে সম্প্রতি রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তদ্দ্বারা আজি কালি আমাদের দেশে আকের চাষের কিরূপ অবস্থা তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। মরিশুস্ (Mauritius) ও ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়া (West Indies) দ্বীপের আকের চাষের তুলনায় আমাদের আকের চাষ অতি-হীন। মরিশুসে অতি-উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রথা-অনুসারে চাষ হইয়া থাকে, এবং আমাদের দেশেও ঐরূপ প্রথা প্রচলিত হওয়া যে সর্ব্বতোভাবে বিধেয়, তাহা শাহাবাদের (Messrs Burrows, Thompson, Mylne) এবং কোম্পানি প্রতিপন্ন করিয়াছেন। উক্ত কোম্পানি মরিশুসের পদ্ধতি-অনুসারে দেশী-আকের চাষ করিয়া এতবড় আক তৈয়ারি করিয়াছেন যে, চাষীলোকেরা ইহাকে দেশীআক বলিয়াই বিশ্বাস করে না; তাহারা বলে যে নিঃসন্দেহই ইহা কোন এক ভিন্ন বড় জাতীয় আক হইবে। এই পরীক্ষায় উক্ত কোম্পানি ততদূর উর্ব্বরা ভূমি লয়েন নাই এবং ততদূর যত্ন করিতেও পারেন নাই; যদি ভূমি আরও উত্তম হইত এবং আরও অধিক যত্ন করা যাইত, তাহা হইলে আকের পরিমাণ ও গুণ উভয় সম্বন্ধেই আরও ভাল ফল পাওয়া যাইত সন্দেহ নাই। অন্যান্য দেশে যেখানে ভাল চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে, সেখানে ১ একার (অর্থৎ প্রায় ৩ বিঘা) জমিতে ২৫ হইতে ৩০ টন করিয়া আক উৎপন্ন হয়; কিন্তু আমাদের দেশে খুব বেশী হইলতো ১৫ কি ২০ টন আক জন্মিল, এবং অন্যান্য দেশে প্রতি একারে ২৷৷০ কি ৩ টন (১ টনে ২৭ মণ হইবে) চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে, কিন্তু ভারতবর্ষে গড়ে খুব জোর ২৫ মণ চিনি প্রস্তুত হয়। যদিও আজি কালি অনেকপ্রকার গণ্ডীগাছ চলিত হইয়াছে বটে, তথাপি আমাদের চিনি প্রস্তুত করিবার প্রণালী এখনও অনেক হীন। আমাদের দেশে আক মাড়িয়া শতকরা ৫০ মণ রস বাহির হয়, কিন্তু ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়া দ্বীপপুঞ্জে শতকরা ৬৫ মণ রস বাহির হইয়া থাকে; এবং আমাদের দেশে শুষ্ক চিনি অপেক্ষা গুড়ের ভাগ দ্বিগুণ কিন্তু উক্ত দ্বীপে গুড় অপেক্ষা শুষ্ক চিনির ভাগ তিনগুণ। অতি অল্পদিন পূর্ব্বে উক্ত মার্কিনদ্বীপে আকের ওজনের অর্দ্ধেক রস বাহির হইত, অর্থাৎ আমাদের দেশের ন্যায় শতকরা ৫০ মণ রস বাহির হইত, কিন্তু এক্ষণে উপযুক্ত কলের দ্বারা

শতকরা ৭৫ হইতে ৮৫ মণ পর্য্যন্তও রস বাহির হইয়া থাকে। অতএব উপযুক্ত কলের অভাবে আমাদের যে লক্ষ লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়া থাকে, তাহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। এবিষয়ে উন্নতি করিতে হইলে সামান্য চাষীলোকে সফলযত্ন হইতে পারে না; কম না, ইহাতে অনেক বহুমূল্য কলবলের প্রয়োজন। ধনী লোকেরা এবিষয়ে মনোযোগী না হইলে উন্নতির সম্ভাবনা অল্প।

——The Hindoo Patriot, July 27, 1882).

৩। আমেরিকার নিউইয়র্ক (New York) নগরের রাস্তায় রাস্তায় সম্প্রতি ডাকে চিঠি পাঠাইবার জন্য যে বাক্স স্থাপিত হইয়াছে তাহাতে এক একখানি করিয়া টিকিট আঁটা থাকে, কোন্ কোন্ সময়ে বাক্স খোলা হয় তাহা ঐ টিকেটে লিখা থাকে; এবং তদ্ব্যতিরেকে নিয়মিত সময়ে বাক্স খোলা হয় কি না তাহা জানিবার জন্য স্বতন্ত্র একখানি বিজ্ঞাপন থাকে; বাক্স খুলিবামাত্র ঐ বিজ্ঞাপন খানি পড়িয়া যায়। যে ডাক হরকরার উপর চিঠি লওয়ার ভার আছে তাহাকে চিঠির সহিত ঐ বিজ্ঞাপন খানি জেলার আফীসে গিয়া দাখিল করিতে হয়, আফীসের কর্ম্মচারীগণ ঐ বিজ্ঞাপন দৃষ্টে ডাকহরকরা নিয়মিত সময়ে বাক্সখুলিয়াছে কি না, তাহা জানিতে পারে।

——(The Pioneer, July 26, 1882.)

৪। সহরে জলযোগাইবার নিমিত্ত লাহোরে যে এক কূপ আছে, তাহার জল এত শুদ্ধ ও জান্তব মলবিহীন (Free from Organic matter), উক্ত জল পরীক্ষক ডাক্তার সেন্টর (Dr. Center), বলিয়াছেন যে, ইংলণ্ডের চাখড়িময় প্রদেশ ভিন্ন অন্যত্র এরূপ বিশুদ্ধপানীয় জল মিলে না। লাহোরের এই জল এরূপ মলহীন হইবার কারণ এই যে, ইহা অনেকদূর হইতে বালি ও কাঁকরের স্তর দিয়া চোয়াইয়া আইসে, এবং বালি ও কাঁকর দ্বারা ময়লা জল অতি সুন্দররূপে পরিস্কৃত হয়।

——(The Indian Daily News, July 26, 1882).

কি শিখিব ?

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

যাঁহার নিজের সুখদুঃখ আপনার করতলগত নহে, হায়! তিনি ভারতের উদ্ধার সাধন করিবেন, এরূপ ভাবনা হৃদয়ে পোষণ করা কতদূর সঙ্গত, জানি না। সংক্ষেপে বলিতে হইলে আমাদিগের অলস কল্পনার ফল, আর্য্যদর্শন, বঙ্গদর্শন প্রভৃতিতে ফলিতেছে, কিন্তু ক্রীড়াশীল কল্পনার (ফলের কথা দূরে থাকুক) বীজ-অদ্যাপিও বঙ্গ ক্ষেত্রে উপ্ত হইয়াছে কিনা সন্দেহের বিষয়।

জাতীয় ধনাগমনীতি (Political Economy) চর্চ্চা বাঞ্ছনীয়, ইহার শুভ ফল নিতান্ত প্রয়োজনীয়, কিন্তু-বঙ্গের আধুনিক-অবস্থায় ইহা কিছু ফলোপধায়ক হইবে কিনা নিশ্চিত নহে। এক এক জনের এমনি কড়াধাত যে সিটলিস পাউডার ও কেষ্টারওএল কিছু করিয়া উঠিতে পারে না, সকলই হজম হইয়া যায়, তেমনি বোধ হয় (Political Economy) বাঙ্গালার অলস উদরে পড়িয়া নিস্ফলতা প্রাপ্ত হইবে। বাঙ্গালার জড়তা, জড়তাই রহিবে, অসারতা, অলসতা সারবত্তা ও পরিশ্রমে পরিণত হইবে কিনা, সন্দেহস্থল। অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া দেশ বিদেশে বানিজ্য উপলক্ষে ভ্রমণ করার কথা এস্থলে বলা বাহুল্যের বিষয়,—বাতুলের প্রলাপ প্রায়।

ভারতে যাহা আছে, তাহা লইয়া আমরা ভারতে থাকিয়া ব্যবসা করিতে পারি না, তবে এরূপ অবস্থায় অন্যদেশে ভারতজাত দ্রব্য লইয়া, জাহাজে আরোহণ করিয়া, সমুদ্র পার হইয়া, ইউরোপ বা রুসিয়ার অন্যকোন-প্রদেশে ব্যবসা করিতে যাইব এরূপ আশা হৃদয়ে পোষণ করিব, উহা যুক্তিসঙ্গত নহে। ভারতের ভূমিতে নীল উৎপন্ন হইতেছে, ইংরাজেরা ধনী হইতেছেন, আর ভারতবাসীর উদরান্নের তরে লালায়িত; বাঙ্গালার তুলা লইয়া Manchester আমাদিগের পরিধেয় কাপড় প্রস্তুত করিতেছে, আর আমরা নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিয়াছি। (Manchester) ম্যানচেষ্টার কাপড় না দিলে আমাদিগের আর অন্য উপায় নাই, নিশ্চয় আমরা বস্ত্রহীন হইব।— তথাচ আমরা নিশ্চেষ্ট। এই সকল জড়তা অপনয়ন করিতে যদি আমাদিগের বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতবিদ্য যুবকেরা বদ্ধপরিকর না হন তাহা হইলে আর আশা নাই। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের (বি, এ ; এম্, এ ;) অনেকের অবস্থা অত্যন্ত মন্দ, তাহারা কি করিবেন, কাজে কাজেই চাকরী ভিন্ন আরতাহাদিগের উদরপূরণের উপায় নাই। কিন্তু বিদ্যাভ্যাস আশয়ে যাঁহারা ইংলণ্ডে গমন করেন, তাঁহাদিগের অবস্থা তোলিতার

মন্দ নহে, তাহারা চাকরীর পথে না যাইয়া নূতন পথ আবিষ্কার করিতে পারেন! তথাচ দলে দলে ব্যেরিষ্টার হইয়া আসিতেছেন কেন? যিনিই ইংলণ্ডে যান-তিনিই ব্যেরিষ্টার হইয়া আসেন, ইহার কারণ কি? ইংলণ্ডে কি শিক্ষণীয় বিষয় আর কিছুই নাই? কেহ কেহ কেন কৃষি বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়া বিলাতীয় ধরণে এদেশে চাষ বাস করুন না, তাহাতে কি তাহাদিগের দুই তিন শত টাকা পোষাইবে না? কেহ কেহ কেন ছুরি কাঁচি প্রভৃতি আবশ্যকীয় দ্রব্যের নির্ম্মাণ-শিক্ষা করিয়া এদেশে সেই সকল প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করুন না? তাহাতে লাভের আশা কি কম?—বোধ হয়, না তো! রুষিয়ার সম্রাট পিটার-দি-গ্রেট অর্ণবপোত নির্ম্মাণ শিক্ষা করিবার জন্য ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন, আর আমাদিগের শিক্ষিত যুবকেরা ব্যারিষ্টারি ভিন্ন আর শিখিবার কিছু দেখিতে পান না। শুনিয়াছি জনৈক বাঙ্গালি বাবু ইংলণ্ডে গিয়া লৌহকারখানায় শিক্ষা লাভ করিতেছেন, ঈশ্বর তাঁহার মনোস্কামনা পূর্ণ করুন, দেশে আসিয়া তিনি নূতন কল স্থাপনা করুন। আশা করি তাঁহার প্রদর্শিত পথে আর দুই চারিজন বিচরণ করুন। এক্ষণে স্বাধীনবৃত্তি অবলম্বনের কি কি প্রতিবন্ধক আসুন তাহাই পর্য্যালোচনা করা যাউক। কেন আমাদিগের যুবকগণ ইংলণ্ডে শিক্ষালাভ করিয়াও চাকরী করিবার প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিতে পারেন না? কি কারণে তাঁহারা বেরিষ্টারী পাশ করিয়া আসিয়াও দেড়শত দুইশত টাকার চাকরীর তরে লালায়িত? আর কেনই বা তাহারা লৌহকারখানায় বা কৃষিপ্রভৃতি অন্য কোন প্রকার কার্য্য শিখিতে প্রবৃত্ত না হন? দাসত্ব আমাদিগের শিরায় শিরায়, মজ্জায় মজ্জায়, অস্থিতে অস্থিতে প্রবেশ করিয়া রহিয়াছে, আমরা যাহাই কেন শিক্ষা করি না, সকলেই আমাদিগকে চাকরীর পথে লইয়া যায়। এই নির্দ্ধারিত বেতনভোগীত্ব-প্রিয়তাও অনেকটা সমাজের-দোষে আমাদিগকে ছাড়িতে চাহে না। হয় তো যিনি ব্যেরিষ্টারি পাশ করিতে যান, ইংলণ্ডে যাইবার পূর্ব্বে তাঁহার বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া যায়। সমাজের দোষ বা গুণেই হউক, বিবাহের সময় ভাবী ব্যেরিষ্টার-পত্নী দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকা মাত্র। বেরিষ্টার সাহেব গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিতে পান তাঁহার পত্নী বয়স্থা হইয়াছেন, স্বরায় পুত্র বা কন্যা প্রসব করিয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করিবেন। তাঁহার মাথা ঘুরিয়া যায়, পিতা যৎকিঞ্চিৎ করিয়া যাহা কিছু সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশ ইংলণ্ড গমনাগমনে ব্যয় হইয়া গিয়াছে, আর যাহা কিছু বাকি পড়িয়া রহিয়াছে, তাহাতে স্বচ্ছন্দে স্বপরিবারে আপনার জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করা দুরূহ। আবার ব্যেরিষ্টারদিগকে বাহ্যিক মান-সম্ভ্রম পোষাক পরিচ্ছদ উপর দৃষ্টি রাখিতে হয় বলিয়া, অন্যাপেক্ষা অধিক ব্যয় হইয়া

থাকে। ব্যয় অধিক হইতে লাগিল কি করেন? বেরিষ্টারসাহেব যেরূপ হউক একটী চাকরীতে প্রবৃত্ত হইতে বাধ্য হইলেন। এইরূপে বাঙ্গালী-জীবন পর্য্যালোচনা করিলে ইহা স্পষ্ট প্রতীত হইবে বাল্য বিবাহই স্বাধীন পথাবলম্বনের প্রধান অন্তরায়, যে কোন বিদ্বান্ ভারতবাসী যুবকের জীবন, যে কোন বিদ্বান্ ইউরোপীয় যুবকের জীবন সহিত তুলনা কর, দেখিতে পাইবে ইউরোপীয় যুবকের হৃদয়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা—প্রফুল্লতা—নির্ভীকতা—প্রকৃত স্বাধীনচিন্তা—প্রকৃত স্বাধীনপথাবলম্বনে তৎপরতা গুণ বিরাজ করিতেছে, সে গুণগুলির শতাংশের একাংশ ভারতবাসীর হৃদয়ে নাই, অন্যান্য কারণ থাকিলেও অসময়ে বিবাহ বা পিতৃদত্ত বিবাহ এই তারতম্যের মূলে জাজ্বল্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। একজন ইংরাজ যুবক স্বাধীন পথ অবলম্বন করিবার পূর্ব্বে ভাবিয়া দেখেন তাঁহার বিবাহ হয় নাই।—স্ত্রী পুত্রের ভার বহন করিতে হইতেছে না, তাঁহার আপনার ভরণপোষণভার ভিন্ন অন্য ভার নাই, মনে করেন স্বাধীন পথে কৃতকার্য্য না হন তাহাতে ক্ষতি কি, আপনার ব্যয় উপযোগী অর্থ যে কোন উপায়ে হউক উপার্জ্জন করিতে পারিবেন, আর যদি নিতান্ত তাহাও না পারেন, তিনি আপনিই কষ্ট পাইবেন, তাঁহার অদূরদর্শিতার জন্য অন্য কাহাকেও কষ্ট পাইতে হইবে না। ভারতবর্ষীয়, বিশেষতঃ বঙ্গীয় যুবকের মনে স্বাধীন পথে বিচরণ করিবার ভাব উদিত হইতে না হইতে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী পুত্র ভরণপোষণের চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হয়। যদি স্বাধীন পথে কৃতকার্য্য লাভ করিতে না পারেন, তাহা হইলে তাহার স্ত্রী পুত্রের কি দশা হইবে? তাহাদিগকে উদরান্নের জন্য লালায়িত হইতে হইবে। বঙ্গীয় যুবক স্বয়ং সকল কষ্ট সহ্য করিতে পারেন, কিন্তু তাহার প্রাণের পত্নী সরলা, স্নেহের পুত্তলী প্রিয়কুমার, অন্নাভাবে দিন অতিবাহিত করিবে, ইহা দেখা দূরে থাকুক, ভাবিতেও তাহার হৃদয় শিহরিয়া উঠে। ভারত সন্তান বুকবাঁধিয়া স্বাধীন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিলেন না। ক্ষুব্ধচিত্তে তাহাকে প্রত্যাগমন করিতে হইল। বাস্তবিক কোন সহৃদয় ব্যক্তি স্ত্রী পুত্রের কষ্ট, বিশেষতঃ অন্ন কষ্ট দেখিতে পারেন না। যিনি পারেন তিনি পাষণ্ড, তিনি প্রকৃত মনুষ্য নামের যোগ্য নহেন। স্বয়ং আপনার দুঃখ সহ্য করিতে পারে এরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তেজস্বী যুবক অনেক দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু তাহার নিজের দোষে তাহার স্ত্রী পুত্রগণ কষ্ট পাইবে, ইহা কোন অসার ব্যক্তি ভিন্ন আর কেহই সহ্য করিতে পারেন না। অতএব বাঙ্গালীদিগের স্বাধীন পথাবলম্বনের প্রথম প্রতিবন্ধকের প্রথম সোপান, অসময়ে বিবাহ! দ্বিতীয় সোপান, পারিবারিক অবস্থা, স্ত্রী পুত্র ভিন্ন আরো অনেক অকর্ম্মণ্য লোক বঙ্গীয় যুবকদিগের গলগ্রহ হইয়া থাকে। তাহাদিগের উদরান্নের তরেও যুবকদিগকে প্রথমে ভাবিতে হয়। আহ্লাদের বিষয় প্রতিবন্ধকের

দ্বিতীয় সোপান ক্রমে ক্রমে অপসৃত হইতেছে, যাহাদিগের সহিত আমাদিগের দূর সম্বন্ধ, তাহাদিগের ভরণের ভার আমাদিগের স্কন্ধ হইতে উত্তোলিত হইতেছে, দুঃখের বিষয় এই ভার লাঘব করিতে গিয়া কতকগুলি কৃতবিদ্য যুবক আজি কালি বৃদ্ধ পিতা—মাতার ভার বহণ করিতেও কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত হইতেছেন। যে পিতা সকল কষ্ট সহ্য করিয়া পুত্রকে ভরণ পোষণ ও শিক্ষাদান করিয়াছেন, সে পুত্র পিতার বৃদ্ধ বয়সে তাঁহাকে গলগ্রহ বোধ করিবেন, ইহাপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? সহস্র কষ্ট সহ্য করিয়া পুত্রকে শিক্ষা প্রদানের কি এই প্রতিদান! শুনিয়াছি ইংলণ্ডে পিতা পুত্রে কেহ কাহার মুখাপেক্ষী নন; কিন্তু বৃদ্ধ পিতা নিজে খাটিয়া খাইবে, ইহা আমরা দেখিতে পারি না, এই যদি পাশ্চাত্য সভ্যতার ফল হয়, তাহা হইলে আমরা কবির সহিত সমস্বরে বলিব——

"পশ্চিম সভ্যতা স্রোত থাক দাঁড়াইয়া
ক্ষমা কর, হইও না আর অগ্রসর"

আমাদিগের প্রতীতি, ইহা পাশ্চাত্য সভ্যতার গুণ নহে, দোষ। এই দোষ পরমুখাপেক্ষীতা দূরীকরণ প্রথা হইতে উত্থিত হইয়াছে। দুঃখের বিষয় ইংরাজি সভ্যতার অন্যান্য আনুসঙ্গিক গুণ অনুকরিত হইতে না হইতে, বঙ্গীয় সমাজে একটী প্রধান দোষের আবির্ভাব হইয়াছে। মানুষ অনুকরণ প্রিয়—বাঙ্গালীও মানবের স্বভাবসিদ্ধ দোষশূন্য হইতে পারে না, কিন্তু গুণের অনুকরণ না হইয়া দোষের অনুকরণ হইয়াছে বলিয়া আমাদিগের এত মনস্তাপ। পিতা মাতার প্রতি অনাদর প্রভৃতি দোষ কীর্ত্তন করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। একথার উত্থাপন অনেকটা অপ্রাসঙ্গিক হইয়া উঠিয়াছে।

কেন আমাদিগের যুবকগণ পাশ্চাত্য জ্ঞানালোকে আলোকিত হইয়াও দাসত্ব-প্রিয়তা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই, তাহার কারণ বিবৃত করিতে আমরা উদ্যত হইয়াছিলাম। প্রথম কারণের একটী অঙ্গ, অসময়ে বিবাহ, অথবা (ভরণপোষণযোগী অর্থ উপার্জ্জন করিতে না পারিয়া যে বিবাহ হইয়া থাকে) দ্বিতীয় অঙ্গ পারিবারিক অবস্থা। উদাহরণ স্বরূপ আমরা একটী ব্যেরিষ্টারের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বলা বাহুল্যের বিষয় যে, ব্যেরিষ্টারবাবুর সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, যে কোন শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবক সম্বন্ধেও তাই। অসময়ে বিবাহের দোষ ব্যেরিষ্টারবাবুকে যেমন, অন্য কোন শিক্ষিত বঙ্গীয় যুবককেও তেমনি স্পর্শ করিয়া থাকে। পারিবারিক অবস্থা নির্য্যাতনে ব্যেরিষ্টার বাবু যেমন প্রপীড়িত, অন্যকোন শিক্ষিত যুবকও তদ্রূপ। দ্বিতীয় কারণ, আমাদিগের সাহসের অভাব। যে সাহসে সাহসী হইয়া ওয়াটারলু সমরক্ষেত্রে ওয়েলিংটন্ নেপোলিয়ানকে পরাজিত করিয়াছিলেন, আমরা সে সাহসের কথা বলিতেছি না। যে সাহসকে ইংরাজিতে (Moral courage)

মরাল কারেজ বলে, সেই সাহসের কথাই আমরা উল্লেখ করিতেছি। একজন অবিবাহিত ইংরাজের যে সাহস আছে, সে সাহস একজন অবিবাহিত বাঙ্গালী যুবকের নাই, রীতিমত স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিতে পারিলেও সে স্বাধীন চিন্তা কার্য্যে পরিণত করিবার সাহস আমাদিগের নাই, অদ্যাপিও জন্মে নাই। আমরা অত্যন্ত সতর্ক হইয়া চলি, পাছে কোন স্বাধীন কার্য্যে ব্যাপৃত হইলে ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হয়, সেই ভয়ে আমাদিগের শিক্ষিত যুবকগণ সতর্ক হইয়া চলেন; সতর্কতা, সাবধানতার গুণ আছে দোষও আছে, সতর্কতার গুণই আমাদিগকে বর্ত্তীয়াছে কি না বলিতে পারি না। কিন্তু সমস্ত দোষগুলি যে আমাদিগের আয়ত্তাধীন হইয়াছে, একথা অসঙ্কুচিত চিত্তে বলা যাইতে পারে। জন্ সাহেব স্বাধীন ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন, রামগোপাল বাবু ময়দার কল করিয়া নিস্বঃ হইয়াছেন, তাঁহার পুত্র কন্যাগণ তাঁহার স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন ব্যবসায়ের দোষে পথের ভিকারী, এইরূপ স্বাধীন-ব্যবসাবলম্বন-পথরোধক চিন্তা সদাসর্ব্বদা আমাদিগের মনে উদিত হইয়া থাকে। ফিন্‌লে মেওর কোং সামান্য ধরণের একটী আফীস খুলিয়া আজি কলিকাতার মধ্যে গণ্য মান্য বণিক সম্প্রদায় হইয়াছে। মতিলাল শীল সামান্য বোতলের ব্যবসা অবলম্বন করিয়া, স্বীয় বুদ্ধিবলে অগাধ ধন উপার্জ্জন করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন; রামদুলাল সরকার সামান্য সরকারের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া স্বাধীন ব্যবসায় অবলম্বন কপূর্ব্ব আপনার অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতার গুণে নির্ভর করিয়া ক্রমে অতুল ধন সম্পত্তি সঞ্চয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় এই সমস্ত জলন্ত দৃষ্টান্ত হইতে আমরা কোন কার্য্যোপযোগী নীতি শিক্ষা করিতে পারি নাই; উন্নতি হইলে আমরা অদৃষ্টের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া থাকি, অবনতি ও ক্ষতি হইলে স্বাধীন ব্যবসায়ের দোষ দিয়া আমরা ক্ষান্ত হই। আমাদিগের আধুনিক যুবকগণ যদিচ নিতান্ত অদৃষ্টবাদী নন, তথাচ তাহাদিগের কার্য্যনিচয় তাহাদিগের বাক্যজালের অসারতা অহরহ সপ্রমাণ করিতেছে। তাহাদিগের এ ঔদাস্যের মূলে, আমরা সহসাভাব জাজ্বল্যমান দেখিতে পাইতেছি। তৃতীয় কারণ আমাদিগের প্রকৃত স্বাধীন চিন্তার অভাব, আমাদিগের মনে এক নূতন ধরণের স্বাধীন চিন্তাস্রোত বহিয়া থাকে; আমরা অনেক পরাধীনকে স্বাধীন, অনেক স্বাধীনকে পরাধীন বলিয়া থাকি। যে তন্তুবায় বস্ত্র বয়ন করিয়া থাকে, যে কুম্ভকার মাটিতে বসিয়া হাঁড়ী শরা প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া থাকে, যে কর্ম্মকার তাহার হাতুড়ীর সাহায্যে প্রতিদিন কাটারি, কাস্তে প্রভৃতি তৈয়ার করিয়া থাকে, আমরা তাহাকে স্বাধীন বলিতে প্রস্তুত নহি; যিনি পেণ্টুলান চাপকান, আলবার্ট ফেসানের টেরিকাটিয়া আফীসে কেরাণীগিরি, স্কুল মাষ্টারি বা অন্য কোন চাকরী করিয়া থাকেন, তাহার সামাজিক অবস্থা একজন

তন্তুবায় কুম্ভকার, কর্ম্মকার বা কাংস্যকার হইতে উন্নত। কোন শিক্ষিত কর্ম্মকার তনয় তাহার পিতার পরিচয় দিতে অনিচ্ছুক। আবার যদি সেই পিতা জীবিত থাকেন ও হাতুড়ীরদ্বারা কাটারী প্রভৃতি প্রস্তুত করণ ব্যবসা পরিত্যাগ না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে শিক্ষিত পুত্রের আর মাথা তুলিবার ক্ষমতা থাকে না, লজ্জায় তাহার মস্তক অবনত হইয়া যায়, তাহার মনে মনে ধিক্কার হয়; হায় বিধাতা কেন তাহাকে এমন নীচ কুলে জন্ম দিয়াছেন? কি করেন, মনের দুঃখ মনেই রহিয়া যায়। যদি কোন প্রকার প্রায়শ্চিত্ত করিলে তাহার সামাজিক উন্নতি সম্ভব হয় তাহাতেও তিনি প্রস্তুত আছেন। মিশনারি ক্যারেসাহেব তদানিন্তন গবর্ণজেনারেলের সভায় আসীন হইয়া শুনিতে পাইলেন, সভাস্থ জনৈক ব্যক্তি অপর একজনকে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "ক্যেরে সাহেব এক সময় জুতাতৈয়ারী করিতেন," এই শব্দ তাহার কর্ণে প্রবেশ করিতে না করিতে ক্যারে অমনি বলিলেন "না না আমি সামান্য মুচি ছিলাম জুতা সেলাই করিতাম মাত্র" যে মহীয়সী বাণী ক্যারের মুখ হইতে বহির্গত হইয়াছিল কয়জন সরলমনে এরূপ কথা বলিতে কুণ্ঠিত না হন? স্বাধীনতা ও প্রকৃত উচ্চতা কার্য্য বিশেষে আবদ্ধ নহে, উন্নত হৃদয়ই ইহাদিগের উপযুক্ত স্থান। একজন মুচিও যে একজন কেরাণী হইতে স্বাধীনতায় উন্নত, একথায় শ্রবণকুহর পরিতৃপ্ত করিতে না পারিলেও একটা প্রকৃত সত্য কথা। আমাদিগের স্বাধীনতা শুদ্ধ বাক্যেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে, আমাদিগের যুবকদিগের অনেকটা ধারণা, যাহারা উচ্চধরণের ব্যবসায় করিয়া থাকেন, তাহারা স্বাধীন হইতে পারেন কিন্তু সামান্ত ব্যবসায়ে যদি কিছু স্বাধীনতা থাকে তাহাও অবস্থা বিশেষ পরাধীনতা বা কেরাণীবৃত্তি হইতেও অবনত।

আমরা জানি নাই অদ্যাপিও শিখি নাই, নীচ ব্যবসা-স্বভাবত নীচ নহে—কেবল অশিক্ষিত ব্যক্তিগণাবলম্বিত বলিয়া নীচত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। যে দিন শিক্ষিত যুবকগণ তন্তুবায়ের কার্য্য করিবেন, সে দিন বস্ত্র বুনন আর নীচ ব্যবসা থাকিবে না। কেনা আজ ম্যানচেষ্টার বনিক সম্প্রদায়কে নীচ ব্যবসায়ী বলিতে সাহসী হইতে পারে? যদি ম্যানচেষ্টার বস্ত্র ব্যবসায়ীকে নীচ বলিতে তোমার ভয় হয়, তবে স্বাধীনতার কোন সূত্র অবলম্বন করিয়া তুমি আজ স্বদেশীয় তন্তুবায়কে ঘৃণা করিতেছ। একজন কলে, অপরজন তাঁতে, এই বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া থাকে। একজন দশলক্ষ টাকা, অপরজন ১০০ একশত টাকা লইয়া একই পথের পথিক, তবে কি জন্য একজন আদৃত-পূজিত, অপরজন ঘৃণিত হইতেছে। ইহাতে প্রতীত হইতেছে, আমরা পূজা করি অর্থের, অনাদর করি দারিদ্র্যের, পূজা করি কলের, অনাদর করি তাঁতের। অথচ বোম্বাইয়ের পারসী সম্প্রদায়ের অধি-

ঠিক কীর্ত্তি আজ ধনীপল্লীপূর্ণ বঙ্গদেশে উহার কিছুই অনুকরিত হয় নাই। শিক্ষিত যুবকদিগের তৃতীয় প্রতিবন্ধক, স্বাধীন চিন্তার অভাব, অসম্পূর্ণ স্বাধীন চিন্তা. রাজনৈতিক স্বাধীনতার আন্দোলন করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, চিন্তা অর্থেই স্বাধীন চিন্তা কথাটী ব্যবহৃত হইয়াছে। সাধুগণের বিশ্বাস যিনি, স্বাধীনউপায়ে স্বকীয় জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে অক্ষম, স্বাধীনচিন্তা তাঁহার মস্তকে প্রবেশ করিতে পারে না।

এটি সাধারণের সামান্য বিধি, ইহার বিশেষ বিধিও আছে। সভ্যতার আকরভূমি ইংলণ্ডেরদিকে দৃষ্টপাত করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, কতকগুলি প্রতিভাশালী পরাধীনব্রতাবলম্বিত ব্যক্তি হইতে উচ্চতর স্বাধীনতা-প্রতিপোষক বাক্য নিঃসৃত হইয়াছে। কিন্তু ইংলণ্ডের কথা স্বতন্ত্র, সেখানে স্বাধীনভাবে স্বাধীন বায়ু অবিরাম বহিতেছে, স্বাধীনতা তরঙ্গিণী বক্ষেঅহরহ স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, যেভূমিতে পদার্পণ করিবামাত্র দাসত্ব শৃঙ্খল উন্মোচিত হয়, সে দেশের পরাধীনতা বিভিন্ন প্রকারের। সেদেশের পরাধীনতায় যে স্বাধীনতা আছে, এদেশের স্বাধীনতায় তাহাপেক্ষা অধিক পরিমাণে পরাধীনতা বিরাজ করিতেছে; সে দেশে যাহা বিশুদ্ধ সত্য কথা, এদেশে মাটির দোষে তাহা (Insubordination) অবশ্যতা—অসহনীয় তেজস্বীতা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। অতএব এদেশস্থ গবর্ণমেণ্টের বেতনভোগী কোন ব্যক্তির মনে স্বাধীন চিন্তা সমুদিত হইলেও পাছে উপরওয়ালাদিগের বিরাগ ভাজন হইতে হয়, এই ভয়ে স্বাধীনভাব বিনির্গত হইতে পারে না। কাজে কাজেই মনে কোন উচ্চচিন্তা উদয় হইয়া মনেই বিলীন হইয়া যায়। তাই বলিতেছিলাম, যিনি স্বাধীন ব্যবসা করিয়া আপনার ভরণ পোষণ চালাইতে অক্ষম, তাহার মস্তিকে স্বাধীন চিন্তা প্রবেশ করিতে পারে না। স্বাধীন ব্যবসাবলম্বন, স্বাধীনতার প্রথম সোপান, এ প্রবন্ধে সেই প্রথম সোপানেরই উল্লেখ হইল।

চতুর্থ প্রতিবন্ধক, অর্থাভাব। যে ভারত ভূমে, যে বঙ্গদেশে ইংরাজ, ফরাসি জারম্যান, ওলোন্দাজ, পটুগীস ও গ্রীকের সৌভাগ্য পরীক্ষিত হইয়া থাকে, সে দেশ নির্ধন, সে দেশে অর্থাভাবে স্বাধীন ব্যবসা চলে না, একথা বলিতে চক্ষে জল আইসে। সম্রাজ্ঞ সম্রান্ত ইংরাজগণ যে দেশ দেখিয়া, স্বদেশে ফিরিয়া গিয়া, এত সুখ্যাতির কথা বলিয়া থাকেন, সে দেশ কি দরিদ্র হইতে পারে? যে দেশে বর্দ্ধমানরাজ ও পাল, শীল, মল্লিকবংশ প্রভৃতি বিরাজ করিতেছেন, আজও সেদেশে অর্থ নাই, একথা কে বিশ্বাস করিবে? যে দেশে যুবরাজের আগমনোপলক্ষে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল, সে দেশে অর্থাভাবে কাপড়ের কল সংস্থাপিত হইতে পারে না, এ কথার উপর কোন মনুষ্যের আস্থা থাকিতে পারে? আজ ও যে দেশের রাজধানীতে

গবর্ণরজেনেরেল মহোদয়ের আহ্বানোপলক্ষে বৎসর বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকার ভোজ হইয়া যায় ও আজও যে দেশে ২-৪ কোটীর (Loan) লোন কোম্পানির কাগজ ২-৪ দিনে (Premeum) এ বিক্রয় হইতেছে, সে দেশের অর্থাভাব কোন কার্য্যের প্রতিবন্ধক, এ কথা ত কেহই শুনিতে চায় না। সংক্ষেপত, ভারতের বঙ্গভূমে আজও প্রচুর অর্থ আছে, একথা অলীক নহে। বঙ্গদেশে অনেক ধনবানের বসতি, একথায় অনেক সত্য আছে। তবে অর্থাভাব স্বাধীন ব্যবসায়ের প্রতিবন্ধক হইতে কিপ্রকারে পারে? অর্থের অসম্ভাব নাই তবে দুঃখের বিষয় যাহাদিগের ধন আছে তাহাদিগের স্বাধীন ব্যবসার দিগে মন নাই, আর যাহাদিগের মন আছে তাহাদিগের ধন নাই। যাহার ধন আছে তিনি প্রায়ই কোম্পানির কাগজ, রেলওয়ে বা ট্র্যাম-ওয়ে কোম্পানির সেয়ায়, অথবা উর্দ্ধসংখ্যা জমিদারি ক্রয় করিয়া থাকেন। স্বাধীন ব্যবসাবলম্বন বা কাপড়, কাগজ, সূতা প্রভৃতির কলস্থাপনের ভার তাহাদিগের মনে উদয় ও হয় না, কেহ উদিত করিয়া দিলে ইহা মনে স্থান প্রাপ্ত হয় না। কল সংস্থাপ-নের কথা তাহাদিগের কর্ণে বাতুলের প্রলাপের মত শুনায় ও তাহাদিগের বিশ্বাস ও সকল মহত্তর কার্য্য ইংরাজদিগের করণীয়। উর্দ্ধসংখ্য তাহারা কতকগুলি সেয়ার ক্রয় করিতে পারেন, ইহাপেক্ষা উচ্চতর আশা হৃদয়ে পোষণ করা তাহাদিগের পক্ষে নিতান্ত অসঙ্গত। আমাদিগের ধনীসম্প্রদায়দিগের অন্যায্য এক মুখে কীর্ত্তন করা অতি দুরূহ ব্যাপার। ট্র্যামওয়ে কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হইল, কিন্তু ইহার অধিকাংশ (Share) কাহারদিগের দ্বারা ক্রীত হইয়াছে? বাঙ্গালি ধনীগণ দ্বারা। কলিকাতায় অসংখ্য ইউরোপীয়ের আফিস চলিতেছে কিন্তু জিজ্ঞাসা করি কাহাদিগের অর্থ বলে? নিঃসন্দেহ এই বাঙ্গালি অর্থীদিগের অর্থবল অধিকাংশ ইউ-রোপীয় সওদাগর প্রতিষ্ঠিত আফিসের মূলীভূত কারণ, যাহাদিগের একটু মনের বল আছে তাহারা সাহসের উপর নির্ভর করিয়া আপনার ঘরের টাকা ইউরোপীয় সওদা-গরের হস্তে সমর্পণ করিয়া (Baneon) হইয়াই সন্তুষ্ট হন। আর যাহারা গদীয়ান ধনী, উঠিতে বসিতে যাহাদিগের কষ্ট হয়, তাহাদিগের কথা উত্থাপন করা বৃথা, তাঁহারা স্বাধীন, কোন কথা ভাবিয়া তাঁহাদিগের মহামূল্য মস্তিষ্ক ঘূর্ণণ করিতে চান না।

যাহাদিগের অর্থ আছে, ব্যবসার কথা ভাবিয়া মস্তক ঘূর্ণণ করিবার ক্ষমতা আছে, আমরা জিজ্ঞাসা করি, কেন তাঁহারা স্বাধীনভাবে ব্যবসা করিতে চেষ্টা না করেন? বুঝি চেষ্টা করিতে তাহাদিগের সাহস হয় না, পাছে ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হয়। যাহার স্বয়ং স্বাধীন ব্যবসা বা কল চালাইবার সাহস ও ক্ষমতা নাই, তিনি কেন অন্য কোন সক্ষম বাঙ্গালির সাহায্য প্রদান করুন না। উপযুক্ত ব্যক্তিকে অর্থ সাহায্য প্রদানে বাধা কি? বাধা এই বাঙ্গালী অর্থী, বাঙ্গালী উপযুক্ত-ব্যক্তিকে বিশ্বাস

করেন না। ট্রামওয়ে কোম্পানি যদি বাঙ্গালি প্রতিষ্ঠিত হইত—তাহা হইলে কখনই ইহার সেয়ার বাঙ্গালীর দ্বারা ক্রীত হইত না। কেন হইত না? বাঙ্গালি বাঙ্গালিকে অবিশ্বাস করে বলিয়া। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করিতে চাই কোন্ উপযুক্ত সুশিক্ষিত বাঙ্গালি, কোন্ স্বাধীন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া অবিশ্বাসের কার্য্য করিয়াছেন? বাঙ্গালির ভীরুতা প্রভৃতি যে থাকিলেও বাঙ্গালি কখনও বিশ্বাস ঘাতকের কর্ম্ম করে নাই। আরই বাঙ্গালি স্বাধীন কার্য্যে হস্তক্ষেপ বা কলঙ্ক কবে করিল। বাঙ্গালির এক প্রধান কীর্ত্তি ভূতপূর্ব্ব(Union Bank)ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক সতেজে চলিয়া বিলয় প্রাপ্ত হইল কেন? ইহার উত্তরে আমরা এই প্রশ্ন করিতে পারি, কেন ইংরাজ প্রতিষ্ঠিত (Bank) আফিস সমূহ মাঝে মাঝে ধ্বংস হইয়া থাকে? ইংরাজ বিশ্বাসঘাতক একথা কে সাহস করিয়া বলিতে পারে-আর (UnionBank) প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা ৺দ্বারিকানাথ ঠাকুরকেই বিশ্বাসঘাতকতা বিশেষণে বিশেষিত করিতে কাহার মনে ভয় ও লজ্জা না হয়। বাঙ্গালি কখনও বিশ্বাসঘাতক নহে। আফিসের সামান্য সরকার হইতে বেনিয়ন সমস্ত বাঙ্গালি পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্য তাহাদিগেরই বুদ্ধিবলে সুচারুরূপে সমাধা হইতেছে। তাহাদিগেরই বিশ্বাসের উপর নির্ভর না করিলে কখন কোন কার্য্য চলে না, কিন্তু—কৈ—বিশ্বাসঘাতকতার কথাত প্রায়ই শ্রুত হয় না। বাঙ্গালি বিশ্বাসঘাতক নহে—একথা আর প্রমাণ করিতে হইবে না। কিন্তু কেহ কেহ হয়তো বলিতে পারেন ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত আফিস সকলের কার্য্যসুশৃঙ্খলতা ইংরাজদিগের তত্ত্বাবধারণ গুণেই হইয়া থাকে। আমরাও তাহাই বলি-কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া থাকি—সুশিক্ষিত বাঙ্গালিও ঐ তত্ত্বাবধারণ কার্য্যে অক্ষম নহে। তত্ত্বাবধারণভার কখন দেওয়া হয় নাই,তবে কিসে জানিলে যে বাঙ্গালি সক্ষম বা অক্ষম? একবার মহাত্মা বাগ্মী ৺রামগোপাল ঘোষের কীর্ত্তি স্মরণ কর,একবার বোম্বাইয়ের কল সমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, জানিতে পারিবে আমার কথার মূলে সত্য কি মিথ্যা বিরাজ করিতেছে। আজিকার বাঙ্গালি যত সুশিক্ষিত উন্নতি সভ্য, রামগোপাল ঘোষের সময়ে পাশ্চাত্য জ্ঞান, সভ্যতার জ্যোতি, তত দূর বিকিরিত হয় নাই। অপেক্ষাকৃত বঙ্গদেশ তখন ঘোর তিমিরাবৃত ছিল। সে তমসাচ্ছন্ন দিবসে যখন মহাত্মা রামগোপাল ঘোষ স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন—বাঙ্গালার ইদানীন্তন উন্নতির দিনে সুশিক্ষিত বঙ্গীয় যুবক ও প্রবীণদিগের মধ্যে স্বাধীন কার্য্যোদলনক্ষম কোন ব্যক্তি নাই; একথা বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। উপযুক্তব্যক্তির অভাব নাই—অভাব অর্থের। অর্থেরও অভাব নাই—দেশে প্রচুর রহিয়াছে—কিন্তু তাহা থাকিয়াও নাই। কোম্পানি কাগজ ক্রয় করিবার সময় সেই অর্থরাশি অনর্গল বহির্গত হইবে। কিন্তু স্বাধীন ব্যবসায়ের সময় সে অর্গল সংক্ষেপতঃ আমাদির আপনা আপনিই পড়িয়া

যাইবে। দেশীয় ধনবানদিগের দ্বারা দেশের কোন শ্রীবৃদ্ধি হইবে না—দেশীয় মধ্যবিদ্‌ ও দরিদ্র শ্রেণীর কোন উপকার হইবে না। যখন—নিচ-স্বার্থপরতা-জঘন্য আমোদপ্রিয়তা ও রাজা মহারাজোপাধি লাভ লালসা তাহাদিগের ক্ষুদ্র হৃদয়ে সদা সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছে তখন তাহাদিগের নিকট আমাদিগের আর আশা কি? এখন এক আশা ধনী সন্তানকে সুশিক্ষা প্রদান করা; তাহাও নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। এ দেশে বিদ্যা শিক্ষা—অনেকটা অর্থের তরে, ধনী সন্তানের অর্থের অনাটন নাই তবে তাহার জ্ঞানানুশীলনে আশক্তি জানিবে কেন?

পঞ্চম প্রতিবন্ধক—একতা। আমাদিগের মধ্যে একতা নাই। ১০ জন সুশিক্ষিত যুবকের মতের সহিত অপর দশজন সুশিক্ষিত যুবকের মতের ঐক্য হয় না, প্রথম দশজনের যাহা মত; অপর দশ জনের মত তাহার বিপরীত। যাহা এক দল—হিতকর বলিয়া জানে—অপর দলের মতে তাহাদিগের ভয়ানক অমঙ্গল কর। এই অনৈক্যের কারণ কি? সকলে স্ব স্ব প্রধান হইতে চাহেন কেহ অন্য কাহার উদ্ভাবিত মতের পোষকতা করিতে চাহেন না, ভারত স্বয়ং এক একটী অভিনব মতের সৃষ্টিকর্ত্তা হইতে যত্নশীল। ইংরাজ সমাজ বিভিন্ন প্রবৃত্তির দুইটী বিভিন্ন দলে বিভক্ত। কিন্তু তাহাদিগের উভয়েরই উদ্দেশ্য স্বদেশ ও স্বজাতীয় সুখ বর্দ্ধন একদল বড় লোকপ্রিয়, অপর দল সাধারণ প্রজাপ্রিয়। আমাদিগের সমাজ সহস্র সহস্র সম্প্রদায়ে বিভক্ত, কোন সম্প্রদায় বিশেষের সৎ উদ্দেশ্য থাকিলেও অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাহায্যাভাবে তাহা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না। আমাদিগের দেশীয় যুবকগণ এই মহাদেশের সার হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই।

"তৃণৈ গুণত্বমাপন্নৈ বধ্যন্তে মত্তদন্তিনঃ"

এই বঙ্গদেশে অসংখ্য লোকের বাস—১০—টাকা করিয়া সেয়ার (Share) করিলে অগাধ ধন সংগৃহীত হইতে পারে এবং সেই টাকায় গুটীকতক কাপড়ের কল সংস্থাপিত হইতে পারে কিন্তু যখন এসমস্তের—মূল—একতা এদেশে নাই তখন কলের আশা করা বৃথা। যদি মধ্যবিৎ শ্রেণীর মধ্যে একতা বিরাজ করিত তাহা হইলে ধনীদিগের স্বদেশের প্রতি বৈরাগ্য সত্বেও (Joint-stock companies) সুফল ফলিতে পারিত। ইংলণ্ডে মধ্যবিৎ ও দরিদ্র প্রজা সমূহের একতা গুণে (Joint-stock company) জয়েনষ্টক কোম্পানির যে মহতী কীর্ত্তি সকল জাজ্বল্যমান রহিয়াছে তাহা দেখিয়া আমাদিগের মনে মধ্যে মধ্যে আশার সঞ্চার হয়। কিন্তু যখন স্বদেশের অনৈক্যের প্রতি নয়ন পতিত হয়, তখন সকল আশা, সকল ভরসা নিরাশা সাগরে মগ্ন হয়। মনে মনে জিজ্ঞাসা করি, ও কি উপায়ে সমস্ত দেশ একতা সূত্রে বদ্ধ হইবে। যে দিন ধনী দরিদ্র সকলেই সুশিক্ষিত হইবে সে দিন

সকলে আপন আপন স্বার্থ আপনার সত্ব বুঝিতে সমর্থ হইবে যে দিন একতার আলোক সকলের হৃদয়ে প্রতিফলিত বা প্রতিবিম্বিত হইবে অন্তত সেইদিন ভারতের ও বাঙ্গালার অদৃষ্টে একটী ঘোর পরিবর্ত্তন ঘটিবে ও সমস্ত বঙ্গবাসী একতা সূত্রে বদ্ধ হইবে। ক্রমশঃ

শ্রীলাল—

মনোযোগ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

মেকলে এইস্থানে একটী বেশ উদাহরণ দিয়াছেন। তাহা এই;—দুই বন্ধু ছিলেন, একজন ফৌজদারীতে পড়িয়াছিলেন, অপর জন বিশেষ আইনজ্ঞ ছিলেন। প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয়কে কহিলেন যে, ভাই আমি জজের নিকট কিরূপ বক্তৃতা করিয়া আত্মরক্ষা করিব তাহা তুমি লিখিয়া দাও, আমি মুখস্থ করিয়া লই। দ্বিতীয় ব্যক্তি বক্তৃতা লিখিয়া দিলেন। প্রথম ব্যক্তি তাহা পাঠ করিয়া কহিলেন যে, ওহে ভাই, তোমার লিখিত বক্তৃতা পাঠ করিয়া আমি প্রথমতঃ চমৎকৃত হইয়াছিলাম। যখন দ্বিতীয়বার পাঠ করিলাম তখন কিছু নীরস বোধ হইল। কিন্তু তৃতীয়বার পাঠ করিয়া দেখিলাম তখন বোধ হইল যে ইহা বক্তৃতাই নহে, ইহাতে আত্ম সমর্থন হইতেই পারে না। ইহা শুনিয়া বন্ধু কহিলেন যে তিনবারের বার বক্তৃতাটী তোমার খারাপ বোধ হইয়াছে, কিন্তু তোমার মনে করা উচিত যে জজেরা একবারই শুনিয়া রায় লিখিতে বসিবে। ফলতঃ মেকলের মতই এই যে, পার্লিমেণ্ট প্রভৃতি রাজ সভার বক্তৃতা সমূহে গভীরতা থাকে না। সময় মত বলিতে পারিলেই যথেষ্ট হয়। এ স্থলে আমাদের একটী গল্প মনে হইতেছে তাহা এই; এক পাদ্রী সাহেব সদর রাস্তায় দাঁড়াইয়া হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মের বিস্তর নিন্দা করিতেছেন। চারিদিকে বহুলোক দাঁড়াইয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে মুটে মজুর অধিকাংশ। পাদ্রী সাহেব কহিলেন যে, ধর্ম্ম যাহাকে বলে তাহা খৃষ্টানেরই আছে, হিন্দু ও মুসলমানের মুছলমে ধর্ম্মই নাই। ইতাতে মুটেদের সর্দ্দার অগ্রসর হইয়া কহিল যে, আচ্ছা যদি আমাদের ধর্ম্ম নাই, তবে আমাদের দেশে ধর্ম্ম ঘড়ি বাজে কেম! সাহেব শুনিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন। কি উত্তর করিবেন তাহা ভাবিয়াই পাইলেন না। মুটেরা চারিদিকে হাততালি দিয়া হাস্য করিতে লাগিল এবং সর্দ্দারের ব্যাখ্যা করিতে করিতে বাড়ী চলিয়া গেল।

ফলতঃ সমাজজার সভ্য হইতে হইল ভাল মত কথা বলিতে পারা চাই; তত গম্ভীরতা আবশ্যক করে না কিন্তু "চেক্‌নাই" আবশ্যক করে শোনা যায় সে দিন ইংলণ্ডে একটী বড় সভায় একজন ইংরাজ এই মর্ম্মে বক্তৃতা করিতে ছিলেন যে, মিসরদেশ অধিকার করিবার চেষ্টা করা ইংরাজ জাতির অন্যায় হইতেছে। তাহার বক্তৃতার স্বদেশানুরাগী ব্যক্তি মাত্রেই আহ্লাদিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই কহিলেন যে, বাস্তবিকই অন্যায় হইতেছে। কিন্তু একজন অধীয়ান ইংরাজ সভামধ্যে দাঁড়াইয়া কহিলেন যে, পণ্ডিতবর ডারইনের মতই এই যে উচ্চশ্রেণীস্থ জীব নীচশ্রেণীস্থ জীবকে ধ্বংস করিয়া তৎস্থান অধিকার করিবে, ইংরাজ জাতি কি মিসর জাতির অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জীব নহে? তাহাতে বক্তা কহিলেন যে, মিসর শাসনের পক্ষে মিসর জাতিই উৎকৃষ্ট জীব। ইহাতে বক্তার জয়লাভ হইল এবং প্রতিবাদী অবাক্ হইয়া গেলেন। কিন্তু বক্তার জয়লাভ হওয়া আপাততঃ আবশ্যক বোধ হইলেও পাঠককে একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রতিবাদী বক্তার অপেক্ষা গভীর চিন্তা করিয়াছেন, কেবল স্বার্থপরতার পরিচয় বশতঃ তাহার উত্তর শ্রোতৃবর্গের মনোরম হইতে পারে নাই। ফলতঃ বক্তৃতার চেক্ নাই এক পদার্থ এবং বক্তৃতার গভীরতা আর এক পদার্থ। অনেকেই বলেন যে ভাল লেখক ভাল বক্তা হয় না এ কথার অর্থ এই যে, গভীর চিন্তাকারী ভাল বক্তা হয়না। অথবা ভাল বক্তা গভীর চিন্তা হয়না। কেহ হয়তঃ বলিবেন যে বর্কের বক্তৃতার কি গভীর চিন্তার পরিচয় নাই। আমরা বলি যে ও সকল উচ্চ কথা ছাড়িয়া দিউন্, আমাদিগকে সংক্ষেপে বলুন যে আজ কাল আমরা যে সকল বক্তৃতা শুনিয়া থাকি, তাহাতে যদি বক্তার প্রসংশা হয় তবে সে প্রশংসা কি তাঁহার চিন্তা শক্তির গভীরতা জন্য হয়, না বক্তৃতার "চেক্ নাই" জন্য হয়। আমাদের মতে "চেক নাই" জন্য হয়। "অমুক লোক অনর্গল বক্তৃতা করিতে পারেন" "অমুক লোক বক্তৃতা কালে ভূরি ভূরি নজীর দিতে পারেন" আমরা বক্তৃতার প্রসংশা স্থলে সচরাচর এইরূপ বলিয়া প্রায় প্রসংশা করিয়া থাকি।

"Tell not the dying man that
thy faith is false"

এ রকম কয়টা লাইন আমরা আজকালকার বক্তাদের বক্তৃতায় দেখিয়া থাকি? ফলতঃ আমরা যদি এই প্রস্তাবের কোন স্থানে কহিয়া থাকিযে সাংসারিকতার সহিত অতি সম্বন্ধ থাকিলে লেখার গভীরতা নষ্ট হয়, তাহা হইলে বোধ হয় আমাদের নিতান্ত ভুল বলা হয় নাই। কারণ বক্তৃতা করা যাঁহাদের ব্যবসার সাংসারিকতার সহিত তাঁহাদের অতি সম্বন্ধ স্পষ্টই উপলব্ধ হয় সুতরাং তাঁহাদের

মনোযোগের গম্ভীরতা হয় না। ভাল উকীল ভাল জজ হয় না ইহা প্রসিদ্ধ আছে। আমরা বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি যে যাঁহারা ভাল উকীল হন, তাঁহারা সচরাচর কোন বিষয় ভাল ধারণা করিতে পারেন না। সকল বিষয়ই ভাসা ভাসা দেখিয়া যান; কেবল ধর্ম্মঘড়ি বাজে কেন ইত্যাদি রূপ কথার গুণে বিপক্ষকে অনেক সময় চমৎকৃত করিয়া থাকেন। ফলতঃ ইহা মনে করিতে হইবে যে বিশজন মক্কেল এক সময়ে আসিয়া বিশ কথা বলিতেছে, এক ব্যক্তি কাঁহাতক তাহা মনে ধারণা করে! ফলতঃ ভাল উকীলদের যে জন্মের মত মাথা খারাপ হয় না ইহাই আশ্চর্য্য। আমাদের বোধ হয় সে কেবল টাকার সুখে মাথা রক্ষা করে।

বোধ হয় এই প্রস্তাবের আনুসঙ্গিক আমাদের বলা উচিত হইতেছে যে, লেখা অপেক্ষা বক্তৃতা করা কঠিন। আমরা এই স্থলে "দর্শক ভয়" নামক একটী নূতন কথার আবিষ্কার করিতেছি, পাঠক আমাদের চঞ্চলতা মার্জ্জনা করিবেন। বক্তৃতার দর্শক ভয় আছে কিন্তু লেখার দর্শক ভয় নাই। এই দর্শক ভয় মনোযোগকে যে কোথায় লইয়া যায় তাহার ঠিকানাই হয় না। আমাদের কোন বন্ধু গল্প করেন যে তিনি একদিন প্রথম বেথুন সভায় বক্তৃতা করিতেছিলেন, কয়েকটা কথা যাইবার সময় বাটী হইতে লিখিয়া লইয়া গিয়াছলেন, আর কয়েকটা কথা মুখস্থ রাখিয়াছিলেন, ভাবিয়াছিলেন যে উপস্থিত সময়ে আবৃত্তি করিয়া দিবেন। তিনি এইরূপ প্রস্তুত হইয়া গিয়াছেন, কিন্তু যখন সভা সমক্ষে দণ্ডায়মান হইলেন, তখন প্রথমতঃ তাঁহার লোমহর্ষণ হইল, পরে হঠাৎ ঘর্ম্মোদ্রেক হইল। কিন্তু তাহাতে অবশ্য বিচলিত হইতে পারিলেন না। কারণ সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া বসিয়া পড়া অপেক্ষা মৃত্যু সহ্য করা সহজ হয়। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে তিনি কয়েকটী কথা লিখিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। তাহাতেই কিছু সাহস হইয়াছিল। কিন্তু সভাস্থলে বক্তৃতার নিয়ম এই যে, হাতে কোন লেখা থাকুক তাহাতে আপত্তি নাই, কিন্তু লোকের দিকে চাহিয়া মুখেই অধিক কথা বলিতে হয়। আমাদের বন্ধুও সেইরূপ আরম্ভ করিলেন, একবার কাগজের দিকে চাহিলেন, পরে সভার দিকে চাহিয়া বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। প্রথম বার তত কষ্ট হয় নাই, কিন্তু যখন প্রথম বক্তৃতা শেষ করিয়া দ্বিতীয় বক্তব্য নিরূপণার্থ কাগজের দিকে চাহিলেন, তখন ছত্র হারাইয়া গেল। এরূপ ধাঁধা লাগিয়া গেল যে, কোনস্থানে আরম্ভ করিয়া যে কোথায় শেষ করিয়াছেন তাহা বার বার দৃষ্টিতেও স্থির করিতে পারিলেন না, যতই বিলম্ব হইতে লাগিল "দর্শক-ভয়" ততই হইতে লাগিল। শেষে গলদ ঘর্ম্ম হইয়া বসিয়া পড়িতে হইল। সকলে হাততালি দিয়া উঠিল, কিন্তু সভাপতি বিচক্ষণ ছিলেন তিনি নিজের গুণে সমস্ত ঢাকিয়া লইলেন। আমাদের বন্ধু বলেন যে তাঁহার শরী

রের অবস্থা এতই খারাপ হইয়াছিল যে, তাঁহাকে যে ডুলী করিয়া বাড়ী যাইতে হইল না ইহাই আশ্চর্য্য। আমরা অবশ্য যতদূর বলিলাম এতদূর প্রায় সর্ব্বদা ঘটেনা। কিন্তু আবার একবারে যে নাই ঘটে তাহাও নয়। প্রসিদ্ধই আছে, এডিসন একবার বক্তৃতা করিতে গিয়া I conceive I conceive I conceive এই কথা তিনবার বলিয়া আর কিছুই বলিতে পারিলেন না. ইহাতে একজন দর্শক কহিয়া উঠিলেন যে এই ব্যক্তি তিনবার conceive করিল কিন্তু কিছুই প্রসব করিতে পারিল না। স্কট্ একজন উৎকৃষ্ট কাব্য লেখক ছিলেন, কিন্তু তিনি বক্তৃতা করিতে এমনই কষ্টবোধ করিতেন যে, তাঁহাকে ওকালতি ব্যবসায় পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। অন্তের কথা দূরে থাকুক্, সিসিরো স্বয়ং বলিয়া গিয়াছেন যে, বক্তৃতার সময়ে লোক-মুখ দেখিয়া তাঁহারও সম্ভ্রম হইত। পাছে প্রস্তুত বিষয় ভুলিয়া যান এই জন্য, আমরা যেমন কোন বস্তুর স্মরণ আবশ্যক হইলে কাপড়ে গিঁট-দি তিনিও সেইরূপ নানাপ্রকার কৃত্রিম উপায় করিতেন। ডিমাস্থীনস্ বক্তৃতার সময় মনোযোগ স্থির করিবার জন্য একপ্রকার যোগ অভ্যাস করিতেন। আমরা ঐ যোগকে ভ্রমস্তক কণ্ডুয়ন যোগ কহিতে পারি। দর্শকভয় নিবারণ অর্থাৎ মনোযোগ স্থির করিবার নিমিত্ত আজিকালি কেহ কেহ বক্তৃতার পূর্ব্বে মদ্যপান করিতে উপদেশ দেন। কিন্তু তাহাতে অনিষ্টই হয়। আমরা শুনিয়াছি, ৺ কিশোরিমোহন মিত্র একদা বক্তৃতার পূর্ব্বে এরূপ মদ্যপান করিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে বক্তৃতার পূর্ব্বেই চলিয়া আসিতে হইয়াছিল। সভাস্থ বিবীগণ তাহার চরিত্রে লজ্জিত হইয়াছিল। ফলতঃ এ সকল অতি কর্ম্মভোগের কথা। বক্তৃতার অনুরোধে প্রকৃতিস্থতা পরিত্যাগ করা কখনই সম্মত নহে। ওরূপ বক্তা না হওয়াই ভাল বোধ হয়। কারণ এক দিকে যেমন বক্তা বলিয়া সুখ্যাতি, আর এক দিকে তেমনই মাতাল বলিয়াই অখ্যাতির সম্ভাবনা।

বক্তৃতা বা রচনা গাঢ় হইলেই যে তাহাতে মনোযোগ অধিক প্রয়োগ করা হইয়াছে এরূপ মনে করিতে হইবে না। শব্দাড়ম্বর বা বক্যাড়ম্বরের সহিত মনোযোগের সম্বন্ধ কম্ আছে। সরলতা ও মিতভাষিতের সহিত মনোযোগের সম্পর্ক অধিক ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সেরিডিয়ান বা বর্কের বক্তৃতা সেইখানেই মধুর যেখানে ছোট ছোট লাইন। ফলতঃ রসিকতার বুদ্বুদের ন্যায় গভীরতম প্রদেশে উৎপন্ন হয়। কিন্তু যখন উপরে ভাসিয়া উঠে তখন তাহা সন্নাকার হয়। ব্রাইট সাহেবের বক্তৃতার অনেক সংবাদ পাওয়া যায়, অনেক তর্ক শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু রসিকতা কম। দেখুন অমিত্রাক্ষর লেখকদের স্বভাবই এই যে, রচনা গাঢ় করিয়া ফেলে, কখন কখন তিন চারি লাইনেও বাক্য সম্পূর্ণ হয় না, কিন্তু দেখুন যেখানে রসিকতা সেখানে অতিবড় গোঁড়া অমিত্রাক্ষর লেখক দিগের ভাষাও

সংক্ষিপ্ত হয়। যেখানে মন প্রাণ খুলিয়া যায় সেখানে কথাগুলি দ্রুত হয় বটে, কিন্তু বাক্য গুলি সংক্ষিপ্ত হয়। Fare well happy fields where joy for ever dwels" এখানে মিল্টনের প্রাণ খুলিয়া গিয়াছে. লাইনটীও সংক্ষিপ্ত হইয়াছে। ফলতঃ যাঁহাদের সংস্কার আছে যে অমিত্রাক্ষর না হইলে জোরের সহিত ভাব প্রকাশ হয় না, তাঁহাদের নিতান্তই ভুল। আচ্ছা দেখুন কোন্ অমিত্রাক্ষর লেখকের এমন কোন কবিতায় জোরের সহিত ভাব প্রকাশ আছে অর্থাৎ আকর্ষকতা আছে; যে কবিতা ক্ষুদ্র২ বাক্য সম্পূর্ণ হয় নাই। লর্ড ডর্বি ইলিয়াড অনুবাদ করিয়াছেন আবার পোপ ও ইলিয়ড রচনা করিয়াছেন। একজন অমিত্রাক্ষর ও অপর জন মিত্রাক্ষরে অনুবাদ করিয়াছেন, কিন্তু কাহার লেখা পরিষ্কার হইয়াছে। আমরা অবশ্য স্থানাভাবে উভয়ের লেখা উদ্ধার করিতে পারিলাম না। কিন্তু পাঠক দেখিবেন যে স্বর্গে সালামন্দারনদ আকীলিসের পাছে পাছে পাছে দৌড়িতেছে, সেখানে ডর্বির লেখা পরিষ্কার কি পোপের লেখা পরিষ্কার। অথবা পরকীয় ভাষা লইয়া চর্চ্চা করা আমাদের অনবিধের। দেখুন কাদম্বরীর লেখা। যেখানে শুকনাশের উপদেশ, যেখানে মহাশ্বেতার বিলাপ, যেখানে কাদম্বরী ও তৎ সখী দিগের সৌন্দর্য্য বর্ণনা, সেখানে কেমন সরলতা। কিন্তু যেখানে গাঢ়তা, সেখানে কেবল পাণ্ডিত্যমাত্র।

কাবং শুভে কস্য পরিগ্রহো বা
কিংবা মদভ্যাপম কারণং তে।
আচক্ষ মত্বা বশিনাং রঘূণাং
মরে পরস্ত্রী বিমুখপ্রবৃত্তি॥

এখানে গাঢ়তা কোথায়। "চক্রন্দে সীতা কুররীব বিগ্না" এখানে গাঢ়তা কোথায়, কিন্তু এখানে যে চারিটী চরণ আছে, তাহা পাঠ করিলে চক্ষু হইতে হঠাৎ টপ্ টপ্ করিয়া চারি পাঁচ ফোঁটা জল পড়িয়া যায়। ফলতঃ পাছে চরণ বড় বড় হইলে রচনা গাঢ় হয়, এই জন্য কালিদাস করুণরস স্থলে—

বসনে পরিধূসরে বসনা

এইরূপ পরিমিত ছন্দে গান ধরিয়া থাকেন। এক একটী চরণে দশ এগারটীর বেশী অক্ষর থাকে না। কেহ হয়তো কহিবেন যে, ওজোগুণে শব্দাড়ম্বর আবশ্যক করে কিন্তু

তাড়কা চল কপাল কুন্তলা
কালিকের নিবিড়া বলাসিনী

এস্থলে কি ওজোগুণ নাই, কিন্তু বর্ণনাতো অপরিষ্কার নহে।

কাব্য অপেক্ষা নাটকে অর্থাৎ শ্রব্যকাব্য অপেক্ষা দৃশ্যকাব্যে অধিক মনোযোগ

আবশ্যক করে। অতএব কাব্য লেখক অপেক্ষা নাটককারের ক্ষমতা অধিক। কাব্য লেখক যখন বীররস লিখিতেছেন তখন বীররসই লিখিতেছেন, যখন করুণরসে আলাপ করিতেছেন তখন তাহাই করিতেছেন, অন্তরাক্রম করিবার আবশ্যক হয় না কিন্তু নাটককারকে এক সময়ে হাসিতে কাঁদিতে হয়। অশ্বত্থামা খড়্গ হস্তে বহির্গত হইয়া কর্ণকে তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক কহিলেন

অরেরে রাধা গর্ভভারভূত স্তুরাত্মন কর্ণ!

কর্ণ উত্তর দিলেন

'সূতো বা সূত পুত্রোবা যোবা স্তোবা ভবাম্যহং।
দেবায়ত্তং কুল জন্ম মমায়ত্তং তু পৌরুষং॥"

দেখুন নাটক লেখককে একবার অশ্বত্থামা হইতে হইতেছে একবার কর্ণ হইতে হইতেছে দুইজন, বিপক্ষের ভাব এক সময়ে হৃদয়ে ধারণ করিতে হইতেছে।

ফলতঃ উত্তর প্রত্যুত্তর স্থলে মনোযোগ আবশ্যক হয়। গৃধ্র গোমায়ু সংবাদে গোমায়ু বলিতেছে—

অলং স্থিত্বা শ্মশানেস্মিন্ গৃধ্র গোমায়ু সঙ্কুলে।
কঙ্কাল বহুলে ঘোরে সর্ব্বপ্রাণি ভয়ঙ্করে।
নচেহ জীবিতঃ কশ্চিৎ কালধর্ম্ম মুপাগতঃ
প্রিয়োবা যদিবা দ্বেষ্যং প্রাণিনাং গতিরীদৃশী॥

গৃধ্র তাহার বিপরীত বলিতেছে যথা—

টাদিত্যোয়ং স্থিতো মূঢ়াঃ স্নেহঃ কুরুত সাম্প্রতং।
বহুবিঘ্নো মুহূর্ত্তোয়ং জীবেদপি কদাচন
অমুং কনক বর্ণাভং বালমপ্রাপ্ত যৌবনং
গৃধ্রবাক্যাৎ কথং বালা ত্যজধ্ব মবিসঙ্কিতাঃ॥

এ স্থলে দেখুন দুইজনে বিপরীত কারণ দর্শাইতেছে অথচ দুই জনের কথাই আপাততঃ প্রশস্ত বলিয়া বলিয়া বোধ হইতেছে। আমীরের মৃত শিশুটীকে একবার ফেলিয়া যাইতেছে আবার আসিতেছে।

কবিওয়ালাদের লড়াই প্রসিদ্ধ আছে। সে সকল সামান্য ব্যাপার নহে। তৎক্ষণ ৎ তৎক্ষণাৎ উত্তর প্রত্যুত্তর সামান্য মনোযোগের কর্ম্ম নহে। শুধু দুই দলে নহে, কখন কখন তিনদলে গালাগালি করিয়া থাকে। তিন ভিন্ন ভিন্ন দল একস্থলে এক বিষয় সম্বন্ধে সম্বন্ধী হওয়া বড় সহজ ব্যাপার নহে। আপাততঃ মনেই হয় না যে একদল অপর দুইদলকে কিরূপে এক সময়ে আক্রমণ করিবে। অথচ করিয়া থাকে। কাশী, বলাইঠাকুর ও চিত্তেশ্বরেরা তিনদল আছে। কাশী কহিতেছে যথা;—

"কাশী কহে পাড়ার লোকে বিয়ে দেখ্‌তে দাঁড়ায়েছে।
অর্জ্জুনবীর বলাইঠাকুর লক্ষ্য বিঁধেছে।
যখন পাঁচ পিড়িতে বস্‌বে পাঁচজনে।
কওনা ভাই, ভগ্নী তোমার চাবে কার পানে॥

এস্থলে পাঠক অবশ্য বুঝিতে পারিতেছেন যে চিন্তে ময়রাকে গালি দেওয়া হইল। উত্তর প্রত্যুত্তরে অশ্লীলতা দোষ আছে। অতএব আমরা আর অধিক উদ্ধার করিলাম না। কেবল দিঙ্‌মাত্র উদাহরণ দিলাম। কিন্তু দেখুন রচনাটী কেমন প্রাঞ্জল ও স্বভাব সম্পন্ন। এবং মনোযোগের সহিত রচনা করিতে হইয়াছে।

আমরা মনোযোগকেই সকল দুঃখের ও সকল সুখের কারণ ভাবিয়া থাকি এবং সকল গুণের ও সকল দোষের কারণ ভাবিয়া থাকি। কিন্তু পাঠক পাছে আমাদিগকে অতিরিক্ত ভাষী বলিয়া সন্দেহ করেন এবং পাছে মনে করেন যে আমরা অশাস্ত্রীয় আলাপ করিতেছি তজ্জন্য প্রথমতঃ মনোযোগ সম্বন্ধে নিম্নে শাস্ত্রকার দিগের মতামত সংক্ষেপে লিখিত হইল। এইরূপে উল্লেখ করিতে আমাদিগকে অধিক পরিশ্রম করিতে হয় নাই, নিম্নে যাহা উদ্ধৃত হইল তাহা একখানি সাধারণ "এনসাইক্লোপেডিয়ার" মনোযোগ পরিচ্ছেদ পাঠ করিলেই প্রমিত হইতে পারে। যথা—

"ষ্টুয়ার্ট কহেন যে মনোযোগ একটী পৃথক্ মনোবৃত্তি। হ্যামিল্টন কহেন যে উহা কোন স্বতন্ত্র মনোবৃত্তি নহে, উহা "মনের যোগ" মাত্র। (হ্যামিল্টন যাহাকে "Consciousness concentrated." কহেন আমরা তাহাকেই সাদা কথায় "মনের যোগ" কহিতেছি। নতুবা ঠিক অনুবাদ করিতে হইলে মনের যোগ না বলিয়া "ঘনীভূত সংজ্ঞা" বলিতে হয়। হামিল্টন কহেন যে সংজ্ঞা মানুষের ইচ্ছায় বিষয় বিশেষে নিয়োজিত হইলে তাহাকেই মনোযোগ বলে। তিনি কহেন যে, বস্তুজ্ঞান অল্পতার অনুসারে পরিষ্কৃত হয়, যতই অধিক বিষয় হয় মনোযোগ ততই অল্প হয়। মনোযোগ তিন প্রকার, প্রথম প্রকার মনোযোগ আমাদের ইচ্ছার অধীন নহে, উহা আমাদের রক্তমাংসের স্বভাবে আপনি আসিয়া থাকে আমরা বারণ করিতে পারি না। দ্বিতীয় প্রকার মনোযোগ আপনি আসিয়া থাকে, কিন্তু আমরা ইচ্ছা করিলে উহাকে বারণ করিতে পারি। তৃতীয় প্রকার মনোযোগ ইচ্ছাধীন, উহা ইচ্ছা করিলে হয় এবং ইচ্ছা করিলে যায়। হেলভিসিয়াস্ কহেন যে সচরাচর যাহাকে শক্তি (Genius.) কহে তাহা "ক্রমাগত মনোযোগ" মাত্র। সার আইজক নিউটন কহেন যে আমি দর্শন সম্বন্ধে যদি কিছু উন্নতি

করিয়া থাকি তবে তাহা আমার আর কোন গুণে নহে, কেবল আমার মনোযোগের বলে।”

ক্রমশঃ

শ্রীযশোদানন্দন সরকার।

বৈদ্য।

প্রাচীন বিজ্ঞান বিদ্ আর্য্য চিকিৎসকগণের মতে বৈদ্য চতুর্দ্দশ প্রকার যথা বিষ বৈদ্য, মূলিকা, স্বেদ, আগ্নেয়, ভৌতিক, আস্থরীয়, বার্ক্ষ্য, হার্দ্দ, রৌমিক, নৈত্রিক, গর্ত্ত, পাশবিক, রাসায়নিক এবং সিদ্ধ।

১। বিষ বৈদ্য। ইহারা দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত, যথা বিষবৈদ্য ও মাল বৈদ্য; যাহারা মধু, সর্পী এই অমৃত তুল্য দ্রব্য দ্বয়ের সংমিশ্রণে বিষ ও বিমিশ্রণে অমৃত ইত্যাদি দ্রব্যাদির প্রয়োগ দ্বারা বিষনাশ অথবা একপ্রকার বিষপান করাইয়া দেহস্থিত অন্য বিষ নাশ এবং হরিতাল, সেঁকো, কাঠবিষ, সর্পবিষ প্রভৃতির দ্বারা ঔষধ প্রস্তুত করিয়া উৎকট উৎকট ব্যাধি হইতে আরোগ্য করেন তাঁহারাই বিষবৈদ্য নামে অভিহিত হন।

মালবৈদ্য—অর্থাৎ যাহারা সর্প বৃশ্চিকাদি দষ্ট ব্যক্তির বিষ মণি, মন্ত্র মহৌষধ দ্বারানির্গত বা নাশ করিয়া মৃতবৎ বিষাক্তব্যক্তিকে আরোগ্য করে তাহাদিগকে মাল বৈদ্য বলে। ইহাদের শাস্ত্রীয় নাম জাঙ্গলিক, ব্যাল গ্রাহি, আহিতুণ্ডিক বা সাপের ওঝা।

২। মূলিকা বৈদ্য। যাঁহারা উদ্ভিজ্জাদি বিশেষের মূল দেহস্থ করিয়া অথবা আঘ্রাণ বা আবদ্ধ করাইয়া রোগ নাশ করিয়া থাকেন। (জরঃহন্তি শিরোবদ্ধা সহদেবী জটাযথা)।

৩। স্বেদ বৈদ্য। যাঁহারা নানাবিধ বল্লীররস, নির্য্যাস, তরলজলীয় সত্বকে নানা বিধ ক্রিয়াদ্বারা দেহে প্রবিষ্ট করাইয়া দূর্ব্বাষ্পকে অধঃ বা উর্দ্ধ বায়ু নিয়োগে বিরেচন করাইয়া অথবা দধজল ও বাষ্পের আদান সম্প্রদান দ্বারা রোগাদি নিঃশেষ করিয়া থাকেন।

৪। আগ্নেয়। যাঁহারা ব্যাপকাগ্নি (Electricity.) দৈহিকাগ্নি (Magnatism.)* এবং লৌকিকাগ্নি যাহা নিয়ত দৃষ্ট হইতেছে; উহাদের অবলম্বনে রোগাদির উপশম করেন।

৫। ভৌতিক। † যাঁহারা স্থান বিশেষে অবস্থান অর্থাৎ কোন স্থানের বায়ু সেবন, কোন স্থানের জল সেবন, পরিমাণ মত উত্তাপ গ্রহণ প্রভৃতি পঞ্চভূত দ্বারা চিকিৎসা করেন। অথবা নিম্নদেশের বা উচ্চদেশের জলাশয়ের চতুস্পার্শ্বের নিম্ববৃক্ষ থাকিলে তথাকার জল বায়ুর কি গুণ হয় এবং ঐ বায়ু কোন রোগীর পক্ষে উপকারী এবং কাহার পক্ষে অনোপকারী ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া বাত জলাদির পরিবর্ত্তন দ্বারা চিকিৎসা করেন। বায়বীয় ‡ নামে অপর সম্প্রদায়িক বৈদ্য বায়ু সংক্রান্ত রোগাদি আরোগ্য করিয়া থাকেন, উহাদের অপভাষায় ভূতের ওঝা কহে।

৬। আসুরীয়। যাহারা শরীরের স্থান বিশেষে পদার্থ বা ঔষধি সংলগ্ন, আগ্নেয়াদি পদার্থ দ্বারা দগ্ধ, অস্ত্র দ্বারা কর্ত্তন, জলৌকা এবং ক্ষারাদি অবলম্বনে অর্থাৎ ফোস্কাদি করিয়া রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

৭। বার্ক্ষ্য। ইহারা দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত, যাঁহারা বৃক্ষাদির ত্বক, পত্র, মূল, ফুল, ফল প্রভৃতির ব্যবহারে পীড়ারোগ্য করেন। যাঁহারা বৃক্ষাদির অসময়ে ফুল ও ফল আদি ফলাইয় থাকেন ও ইচ্ছানুসারে নূতন অন্ন, কন্দ, মূল প্রভৃতি সৃজন করিতে পারেন।

৮। হার্দ্দ। যাঁহারা হৃৎপিণ্ড ও শারীর-যন্ত্রের বিষয় উৎকৃষ্ট রূপে অবগত আছেন।

৯। রৌমিক। যাঁহারা বাহ্য পদার্থ রোমকূপে প্রবেশ করাইয়া বা ঔষধি বিশেষের রসে বা বাষ্পে বসনাদি আপ্লুত করিয়া উহা শুষ্ক বা আর্দ্র অবস্থায় রোগীকে পরিধান করাইয়া পীড়া হইতে আরোগ্য করেন।

---

* যজুর্ব্বেদের শিক্ষা যথা। আত্মা বুদ্ধ্যা সমেত্যার্থান মনোযুঙ্‌ক্তে বিবক্ষয়া। মনঃ কায়াগ্নি মাহন্তি সপ্রেরয়তি মারুতং, মারুতস্তূরসি চরন্ মন্দ্রং জনয়তি স্বরং॥ ইত্যাদি। এই কায়াগ্নিকেই ইংরাজিতে (Magnatism) কহে ইহাই চুম্বক সম্বন্ধীয় আগ্নেয় শক্তি।

† কেহ কেহ জালীয় নামক এক স্বতন্ত্র সম্প্রদায় বৈদ্যের কথাও কহিয়া থাকেন। জালীয় যাঁহারা জল বিকারের অর্থাৎ পুষ্করিণী. কূপ প্রভৃতির জল দূষিত হইলে ঔষধ দ্বারা উহা শোধন করিয়া থাকেন এবং মৎস্যাদিকে মারী ভয় হইতে রক্ষা করেন।

‡ কোনমতে মানসিক সন্দেহ জন্য ব্যাধির চিকিৎসা (কেবল রোগীর বিশ্বাস জন্মাইয়া অর্থাৎ মন্ত্রাদি দ্বারা চিকিৎসা।)

১০। নৈত্রিক ইহারা দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত—যথা নৈত্রিক ও আঞ্জনেয়।

নৈত্রিক অর্থাৎ যাঁহারা অস্ত্র চিকিৎসা দ্বারা নেত্রের রোগাদি আরোগ্য করেন। আঞ্জনেয়। যাঁহারা অঞ্জনাদিদ্বারা নেত্র রোগ হইতে অব্যাহতি প্রদান করেন।

১১। গর্ভবৈদ্য। ইহারা দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত ধাত্রী—ও গর্ভ।

ধাত্রী। প্রসূতির গর্ভ সঞ্চার অবধি প্রসূত সন্তানের পঞ্চম বর্ষ বয়ক্রম পর্য্যন্ত চিকিৎসকের অধীনে থাকিয়া অর্থাৎ স্নান, ভোজন, উপবেশন, শয়ন, এবং কোন্ দিবসে, কোন তিথিতে, কোন মাসে কি কি দ্রব্য ভোজন, এবং ভোজ্য দ্রব্যের পরিমাণ পরিমিত আহারের ব্যবস্থা ও পরে সন্তান প্রসূত হইলে প্রসূতী ও সন্তানের সচ্ছন্দতা, সুস্থতা, বল প্রভৃতি জন্মাইবার চিকিৎসা।

গর্ভ। যাঁহারা দম্পতীযুগলের আহার, বিহার, শয়ন, সঙ্গম; প্রভৃতি ও কি প্রণালী অনুসারে প্রসূত সন্তান সুস্থ, বলিষ্ঠ, উন্নত মস্তিষ্ক, সর্ব্বকর্ম্মে জয়ী প্রভৃতি হইয়া থাকে তদ্বিষয়ের বিধানাদি দিয়া থাকেন।

১২। পাশবিক। যাঁহারা পশ্বাদির পীড়ার চিকিৎসা করেন অর্থাৎ অশ্ব গো প্রভৃতি মহৎ পশুর কিম্বা বিড়াল কুকুরাদি ক্ষুদ্র জন্তুর পীড়ার—চিকিৎসা করেন। *

১৩। রাসায়নিক বৈদ্য। যাহারা দ্রব্যাদির সংমিশ্রণ ও বিমিশ্রণে জারণ, মারণ দ্রাবণ, শোষণ, বৃংহণ আদি ক্রিয়া জনক উৎকৃষ্ট ঔষধ ও খাদ্যাদি প্রস্তুত করিয়া থাকেন।

কেহ কেহ গ্রহ বৈদ্য নামে স্বতন্ত্র বৈদ্যের কথাও কহিয়া থাকেন। তাঁহারা জ্যোতিষিক গ্রহ, তিথি, নক্ষত্রাদির বিচার করিয়া তদনুযায়ী ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।

১৪। সিদ্ধ—যে চিকিৎসক উল্লিখিত সর্ব্ব প্রকার চিকিৎসায় নিপুণ।

"বিষবৈদ্যশ্চ শূলীয় স্বেদশ্চাগ্নেয় নামকঃ।
ভৌতিকশ্চ তথাসূরো বার্ক্ষ্যো হার্দ্দিক সংজ্ঞকঃ।
রৌমিকো নৈত্রিকশ্চেতি গার্ব্বিকঃ পাশবীয়কঃ
রাসায়নিক ইত্যেষ সিদ্ধবৈদ্যস্ততোধিকঃ।"

যদাহ যোগতত্ত্বচন্দ্রিকায়াং ৪৩ অধ্যায়ে (ভগবান কপিল মহর্ষি জনকং প্রতি)

শ্রীকেদারনাথ বিদ্যাবিনোদ।

* পাক্ষিক। যাহারা পক্ষী আদির পীড়া আরোগ্য করেন।

স্বাস্থ্য বিধান।

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং।"

অতি প্রাচীনকাল অবধি প্রধান প্রধান শরীর তত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ স্বাস্থ্যবিধান উদ্দেশে যে সকল মঙ্গলজনক উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা জনসমাজের মহোপকার সাধন করিয়া আসিতেছেন, মহাকবি কালিদাস সেই সমুদায়ের সার-ভাগ উপরি উদ্ধৃত শ্লোকাংশের দ্বারা সম্যক্ প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বস্তুতঃ ধর্ম্মসাধন * জন্য শরীরই আদ্য প্রয়োজনীয় পদার্থ। সুস্থ শরীর-সুস্থ মন, অক্ষত শরীর—অক্ষত মন—ইহাই প্রকৃতির অবিচলিত নিয়ম। অতএব যিনি রোগ † হীন তিনিই সম্যক ধর্ম্মানুষ্ঠানে সিদ্ধকাম হইবেন, ইহা আর বিচিত্র কি? যাঁহার শরীর একে বারে রোগশূন্য, তাঁহারই উদ্যম অধ্যবসায়, মনঃসংযম, স্থির প্রতিজ্ঞা, জ্ঞানার্জ্জন, চিত্ত শুদ্ধি,—এই সমস্ত ধর্ম্মানুষ্ঠানের,—কর্ত্তব্যসাধনের প্রধান উপায় বিশিষ্টরূপ স্ফূর্ত্তি লাভ করে ও অচিরাৎ আশাতীত সুফল ধারণ করে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় যে, আমাদিগের দেশে দিন দিন জ্ঞান ও সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যবিধানের প্রতি কৃতবিদ্য সমাজের ততদূর আস্থা দেখিতে পাওয়া যায় না। ইউরোপে স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের বহুল অনুশীলন প্রযুক্ত, উত্তরোত্তর লোক সংখ্যা সমধিক বৃদ্ধি হওয়া সত্বেও, মানুষ পূর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘায়ু হইতেছে এবং জীবনের সুখ সচ্ছন্দতা দিন দিন বাড়িতেছে ভিন্ন কমিতেছে না। কিন্তু আমাদিগের দেশে মনুষ্যের আয়ু ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে বলিয়াই স্পষ্ট প্রতীতি হয়। কোথায় উত্তরোত্তর রোগাদির উপশম হইয়া জীবন সুখের আবাস-ভূমি হইবে, না প্রতিদিন এক এক উৎকট রোগ আসিয়া সমগ্র বাঙ্গালাকে জর্জ্জরীভূত করিয়া তুলিতেছে। দুই শতাব্দী অতীত হইল ইংলণ্ডে এক মহামারীভয় উপস্থিত হয়, এবং তাহাতে সহস্র সহস্র লোক এককালে কাল-গ্রাসে পতিত হওয়ায় বহুজনাকীর্ণ লণ্ডন নগর এক বিস্তীর্ণ শ্মশান ভূমিতে পরিণত হয়। এখন ও এক শত বৎসর অতীত হয় নাই, ইংলণ্ডে বৎসরে শত শত লোকের ম্যালেরিয়া জ্বরে প্রাণ বিয়োগ হইত। কিন্তু এক্ষণে ইংলণ্ডের জনসাধা-

* ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষানাম্ মূলমুক্তং কলেবরং তচ্চ সর্ব্বার্থ সংসিদ্ধ্যৈ ভবেৎ যদি নিরাময়ং। চরক।

† রোগ চতুর্ব্বিধ যথা। স্বাভাবিক, আগন্তুক, কায়িক এবং মানসিক।

রণের মধ্যে স্বাস্থ্য তত্ত্বের বহুল বিস্তার হওয়ায় এই সকল ভয়ানক রোগ ইংলণ্ড হইতে একেবারে নির্ব্বাসিত হইয়াছে। ইংলণ্ডে ম্যালেরিয়ায় এখন আর প্রায় মরিতে দেখা যায় না। পূর্ব্বে ইংলণ্ডের অসংখ্য নাবিকগণ স্কর্বি (Scurvy) রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যু মুখে পতিত হইত, কিন্তু এক্ষণে ঐ রোগ ইংলণ্ডের নাবিক সম্প্রদায়ের মধ্যে আর নাই বলিলেই হয়। এমন কি টাইফস (Typhus) বসন্ত (Small pox) ও ভীষণ যক্ষা রোগেরও ভয়ানক ভাব ইংলণ্ডে অনেকটা প্রশমিত হইয়া আসিয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ জেনর (Sir Wiliam Jenner) কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত গোবীজ টীকার পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হওয়া অবধি বসন্ত রোগের করালকবল হইতে শত শত লোক পরিত্রাণ পাইয়াছে; এবং পরিষ্কৃত বায়ু সেবন ও অপরাপর স্বাস্থ্য বিধায়ক নিয়ম পালন দ্বারা কাশরোগীদিগের আয়ু-বৃদ্ধি ও জীবন অপেক্ষাকৃত সুখসেব্য হইয়াছে।

ইংলণ্ডে স্বাস্থ্য বিদ্যার প্রকৃষ্ট উন্নতি প্রযুক্ত এইরূপে জীবনের সুখ স্বচ্ছন্দতা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে; কিন্তু আমাদিগের মধ্যে ঠিক তাহার বিপরীত ভাব দেখিতে পাওয়া যায়; আমরা প্রতিনিয়ত এত অধিক স্বাস্থ্য বিষয়ক নিয়মাদি লঙ্ঘন করিয়া থাকি যে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। আমরা যে জানিয়া শুনিয়া এইরূপে প্রকৃতির নিয়ম বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়া থাকি তাহা নহে; অনেক সময়ে স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়মাদি সবিশেষ জ্ঞাত না থাকাতেই আমরা এরূপ প্রমাদ পূর্ণ কার্য্য করিয়া ফেলি, আমাদিগের অনেক সুশিক্ষিত ব্যক্তিকেও স্বাস্থ্য নীতির মূল সূত্রের বিরুদ্ধ কার্য্য করিতে দেখা যায়। তাঁহাদিগের এরূপ আচরণ কেবল স্বাস্থ্য শাস্ত্রে সম্যক্ জ্ঞান না থাকার ফল। আমাদিগের দেশীয় বিচারক সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বহুমূত্র রোগ এত প্রবল তাহার কারণ কি?— তাহার কারণ, মানসিক পরিশ্রমের অত্যন্ত আধিক্য ও শারীরিক পরিশ্রমের একেবারে অভাব ভিন্ন আর কিছুই নহে। কেবল যে হাকিম দিগের মধ্যেই এই রূপ স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া থাকে তাহা নহে; শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অধিকাংশই এই স্বাস্থ্য ভঙ্গ দোষে দোষী। কি উকিল, কি চিকিৎসক, কি শিক্ষক, কি কেরাণী সকলেই অনবরত মানসিক শ্রম ও চিন্তায় অভিনিবিষ্ট; উপযুক্ত শারীরিক পরিশ্রমের নাম ও নাই,—এমন কি অনেকের ভাগ্যে প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে পবিত্র বায়ু সেবনও ঘটিয়া উঠে না। এদিকে আবার আজি কালি খাদ্য দ্রব্যাদি এত দুর্মূল্য যে সামান্য শ্রমজীবীদের প্রচুর পরিমাণে পুষ্টিকর আহার জুটিয়া উঠা ভার; এবং ইহার সহিত আবার তাহাদের অত্যধিক পরিশ্রম, অপরিষ্কৃত ও দুর্গন্ধময় স্থানে বহুজনে একত্রে বাস, অপরিষ্কৃত আহার ও পান

প্রভৃতি দোষ একত্রে মিলিত হইয়া আমাদের দেশকে নানা রোগের লীলাভূমি করিয়া তুলিয়াছে। ম্যালেরিয়া ও বিসূচিকা আমাদের গৃহে গৃহে সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে এবং যক্ষ্মারোগ আমাদিগের মধ্যে দিন দিন স্বীয় প্রভুত্ব বিস্তার করিতেছে। আমাদিগের মধ্যে ক্রমে যেমন সভ্যতার বিস্তার হইতেছে, আমরাও তাহার সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতার চির সহচর অহিতকর প্রথা গুলিকেও বিশেষ প্রশ্রয় দিতেছি। দেশীয় মাদক দ্রব্যের উপর আবার বিলাতী মদ্য আসিয়া আমাদের সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছে। ই সমুদায় কারণে ক্রমশঃ আমাদিগের শরীর ও মন নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে, এবং আমরা সময়ে সাবধান না হইলে আরও অমঙ্গলের সম্ভবনা। এরূপ ভয়ানক অবস্থায় একমাত্র প্রতিকার স্বাস্থ্য বিষয়ক নিয়মাদির বিশিষ্টজ্ঞান, এবং আমাদিগের দৈনিক কার্য্য কলাপে ঐ সমস্ত নিয়ম পালন, যাহাতে জন সাধারণে স্বাস্থ্য রক্ষার মূল সূত্রগুলি শিক্ষা করিতে পারে; সে বিষয়ে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের যত্নবান হওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কিরূপ নিয়মে থকিলে, অথবা কি কি অনিয়ম না করিলে, আমাদিগের শরীর নীরোগ সুস্থ ও সবল থাকে এবং মন প্রফুল্ল ও তেজস্বী হয়, তাহা সবিশেষ জ্ঞাত হওয়া প্রত্যেক মনুষ্যেরই যে একান্ত প্রয়োজনীয় ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। আজিকালি বিদ্যালয় সমূহে শরীর পালনাদি স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ক পুস্তক প্রচলিত করিয়া গবর্ণমেণ্ট আমাদিগের বচনাতীত হিত সাধন করিয়াছেন; এবং গবর্ণমেণ্টের সহিত দেশীয় কৃতবিদ্য ও ধনাঢ্য লোকেরা যোগ দান করিলে জল নির্গমন প্রণালী (Drainage) প্রভৃতি স্বাস্থ্য বিধানের অনেক স্থায়ী উপায় অক্লেশে সাধিত হইবে এ রূপ ভরসা করা যাইতে পারে।

স্বাস্থ্যশাস্ত্রের উদ্দেশ্য।

যে সকল নিয়ম পালন করিলে শরীর ও মন যথোচিত স্ফূর্ত্তিলাভ করে, সেই সকল নিয়ম সবিশেষ বিবৃত করাই স্বাস্থ্য শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। যে বায়ু আমরা প্রতি নিশ্বাসে গ্রহণ করিয়া থাকি, যে জল ও খাদ্যদ্রব্য আমাদের জীবনের অবলম্বন; যে ব্যায়াম ও অঙ্গ সঞ্চালন ব্যতিরেকে আমাদের শরীর ও মন নিশ্চেষ্ট ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে, যে বিশ্রাম ও নিদ্রা যথাকালে যথা নিয়মে উপভোগ করা জীবনের একটী প্রধান প্রয়োজনীয়, যে গৃহে আমাদিগকে পিতা মাতা কন্যা পুত্র লইয়া সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিতে হয়, যে পবিত্র বিবাহ বন্ধনের উপর আমাদের জীবনের সুখ দুঃখ, আশা ভরসা নির্ভর করে,——সেই সমুদায়ই স্বাস্থ্য শাস্ত্রের বিষয়ীভূত। কিসে রোগাদির উৎপত্তি এবং কি উপায়েই বা ব্যাধির

আক্রমণ এককালে নিবারিত হইতে পারে, তাহা নিরূপণ করাও স্বাস্থ্য শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। সংক্ষেপে, যাহা কিছু আমাদিগকে স্বস্থ—আত্মস্থ করিতে পারে, যাহা কিছু আমাদিগের স্বাভাবিক নীরোগ অবস্থার ব্যতিক্রম ঘটিতে না দেয় এবং ঐরূপ ব্যতিক্রম ঘটিলে তাহা অপসারিত করিয়া আমাদিগকে প্রকৃতিস্থ করে, তাহাই স্বাস্থ্য শাস্ত্রের অন্তর্গত।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রসাদদাস মল্লিক।

তাপ।

তাপ কাহাকে কহে? যখন আমরা কোন বস্তুর নিকটবর্ত্তী হই অথবা তাহা স্পর্শ করি তখন ঐ বস্তুসন্নিহিত শরীরাংশে একপ্রকার ভাব অনুভূত হয় তাহাতে আমরা সেই বস্তুকে উষ্ণ বা শীতল বলিয়া নির্দ্দেশ করি। একটী হেতু আমাদিগের শরীরান্তর্গত; সেটী আমাদিগের স্নায়ুসমষ্টি ও তাহার স্থূল মস্তিষ্কের ক্রিয়া বিশেষ, দ্বিতীয় কারণ যে বস্তুকে উষ্ণ বা শীতল বলি, তাহার অবস্থা বিশেষ। এই দ্বিতীয়টীই বিজ্ঞান শাস্ত্রে তাপ পদ বাচ্য। তাপ যে কি বস্তু তাহা দর্শন স্পর্শনাদি দ্বারা সম্যক্ নিরূপণ করা যায় না; ইহা কেবল ইহার ক্রিয়া দ্বারা নির্ণীত হয়। তাহা বলিয়া আমাদের এরূপ বিবেচনা করা উচিত নহে যে তাপের স্বরূপ নির্ব্বাচন আমাদিগের ক্ষমতাবহির্ভূত। অনুষ্ঠান করিয়া দেখিলে জগতের যাবতীয় বস্তুর সহিতই যে আমাদের এইরূপ পরিচয় তাহা স্পষ্ট বোধগম্য হইবে।

তাপের উৎপত্তি।

তাপের যত কারণ আছে তন্মধ্যে সূর্য্যই সর্ব্ব প্রধান। উদয়াস্তের মধ্যে সূর্য্য যে পরিমাণে তাপ বিতরণ করেন, আর সমস্ত তাপোৎপাদক বস্তু মিলিত হইয়াও তত পারে না। জ্যৈষ্ঠ মাসে মধ্যাহ্নকালে সূর্য্যকিরণে পীড়িত হইয়া আমরা সূর্য্যের উপকারিতা বিষয়ে সন্দেহ করিতে পারি কিন্তু ভূমণ্ডলের মেরুসন্নিহিত প্রদেশের তুষারাচ্ছন্ন ও জীবোদ্ভিদ বিরহিত অবস্থা মনোমধ্যে পর্য্যালোচনা করিলে স্বতঃই প্রতিপন্ন হইবে যে সূর্য্য না থাকিলে বসুন্ধরা প্রাণিগণের আবাসযোগ্য হইতে পারিত না, সূর্য্যকিরণ না পাইলে যাবতীয় জলরাশি দুর্ভেদ্য প্রস্তরবৎ কঠিন হইয়া থাকিত, অগ্নিপ্রজ্বলন তাপোদ্ভাবনের আর এক উপায়। দহ্যমান বস্তু বায়ুর অন্তর্গত পদার্থ বিশেষের সহিত সংমিলিত হইয়া পদার্থান্তরে পরিণত হয় এবং এই অবস্থা

পরিবর্ত্তনের সময় তাপ উৎপন্ন করে, অতএব দাহ্যবস্তুর উক্তরূপ অবস্থা পরিবর্ত্তনই এই অগ্নির হেতু। যেপরিমাণে দাহ্য বস্তু ব্যবহার করা যায় তাহা হইতে তাপও সেই পরিমাণে পাওয়া যায় এবং সেই বস্তুর অবস্থার পরিবর্ত্তন সমাপ্ত হইলে তাপ ও বন্ধ হয়।

ঘর্ষণ দ্বারা তাপের উৎপত্তি হয়। ব্যবহৃত বস্তুর পরিমাণের সহিত তাহার পরিমাণের কোন সম্বন্ধ নাই, যত ঘর্ষণ করা যায় ততই তাপ অনুভূত হইয়া থাকে। চকমকী ও ইস্পাতের ঘর্ষণে যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয় তাহা সকলেই] জানেন। বায়ুবেগে অরণ্য মধ্যস্থ শুষ্ক বৃক্ষাংশদ্বয় পরস্পর ঘর্ষিত হইয়া এরূপ উত্তপ্ত হয় যে কখন কখন তাহারা জ্বলিয়া উঠে এবং এই অগ্নিবলে বিস্তীর্ণ অরণ্যে অগ্নিপ্রজ্বলিত হইয়া তাহার অনেকাংশ ভস্মাবশেষ হইতে দেখা গিয়াছে। শীত প্রধান দেশে শীতের প্রভাব লাঘব করিবার মানসে ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ একপ্রকার উপায় করিয়া থাকেন, তাহাও ঘর্ষণ দ্বারা সাধিত হয়। আবাস ভূমির নিকটস্থ কোন নদী অথবা নির্ঝরের প্রবাহ মধ্যে ষ্টীমারের চাকার ন্যায় একখানা চাকা বসাইয়া দেওয়া হয়। তৎপরে তাহা কোন প্রকাণ্ড জলপাত্রমধ্যস্থ আবরণ সন্নিবিষ্ট দুই খানি বৃহৎলৌহ ফলকের সহিত এরূপে সংযুক্ত থাকে যে, জলপ্রবাহচালিত চক্রের পরিবর্ত্তনে ফলক দুইখানির পরস্পর ঘর্ষণ হয়। এই ঘর্ষণে ফলক দ্বয় ও পাত্রমধ্যস্থ জল বিলক্ষণ উষ্ণ হইয়া উঠে এবং এই উষ্ণজল নলপ্রণালী দ্বারা গৃহের চতুপার্শ্বস্থ ভিত্তির অভ্যন্তর দিয়া প্রবাহিত হইয়া তাবৎ গৃহের শৈত্য অপহরণ করে।

তাড়িত হইতেও তাপ উদ্ভূত হয়। অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন যে নদীতে জাহাজাদি নিমগ্ন হইলে তাহাকে সমগ্র উত্তোলন করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে, তখন তাহাকে জলের ভিতরেই ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া ভগ্ন অংশগুলি ক্রমে ক্রমে বাহির করা হয়, জাহাজ খানিকে ভাঙ্গিবার জন্য তাহার ভিতরে বারুদ প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়া তাপ সংযোগ করিতে হয়; কিন্তু এরূপ স্থলে বারুদে অগ্নিসংযোগ করা আর সম্মুখবর্ত্তী যমের নিকট আত্ম সমর্পণ করা সমান কথা। এই বারুদ আওয়াজ করিবার নিমিত্ত তারদ্বারা দূরস্থ তাড়িত যন্ত্রের সহিত সংযুক্ত করিয়া তদ্বারা কার্য্য সমাধা করা হইয়া থাকে। তাড়িতালোক যিনি দেখিয়াছেন, তিনি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন যে, তাড়িত হইতে কিরূপ তাপ উৎপন্ন হইয়া থাকে। অধিকাংশ প্রাণিগণের শরীর অহোরাত্র

ঈষদুষ্ণ অবস্থায় থাকে, সুতরাং প্রাণিশরীরও একটী তাপোদ্ভাবক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক সেই তাপ প্রাণিশরীরাভ্যন্তরে খাদ্যাদির পরিপাক দ্বারা উৎপন্ন হয় ও সেই পরিপাক দাহন ক্রিয়া ব্যতীত আর কিছুই নহে।

ভূতত্ত্ববিদ্যা দ্বারা আমরা অবগত হই যে, পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ উপরিভাগ অপেক্ষা সমধিক উত্তপ্ত। পারিস নগরে একটী গভীর কূপ খনন করা হইয়াছে, তাহার গভীরতা ১৭৯৪ ফুট, ইহার জল পারিসের জলঅপেক্ষা ৩১০ অংশ উচ্চ। মণ্ডবুক্ নামক স্থানে আর একটী কূপ আছে, সেটী ২২০০ ফুট গভীর ও তাহার জল উপরিস্থ বায়ু অপেক্ষা ৩৯° অংশ উষ্ণ। পুরাতন গভীর খনির ভিতরেও এইরূপ আভ্যন্তরীন তাপের প্রমাণ পাওয়া যায়, উপরিলিখিত দুইটী কূপের উদাহরণ দ্বারা দৃষ্ট হইবে যে ন্যূনাধিক ৫৭ ফিট নিম্নে গমন করিলে ১ এক অংশ তাপের বৃদ্ধি হয়, আরও দেখা গিয়াছে যে, যত নিম্নে যাওয়া যায় ততই শীঘ্র শীঘ্র তাপের বৃদ্ধি হয়। কিন্তু অন্ততঃ এই নিয়মে সমানরূপে তাপের বৃদ্ধি হইলে ভূপৃষ্ঠ হইতে দুই মাইল নিম্নে যেরূপ উষ্ণতা যাহাতে জল ফুটিতে পারে ও ৩০। ৪০ মাইল নিম্নে ভূমণ্ডলস্থ সকল বস্তুই তরল হইয়া যাইবে। বাস্তবিক ও পৃথিবীর ভিতর যে, এইরূপ অবস্থায় আছে, তাহার ভূরি ভূরি নিদর্শন পাওয়া যায়— মুঙ্গের নগরের সান্নিধ্যে সীতাকুণ্ড নামক যে প্রস্রবণ আছে তাহার জল এরূপ উষ্ণ কেন? ইহার কারণ আর কিছুই নহে, কেবল স্থান বিশেষে বৃষ্টির জলের কিয়দংশ তত্রস্থ মৃত্তিকার শৈথিল্যবশতঃ নিম্নগামী হয়, যত নিম্নে যায় ততই উষ্ণ হইতে থাকে, পরে কিয়দ্দূর অধোগমনের পর কোন কঠিন স্তর বিশেষে প্রতিহত হইয়া স্তর বিন্যাসের অবস্থা অনুসারে ক্রমশঃ উর্দ্ধগামী হইয়া উপরে ভাসিয়া উঠে। যদি সেখানকার ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগ—যথা হইতে জলনিম্নে গমন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল সে স্থান অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত নিম্নতর হয়, তবে তরল পদার্থের সাধারণ গুণ অনুসারে ঐ জল পূর্ব্বোন্নতি লাভের আশায় উর্দ্ধমুখ হইয়া প্রস্রবণ রূপে পরিণত হয়, যদি জল অধিক নিম্নে গিয়া উপরে উঠে তবে নীচের উষ্ণতাবশতঃ ফুটিতে থাকে অর্থাৎ তাহার কিয়দংশ বাষ্পাকারে পরিণত হয় এবং সেই বাষ্পের অপরিসীম তাপে সমস্ত জলরাশি তীব্র বেগে উপরে উৎক্ষিপ্ত হইয়া, আগ্নেয় গিরি র অগ্ন্যুদগম

ও এই ভূমধ্যস্থ উত্তাপের পরিচায়ক হয়। এই আভ্যন্তরীণ উত্তাপ যে উপরের পদার্থ সমূহের অবস্থার কোন না কোন প্রকার বৈলক্ষণ্য সম্পাদন করিতে পারে তাহতে আর অনুমাত্র সংশয় নাই।

তাপের কারণ যাহাই হউক কারণভেদে তাপের গুণভেদ হয় না অতএব আমরা এক্ষণে তাপের প্রধান প্রধান গুণ বা ক্রিয়া বর্ণন করিব।

সাধারণতঃ তাপ শব্দের অর্থ আর একরূপ, আমরা বস্তুবিশেষে যে পরিমাণ তাপ অনুভব করিতে পারি, তাহাই সেই বস্তুতে, তাপের যথার্থ পরিমাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করি। কোন বস্তুকে অন্যান্য বস্তু অপেক্ষা শীতল দেখিলে বিবেচনা করি যে তাহাতে তাপের সম্পূর্ণ অভাব এবং তাহাতে শৈত্য অধিক আছে। বাস্তবিক শৈত্য বলিয়া কোন পদার্থ নাই। যেরূপ অন্ধকার, বাস্তবিক কোন পদার্থ নহে, আলোকের অভাবই অন্ধকার, সেইরূপ আপাত প্রতীয়মান তাপের অভাবকেই শৈত্য কহা যায়। কোন বস্তুই তাপ বিহীন নহে; সকল বস্তুতেই প্রচুর পরিমাণে তাপ বিদ্যমান আছে এবং কোন বস্তুতে তাপের যথার্থ পরিমাণ যে কি তাহার নিরূপণ হয় নাই। তবে আমাদিগের তাপের জ্ঞান তুলনা সাপেক্ষ; কোন বিশেষ বস্তুর সহিত তুলনায় যাহাতে অধিক তাপ প্রতীয়মান হয় তাহা——উষ্ণ ও যাহার তাপ আপাততঃ অল্প বলিয়া বোধ হয় তাহাকে আমরা শীতল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকি। বাস্তবিক যে বস্তু আমাদিগের চর্ম্ম সন্নিহিত স্নায়ুগণের আকুঞ্চন সম্পাদন করে, তাহাকে শীতল ও যে বস্তু তাহার বিপরীত আর্থাৎ প্রসারণ ক্রিয়া-সম্পাদন করে তাহাকে উষ্ণ কহা যায়। আপেক্ষিক গুরুত্ব পর্য্যালোচনার সময় ইহার সম্যক্ আলোচনা করা যাইবে—আপাততঃ নিম্ন লিখিত উপায়ে ইহার যাথার্থ কথঞ্চিৎ উপলব্ধি হইবে।

একটী পাত্রে কিঞ্চিৎ জল আনিয়া তাহা দুই সমান ভাগে বিভক্ত করিয়া দুইটী একই প্রকার পাত্রে স্থাপিত কর, আর দুইটী পাত্র লও, একটীতে যে জল বিলক্ষণ উষ্ণ বলিয়া বোধ হইবে এরূপ জল ও অপরটীতে সমধিক শীতল জল রক্ষা কর। শেষোক্ত দুইটী পাত্রে কিয়ৎকাল দুইটী হস্ত নিমজ্জিত করিয়া রাখ, পরে এককালে উঠাইয়া লইয়া পূর্ব্বের দুইটী পাত্রে ডুবাইয়া দেও। এই দুইটীর জল যে সম্পূর্ণরূপে এক ভাবাপন্ন তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। তথাপি যেটীর মধ্যে উষ্ণ হস্তটী স্থাপিত হইয়াছে সেটী শীতল বোধ হইবে ও—— যেটীতে শীতল হস্তটী রাখা হইয়াছে তাহাকে উষ্ণ বোধ হইবে। এখন দেখা যাউক এরূপ প্রতীতি হওয়ার কারণ কি। হস্ত প্রথমে উষ্ণ জলে নিমজ্জিত হয়, তাহার স্নায়ু সমস্ত তাপ সংযোগে প্রসারিত হইয়াছিল এবং পুনরায় সামান্য জলে

স্নায়ুগণ পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইতে লাগিল, অর্থাৎ তাহারা অপেক্ষাকৃত আকুঞ্চিত হইতে আরম্ভ হইল এবং সেই জন্য সামান্যাবস্থার জল শীতল বোধ হইল, আর শীতল জল হইতে উত্থিত হস্তের প্রকুঞ্চিত স্নায়ু অপেক্ষাকৃত উষ্ণজল সংস্পর্শে পুনঃ প্রসারিত হইয়া প্রকৃত জলের উষ্ণতা প্রতিপাদন করিল। এইরূপে ক্রমশঃ আরও বুঝা যাইবে যে আমাদিগের সামান্য অনুমান এ বিষয়ে অনেক স্থলে বিলক্ষণ ভ্রম মূলক।

কোন বস্তুতে উক্ত তাপ প্রবিষ্ট হইলে সেই তাপ তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া যায় অর্থাৎ তাহার যে সমস্ত ক্রিয়া দেখা যায়, তাহা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক অংশ বস্তুকে উত্তপ্ত করে, দ্বিতীয় অংশ বস্তুর অণুগণের পরস্পর আকর্ষণ হ্রাস করিয়া তাহার আয়তন বৃদ্ধি করে অথবা সেই আকর্ষণ যথেষ্ট পরিমাণে শিথিল করিয়া অণুগুলিকে বিভিন্ন প্রকারে বিন্যস্ত করিয়া তাহার রূপান্তর করিয়া দেয়। এই দুইটী ক্রিয়া আভ্যন্তরীণ ক্রিয়া। তৃতীয়তঃ জড় পদার্থ সমুদায় বায়ু দ্বারা পরিবেষ্টিত আছে এবং চতুঃপার্শ্বস্থ বায়ুরাশির ভার ও তাহার উপর ন্যস্ত আছে, অগ্নিসংযোগে বস্তুর আয়তন বৃদ্ধি করিতে হইলে পার্শ্বস্থ বায়ুরাশিকে স্থানান্তরিত করিতে হইবে, ইহাতে যে বলের আবশ্যক তাহাও তাপ হইতে উদ্ভূত হয়।

প্রায় বস্তু মাত্রেই তাপ সংযোগে বর্দ্ধিতায়তন হয়। বায়বীয় পদার্থের বৃদ্ধি অত্যন্ত অধিক। তরল পদার্থ তদপেক্ষা অল্প বাড়ে ও ঘন বস্তু অতি অল্পমাত্র বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

ঘন পদার্থ যে উত্তপ্ত হইলে বাড়ে তাহা নিম্নের প্রক্রিয়া দ্বারা বুঝিতে পারা যায়। ক খ একটী ধাতু নির্ম্মিত, শলাকা তাহার খ প্রান্ত স্ক্রু দ্বারা বদ্ধ ও ক প্রান্ত দ চিহ্নিত ছিদ্রের ভিতর দিয়া ক ট কাঁটার ক্ষুদ্র বাহুতে সংলগ্ন ও ঐ কাঁটাটীর দীর্ঘতর বাহু সমান সমান কারক ভাগে বিভক্ত, একটী বৃত্তের দিকে মুখ করিয়া রহিয়াছে, যদি কোন স্বর্ণকারের হাপর ক খ শলাকার নিম্নে রাখিয়া উহাকে উত্তপ্ত করা যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে কাঁটাটীর মুখ উর্দ্ধে উঠিয়াছে, ইহার দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, ক খ শলাকা অবশ্য আয়তনে বাড়িয়াছে, নতুবা কাঁটাটীর ক্ষুদ্রতর বাহুটী যে নিম্ন দিকে সরিয়া গেল তাহার কারণ কি? খ প্রান্ত স্ক্রু দ্বারা আবদ্ধ থাকায় সমস্ত বৃদ্ধি ক প্রান্তেই দেখা যাইতেছে, আবার যখন শলাকা শীতল হইয়া যাইতে আরম্ভ করিবে তখন কাঁটাটী ক্রমে নিম্নে নামিতে
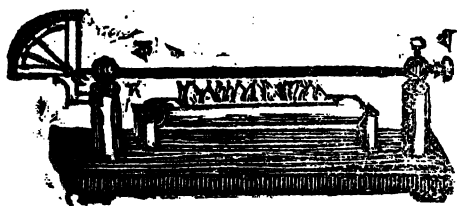
আরম্ভ করিবে, উপরি লিখিত উপায়ে বস্তুর দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া গেল কিন্তু বাস্তবিক যে কেবল রৈখিক বৃদ্ধি হয়, এরূপ নহে বৃদ্ধি সকল দিকেই হয়।

একটী লৌহ গোলাকার ব্যাস ক চিহ্নিত বলয়াকৃতি ছিদ্রের ব্যাস অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ছোট। শীতল অবস্থায় ছিদ্রের উপর গোলকটী স্থাপন করিতে গেলে গলিয়া পড়িয়া যাইবে। যদি গোলকটীকে উত্তপ্ত করিয়া উত্তমরূপে বসান যায় তাহা হইলে গোলকটীর আয়তন এত বৃদ্ধি পাইয়াছে দেখা যাইবে যে উহাদের ছিদ্রের ভিতর বসাইলে আর পড়িয়া যাইবে না। গোলক টীকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া যেরূপে দেখ কোন রূপেই গলিয়া পড়িবে না। অতএব গোলকটী যে সকল দিকেই সমান রূপে বাড়িয়াছে
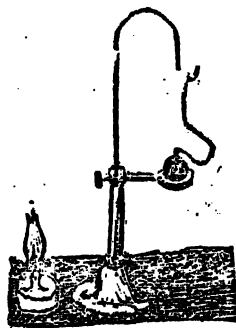
তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। আবার গোলকটী শীতল হইলেই আপনা হইতেই ঐ ছিদ্রের ভিতর দিয়া নিম্নে পড়িয়া যাইবে। বাষ্পীয় শকট চালনার জন্য যে লৌহবর্ম্ম প্রস্তুত হয়, তাহাতে রেল বসাইবার সময় দুই খণ্ড রেলের মধ্যে কিঞ্চিৎ অবকাশ রাখা হয় ইহার উদ্দেশ্য কি? গাড়ীর চাকার ঘর্ষণে ও রৌদ্র উত্তাপে রেলের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি হইয়া অবশেষে রেল গুলি মুখে মুখে লাগিয়া উর্দ্ধ দিকে উঠিয়া পড়িতে পারে, ইহাই ঐ ফাঁক রাখিবার যথার্থ কারণ। পুস্তক ও পাতলা কাষ্ঠ প্রভৃতি রৌদ্র লাগিলে যে তাহা বক্রভাব ধারণ করে তাহার কারণও এই। রৌদ্রের উত্তাপ উপরিভাগে অপেক্ষাকৃত অধিক লাগে, সেই জন্য উপরিভাগ দৈর্ঘ্য প্রস্থে কিঞ্চিৎ বড় হয়, কিন্তু একই বস্তুর দুই পৃষ্ঠে অসমান হইতে গেলে সরল থাকা অসম্ভব, এই হেতু বক্রভাব ধারণ করে। দুইটী সম কেন্দ্রিক বৃত্তের মধ্যে ভিতরের পরিধি ছোট ইহাতেই বুঝা যাইবে যে, যে পৃষ্ঠটী রৌদ্রে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহা ক খ অংশের ন্যায় ও অপর পৃষ্ঠটী গ ঘ চিহ্নিত অংশের ন্যায় আকার ধারণ করে।

তরল পদার্থের বৃদ্ধি দেখাইতে হইলে একটী সূক্ষ্মনলযুক্ত বড় কাঁচের ফাঁপা বর্ত্তুলের ভিতর জল পুরিয়া দাও, জলদ্বারা সমস্ত বর্ত্তুল ও নলের কিয়দংশ পূর্ণ কর। বর্ত্তুলের নিম্নভাগে কোনপ্রকার তাপপ্রয়োগ করিলে জলের সীমা উর্দ্ধে উঠিয়াছে দেখিতে পাওয়া যাইবে ঐ জলে

একটু ম্যাজেন্টা গুলিয়া দিলে জলের বৃদ্ধি স্পষ্ট লক্ষিত হইবে। বায়বীয় পদার্থের বৃদ্ধিও এই যন্ত্রের দ্বারাই দেখিতে পারা যায়, বর্ত্তুলটীতে জল বা অন্য পদার্থ না পুরিলে তাহা স্বতই বায়ু পূর্ণ থাকিবে। অতি স্বল্পভাগ পারদ সূক্ষ্ম নলের ভিতর কিঞ্চিৎ নিম্নে প্রবেশ করাইয়া দাও, নলটী সূক্ষ্ম থাকা প্রযুক্ত পারদ রেখার নিম্নস্থ বায়ু উপরে বা উপরের বায়ু নিম্নে উহার ভিতর দিয়া যাইতে পারিবে না। এক্ষণে যদি অতি সামান্য তাপ প্রয়োগ করা যায়, এমন কি বর্ত্তুলটীর নিকট হাত লইয়া গেলেও আয়তন বৃদ্ধি এত অধিক হয়, যে পারদ রেখাটী অতি শীঘ্র নলের উপরিভাগে ও অবশেষে একেবারে নলের বাহিরে নিক্ষিপ্ত হয়।
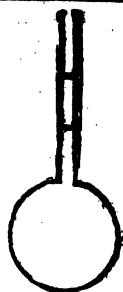
তরল পদার্থের বৃদ্ধি যে ঘন পদার্থ অপেক্ষা অধিক, তাহা ম্যাজেণ্টারঞ্জিত জলপূর্ণ বর্ত্তুলের ক্রিয়া মনোযোগ পূর্ব্বক লক্ষ্য করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে। প্রথমে যখন তাপ দিতে আরম্ভ করা যায়, তখন জলের সীমা নীচে নামিতে থাকে কিয়ৎকাল পরেই আবার তাহা উপরে উঠিতে আরম্ভ করে ও পূর্ব্বসীমা অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায়। ইহার কারণ এই যে যখন প্রথমে তাপ প্রদত্ত হয়, তখন কাচ পাত্রটী অগ্রে উত্তপ্ত হয় ও অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত হয়, সেই জন্য নলের সীমা নিম্নে নামিয়া পড়ে, পরে যত বিলম্ব হয় ততই ভিতরের জল উত্তপ্ত হইয়া উঠে এবং ক্রমে তাহার পরিমাণ এত বৃদ্ধি হয় যে কাচ বর্ত্তুলের বৃদ্ধি সত্বেও জলের সীমা পূর্ব্বাপেক্ষা উচ্চে উঠে। এতদ্বারা ইহাও দেখিতে পাওয়া গেল যে কোন পাত্রস্থ তরল বা বায়বীয় বস্তুর বৃদ্ধি অবধারণের সময় অথবা সেই পদার্থটীর যথার্থ বৃদ্ধি দেখিতে পাই না। পাত্রটীর আয়তন বৃদ্ধি ও পাত্রস্থ বস্তুর বৃদ্ধি এই দুয়ের অন্তরই আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হয়, যখন আমরা তাপমাণ যন্ত্রের বর্ণনার পর কোন্ পদার্থ তাপ সংযোগে কত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহা নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হইব তৎকালে এই কথাটী স্মরণ করা আবশ্যক হইবে।

উত্তপ্ত বস্তু শীতল হইলে কমিয়া আসে বটে কিন্তু অনেক বস্তু এরূপ আছে যে তাহারা এককালে উত্তপ্ত হইলে পুনরায় আর পূর্ব্বায়তন প্রাপ্ত হয় না। দস্তা সীসা ও আর দুই একটী ধাতু এবং কোন কোন প্রকার কাচ ও এইরূপ শীতল হইলে কমিয়া যায় বটে কিন্তু পূর্ব্বে যেরূপ ছিল তাহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বড় থাকে। সুতরাং বার বার উত্তপ্ত করিলে বারংবারই আয়তন বৃদ্ধি হইয়া অবশেষে অনেক বড় হইয়া পড়ে। ইংলণ্ডদেশে বরফ পড়িয়া ছাদে জমিয়া থাকে এই জন্য সেখান

কার ছাদ এতদ্দেশীয় চালাঘরের ন্যায় ক্রমে নিম্নগামী অর্থাৎ ঢালু করা হয় ও তাহার উপর সীসা ঢালিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু ইহাতে সীসার উপযুক্ত দোষ বশতঃ সময়ে সময়ে মহান্ অনর্থ উপস্থিত হয়। কোন বড় গির্জ্জার ছাদে এইরূপ সীসা ঢালিয়া দেওয়াছিল, বৎসর বৎসর সীসা ২। ১ইঞ্চি করিয়া বাড়িয়া (আসিলে ও তাহা খাটিয়া যায়, কিন্তু এদিকে ভিতরে যে কি ক্ষতি হইতেছিল তাহা কেহই লক্ষ্য করেন নাই।) যে কাষ্ঠের ছাদের উপরে ঢালা ছিল তাহার ভিতরেও প্রবেশ করিয়াছিল, রৌদ্রে বাড়িবার সময় সেই ছাদের বন্ধন ক্রমশঃ শিথিল করিয়া দিয়া- ১০। ১২ বৎসর পরে হঠাৎ একদিন সমস্ত ছাদ ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গেল বিজ্ঞান শাস্ত্রের সমধিক অনভিজ্ঞতাই এরূপ ক্ষতির মূল।

প্রথমেই লিখিত হইয়াছে যে প্রায় বস্তুমাত্রেই তাপসংযোগে বাড়ে। কিন্তু কোন কোন বস্তু উত্তপ্ত হইলে না বাড়িয়া কমিয়া যায়। রবর এই প্রকৃতির বস্তু রৌপ্যে একটী ভৌতিক লবণ আছে তাহাও এইরূপ, এতদ্ভিন্ন জল ও তাপের পরিমাণ বিশেষে এই অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

ক্রমশঃ

শ্রীকিশোরিমোহন সেনগুপ্ত

তত্ত্ব সংগ্রহ

১। পতঙ্গ জাতির শারীরিক বল অপরাপর জন্তুর অপেক্ষা বড় কম নহে। পিপীলিকারা তাহাদের নিজের দেহ অপেক্ষা দশ কুড়ি গুণ বড় সামগ্রী সচরাচর বহন করিয়া লইয়া গিয়া থাকে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গাড়ী তৈয়ারি করিয়া তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভারী জিনিষ চাপাইয়া নানা জাতীয় পতঙ্গের গায়ে বান্ধিয়া দিয়া টানাইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে। এই সকল পরীক্ষায় জানা গিয়াছে যে জীব জন্তু দিগের শারীরিকবল তাহাদের শরীরের আয়তনের উল্টা পরিমাণে (Inverse Ratio.) হইয়া থাকে; অর্থাৎ কোন প্রাণীর শরীর যত ক্ষুদ্র তাহার বল তত বেশী; এবং সেই নিমিত্ত শরীরের তুলনায় ক্ষুদ্রতম পতঙ্গই সর্ব্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ। ইহাও সপ্রমাণ হইয়াছে যে সামান্য একটা মাল পোকা কিম্বা মৌমাচী একটা ঘোড়া অপেক্ষা অনেক পরিমাণে বেশী বলবান্। কারণ একটা ঘোড়া তাহার শরীরের ওজনের

৬৭ ভাগের ১ ভাগের অধিক বল প্রয়োগ করিতে পারে না, কিন্তু একটা মৌমাছী তাহার দেহ অপেক্ষা ২০ গুণ ভারী ক্ষুদ্র গাড়ী অবলীলাক্রমে টানিয়া লইয়া যাইতে পারে। তবে উড়িবার সময় তাহাদের নিজের শরীরেরভার বহন করিতে হয় ও উড়িতে অনেকটা জোর লাগে বলিয়া, উড্ডীয়মান্ অবস্থায় পতঙ্গেরা তাহাদের দেহ অপেক্ষা অধিক ভারী জিনিষ বহন করিতে পারে না।

বালক মাত্রেই মালপোকার শারীরিক বলের বিষয় বিলক্ষণ অবগত আছে। বড় বড় ইষ্টকখণ্ড ধরাইয়া দিলে, মালপোকারা সেই ইটখানা পায়েরদ্বারা কতজোরে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে তাহা বালকেরা বেশ জানে। এক জাতীয় মালপোকার সম্বন্ধে জর্ম্মণি দেশে এক কৌতুকাবহ লোক প্রবাদ প্রচলিত আছে। তথাকার সামান্য লোকেদের মনে ধারণা এই যে ঐ জাতীয় মালপোকায় জলন্ত কয়লা মুখে করিয়া বহন করিয়া থাকে এবং তাহাদেরদ্বারাই অনেক বড় বড় অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়! (Scientific American.)

২। অনেকে শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন যে ১৮৮১ সালে অন্যূন ২৪৪ টা ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। এই সকলের মধ্যে কাইঅস্ (Chios.) নামক স্থানের ভূমিকম্পটিই অত্যন্ত ভয়ানক হইয়াছিল। ইহা উপর্য্যুপরি ছয় দিন ধরিয়া হইয়াছিল এবং ইহাতে ৪১৮১ জন লোকের প্রাণনাশ হইয়াছে। ইহার নীচেই ইটালীর নিকটস্থ ইস্কিয়া (Ischia.) নামক দ্বীপের ভূমিকম্প; ইহাতেও প্রায় দেড় শত জন লোক মরিয়াছে। বিস্থবিয়স্ মানমন্দির (Vesuvius Observatory.) স্থিত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম যন্ত্রদ্বারা এই সকল ভূকম্প ততদূর জানা যায় নাই; সুইজর্লণ্ডেই অধিকাংশ আবশ্যকীয় পর্য্যবেক্ষণ করা হইয়াছিল। পৃথিবীর কম্পবাহক শক্তি সম্বন্ধে জাপানে পালনামক একজন সাহেব (Prof H. M. Paul.) অনেক গুলি নূতন রকমের পরীক্ষা করিয়াছেন। তিনি যে যন্ত্র ব্যবহার করিয়াছিলেন, সেটি অতি সামান্যরূপ যন্ত্র বটে কিন্তু বেশ সূক্ষ্ম। মাটিতে একটি খোঁটাপুঁতিয়া ঐ খোঁটাটির উপরিভাগে একটি টিনের পাত্র স্ক্রু দ্বারা আঁটা থাকে, ঐ পাত্রের ভিতরে খানিক পারা ঢালিয়া; পারাটুকু কিছু পুরু করিবার জন্য তাহাতে আর একটি ধাতু মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হয়। একমাইল দূরে রেলগাড়ী যাইলে, মাটি কম্পিত হওয়ায়, পাত্রস্থিত পারদ ও কম্পিত হইয়া উটে; এমন কি ৫০০ ফুট (৩৩৩ হাত) দূরে একখানা সামান্য গাড়ীর চাকায় একটা ইঁট কি পাথর বাঁধিলে তাহার উপর দিয়া আসিবামাত্র মাটিতে গাড়ির যে একটা ধাক্কা লাগে তাহাতেও দর্পণ সদৃশ পারদের উপরিভাগে একটি ক্ষুদ্র তরঙ্গ উদ্ভূত হয়।— (Graphic. July, 1882.)

আর্য্যজাতির অলঙ্কারশাস্ত্র।

অল্প কথায় অধিক বলিতে পারা বিচক্ষণতার সর্ব্ব প্রধান লক্ষণ। মনোবৃত্তি ও কার্য্যবুদ্ধি সুপরিপক্ক না হইলে ওরূপ বিচক্ষণতার উপচয় হইতে পারে না। উহা অল্প বুদ্ধি বা অল্প ব্যুৎপত্তির কার্য্য নহে।

কিন্তু মিতভাষী হওয়া উচিত বলিয়া জটিলভাষী বা অস্ফুটভাষী হওয়া উচিত নহে। কথিত আছে যে, গ্রীসদেশে এক সম্প্রদায় নৈয়ায়িক ছিলেন, তাঁহারা কথা কহাই দোষের বিষয় মনে করিতেন। আর্য্য সাহিত্য আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, তাঁহাদের মধ্যে কোন কোন সম্প্রদায় জটিল বা অস্ফুটভাষিতাকেই পাণ্ডিত্যের সর্ব্ব প্রধান পরিচায়ক মনে করিয়া গিয়াছেন। উয়িলিয়াম্‌স প্রভৃতি ইংরেজ পণ্ডিতেরা কহেন যে, আর্য্যেরা শূদ্র জাতির অনধিগম্য করিবার নিমিত্তই শাস্ত্র সকল জটিল বা অস্ফুটভাবে রচনা করিয়া গিয়াছেন। যাহাই হউক, আমরা মিতভাষিতার পক্ষপাতী বলিয়া জটিল বা অস্ফুটভাষিতার পক্ষপাত করিতে চাহি না। রচনা বিষয়ে ইংরেজ লেখকেরা আমাদের আদর্শস্থানীয় সন্দেহ নাই। দর্শন ও রাজনীতি সম্বন্ধে ইঁহাদের রচনাপ্রণালী আর্য্যজাতির অনুকার্য্য বলিলেও দোষ হইতে পারে না। কিন্তু বোধ হয়, বলিলে রূঢ় হইবে না যে, অলঙ্কার বা ব্যাকরণ সম্বন্ধে ইঁহারা যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহাতে বহুভাষিতার বিশেষ প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হইয়া থাকে। ইঁহারা অনেক কথাই বলিয়াছেন, কিন্তু ইঁহাদের কথার সম্পূর্ণতা দেখিতে পাওয়া যায় না। ইঁহারা কেবল ব্যাখ্যা করিয়াছেন মাত্র, কিন্তু সূত্র করিতে পারেন নাই। ইঁহারা যাহা দশ পৃষ্ঠায় শেষ করিতে পারেন নাই, আর্য্যেরা তাহা এক ছত্রে শেষ করিয়াছেন।

সাহিত্যই অলঙ্কার শাস্ত্রের সমালোচনার বিষয়। সাহিত্য দুই প্রকার। কাব্য ও সাধারণ সাহিত্য। আর্য্যদিগের অলঙ্কার শাস্ত্রের দোষ গুণ পরিচ্ছেদে উভয় প্রকার সাহিত্যেরই প্রসঙ্গ দেখা যায়; কিন্তু অন্যান্য পরিচ্ছেদে প্রধানতঃ কাব্যেরই আলোচনা করা হইয়াছে। অতএব আমরাও সর্ব্বপ্রথমে তাহাই করিতেছি।

কাব্য কাহাকে কহে, এই প্রশ্ন উপস্থিত হওয়াতে দণ্ড্যাচার্য্য কহিতেছেন যে, যে বাক্যে চমৎকারিত্ব আছে, অর্থাৎ যাহাতে এমন কিছু আছে যে, শুনিবামাত্র মনে লগ্ন হয়, তাহাই কাব্য। মম্মটাচার্য্য কহেন যে, যে শব্দার্থে দোষ নাই, অথচ গুণ

আছে এবং প্রায়ই অলঙ্কার আছে, তাহাই কাব্য। বিশ্বনাথ কহেন যে, যাহাতে রস আছে, এরূপ বাক্যই কাব্য। আমরা এস্থলে চমৎকারিত্ব, রস ও গুণ একই ভাবিয়া থাকি। চমৎকারিত্ব শব্দের অর্থ স্পষ্ট। রস নয় প্রকার যথা—

"শৃঙ্গার হাস্য করুণ রৌদ্র বীর ভয়ানকাঃ।
বীভৎসাদ্ভুত ইত্যষ্টৌ রসাঃ শান্তস্তথা মতাঃ॥"

—শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত এই আট এবং শান্ত (এই নয়) রস।

পাছে এই স্থলে জিজ্ঞাসা হয় যে, যদি রস এই নয় প্রকারই হইল, তবে যে সকল বর্ণনায় এই নয় রসের কোন রসই নাই, অথচ যে সকল রচনা এত মধুর যে, তাহাদিগকে কবিত্বের প্রসব না বলিয়া থাকা যায় না, সে সকল কি কাব্যের অন্তর্গত হইবে না—পাছে এইরূপ জিজ্ঞাসা হয়, এই নিমিত্ত নিম্নলিখিত লক্ষণ করা হইয়াছে;—

রস ভাবৌ তদাভাসৌ ভাবস্য প্রশমোদয়ৌ।
সন্ধিঃ শবলতা চেতি সর্ব্বেপি রসনাদ্রসাঃ॥

রস, ভাব, রসাভাস, ভাবের প্রশম ও উদয়, ভাবসন্ধি ও ভাবশবলতা ইহারাও রসের অন্তর্গত। এস্থলে ভাব শব্দের অর্থ সহজ কথায় বলিতে গেলে, মনের ভাব বা প্রবৃত্তিমাত্র বুঝাইতে পারে। যে বর্ণনা পাঠ করিলে কোন প্রকার প্রবৃত্তির উদয় হয় বা এক প্রকার প্রবৃত্তির প্রশম হইয়া অন্য প্রকারের উপচয় হয়, তাহাতেও রস আছে বুঝিতে হইবে। ব্রুটস্ যখন বক্তৃতা করিলেন, তখন রোমবাসীরা সিজারের প্রতি বিষম বিরক্ত হইল, আবার যখন তাহার পর আণ্টোনী বক্তৃতা করিলেন, তখন তাহারা সিজারের প্রতি বীতবিরাগ ও আণ্টোনী সম্প্রদায়ের প্রতি অনুরক্ত হইয়া উঠিল।

অসঙ্গত স্থলে রস হইলে তাহাকে রসাভাস কহে। যেমন বেশ্যার প্রণয়, যেমন গুরুজনের কোন প্রকার আকারভঙ্গী-দর্শনে হাস্যোদয় ইত্যাদি। এই স্থলে তর্ক হইতে পারে, অর্থাৎ কেহ হয়তো বলিতে পারেন যে, সীতাদির রূপ, যৌবনাদি দর্শনে রামাদির যে মনোবিকার হয়, তাহাকেই কি রস বলে? এইরূপ জিজ্ঞাসার উত্তরে বলা হইয়াছে যে, রামাদির মনোবিকারকে রস বলে না, যখন রামাদির মনোবিকার পাঠকের হৃদয়ে প্রতিফলিত হয়, তখনই উহাকে রস বলা যায়। যে ব্যক্তি দুর্ভিক্ষ স্বয়ং দর্শন করে, তাহার কখন রস হয় না, পরন্তু তাহার কেবল শোকই হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি উহার বর্ণনা পাঠ করে, তাহারই করুণ রস হয়।

ভাব সন্ধি অর্থাৎ যেমন কথায় বলে "হর্ষও হইতেছে, আবার বিষাদও হইতেছে।" এইরূপ স্থলেই ভাবসন্ধি বলা যায়। ভাবশবলতা অর্থাৎ নানা ভাবের একত্রীভাব, যেমন ঔৎসুক্য, ব্রীড়া, আহ্লাদ, জড়তা ইত্যাদি।

ইহাতে বোধ হইতেছে যে রস শব্দের অর্থ ও চমৎকারিত্ব শব্দের অর্থ বাস্তবিক ভিন্ন নহে।

মম্মটাচার্য্য যে লক্ষণ কহিয়াছেন, তাহা মূলে এইরূপ আছে যথা "তদদোষৌ শব্দার্থৌ সগুণাবনলঙ্কৃতী পুনঃ ক্বাপি।" অর্থাৎ নির্দোষ যে শব্দ ও অর্থ—তাহাই কাব্য—কিন্তু ঐ শব্দ ও অর্থ সগুণ অর্থাৎ গুণযুক্ত হওয়া চাই—তাহাতে আবার অলঙ্কারও থাকা চাই—দুই এক স্থলে অলঙ্কার না থাকিলেও চলে। মম্মটাচার্য্যের উদ্দেশ্য দণ্ডী বা বিশ্বনাথের উদ্দেশ্য হইতে বাস্তবিক পৃথক নহে; কিন্তু তাঁহার লক্ষণটী অপেক্ষাকৃত জটিল ও অসম্পূর্ণ। রসের লক্ষণ এইরূপ করা হইয়াছে যথা—

"বিভাবেনানুভাবেন ব্যক্তঃ সঞ্চারিণা তথা।
রসতামেতি রত্যাদিঃ স্থায়ী ভাবঃ সচেতসাং॥"

(সচেতসাং) ইহার অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি রসাস্বাদ করিবে, তাহার 'সহৃদয়' হওয়া চাই। এইরূপ লোকের অন্তঃকরণে রতি প্রভৃতি যে সকল স্থায়ী ভাব আছে, তাহারাই রস হয়। স্থায়ী ভাব অর্থাৎ মানুষের সহজাত ভাব বা স্বাভাবিক ভাব। আলঙ্কারিকেরা স্থির করেন যে, মানুষের ঐরূপ ভাব নয়টি যথা রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা বা ঘৃণা, বিস্ময় ও বিরাগ। রতি অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষগত অনুরাগ, অন্যান্য অর্থ সহজ।

পূর্ব্বে যে সকল রসের নাম করা হইয়াছে, রতি হাস প্রভৃতি পর্য্যায়ক্রমে তাহাদের স্থায়ী ভাব যথা।—

রস—	আদি	হাস্য	করুণ	রৌদ্র	বীর	ভয়ানক	বীভৎস	শান্ত
স্থায়ী—	রতি	হাস	শোক	ক্রোধ	উৎসাহ	ভয়	জুগুপ্সা	বিরাগ

মানুষের এই সকল স্থায়ী ভাব, বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী ভাব যোগে পরিস্ফুট হইলে তাহাকেই রস বলে। এখন বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী ভাবের ব্যাখ্যা করিতে হইতেছে। ভিন্ন ভিন্ন স্থায়ী ভাবের ভিন্ন ভিন্ন উত্তেজক কারণ আছে। যেমন রতি বা অনুরাগের উত্তেজক গুণবতী বা রূপবতী স্ত্রী। বিভাব দুই প্রকার—প্রথম যথা সুন্দরী স্ত্রী, দ্বিতীয় যথা মলয়ানিল প্রভৃতি। প্রথম বিভাবকে 'আলম্বন' বিভাব কহে, কারণ উহাই প্রধান অবলম্বন। দ্বিতীয় বিভাবকে উদ্দীপন বিভাব কহে, কারণ উহাতে উত্তেজনা হয়।

যে সকল লক্ষণে স্থায়ী ভাব প্রকাশ পায়, তাহারাই অনুভাব। যথা জড়তা, ঘর্ম্ম, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, কম্পন ইত্যাদি। এস্থলে তর্ক হইতে পারে যে, জড়তা, ঘর্ম্ম প্রভৃতি এক প্রকার কার্য্য, উহারা রসোদয়ের কারণ কিরূপে হইতে পারে। ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে যে, মনে কর যেন 'খিচুড়ী'। খিচুড়ী অবশ্য সকলেই খাইয়াছেন। গরম গরম খিচুড়ীই অবশ্য ভাল লাগে, অথচ দেখ খিচুড়ীর উত্তাপ খিচুড়ীর এক প্রকার কার্য্য; কিন্তু উহারা উভয়ে একত্র না হইলে রস পাওয়া যায় না। সেইরূপ বিভাব, অনুভাব ও স্থায়ীভাব সকল এক প্রকার খিচুড়ী পাকাইয়া যায়, তাহাতেই রস হয় বা তাহারাই রস।

এইরূপ সঞ্চারিভাবও প্রয়োজনীয় হইয়া থাকে। রসোদয় স্থলে যে সকল বিকার প্রধান লক্ষ্য হইয়া থাকে, তাহারাই সঞ্চারী ভাব। বিশ্বনাথ তাহাদের নিম্নলিখিত তালিকা দিয়াছেন। যথা—

"নির্ব্বেদা বেগ দৈন্য শ্রমমদ জড়তা ঔগ্রমোহৌ বিবোধঃ
স্বপ্নপস্মার গর্ব্বা মরণমলসতামর্ষ নিদ্রাবহিত্থাঃ।
ঔৎসুক্যোন্মাদশঙ্কাঃ স্মৃতিমতিসহিতা ব্যাধিসন্ত্রাসলজ্জা
হর্ষাসূয়াবিষাদাঃ সধৃতিচপলতা গ্লানিচিন্তাবিতর্কাঃ॥"

অর্থাৎ নির্ব্বেদ, আবেগ, দৈন্য, শ্রম, মদ, জড়তা, উগ্রতা, মোহ, জাগরণ, স্বপ্ন, অপস্মার, গর্ব্ব, মরণ, অলসতা, অমর্ষ, নিদ্রা, অবহিত্থা ঔৎসুক্য, উন্মাদ, শঙ্কা, স্মরণ, মতি, ব্যাধি, ত্রাস, লজ্জা, হর্ষ, অসূয়া, বিষাদ, ধৃতি, চপলতা, গ্লানি, চিন্তা, বিতর্ক, এই তেত্রিশটী। এ সকল শব্দের অর্থ সহজ, বোধ হয়, অবহিত্থা শব্দের অর্থ একটু অপরিষ্কার। আলঙ্কারিকেরা অবহিত্থার লক্ষণ এইরূপ করিয়াছেন যথা—"মনে আহ্লাদ, ভয় প্রভৃতির উদয় সময়ে যে আকার গোপন করা হয়, তাহাই অবহিত্থা।" যেমন কালিদাসের কুমারসম্ভবে যখন নারদ গৌরীর বিবাহের প্রস্তাব করিতেছেন, তখন গৌরী যেন শুনিয়াও শুনিতে পান্ নাই—তিনি যেন অন্যমনস্কার ন্যায় তাঁহার করকমলস্থিত কমলপত্র গণনা করিতেছেন ইত্যাদি।

অলঙ্কার শাস্ত্রের রস পরিচ্ছেদ সাতিশয় বিস্তীর্ণ ও যত্নপরিশ্রমসম্পন্ন। তথাপি বোধ হয়, আমরা সংক্ষেপে সমুদায়ই বলিতে পারিয়াছি। কিন্তু এই ভয় হইতেছে যে, আমরা হয়তো ততদূর সতর্ক হইতে পারি নাই। রসের লক্ষণ কি? এই প্রশ্নের উত্তর করিবার সময় সাতিশয় সাবধানতা অবলম্বন করিয়া কথা কহিতে হয়। নতুবা কার্য্য, কারণ প্রভৃতির গোলমাল হইয়া পড়ে। যাহাই হউক, আমরা এক্ষণে প্রথমতঃ বাক্য ও তৎপরে দোষ পরিচ্ছেদে অবতরণ করিতেছি।

বাক্য কাহাকে কহে এই বিষয় লইয়া অলঙ্কার শাস্ত্রে অনেক বিচার করা

হইয়াছে। বিচারে যাহা স্থির হইয়াছে, তাহা অবশ্য সহজ। সাধারণ বুদ্ধিতে কর্ত্তা, কর্ম্ম, ক্রিয়া, অথবা কর্ত্তা ও ক্রিয়া লইয়াই সচরাচর একটী বাক্য হইয়া থাকে। এক একটী বাক্য অবশ্য এক একটী সম্পূর্ণ মনোভাব বা বস্তু বর্ণনা করিয়া থাকে। অলঙ্কারে প্রকারতঃ তাহাই লিখিতেছে।

ভিন্ন ভিন্ন পদ লইয়াই অবশ্য এক একটী বাক্য হয়। আবার ভিন্ন ভিন্ন শব্দ হইতে ভিন্ন ভিন্ন পদ হইয়া থাকে। শব্দের তিন প্রকার শক্তি আছে। যথা—অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা। তন্মধ্যে অভিধা দ্বারা শব্দের মুখ্যার্থ প্রকাশিত হয়, যেমন মানুষ বলিলে দুই পদ দুই হস্ত বিশিষ্ট বুদ্ধিমান্ জীবের উপস্থিতি হয়। রাম বলিলে ব্যক্তিবিশেষকে মনে হয়। লক্ষণা দ্বারা স্পষ্ট মুখ্যার্থের উপস্থিতি না হইয়া তাহার আনুষঙ্গিক কোন প্রকার অর্থের উপস্থিতি হয়, যেমন "বিহার বন্ধু কহিয়াছেন" এস্থলে বিহারবন্ধু বলিতে বিহারবন্ধু কাগজের সম্পাদককে বুঝিতে হইবে। "ভারতবর্ষের দুর্দ্দশা" এস্থলে ভারতবর্ষ শব্দে "ভারতবর্ষের অধিবাসী বুঝাইতেছে। "ভাই হে তুমি যে আমার উপকার করিয়াছ, তাহা এজন্মে ভুলিব না" এস্থলে যদি উপকার শব্দে অপকার লক্ষ্য হয়, তাহা হইলেও লক্ষণা বুঝিতে হইবে।

অভিধা ও লক্ষণার কার্য্য শেষ হইলে যদি অন্য কোন প্রকার অর্থ মনকে স্পর্শ করে, তবে সে স্থলে ব্যঞ্জনা বুঝিতে হইবে। যেমন "সখি সন্ধ্যা হইয়াছে" এই কথা বলিলে লোকে স্থল বিশেষে কতই বুঝিতে পারে। কেহ হয়ত বুঝিবে যে, প্রদীপ জ্বালিতে বলিতেছে, কেহ হয়ত বুঝিবে যে, প্রণয়ীর সমাগম ইঙ্গিত করিতেছে ইত্যাদি। এস্থলে বলা আবশ্যক হইতেছে যে, শব্দের ব্যঞ্জনা শক্তি থাকাতেই হাস্য করুণ প্রভৃতি রসের বোধ হইয়া থাকে।

শব্দের তিন প্রকার শক্তি থাকাতে অর্থও তিন প্রকার হইয়াছে। যথা—মুখ্যার্থ, লক্ষ্যার্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থ।

যেরূপে রসের অপকর্ষ বা উপকর্ষ হয়, সম্প্রতি তাহারই উল্লেখ করা হইতেছে। যাহাতে রসের অপকর্ষ হয় তাহাই দোষ। দোষ তিন প্রকারে রসের ব্যাঘাত করে। প্রথমতঃ পদ ও বাক্যগত, দ্বিতীয়তঃ অর্থগত ও তৃতীয়তঃ উহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে রসগত হইয়া রসের অপকর্ষ বা ব্যাঘাত সাধন করে। পদ বা বাক্যগত যথা—"শ্রুতিকটু, অশ্লীল, অনুচিতার্থ, অপ্রযুক্ত, গ্রাম্য, অপ্রতীত, সন্দিগ্ধ, নেয়ার্থ, নিহিতার্থ, অবাচক, ক্লিষ্ট, বিরুদ্ধমতিকারী, বিধেয়াবিমর্ষ, নিরর্থক, অসমর্থ ও ব্যাকরণ দোষ ইত্যাদি।"

আরও কয়েকটি দোষ যথা—প্রতিকূল বর্ণ, লুপ্তবর্গ, অধিক পদ, ন্যূনপদ ছন্দঃপাত, পতৎপ্রকর্ষ, সন্ধি স্থলে সন্ধি না করা, সমাপ্তপুনরাত্ত, অভিপ্রেতার্থের অপ্রকাশ,

অযথা স্থলে শব্দ প্রয়োগ, অনভিপ্রেত অর্থের প্রকাশ, ভগ্নপ্রক্রম, প্রসিদ্ধি ত্যাগ, অযথাস্থানে সন্ধি বা সমাস।

প্রতিকূলবর্ণ অর্থাৎ যে যে রসে যে যে বর্ণ হওয়া অনুচিত, সেই সেই রসে সেই সেই বর্ণের প্রয়োগ। লুপ্তবর্ণ যথা—মন, তেজ, যশ প্রভৃতি শব্দে বিসর্গের লোপ ও মনান্তর প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ; মুখখানি থুইল বলিতে মুখানি থুইল বলিলে বা মহাশয় বলিতে মাশয় ইত্যাদি বলিলেও লুপ্তবর্ণ দোষ হয়। যে স্থলে অনুপ্রাসাদি উত্তরোত্তর থাকাতে উত্তম শুনাইতেছিল, সে স্থলে হঠাৎ সেই অনুপ্রাসাদির লোপ হইলে পতৎপ্রকর্ষ হয়। সন্ধি স্থলে সন্ধি না করা যেমন—"কনক আসন।" সমাপ্তপুনরাত্তত্তা—কর্ত্তা কর্ম্ম ক্রিয়া প্রভৃতি সমুদায়ের প্রয়োগ হইয়া বাক্য শেষ হইলে পর আবার যে তাহাতে খানিক জুড়িয়া দেওয়া তাহার নাম সমাপ্ত পুনরাত্তত্তা। মাইকেলের অমিত্রাক্ষর কাব্যে এরূপ অনেক দেখা যায়। ভগ্নপ্রক্রম, যেস্থলে এক প্রকার বিভক্তি বা প্রত্যয়যুক্ত পদাদির সহিত বাক্যের সমাপিকা ক্রিয়ার অন্বয় না থাকে। যেমন "তুমি আমাকে খাওয়াইতে না মারিবার নিমিত্ত নিমন্ত্রণ করিয়াছ" এস্থলে 'মারিতে' বলিলে প্রক্রম ভগ্ন হইত না। প্রসিদ্ধ বিষয়ের বিরুদ্ধ বলাকে, প্রসিদ্ধিত্যাগ বলা যায়; যেমন "দাঁড়াইলা লক্ষ্মীপাশে শূলপাণি হরি" হরির শূলাস্ত্র অপ্রসিদ্ধ। অযথাস্থানে সন্ধি যেমন ভাবিত আছি, না লিখিয়া ভাবিতাছি, অন্য মনঃ অর্থে মনোন্তর এরূপ করিলে তাহা সুশ্রাব্য হয় না; মনান্তর শব্দও শুদ্ধ নয়, তাহা অপপ্রয়োগ মাত্র।

এইরূপ অনুচিতার্থ যথা—"রণ যজ্ঞে বীরেরা যজ্ঞীয় পশুর ন্যায় অমরত্ব প্রাপ্ত হইলেন" এস্থলে 'বীরগণ যজ্ঞীয় পশুর তুল্য' এই অনুচিত অর্থের প্রতীতি হওয়াতে অনুচিতার্থ হইয়াছে। অপ্রযুক্ততা অর্থাৎ অপ্রচলিত শব্দের প্রয়োগ, অপ্রতীতার্থ অর্থাৎ প্রচলিত শব্দের বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ। নেয়ার্থ যথা—"তোমার মুখ কমলে পদাঘাত করিয়াছে" এস্থলে পদাঘাত শব্দে পরাজয় টানিয়া লইতে হইয়াছে, এইরূপ টানিয়া অর্থ ঘটাইতে হইলেই নেয়ার্থ দোষ হয়। উভয়ার্থ শব্দের অপ্রসিদ্ধ অর্থে প্রয়োগকে নিহতার্থ বলা যায়। বিরুদ্ধ মতিকারিতা অর্থাৎ যেমন শিবের স্ত্রীর স্বামী বলিলে শিবকে না বুঝাইয়া বিরুদ্ধ বুঝাইতে পারে। বিধেয়াবিমর্ষ দোষ বাঙ্গালায় সর্ব্বদা ঘটিয়া থাকে যথা—"তাঁহার সহিত মিলনেচ্ছা হয়" এস্থলে তাঁহার সহিত এই পদের সহিত মিলন পদের অন্বয় 'ইচ্ছা' অপেক্ষা অধিক, অতএব মিলনকেই প্রধান করিয়া প্রকাশ করা উচিত। অর্থাৎ তাঁহার সহিত মিলনের ইচ্ছা বলা উচিত ছিল। অন্যান্য অর্থ স্পষ্টই।

অর্থদোষ যথা—অপুষ্ট, পর্য্যায়ক্রমহানি, গ্রাম্য, ব্যাহত, অশ্লীল, কষ্ট, অনবীকৃত,

বিরুদ্ধার্থ প্রকাশ, সন্দিগ্ধ, পুনরুক্ত, অপ্রসিদ্ধ, বিদ্যাবিরুদ্ধ, সাকাঙ্ক্ষ, সহচরভিন্ন ইত্যাদি।

কোন বাক্যের অর্থবোধ হইবার পর যদি তাহার অন্তর্গত কোন পদ অতিরিক্ত বোধ হয়, তবে সেস্থলে অপুষ্টার্থের দোষ বুঝিতে হইবে। যথা—"হে প্রিয়ে! বিস্তীর্ণ আকাশ মণ্ডলে চন্দ্র দর্শন করিয়া মান পরিত্যাগ কর।" এস্থলে 'বিস্তীর্ণ' পদ অনর্থক। পর্য্যায়ক্রমহানি যথা—"হে রাজন্! আমাকে একটি ঘোটক, না হয়, একটি হস্তী দান কর" এস্থলে "হস্তী না হয় ঘোটক দান কর" বলা উচিত ছিল। গ্রাম্য ও অশ্লীল অর্থ স্পষ্ট। ব্যাহত অর্থাৎ যাহাকে উৎকৃষ্ট বা অনুৎকৃষ্ট বলিতেছ, তাহাকেই আবার অনুৎকৃষ্ট বা উৎকৃষ্ট প্রতিপন্ন করা। কষ্ট অর্থাৎ দুর্বোধ। অনবীকৃত যথা—ভানু সর্ব্বদা আকাশে বিচরণ করিতেছে, বায়ু সর্ব্বদা বহিতেছে, বাসুকি সর্ব্বদা পৃথিবী ধারণ করিতেছে ইত্যাদি। এস্থলে 'সর্ব্বদা' শব্দের বার বার প্রয়োগ করা হইয়াছে। প্রাচীন কবিরা এইরূপ একটি পদ বা কবিতা অনেক স্থলে বার বার প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। নব্যেরা ওরূপ করেন না। যথা—ভানু সর্ব্বদাই বিচরণ করেন্, গন্ধবহ রাত্রি দিনই বহিয়া থাকেন, বাসুকি সততই ধরিত্রী ধারণ করেন ইত্যাদি। হে রাজন্! তোমার পুত্র শীঘ্র রাজা হউন্ এস্থলে "তুমি মর" এইরূপ চিন্তা উপস্থিত হইতে পারে, ইহাকেই বিরুদ্ধার্থ প্রকাশ কহে। সন্দিগ্ধ অর্থ স্পষ্ট। পুনরুক্ত অর্থও স্পষ্ট। অপ্রসিদ্ধ যথা "হরি শাণিত শূল হস্তে করিয়া রণ ভ্রমণ করিতেছেন।" এস্থলে হরির শূল ধারণ অপ্রসিদ্ধ। বিদ্যা-বিরুদ্ধ অর্থাৎ এক শাস্ত্রে যে কথা যে অর্থে প্রযুক্ত হয়, অন্য শাস্ত্রে সে কথা সে অর্থে প্রযুক্ত না হইলেও প্রয়োগ করা। সাকাঙ্ক্ষ অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষা থাকিতে নিবৃত্ত হওয়া অর্থাৎ কথাটার সমুদয় শেষ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া। সহচর-ভিন্ন যথা ভদ্রলোকে যে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়, কামিনী যে গতযৌবন হয়, আর খল যে রাজ-সভায় প্রভুত্ব করিতে পায়, তাহা আমার বড়ই কষ্টকর। এ স্থলে 'ভদ্রলোক' ও 'কামিনী' উৎকৃষ্ট শ্রেণীর; খল অধম শ্রেণীর; অতএব ইহাদের সাহচর্য্য ভাল হয় নাই।

রস দোষ যথা—স্বশব্দোক্তি, বিরুদ্ধ রস শব্দাদির উল্লেখ ইত্যাদি। স্বশব্দোক্তি যথা—তোমাকে দেখিয়া আমার বীর রসের উদয় হইল—এস্থলে বীররসের স্বশব্দে উল্লেখ করা হইল। বিরুদ্ধ রস শব্দাদির উল্লেখ অর্থাৎ এক রসে বিরুদ্ধ রসোপ-চায়ক শব্দাদির উল্লেখ। বিরুদ্ধ রস যথা;—

আদিরস করুণ, বীভৎস, রৌদ্র, বীর ও ভয়ানক রসের বিরোধী। হাস্যরস ভয়ানক ও করুণের বিরোধী, করুণরস হাস্য ও আদিরসের বিরোধী এবং রৌদ্ররস

হাস্য ও আদিরসের বিরোধী। এইরূপ বীররস ভয়ানক ও শান্তে, ভয়ানকরস আদি, বীর, রৌদ্র ও হাস্যের, শান্তরস আদি, বীর, রৌদ্র, হাস্য ও ভয়ানকের এবং বীভৎস রস আদিরসের বিরোধী।

এক্ষণে আমরা গুণ পরিচ্ছেদে অবতরণ করিতেছি। গুণ তিন প্রকার,—মাধুর্য্য, ওজঃ ও প্রসাদ। শুনিতে মধুর হইলে তাহাকে মাধুর্য্য কহে। আলঙ্কারিকেরা কহেন যে, টবর্গ ভিন্ন অন্যান্য বর্গের প্রথম চারি বর্ণ তদ্বর্গীয়পঞ্চম বর্ণের নিম্নবর্ত্তী হইলে শুনিতে মধুর হয় যথা ঙ্ক, স্ত, ন্ধ ইত্যাদি।

ওজোগুণ বীরাদি রসে উপাদেয় হয়। আলঙ্কারিকেরা কহেন যে,বড় বড় সমাস, টবর্গ, ষ র ও তদ্যুক্ত অক্ষর সকল ওজোগুণের সহকারী। শুনিবামাত্র অর্থ বোধ হইলে তাহাকে প্রসাদ গুণ কহে।

বারান্তরে অলঙ্কার ও নাটক পরিচ্ছেদের বিবরণ করা হইবে।

শ্রীপ্যারীমোহন সেন।

পাথুরিয়া কয়লা।

ভূভাণ্ডারে পাথুরিয়া কয়লা সদৃশ উপকারক বস্তু অপর কিছু আছে কিনা তাহা সন্দেহের বিষয়। অথচ বর্ষে, বর্ষে প্রভূত পরিমাণে দেশে দেশে ইহা ব্যবহৃত হইতেছে, তাহা ভাবিয়া দেখিলে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। কোন এক পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, লৌহ এবং পাথুরিয়া কয়লা মনুষ্য সমাজের সভ্যতার প্রধান উপকরণ। বাস্তবিক দেখিতে গেলে ইহাই প্রতীত হয় যে, এতদিন যদি পাথুরিয়া কয়লা ভূগর্ভ হইতে বহিষ্কৃত না হইত, তাহা হইলে সভ্য জগতের এতদিন এতদূর উন্নতি হইত না। পাথুরিয়া কয়লা না থাকিলে সর্ব্বপ্রকার বাষ্পীয়কল এত অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইত না। যদিও বাষ্পীয় কলে কর্ষণ দ্বারা কয়লার কার্য্য সংসাধিত হইতে পারে। একটি সামান্য কলে অল্প দিবসের মধ্যে কত কত প্রকাণ্ড অরণ্য কাটিয়া আহুতি দিতে হইত, তাহার ইয়ত্তা নাই। বাষ্পীয় কল কেন এখন যে মহোপকারী নিশান্ধকার বিনাশকর গ্যাসের আলোক এত প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইত না। যে কারোসিন তৈল এক্ষণে ছোট

বড় সকলের গৃহকার্য্যে লাগিতেছে, তাহারও অধিকাংশ কয়লা খনি ঐ কয়লা সম্ভূত, এক্ষণে কয়লা দ্বারা রন্ধন কার্য্যও হইতেছে। কাষ্ঠ কীট বিনাশক, দুর্গন্ধাপ-হারক আলকাতরা, বহুবিধ মেটো তৈল ও অশেষ প্রকার রঙ্গ এই কয়লা হইতে উৎপন্ন হইতেছে।

এমত অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য কোন দ্রব্য হইতে ও কি প্রকারে উৎপন্ন হইল এবং পৃথিবীর বিশেষতঃ ভারতবর্ষের কোন্ কোন্ স্থানেই পাওয়া যায়, জানিতে অনেকে-রই কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইতে পারে। এই বিবেচনায় এতদ্বিষয়ের সামান্য বিবরণ-নিম্নে বিবৃত হইল।

অতি পূর্ব্বকালে পাথুরিয়া কয়লার ব্যবহার লোকে অবগত ছিল না বলিয়া বোধ হয়। এবং কোন সময়ে ইহার ব্যবহার প্রথম আরম্ভ হয়, তাহা নিরূপণ করাও দুঃসাধ্য। কেহ কেহ বলেন যে প্রাচীন ব্রিটনরা ইহার ব্যবহার পরিজ্ঞাত ছিলেন। যাহা হউক ৮৫২ খৃষ্টাব্দে ইহা যে গৃহকার্য্যে ব্যবহৃত হইয়াছিল তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। ইউরোপ মধ্যে ইংলণ্ড বাসীরা সর্ব্বপ্রথমে ইহার ব্যবহার করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়।

অধিকাংশ প্রকার কয়লা কৃষ্ণবর্ণ। কয়েক প্রকার কয়লা তৈলময় হওয়াতে চাকচিক্য বিশিষ্ট। এবং অন্যান্য প্রকার কয়লায় আদৌ জ্যোতিঃ হীন। পাথুরিয়া কয়লাকে বায়ুশূন্য পাত্রে রাখিয়া উত্তপ্ত করিলে তন্মধ্য হইতে গ্যাস ও আলকাতরার মত এক প্রকার তরল পদার্থ নির্গত হইয়া জ্বালানি কয়লা (Coke) কোক্ প্রস্তুত হয়। রানীগঞ্জ অঞ্চলে ইন্ধন কয়লা বা কোক্ তৈয়ার করিবার জন্য খনিজ পাথুরিয়া কয়লা একস্থানে রাশীকৃত করিয়া তাহার উপরিভাগ মৃত্তিকার চাব্‌ড়া দিয়া আবৃত করিয়া অগ্নি লাগাইয়া দেয়। দুই এক দিবস থাকিলেই খনিজ পাথুরিয়া কয়লার তৈল ভাল বহির্গত হওয়াতে তাহা কোক্ বা জ্বালানি কয়লা প্রস্তুত হয়। আনথ্রাসাইট নামক কয়লায় প্রায় কোন প্রকার তৈল পদার্থ নির্গত হয় না। ইহার কারণ এই যে ভূগর্ভে অবস্থিতি কালে ইহার মধ্য হইতে তৈল পদার্থ নির্গত হইয়া থাকে; একারণ আমরা পাথুরিয়া কয়লাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিতে পারি। (১) আনথ্রাসাইট বা তৈলহীন কয়লা, যাহা হইতে অগ্নিশিখা নির্গত হয় না, এবং (২) বিটুমিনস্ বা তৈলময় কয়লা যাহা পোড়াইলে অগ্নিশিখা দৃষ্ট হয়। তৈলহীন কয়লা বা আনথ্রাসাইটে প্রায় শতকরা ৯৪ ভাগ অঙ্গারক ধাতু থাকে। পাঁশ শুদ্ধ ধরিলে ইহাতে শতকরা প্রায় ৯৮ ভাগ অঙ্গারক ধাতু থাকে। অঙ্গারক পদার্থ যত কম হইতে থাকে, ইহা তত বিটুমিনস্ বা তৈলময় কয়লায় পরিণত হইতে থাকে। লৌহ প্রভৃতি

ধাতুগলন ও বাষ্পজনন জন্য প্রায় আনথ্রাসাইট ব্যবহৃত হয়। ইহা পোড়াইলে জ্বলে না, কিন্তু অতিশয় ঝাঁজ হয়।

বিটুমিনস্ কয়লা অসংখ্য প্রকার। তন্মধ্যে কানেল কয়লা প্রসিদ্ধ। কানেল কয়লা অত্যুজ্জ্বল আলোক প্রদান করে বলিয়া ইহাকে কানেল বা আলোকপ্রদ কয়লা কহে। ইহা অতি কঠিন, ইহার কয়েক জাতীয়কে শিলাখণ্ডের ন্যায় পালিস করিলে কৃষ্ণময় প্রস্তরবৎ আকার ধারণ করে। এই কয়লা হইতে কালির দোয়াত, বাক্স ইত্যাদি বহুবিধ পাত্র প্রস্তুত হয়। ইহা পোড়াইলে অনেক অংশ পাঁশ অবশিষ্ট থাকে বলিয়া গৃহে আগুণ রাখিতে ব্যবহৃত হয় না। কেবল গ্যাসের জন্য অধিক প্রয়োজনে লাগে; ইহা হইতে পারাফিন নামক এক প্রকার তৈল প্রস্তুত হয়।

পাথুরিয়া কয়লা উদ্ভিদ বিশেষের পরিবর্ত্তিত অবস্থা অর্থাৎ যেমন বালুকা একত্র জমাট বাঁধিয়া বেলে পাথর হয়, তদ্রূপ উদ্ভিদ কতকগুলি প্রাকৃতিক নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া এরূপ প্রস্তরবৎ আকার ধারণ করে। এক খণ্ড পাতলা পাথুরিয়া কয়লাকে অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিলে দৃষ্ট হইবে যে, যেমন কাষ্ঠখণ্ডে আঁইশ বা চোঁচ্ ইত্যাদি বর্ত্তমান থাকে, তদ্রূপ ঐ কয়লায় উদ্ভিদের অপর চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। এবং কোন কোন প্রকার কয়লার উদ্ভিদের সমগ্র অবয়ব দেখিতে পাওয়া যায়। গ্যাসের আলোক যে কয়লা হইতে উৎপন্ন হইতেছে, তাহাতেও এই প্রকার উদ্ভিদের আঁইশাদি দেখিতে পাওয়া যায়। সমুদয় প্রকার কয়লা এক বা দুই জাতীয় উদ্ভিদের রূপান্তরে উৎপন্ন হয় নাই। একারণ এত ভিন্ন ভিন্ন প্রকার কয়লা দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত উদ্ভিদের পরিবর্ত্তনের তারতম্য অনুসারে কয়লার প্রকৃতির তারতম্য হয়। পাথুরিয়া কয়লা যে উদ্ভিদের রূপান্তর মাত্র তাহার আর এক প্রমাণ এই যে, যে সকল ভৌতিক পদার্থ কাষ্ঠ গঠিত সেই সকল ভৌতিক পদার্থ দ্বারা কয়লাও প্রস্তুতীকৃত। এই খনিজ প্রধানতঃ অঙ্গারক, উদজান ও অম্লজান ধাতু দ্বারা সংগঠিত; এই তিন পদার্থ ভিন্ন পরিমাণে কাষ্ঠে বর্ত্তমান থাকিয়া উভয়ের এক বস্তুত্ব প্রমাণ করিতেছে। কাষ্ঠ হইতে একেবারে কয়লা হয় নাই, কাষ্ঠের রূপান্তরে পিট্কয়লা, পিটের পর লিগ্ নাইট (বা পিঙ্গল কয়লা) ও তার পর যথার্থ কয়লার উৎপত্তি হইয়াছে। ইহা নিম্ন প্রদত্ত তালিকা দৃষ্টে বোধ হইবে।

	কাষ্ঠ	পিট	লিগনাইট	কয়লা
অঙ্গারক	৫০.০	৬০.০	৬৫.[illegible]	৮২.৬
উদজান	৬.২	৬.৫	৫.[illegible]	৫.০
অম্লজান	৪৩.৮	৩৩.৫	২৯.[illegible]	১১.৮
	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

উক্ত প্রত্যেক দ্রব্যে কিঞ্চিৎ পরিমাণ যবক্ষারজান নামক ভৌতিক পদার্থ আছে। তাহা ঐ তালিকায় লেখা হয় নাই। কাষ্ঠ ও পিট্ হইতে কয়লার পরিণতি জন্য অম্লজান ও উদজান ধাতুর পরিমাণ কম হইতে দেখা যায়।

ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের মধ্যে পাথরিয়া কয়লার উৎপত্তি সম্বন্ধে বিবিধ মতভেদ দেখা যায়। ২০।৩০ বৎসর পূর্ব্বে ইহার উৎপত্তি নিরূপণ, পণ্ডিতগণের অতি প্রিয় কার্য্য ছিল। বালুকাপ্রস্তর (বেলে পাথর) পরীক্ষা করিলে সহজেই উপলব্ধি হয় যে, তাহা এক সময়ে অসংলগ্ন বালুকারাশি ছিল এবং জলপ্রবাহ দ্বারা আনীত হইয়া পলি পড়ার মত পড়িয়া জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে। কিন্তু পাথরিয়া কয়লা সম্বন্ধে এরূপ নিরূপণ সহজ নহে। কিন্তু ইহা যে উদ্ভিদ বিশেষের রূপান্তরমাত্র তাহার কোন সন্দেহ নাই। ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রধানতঃ দুই মত দেখা যায়। প্রথম মতে বলেন যে, নদী প্রবাহ দ্বারা উদ্ভিদ সকল নদী মুখে আসীন হইয়া বালুকা ও কর্দ্দম সদ্য ভূমিপরে পতিত হইয়াছিল ও পরে তাহাদের উপরে মৃত্তিকা স্তর হওয়াতে ভূগর্ভ মধ্যে পড়িয়াছে। ২য় মত এই যে, নিবিড় অরণ্য ও পিট্ নামক এক প্রকার শৈবাল ভূমধ্যে নিহিত হওয়ায় তাহার উপর বালুকা কর্দ্দম পড়াতে সেই সকল উদ্ভিদ ভূগর্ভস্থ কয়লা স্তররূপে পরিণত হইয়াছে।

পণ্ডিতাগ্রগণ্য লায়েল ও ব্রন্ নিয়ার্ট সাহেব এই দ্বিতীয় মতাবলম্বী। ইহাঁরা বলেন যে, উদ্ভিদরাশি কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত একত্র হইয়া জঙ্গল হইয়াছিল। তদনন্তর তত্রস্থ ভূমি পৃথিবী মধ্যে বসিয়া যাওয়াতে একটী হ্রদ কিম্বা নদীর মোহানা হয় এবং তথায় নদী কর্দ্দম বালুকা আনিয়া ফেলে; ঐ মৃত্তিকা ও বালুকা যেটে ও বেলে পাথরের রূপ ধারণ করে ও তন্নিম্নস্থ উদ্ভিদরাশি রাসায়নিক প্রক্রিয়া বলে ক্রমে ক্রমে পাথরিয়া কয়লারূপে পরিণত হয়। যৎকালে এই সকল কার্য্য হইতেছিল, তখন সমুদয় স্থান পুনর্ব্বার উর্দ্ধে উত্থিত হয়, অথবা পলিদ্বারা এতদূর উচ্চ হইয়া পড়ে যে, তদুপরি বৃক্ষাদি জন্মিতে পারিয়াছিল। এবং এই সকল নবজাত উদ্ভিদ সহ ভূমিখণ্ড নিম্ন প্রোথিত হয়, এবং তদুপরি বালুকা কর্দ্দম পতিত হয়। এই প্রকারে একটী কয়লা খনিতে যতগুলি কয়লা স্তর থাকে, ততবার তত্রস্থ ভূমি নিম্নে প্রোথিত ও উর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছিল।

অপর মতানুসারে পণ্ডিতগণ বলেন যে, যেমন আজিকাল ভূমি উর্দ্ধে উত্থিত ও নিম্নে প্রোথিত হইয়া থাকে ভূমির তদ্রূপ অবস্থা হয়, অর্থাৎ যখন ইহা নিম্নে প্রোথিত হইতেছিল, তাহার উপরিস্থ জঙ্গল পাইন বৃক্ষাদি এবং পিট্ শৈবাল প্রভৃতি জলের নিম্নবর্ত্তী হইয়াছিল, এবং তখন প্রভূত পরিমাণে বালুকা কর্দ্দম-রাশি ও কাষ্ঠখণ্ড সকল জলদ্বারা আনীত হইয়া নিম্নস্থানে পড়িত। ক্রমে ঐ স্থান

নদীর মোহানা হইয়া পড়ে এবং তথায় অনেক নদী পতিত হওয়ায় স্রোতে বা শুদ্ধ বালুকা, কর্দ্দম, বৃক্ষাদি আনিয়া ফেলে। এই মতানুসারে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, এই সমুদায় নদীতে (যেমন গঙ্গা ও নীলনদ ইত্যাদি) বন্যা দ্বারা মধ্যে মধ্যে প্লাবিত হয়, এবং জলপ্লাবনকালে তাহার উপরে বৃক্ষাদি জন্মে। মিশিসিপি, সেন্ট লরেন্স ও অন্যান্য বড় বড় নদী সকল ঐ প্রকারে কাষ্ঠ খণ্ড সকল বহিয়া আনিয়া কয়লা উৎপত্তির কারণ হয়।

কয়লার উৎপত্তি সম্বন্ধে উপরি উক্ত দুইটী মতই প্রবল। বস্তুতঃ বোধ হয় যে, কয়লা উৎপত্তি সম্বন্ধে উক্ত দ্বিবিধ মতই সমর্থিত হইতে দেখা যায়।

যে স্তরে কয়লা পাওয়া যায়, তাহাকে ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা কয়লা প্রধান স্তর বলিয়া ব্যাখ্যাত করেন। সেই স্তরেই পৃথিবীস্থ অধিকাংশ কয়লা সঞ্চিত আছে। এই সকল পণ্ডিতগণ স্তর মধ্যস্থ জীব ও উদ্ভিজ্জাদির নষ্টাবশেষ ও চিহ্নাদি দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, ইংলণ্ড ও আমেরিকার কয়লা একজাতীয় উদ্ভিদ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং বোধ হয়, একই সময়ে পৃথিবীস্থ কয়লা রাশি প্রস্তুত হইয়াছিল। যে সমুদায় স্তরে কয়লা পাওয়া যাইতেছে, তাহারা যে এক কালে অত্যন্ত নিম্ন ছিল, তাহার সন্দেহ নাই, কারণ ঐ সকল স্তরে প্রায় সামুদ্রিক জীবজন্তু দেখিতে পাওয়া যায়। কয়লা স্তরের উপরিস্থিত মৃত্তিকাস্তর অধিকাংশ স্থানে হাজার হাজার ফিট এবং স্থানে স্থানে দুই তিন মাইল পর্য্যন্ত নিম্ন দেখা যায়। ইহাতে বোধ হয় যে, কত অসংখ্য বৎসর ধরিয়া ঐ সমুদায় মৃত্তিকা রাশি সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহার সীমা নাই। যখন একই জাতীয় উদ্ভিদাদি যাবতীয় কয়লা স্তরে দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতে বোধ হয় যে, যে সময়ে কয়লাস্তর উৎপন্ন হইয়াছিল তখন পৃথিবী মধ্যে একপ্রকার জল বায়ু ছিল।

ইয়ুরোপ মধ্যে বেলজিয়াম, ফ্রান্স, স্পেন, জর্ম্মনির উত্তরাঞ্চল এবং রুসিয়ার কার্য্যকর কয়লাখনি আছে। তন্মধ্যে রুসিয়াতেই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড খনি সকল বিদ্যমান। আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, ইউনাইটেড ষ্টেটস্, ভারতবর্ষ, ও চীনে প্রচুর পরিমাণে কয়লা খনি আছে।

এক্ষণে ভারতবর্ষের কোন কোন স্থানে কয়লা আছে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়া আমরা এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

ক। বীরভূম, দেওঘর, কারহার।

(১) কাহার বাড়ী (বা কারহার বালি) কয়লাবাড়ী প্রদেশ এই ক্ষুদ্রায়তন প্রদেশ উৎকৃষ্ট পাথুরিয়া কয়লার নিমিত্ত প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

পরেশনাথ পর্ব্বতের ১৬ মাইল উত্তর পূর্ব্বে খরগদহ স্থানের ১৭ মাইল দক্ষিণ—

পূর্ব্বদক্ষিণ ইহা লম্বে অর্দ্ধ মাইল এবং প্রায় সিকি মাইল প্রশস্ত, আয়তন ১১ বর্গ মাইল। ইহার পশ্চিমাংশে কারহার বাড়ী গ্রাম। রাণীগঞ্জের কয়লাখনি উৎকৃষ্ট। এখানকার কয়লা ইংরাজী কয়লা অপেক্ষা কিছুতেই খারাপ নহে। কয়লাপ্রধানস্তর ১২ হইতে ১৬ ফিট পুরু। অন্যান্য স্তর ৭।৮ ফিটের বেশী নয়। এই কয়লাখনি যদিও অন্যান্য খনি অপেক্ষা অয়তনে ক্ষুদ্রতর, তথাপি ইহা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ হইয়াছে। কারণ ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানীর অধিকাংশ কয়লা এখান হইতে যায়।

খ। রাজমহল প্রদেশ।

(১) চাপরভিটা কয়লা প্রদেশ।

(২) ব্রহ্মানি নদী কয়লা প্রদেশ।

(৩) পুরাকয়লা প্রদেশ।

গ। দামোদর নদ প্রদেশ।

১ রাণীগঞ্জ খনি।—পূর্ব্বে ইহার বর্দ্ধমান কয়লা খনি নাম ছিল। এই খনি দামোদর নদস্থ অঞ্চলে। দামোদর নদ এই প্রদেশের পূর্ব্ব পশ্চিমে প্রবাহিত। রাণীগঞ্জ সহর কলিকাতা হইতে ১০৬ মাইল উত্তর পশ্চিমে। এই প্রদেশ পূর্ব্ব পশ্চিমে ৩৯ মাইল লম্বা এবং ১৮ মাইল উত্তর দক্ষিণে। রাণীগঞ্জ কয়লাখনির পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া বরাকর নদী দামোদর মিশিয়াছে, এবং খনির উত্তরাংশে অজয় নদী প্রবাহিত। রাণীগঞ্জ খনি অনেক পূর্ব্ব হইতে প্রসিদ্ধ এবং ৩০।৪০ বৎসর হইল, অত্রস্থ ভূতত্ত্ব নিরূপণ আরম্ভ হইয়াছে। এখানে কয়লাস্তর ৩৩।৩৪ ফিট পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। খনির পশ্চিমাংশে এক এক স্থানে ১৭৫ ফিট কয়লাও পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহার সমুদায় অংশ তত উত্তম নহে।

(২) ঝাড়িয়া কয়লাখনি। ইহা রাণীগঞ্জখনির দক্ষিণ পশ্চিম অংশের ১৬ মাইল পশ্চিমে। ইহা রাণীগঞ্জ হইতে আয়তনে ক্ষুদ্রতর, কেবল মাত্র ২৬ মাইল লম্বা, ১০ মাইলের বেশী প্রসার কোথাও নাই।

(৩) বোকারো কয়লাখনি—ইহা হাজারিবাঘের নিকট, আয়তন ২২০ বর্গ মাইল। ইহার মধ্য দিয়া লুসু পাহাড় রহিয়াছে, কয়লা তত ভাল নহে।

(৪) রামগড় কয়লাখনি—দামোদরের উপরস্থিত রামগড়ের নিকট, আয়তন ৪০ বর্গ মাইল। দামোদর নদ ইহার নিকট দিয়া প্রবাহিত।

(৫) কারণপুর।—কারণপুর পরগণাস্থিত দামোদর নদ্যাঞ্চলের মধ্যে, ইহা রাণীগঞ্জ হইতে ছোট। ইহা লম্বে ৪২ মাইল এবং প্রস্থে ১৯ মাইল।

গ। হাজারিবাগ, দক্ষিণ বেরার ও পালামো।

(১) চোপ, (২) ইটকুড়ী, (৩) দাণ্ডনগঞ্জ।

ঘ। শোন, মহানদী, এবং ব্রাহ্মণী নদী প্রদেশ।

(১) সোহাগপুর (২) ঝিলমিলি, (৩) বিশ্রামপুর।

ঙ। ছোট নাগপুর।

(১) কোর্ব্বা, (২) রায়গড় ও হিনজির।

(৩) তালচির খনি। ব্রাহ্মণী নদীর উপরস্থিত তালচির স্থানের নিকট। তথায় এক ক্ষুদ্র রাজা আছেন। (৪) সাতপুর।

৮। গোদাবরী।

(১) বান্দার কয়লাখনি, (২) চান্দ।

(১ কমরল খনি, (২) সিঙ্গারাণী খণি।

(৩) ঝাড়িয়া রাণীগঞ্জ খনির দক্ষিণ পশ্চিম সীমা হইতে ১৬ মাইল পশ্চিমে। ইহা রাণীগঞ্জ খনি অপেক্ষা আয়তনে কম।

(৪) বোকারো।

(৫) রামগড়—দামোদর নদের উপরিস্থিত পুরাতন রামগড় নগরের নিকট।

(৬) কারণপুর—কারণপুর পরগণায়। ইহা দামোদর রাণীগঞ্জ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ছোট। ইহা হাজারিবাগের দক্ষিণ পশ্চিম ১০ মাইল দূরে।

খ। হাজারিবাগের উত্তরাঞ্চল, বেহারের দক্ষিণাঞ্চল এবং পালামো।

(১) চোপ, ইটকুড়ী, দাণ্ডনগঞ্জ।

গ। শোন, মহানদী, এবং ব্রাহ্মণি নদী প্রদেশ। ঝিলমিলি, বিশ্রামপুর, তালচির (ব্রাহ্মণি নদীর উপর) সাতপুর।

ঘ। গোদাবরি, বান্দার প্রদেশ ও সিঙ্গারণী—

সিঙ্গারণী খনি হায়দ্রাবাদের খামেত সরকারের তালুকস্থিত।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

COAL.

1. Introduction.
2. What is it? its varieties.
3. How was it formed.
   (a.) Its theories.
4. Distribution.
5. Distribution in India with some description of some of the Coal-measure.

সমাজ-চিন্তা। *

একদল বাঙ্গালীর এইরূপ অভিমান আছে যে, তাঁহারা ইংরাজ অপেক্ষা বুদ্ধিমান ও বিদ্বান। ইংরাজ প্রভুত্ব করে ইহা তাঁহাদের সহ্য হয় না। ইংরাজের সহিত সমান অধিকার পান না বলিয়া তাঁহারা নবাবী আমলের পক্ষপাতী। তাঁহারা বলেন, নবাব বিধর্ম্মী হইলেও ভিন্নদেশীয় ছিলেন না, তিনি দেশে থাকিয়া রাজত্ব করিতেন, দেশীয় ভাষায় কথা কহিতেন এবং দেশের আচার ব্যবহার অনুসারে চলিতেন। নবাবী আমলে দেশের লোক মন্ত্রী, দেশের লোক ভাণ্ডারী ও প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী হইয়া রাজ্য শাসন করিত এবং রাজ্যোৎপন্ন সমস্ত অর্থ রাজ্য-মধ্যেই থাকিত। তখন বাঙ্গালী একপ্রকার স্বাধীন ও বাঙ্গালা ধনশালী ছিল। অতএব যাহারা মুসলমানকে বঞ্চনা করিয়া ইংরাজকে রাজ্য দিয়াছে তাহারা নির্ব্বোধ ও মূর্খের ন্যায় কার্য্য করিয়াছে। এ সকল কথা কেবল উন্মত্ত প্রলাপ। রাজ্যোৎপন্ন অর্থ রাজভাণ্ডারে আবদ্ধ থাকিলেই কি রাজ্য ঋদ্ধিমন্ত হয়—প্রজার সকল দুঃখ ঘুচিয়া যায়? আমরা যে পৃথিবীতে বাস করি, সেই পৃথ্বী-গর্ভে প্রচুর পরিমাণে মণিমাণিক্য রহিয়াছে, তবে আমাদের দুঃখ ঘুচে না কেন? অর্থের যথার্থ ব্যবহার, অর্থের পরিচালনা না হইলে, দেশের দুর্গতি দূর হয় না,—প্রজার সুখ স্বাচ্ছন্দ বৃদ্ধি হয় না। কে বলিল, নবাবী আমলে বাঙ্গালী বড় বড় কর্ম্মচারী হইত? দেওয়ানী, উজিরী, ও সেনাপতিত্ব বাঙ্গালীকে কখনই প্রদত্ত হয় নাই। বাঙ্গালী বড় কর্ম্মের মধ্যে নায়েব-দেওয়ানী ও ফৌজদারী পাইয়াছিল, আর তাহাও আবার কয় জন পাইয়াছিল? যাহা পাইয়াছিল—সেও কেবল মুরশীদ কুলির সময় হইতে। বোধ হয় মুসলমানের যোগ্যতা থাকিলে নায়েব দেওয়ানী ও হিন্দুতে পাইত না। আর দেশের যে কেহ এক জন রাজা হইলেই কি প্রজার স্বাধীন হওয়া হইল? এই কি স্বাধীনতার অর্থ? এই অর্থে যদি স্বাধীনতা বুঝিতে হয়, তবে আমরা পরাধীনতায় দুঃখিত নহি। মুসলমান অধিকারে বাঙ্গালী স্বাধীন ও সুখী ছিল একথা কে বিশ্বাস করিবে? যবন অধিপতিদিগের যথেচ্ছাচারিতা, একাধিপত্য ও মূর্খতা চিরপ্রসিদ্ধ। আলাদিন হইতে আলমগীর পর্য্যন্ত যে সকল বাদসাহ রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কয়জন ধার্ম্মিক ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন? যে দেশের রাজা সর্ব্বে-সর্ব্বা সে দেশে আবার স্বাধীনতা কোথায়। যে দেশের রাজা যথেচ্ছাচারী সে দেশের প্রজার আবার সুখ কি? মুসলমান শাসনে বাঙ্গালীর দুঃখের পরিসীমা ছিল না। সাধারণ

* শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু প্রণীত, মূল্য এক টাকা। গ্রেট ইডেন যন্ত্রে মুদ্রিত।

প্রজাগণ খাইতে পাইত না, পরিতে পাইত না, সুখে নিদ্রা যাইতে পাইত না। নবাবের অত্যাচার, জমিদারের অত্যাচার এবং রাজকর্ম্মচারীর অত্যাচারে তাহারা জর-জর হইয়াছিল; বড় বড় ব্যবসাদার ও জমিদারদিগের ও নিস্তার ছিল না। ধন প্রাণ ও ইজ্জতের ভয়ে সকলেই ত্রস্ত হইয়া থাকিত। কাহারও ধন থাকিলে পুতিয়া রাখিতে হইত, গৃহে সুন্দরী রমণী থাকিলে লুকাইয়া রাখিতে হইত। নবাবী আমলে বাঙ্গালী এক দিনের তরে নিরাপদ, নিশ্চিন্ত ও সুখী হইতে পারে নাই। অবিচার ও যথেচ্ছাচারে দেশ ছারখার হইয়া গিয়াছিল। নবাবী আমলে বাঙ্গালা নরক ছিল, এখন স্বর্গতুল্য হইতেছে। যাহাদিগকে ব্রাহ্মণ দেখিলেই মস্তক অবনত করিতে হইত, রাজকর্ম্মচারীর ভয়ে সর্ব্বদা সশঙ্ক থাকিতে হইত, জমিদারের নামে কাঁপিতে হইত, সেই ঘৃণিত শূদ্র জাতির আজি সুখ কত! অধমতমা চণ্ডালিনীর করেও আজি স্বর্ণ বলয় শোভা পাইতেছে এবং অস্পৃশ্য কৈবর্ত্ত যুবাও আজি লব্ধ-উপাধি ও কৃতকর্ম্মা হইয়া দেশের মুখোজ্জ্বল করিতেছে। ইংরাজ অধিকারে কি ছোট, কি বড়, সকলেই নিরাপদ, সকলেই নিশ্চিন্ত, সকলেই সুখী। দেশে দস্যুভয় নাই, জমিদারের অত্যাচার নাই, রাজার অন্যায় আচরণ নাই। মহারাজ রায়দুর্ল্লভ ও মাহাতাপ রায় বিবেচনা করিয়াই প্রবলপ্রতাপ ইংরাজ করে রাজ্য-ভার অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা অদূরদর্শিতা বা মূর্খতার কার্য্য করেন নাই। তাঁহারা দানব রাজ্যের পরিবর্ত্তে দেবরাজ্য সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

ইংরাজ শাসনে সুখী হইয়াছি বলিয়া আমরা ইংরাজের নিকট তত ঋণী নহি, আমরা সুখে থাকিব বলিয়াইত ইংরাজকে রাজত্ব দিয়াছি। আমরা যে ঋণে ইংরাজের নিকট আবদ্ধ হইতেছি, সে ঋণ আমরা কখনই পরিশোধ করিতে পারিব না। চিন্তাশীল সমাজ-চিন্তা প্রণেতা পূর্ণবাবু বলেন—"আমরা বিদেশীয় ইংরাজগণকে স্বদেশ দিয়াছি সত্য, কিন্তু তদ্বিনিময়ে যাহা লাভ করিতেছি তাহা অমূল্য ধন।" সে ধন ইংরাজী শিক্ষা, এই শিক্ষা প্রভাবে বাঙ্গালীর সীমাবদ্ধ হৃদয় সম্প্রসারিত ও তাঁহার চিন্তায় স্রোত সঞ্চারিত হইয়াছে—এই শিক্ষা প্রভাবে বাঙ্গালার বাহ্যাভ্যন্তরে যুগান্তর উপস্থিত হইতেছে। আমরা ইংরাজের নিকট শিক্ষার জন্য ঋণী হইতেছি। পূর্ণ বাবু যথার্থই বলিয়াছেন যে "ইংলণ্ড ভারতকে যে শিক্ষা ও যে বিদ্যাদান করিতেছে ভারত সে শিক্ষা কুত্রাপি পাইত না, মুসলমানগণ ভারতকে সে শিক্ষা দিতে পারে নাই, ভারতীয় ইতিহাসে, ভারতীয় সাহিত্যে সে শিক্ষা নাই।" এসকল কথা অনেকের হৃদ্য না হইতে পারে, কিন্তু ইহার যাথার্থ্য অস্বীকার করা অসম্ভব।

পূর্ণ বাবু বলেন "ঐহিক সুখের প্রতি অনুরাগ, স্বাধীনতার প্রতি অনুরাগ, স্বদেশের প্রতি অনুরাগ ও স্বজাতির প্রতি অনুরাগ, এই চারিটি নূতন ভাব আমরা ইংরেজের নিকট পাইয়াছি।" স্বজাতিপ্রেম, স্বদেশানুরাগ ও স্বাধীনতা-প্রিয়তা, আর্য্যজাতির হৃদয় হইতে বহুকাল তিরোহিত হইয়াছে। আর্য্যগণ পঞ্চনদ পার হইয়াই ঐ সকল মহদ্ভাব ভুলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু সকল উন্নতির প্রসূতী, সুখাকাঙ্খা তাঁহাদের ছিল না, একথা আমরা স্বীকার করিতে পারিলাম না। কে বলিল? "সংসারের প্রতি বৈরাগ্য ভারতীয় সকল ধর্ম্মের উপদেশ" কি বেদে, কি পুরাণে, বোধ হয় হিন্দু শাস্ত্রের কোন খানে বৈরাগ্যের উপদেশ নাই, বরং বিপরীত শিক্ষা আছে। কে বলিল? "তাঁহাদিগের (আর্য্যদিগের) মনের গতি ঔদাসীন্যের দিকে যত ধাবিত হইত, সংসারের দিকে তত নহে" হিন্দু কলেবর কি রক্ত মাংস ভিন্ন অন্য উপকরণে সংগঠিত? হিন্দুহৃদয় কি মানব-হৃদয় নহে? পার্থিব পদার্থমাত্রেই পৃথিবীর দিকে আকৃষ্ট হইবে ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম। সর্ব্বসাধারণের সংসার বৈরাগ্য অসম্ভব। আর্য্যগণ সম্পূর্ণ সংসারী ছিলেন এবং ঐহিক সুখে কখনই তাঁহাদের বিরাগ ছিল না। বরঞ্চ বিলাসিতাই ভারতবাসীদিগের চিরাপবাদ। কে বলিল? "ভারতীয় সভ্যতা কখনও উন্নত হয় নাই" আর্য্যেরা সকল বিষয়েরই যথোচিত উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। ইলোরার অপূর্ব্বপুরী এবং অন্যান্য স্থানীয় পুরাতন দেবালয়ের ভগ্নাবশেষ সকল, তাঁহাদের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের পরিচয় দিতেছে। শকুন্তলা ও রঘুবংশে তাঁহাদের চিত্রকার্য্য-দক্ষতার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। তাঁহাদের নাট্য ও সঙ্গীতশাস্ত্র চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি আর্য্য কবিগণের নাটকাবলী অপূর্ব্ব সৃষ্টি, তাঁহারা ইংলণ্ডের সেক্‌সপিয়ার, স্পেনের কাল্‌ডেরণ্‌ ও জার্ম্মানির গেটে অপেক্ষা কবিত্বে কোন অংশে ন্যূন ছিলেন না। আর্য্য-সঙ্গীত এমনই মনোহর ও গাম্ভীর্য্য-পূর্ণ যে, তচ্ছ্রবণে মনুষ্য-মন মর্ত্ত হইতে স্বর্গে উন্নীত হয়—তচ্ছ্রবণে মানবগণ সকল শোক, সকল দুঃখ, সকল যন্ত্রণা ভুলিয়া যায় এবং সে সঙ্গীতে মানবহৃদয় ঐশ্বরিক ভাবে আপ্লুত হয়। তাঁহাদের মহাকাব্য জগতে অতুল্য। মহাভারত ও রামায়ণের সদৃশ কাব্য আর কোন্ দেশে জন্মিয়াছে? সাগর সহ তুলনায় গোষ্পদ যেমন, সুধা সহ তুলনায় সুরা যেমন, রামায়ণ ও মহাভারত সহ তুলনায় পৃথিবীর অন্যান্য কাব্য সেই রূপ প্রতীয়মাণ হয়। কেবল কাব্য-নাটক কেন, আর্য্যদিগের ব্যাকরণ যেমন সম্পূর্ণ এমন অপর কোন জাতিরই নহে। তাঁহাদিগের দর্শন শাস্ত্র ও চিকিৎসা শাস্ত্র, অঙ্কশাস্ত্র ও জ্যোতিষ শাস্ত্র এক সময় পৃথিবীর সকল সভ্য জাতিকেই শিক্ষা দিয়াছে। অনেকের ভ্রান্তি আছে যে, নৌবিদ্যার

ভারতবর্ষীয়েরা কখনও পারদর্শিতা প্রদর্শন করিতে পারে নাই। কিন্তু কালিদাসের রঘুবংশ যাঁহারা অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে এক্ষণকার বাঙ্গালী বাবুদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা, শত শত রণতরী লইয়া দিগ্বিজয়ী রঘুরাজকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। অধুনাতন পণ্ডিতগণের গবেষণা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, এক সময় বিজয় নামা জনৈক গৌড়ীয় রাজ-পুত্র সুসজ্জিত রণতরণী সহযোগে সিংহল দ্বীপ জয় করিয়াছিলেন। জাহঙ্গীর বাদসাহের সময়েও বঙ্গদেশীয় বণিকেরা বাণিজ্যার্থ দ্বীপ দ্বীপান্তরে গমন করিতেন—তখন বাঙ্গালীর জাহাজ ইংরাজ তৈয়ারি করিয়া দিতেন না—তখন তাঁহারা আপনাদের জাহাজ আপনারাই প্রস্তুত করিতেন এবং আপনারাই তাহা সুসজ্জিত করিয়া দেশদেশান্তরে লইয়া যাইতেন। আর্য্যদিগের পোশাক পরিচ্ছদের কথা বলা বাহুল্য, মণিমুক্তা-জড়িত অলঙ্কার তাঁহারা স্মরণাতীত কাল হইতে ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। বাঙ্গালার সুচারু কার্পাস বস্ত্র ও পঞ্জাবের অপূর্ব্ব লোমজ বসন অদ্যাপি অপরাপর সভ্য সমাজের অননুকরণীয় হইয়া রহিয়াছে। দুঃখের বিষয় উৎসাহ অভাবে ভারতবর্ষ হইতে তন্তুবায় ব্যবসায় ক্রমশঃ লোপপ্রাপ্ত হইতেছে। এক্ষণে তাঁতিরাও অন্যান্য জাতির ন্যায় ঘৃণিত কেরাণীবৃত্তি অবলম্বন করিতেছে। আর্য্যেরা এক্ষণকার ইউরোপীয়দিগের ন্যায় মনোহর পর্য্যঙ্কোপরি দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করিতেন এবং তাঁহাদের মত সভাধিবেশনে * সুবিহিত সোপানাবলী শোভিত, নানা-বর্ণ-রঞ্জিত-আস্তরণ মণ্ডিত মঞ্চোপরি সুচারু আসন পরম্পরায় উপবিষ্ট হইয়া পাদপীঠে চরণ ও আসন-পৃষ্ঠে ভুজ স্থাপন করিয়া পরস্পর সদালাপ করিতেন। আর্য্যদিগের অট্টালিকা, উপবন ও ধ্বজপতাকা শোভিত নগর সকল দুর্গ, প্রাকার ও পরিখা দ্বারা সংরক্ষিত হইত। তাঁহাদের আইন আদালৎ, হাটবাজার, রাস্তা ঘাট সকলই ছিল। সভ্য জাতির যাহা কিছু প্রয়োজনীয় তাহা তাঁহাদের সকলই ছিল, কেবল কল-কাটরায় তাঁহারা বিশেষ উন্নতি করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের কলের জাহাজ, কলের গাড়ি, গ্যাসের আলো ও তাড়িৎ-দূত ছিল না, কিন্তু শত বৎসর পূর্ব্বে ঐ সকল উপাদান কোন্ জাতিরই ছিল? আর্য্যেরা সংসার বিরাগী ছিলেন না, তাঁহারা ঐহিক সুখসাধক সকল বিষয়েরই সম্যক্ উন্নতি করিয়াছিলেন, তাঁহারা কেবল ঈশ্বর ঈশ্বর করিয়া সংসার ভুলেন নাই এবং এক্ষণকার নাস্তিকদের মত নিরবচ্ছিন্ন ইন্দ্রিয় সুখানুরোধে ঈশ্বরকেও ভুলেন নাই। তাঁহারা মানবোচিত কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। মনুষ্যের যাহা কর্ত্তব্য তাহা কবিবর লং ফেলো নিম্নোদ্ধৃত একটিমাত্র শ্লোকে সুন্দররূপে উপদেশ দিয়াছেন।

* রঘুবংশের ষষ্ঠ সর্গের ৩য় হইতে ১৬ শ শ্লোক দেখুন।

"Trust not in future however pleasant,
Let the dead past bury its dead;
Act, act in the living present,
Heart within and God over head."

যতই মনোজ্ঞ হোক, ভবিষ্যতে কোর না বিশ্বাস,
করুক অতীত কাল ভূতের সমাধি;
কার্য্য কর বর্ত্তমানে, প্রাণপণে থাকিতে নিশ্বাস
হৃদয়ে সাহস, ঈশে শিরোদেশে বাঁধি॥

নব্য বাঙ্গালীকে আমরা লং ফেলোর এই মহাবাক্য সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে বলি এবং এই মহাবাক্য নিহিত সমীচীন উপদেশ অনুসারে আচরণ করিতে বলি। যুগপৎ ঈশ্বরপরায়ণ ও কার্য্যশীল না হইলে কখনই উন্নতি হইবে না।

স্বজাতি-বৎসল পূর্ণ বাবু বাঙ্গালীকে কার্য্যক্ষম করিতে চাহেন, এই জন্য তিনি অদম্য উদ্যমশীল ইউরোপীয়গণের চরিত্র বিশেষ অভিনিবেশ ও দক্ষতার সহিত সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন "যে উদ্যোগ, উৎসাহ, সাহস, অধ্যবসায়, সহিষ্ণুতা এবং প্রাণপণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞা (ইউরোপীয়দিগের) এই জয়পতাকা রোপণের প্রধান সাধন, সেই সমস্ত মহার্ঘ গুণ পরম্পরা যত দিন আমরা অর্জ্জন করিতে না পারিব তত দিন আমাদের উন্নতি নাই, তত দিন আমরা জ্ঞান করিব, ইউরোপীয়গণ আমাদিগের অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ এবং তাঁহাদিগের নিকট এখনও আমাদের অনেক বিষয় শিখিবার আছে।" মহৎকার্য্যের অনুষ্ঠান বা প্রকৃত উন্নতির চেষ্টা বাঙ্গালীর আদৌ নাই। বাঙ্গালী অলস ও বিলাসী, বাঙ্গালী ভীরু ও নীচাশয়, নির্ব্বীর্য্য বাঙ্গালীর উচ্চদিকে তাকাইতে ও ভয় হয়। বাঙ্গালী মদ খাইবে, উপন্যাস পড়িবে ও তাকিয়া হেলান দিয়া হুক্কা টানিবে। বাঙ্গালী নাট্যাভিনয় দেখিতে গেলে শোকাতুরা সাবিত্রীর নাচ না দেখিলে ক্ষান্ত হইবে না, সত্যবান মরিল কিন্তু সাবিত্রীকে খ্যামটা নাচিতে হইবে। বাঙ্গালীর এমনই নীচ প্রকৃতি যে চাকরি ভিন্ন অন্য কোন ব্যবসায়ে তাঁহার স্বতঃ প্রবৃত্তি জন্মিবে না। পূর্ণ বাবু বলেন "চাকরি করাও পরের দাস হইয়া থাকা আমাদের জাতীয় ব্যবসায়, ভারতবর্ষীয় আর কোন জাতির ইহা জাতীয় ব্যবসায় নহে, আর কোন জাতি এত দূর নীচ-প্রকৃতি নহে। চাকরি ভিন্ন আর কোন ব্যবসায়ে বাঙ্গালীর চিন্তা বিস্তৃত হয় না। * * * পরের পাদলেহনে ও উপাসনায় বাঙ্গালী বিলক্ষণ পটু। সে কার্য্য তাহাকে শিক্ষা দিতে হয় না। সে কার্য্যে যে চাতুরী, যে নীচতার আবশ্যক তাহা বাঙ্গালী বিলক্ষণ জানেন। চাকরি হইলে কিরূপ

চাতুরী ও নীচতার সহিত সেই চাকরি রক্ষা করিতে হয় তাহাতেও বাঙ্গালী বিশিষ্ট রূপ পারদর্শী আছেন। বাঙ্গালী আর কিছুর জন্য গৃহ-ত্যাগী হইবেন না, কেবল চাকরির জন্য হইবেন। বাঙ্গালী আর কিছুরই জন্য আত্মীয় স্বজন ও পরিবার বর্গ পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারেন না কেবল চাকরির জন্য পারেন। বাঙ্গালী কিছুতেই জাতিভ্রষ্ট হইতে স্বীকৃত হইবেন না, কেবল চাকরির জন্য হইবেন। বাঙ্গালী চাকরির জন্য সাত সমুদ্র তের নদী পার হইতে স্বীকৃত আছেন ও বাস্তবিক তাহাই করিতেছেন। তিনি ইংলণ্ডে যান, বড় চাকর হইবার জন্য। দাসত্ব বিশিষ্ট রূপে সম্পন্ন করিবার জন্য তিনি বিশিষ্ট রূপে শিক্ষিত হইয়া আইসেন।" বাস্তবিক বাঙ্গালীর চরিত্র নিতান্ত লজ্জাকর হইয়া পড়িয়াছে। দেশ শুদ্ধ লোক দাস হইয়া গেলে আমাদের উন্নতির আর কি আশা রহিল। চাকরিতে কখনই দুঃখ ঘুচে না। স্বাধীন ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে শিখ। স্বাধীন ভাবে উৎসাহ পুরিত হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও অবশ্যই অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। কষ্ট ভিন্ন কখনই ইষ্ট লাভ হয় না, "বিঘ্ন বিপত্তি অতিক্রম করিতে না পারিলে কখনই উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়া যায় না।"

ইংরাজ মদ খায়, বাঙ্গালী মদ খাইতে শিখিয়াছে; ইংরাজ কোটপেণ্টালুন্ পরে, বাঙ্গালী কোট পেণ্টালুন্ পরিতে শিখিয়াছে, ইংরাজ চুরুট খায়, বাঙ্গালী চুরুট খাইতে শিখিয়াছে; সংক্ষেপতঃ বানরে যেমন মানুষের অনুকরণ করে, বাঙ্গালী ঠিক সেই রূপ ইংরাজের অনুকরণ করিতে শিখিয়াছে। ইংরাজের নিকট যাহা শিক্ষণীয়, বাঙ্গালী আজও তাহা শিখে নাই। ইংরাজের শ্রমসহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায় বাঙ্গালী কই শিখিয়াছে? ইংরাজের স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতিপ্রেম বাঙ্গালী কই শিখিয়াছে। বাঙ্গালী যদি বাঙ্গালীকে ভ্রাতৃভাবে ভালবাসিত তাহা হইলে একদেশবাসী, এক ভাষা ভাষী হিন্দু মুসলমানের পরস্পর বিদ্বেষভাব থাকিত না, তাহা হইলে মুসলমানেরা হিন্দুকে কাফের এবং হিন্দুরা মুসলমানকে নেড়ে বলিয়া ঘৃণা করিত না। বাঙ্গালীর যে, কোন বিষয়েই একতা নাই, তাহা এই স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতিপ্রেম না থাকা প্রযুক্ত। পাঁচজনে মিলিয়া আজিও বাঙ্গালী কোন বিষয় সুসম্পন্ন করিতে পারে না। পাঁচজনের দ্বারা যে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছে বাঙ্গালীর সেই কার্য্যেই বিঘ্ন ও বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস, মেট্রপলিটান কলেজ ও কলিকাতা ট্রেনিং স্কুলের ইতিহাস আমাদের উক্তির যাথার্থ্য প্রমাণ করিয়া দিতেছে। আমাদের যদি একতা থাকিত তাহা হইলে আমাদের সমাজ-প্রচলিত প্রমাদজনক কুপ্রথা সমূহ কোন কালে সংশোধিত হইত, কত কত মহদ্ব্যাপার অনুষ্ঠিত ও সম্পাদিত হইত—দেশের শ্রী ফিরিয়া যাইত। ইউরোপীয়েরা

কোন্ ব্যবসায় ভাগে না করিতেছেন? ভাগে তাঁহারা কোন্ মহৎকার্য্য সুসম্পন্ন না করিতেছেন? ভাগে ব্যবসায় চালাইতে, মিলিয়া মিসিয়া কার্য্য করিতে কি বাঙ্গালী কখন ও শিখিবে না? দেশীয় ক্রোরপতিগণ কোম্পানির কাগজ ক্রয় করিয়া রাখা ভিন্ন অর্থের কি অন্য ব্যবহার শিখিবেন না? তাঁহারা পাঁচজনে অর্থ সাহায্য করিয়া বড় বড় শিল্প-কারখানা কেন না খুলেন? তাঁহাদের অর্থ থাকিতে দেশের উৎপাদিকাশক্তি থাকিতে, দেশীয় লোকের সামর্থ থাকিতে, শিল্পজাত সামগ্রীর জন্য আমরা অন্য দেশের উপর নির্ভর করি কেন? বাঙ্গালী আপনার দোষে দুঃখ পাইতেছে। সমাজের সময়োচিত সংস্কার না করিলে, এখনও পূর্ব্বতন শাস্ত্রানুসারে চলিলে এবং জড়বৎ নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলে, অবশ্যই দুঃখ পাইতে হইবে। স্বদেশের প্রতি আমাদের প্রকৃত অনুরাগ না জন্মিলে, আমাদের জাতীয় ঐক্য না হইলে, স্বদেশ ও স্বজাতির তরে সঙ্কীর্ণতা ও স্বার্থপরতা বিসর্জ্জন করিতে না পারিলে, আমাদের অবশ্যই দুঃখ পাইতে হইবে।

সূর্য্যবংশের গৌরবের সহিত ভারতের স্বাধীনতা বহুকাল অস্তমিত হইয়াছে, স্বাধীনতার ভাব ভারতবাসীদিগের হৃদয় হইতে বহুকাল অন্তর্হিত হইয়াছে, ব্রাহ্মণ ও মুসলমানের অধীনতা ও অত্যাচার তাহারা বহুকাল সহ্য করিয়া আসিয়াছে। যখন সেই অত্যাচার অসহ্য হইয়া উঠিল, যখন তাহারা নিতান্ত নিপীড়িত, ও পদদলিত হইয়া অবসন্ন হইয়া পড়িল, তখন ন্যায়ের মন্দিরে প্রজাপীড়ন পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ সেরাজ রূপ পশু বলি প্রদত্ত হইল। সেই সেরাজ রুধিরে বিধৌত হইয়া আজি ভারত পুনর্জ্জীবনে জীবিত হইতেছে। ভারতের ভাগ্য-গগণ পুনর্ব্বার পরিস্কার হইয়া আসিতেছে। ভারতের পরাধীনতা রূপ ধ্বান্তরাশি ক্রমশঃ বিদূরিত হইবে এরূপ আশা করা যাইতেছে। জীর্ণ রোগে বহুদিন শয্যাগত যে ব্যক্তি সে কি আরোগ্য লাভ করিলে এক, দিনেই চলিয়া বেড়াইতে পারে? চিরপরাধীন, পৌরুষবিহীন বাঙ্গালীকে স্বাধীনতা দিলে সম্প্রতি সে স্বাধীনতা তাহারা কি রক্ষা করিতে পারে? বাঙ্গালীর রাজনৈতিক স্বাধীনতা এখনও অনেক দূরের কথা। আমরা যদি যথার্থই স্বাধীনতার ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়া থাকি, যদি আমরা স্বাধীনতার জন্য যথার্থই লালায়িত হইয়া থাকি, তবে অগ্রে আমরা দেশাচারের অধীনতা হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টা করিতেছি না কেন? কেন আমরা সামাজিক কুপ্রথা সমূহের সংশোধনে যত্নবান হইতেছি না? বুঝিতে পারিতেছি—জাতিভেদ, বর্ণভেদ ও সম্প্রদায় ভেদে ভারতের সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে, তবুও কেন আমরা সেই মহানর্থের মূলে কুঠারাঘাত করিতে পারিতেছি না? বুঝিতে পারিতেছি চিরদুঃখিনী বিধবাদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ না দেওয়া মহাপাপ

তবুও কেন সেই অবশ্য কর্ত্তব্য বিষয়ে আমরা পরাঙ্মুখ হইয়া রহিয়াছি? বুঝিতে পারিতেছি বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ প্রমাদজনক তবুও কেন তন্নিবারণে আমরা কৃতকার্য্য হইতেছি না? বুঝিতে পারিতেছি চাকরি করিয়া, দাসত্ব করিয়া, আমাদের দৈন্যদুঃখ বিমোচন হইতেছে না, তবুও কেন আমরা শিল্পশিক্ষা ও বানিজ্যের জন্য ভারতসীমা অতিক্রম করিতে সাহসী হইতেছি না? কেন আমরা আমাদিগের কুমারীদিগকে যথোচিত শিক্ষাদানে নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিয়াছি। আমরা স্বাধীনতা চাই কিন্তু আমাদের হৃদয়ের বল নাই; আমরা মহারাজ বলাইতে চাই কিন্তু আমাদের রাজপ্রতাপ নাই; আমরা বীর নামে অভিহিত হইতে চাই কিন্তু আমাদের বীর্য্য বা কার্য্য শক্তি নাই। পূর্ণ বাবু যথার্থই বলিয়াছেন "আমাদিগের যদি এক্ষণে কোন বীরত্বের আবশ্যক হয়, তাহা সামাজিক অধীনতার বল অতিক্রম করিয়া উন্নতির দিকে উঠিতে পারার বীরত্ব। এই বীরত্বে মাতিতে পারিলে এক দিন আমরা পুরুষ নামের উপযুক্ত হইব। এই বীরত্বে মাতিতে পারিলে আমরা সর্ব্ববিধ যুদ্ধে ক্রমশঃ সমর্থ হইব। যে শত্রু অতি গোপনীয় ভাবে অদৃশ্য রূপে আমাদিগের সমূহ অনিষ্ট করিতেছে, আমরা যদি তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইতে না পারিলাম, তবে আর কাহার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইব?"

স্বাধীনতা লাভ করিতে হইলে অগ্রে আত্ম-নির্ভর করিয়া কার্য্য করিতে শেখা একান্ত আবশ্যক, যাঁহার আত্ম-নির্ভর নাই তাঁহাকে পরের উপর নির্ভর করিয়া চলিতেই হইবে, কাযেই পরাধীনতা তাঁহার অনতিক্রমনীয়। বাঙ্গালীর স্বাতন্ত্র্য ও আত্ম-নির্ভর আদৌ নাই, কাযেই বাঙ্গালীকে সকল বিষয়েই পরাধীন হইয়া থাকিতে হইয়াছে। পারিবারিক একান্নবর্ত্তিতা আমাদিগের স্বাতন্ত্র্য ও আত্ম-নির্ভর জন্মিবার পক্ষে প্রধান অন্তরায়। এই একান্নবর্ত্তী ব্যবস্থা বিলুপ্ত না হইলে কখনই বাঙ্গালী স্বতন্ত্র ও স্বাবলম্বী হইতে পারিবে না। একান্নবর্ত্তী ব্যবস্থায় আলস্য প্রশ্রয় পায় এবং অধিকাংশ মনুষ্য অকর্ম্মণ্য ও নীচাশয় হইয়া যায়। পিতা মাতার উচিত, সন্তান বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেই তাহাকে ভিন্ন করিয়া দেওয়া। শৈশব হইতে পঞ্চবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত পুত্রকে প্রতিপালন করা এবং লেখাপড়া ও ব্যবসায় শিখান পিতামাতার কার্য্য, তৎপরে পুত্রের প্রতি তাঁহাদের আর কোন কর্ত্তব্য নাই। কন্যার পঞ্চদশ বৎসর বয়ঃক্রম হইলেই তাহাকে অভিমত, সৎপাত্রে প্রদান করা পিতামাতার কার্য্য, তৎপরে কন্যার প্রতি তাঁহাদের আর কোন কর্ত্তব্য নাই। অপাত্রে কন্যা প্রদান করিলে পিতা মাতাকে ঘোর পাপে পতিত হইতে হয়। আমাদের দেশে কৌলিন্য বা অভিমান মন্দিরে নিত্য অসংখ্য অবলা নিষ্ঠুররূপে বলি প্রদত্ত হইতেছে। এ পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে? পিতা হইয়া,

জানিয়া শুনিয়া, কন্যাকে চিরদিনের জন্য অপার দুঃখার্ণবে নিমজ্জন করিতেছে, এ পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে?

সকল সুসভ্য জাতিকেই, সামাজিক, রাজনৈতিক ও পারিবারিক অধীনতা কিয়ৎপরিমাণে সহ্য করিতে হয়। পূর্ণ বাবু এইরূপ অধীনতাকে নির্ভর ভাব বলেন, এ অধীনতা সহ্য করিতে যিনি অপারগ তিনি নিশ্চয় যথেচ্ছাচারী, তিনি সভ্য সমাজের উপযুক্ত নহেন। যথেচ্ছাচারিতা পাশব প্রকৃতি, মানব ধর্ম্ম নহে। সমালোচ্য গ্রন্থান্তর্গত বঙ্গবামা শির্ষক প্রস্তাবে যে সকল কথা উক্ত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই প্রতিবাদ-সহ, অতএব সে সম্বন্ধে একটি পৃথক্ প্রবন্ধ লিখিবার বাসনা রহিল।

আমারা এই প্রস্তাবে যে সকল বিষয়ের আলোচনা করিলাম সেই সকল বিষয় পূর্ণ বাবুর 'সমাজ-চিন্তায়' বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইয়াছে। পূর্ণ বাবু সেই সকল গুরুতর বিষয়ের অধিকাংশই দক্ষতার সহিত বিচার করিয়াছেন। তাঁহার চিন্তাশক্তি, তার্কিকতা এবং স্বজাতি ও স্বাধীনতা-প্রিয়তার প্রশংসা করিয়া আমরা শেষ করিতে পারি না। তাঁহার সমাজ-চিন্তা, চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই অভি-নিবিষ্ট মনে পাঠ করা উচিত।

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী।

রহস্য।

সম্পাদক মহাশয়, আপনি "বিজ্ঞানদর্পণ" প্রকাশ করিতেছেন শুনিয়া বড়ই আহ্লাদিত হইলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাঙ্গালির মধ্যে প্রায় কাহারও বিজ্ঞানে আস্থা নাই। অনেকেই বলেন "আমি কেরাণি হইয়াছি, চিরকাল কেরাণিগিরি করিয়া মরিব, বিজ্ঞান পড়িয়া আমার কি হইবে?" অনর্থক নীরস বিজ্ঞান তত্ত্বে মস্তক বিঘূর্ণিত করিব কেন? এটি তাঁহাদের বিষম ভ্রম! সকল বিষয়ের কিছু কিছু জ্ঞান থাকা ভাল। একদা বিজ্ঞান আমাকে অজ্ঞান বাঙ্গালি পাইয়া কিরূপ দুর্গতি করিয়া ছিল তাহা বলিতেছি, শুনিয়া আপনাকে কাঁদিতে হইবে।

ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখিব এবং বড়লোক হইব, এই আশয়ে কালেজ

ছাড়িয়া আমি বিলাতে গিয়াছিলাম। পাঁচ ছয় মাস লণ্ডনে থাকিতে থাকিতে আমার বিস্তর সাহেবের সঙ্গে আলাপ হইল। আমিও সাহেবদের সঙ্গে থাকিয়া এক রকম সাহেব হইয়া পড়িলাম। বাল্যকাল হইতেই আমার সাহেব হইবার ইচ্ছা ছিল। কলিকাতায় একবার সাহেব সাজিয়া কয়েকজন বন্ধুকে এরূপ ভয় দেখাইয়াছিলাম যে, সে কথা মনে পড়িলে হাসি পায়। তাহারা আমাকে সে বেশে চিনিতে পারে নাই। তবু তখন পরচুলের দাড়ি গোঁফ করিয়াছিলাম; এখন আমার বেশ গোঁফ দাড়ি উঠিয়াছে এবং বাঙ্গালি ধরণে দাড়ি না রাখিয়া চুকটার রাখিয়াছি। রংটা কিছু কাল, তা প্রত্যহ যেরূপ সোপ ব্যবহার করি তাহাতে এরূপ ভরসা আছে, যে দেশে ফিরিয়া যাইলে নগেন্দ্রনাথ-সরকার বলিয়া কেহ চিনিতে পারিবে না।

পূর্ব্বেই আপনাকে বলিয়াছি যে, বিস্তর সাহেব ও ভাল ভাল বিবির সহিত আমার আলাপ হইয়াছে; কিন্তু তন্মধ্যে হার্বি নামক একজন ইঞ্জিনিয়ারের সহিত আমার বন্ধুত্ব হইল। হার্বিসাহেব খুব ভাল ইঞ্জিনিয়ার ও বড় ভদ্রলোক; হার্বির রাজসরকারে চাকরি, মাসিক বেতন একশত পাউণ্ড। আমাদের পরস্পরে এরূপ ভাব জন্মিল যে বাঙ্গালি ও ইংরাজে তদ্রূপ হইতে পারে না; দুই ইংরাজেই সম্ভবে। এইরূপে কিছু দিন যায়, এক দিন সম্বাদ আসিল যে, হার্বি সাহেবের খুড়ির কাল হইয়াছে; তিনি নিঃসন্তান হেতু মৃত্যুকালে হার্বির নামে সমস্ত বিষয় উইল করিয়া গিয়াছেন। এই সংবাদ পাইয়া, আমার বন্ধুর আনন্দের সীমা থাকিল না। আর চাকরি করিতে হইবে না; টেবিলের উপর পা তুলিয়া চিরকাল বড়মানুষি করিতে পারিবেন; এই আনন্দে বন্ধু উন্মত্ত হইলেন। একেবারে চাকরিতে জবাব দিয়া পরদিনেই হার্বি লণ্ডন পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন। যাইবার সময় আমাকে বলিয়া গেলেন "দেখ নগেন্দ্র, বোধ হয় তোমার পরীক্ষা শেষ না হইলে তুমি আমার বাটী দেখিতে যাইতে পারিবে না। তার এখনও আট মাস বিলম্ব আছে। যাহা হউক এই সময়ের মধ্যে আমিও এক রকম বাড়ীটি সাজাইতে পারিব। কিন্তু নিশ্চয় করিয়া বল পরীক্ষার শেষে আমার বাটীতে গিয়া দশ পনর দিন থাকিবে ত?" আমি বলিলাম "তার আর আপত্তি কি? কিন্তু জিজ্ঞাসা করি তোমার নিত্য এত পরিশ্রম করা অভ্যাস; এখনত আর কোন কাজই রহিল না; কিরূপে দিন কাটাইবে?" উত্তর। "কেন, কাজের ভাবনা কি? পরের জন্য পরিশ্রম করিতে হইবে না বলিয়া কি আর কর্ম্ম নাই? আমি এখন হইতে নিজের বাটীতে কলবল প্রস্তুত করিব; তাও ত দেখিতে পাইবে। আর তাই বলিতে পারি না শীঘ্র ট্রেন ছাড়িবে।"

এই বলিয়া হার্বি সেক্‌হ্যাণ্ড করিয়া চলিয়া গেলেন।

এক মাস, দুই মাস করিয়া ক্রমে জলের মত আট মাস কাটিয়া গেল। পরীক্ষার সময় আসিল, ক্রমে তাহাও শেষ হইল। এই কয় মাসের মধ্যে প্রতি সপ্তাহে হার্বির পত্র পাইতাম। প্রতি পত্রে তাহার সহিত দেখা করিবার অনুরোধ আসিত, প্রতি প্রত্যুত্তরে যথা সময়ে অনুরোধ রক্ষা করিবার মানস জানাইতাম। শেষ পত্রে হার্বি লিখিল "সোমবার বৈকালে ৪ টার ট্রেণে এখানে আসিবে, আমি গাড়ি লইয়া ষ্টেশনে অপেক্ষা করিব। এখানে তোমাকে পনর দিন থাকিতে হইবে, ইহার কম ছাড়িয়া দিব না।"

সোমবার বৈকালে একটি পোর্টমেণ্টো গুছাইয়া গাড়িতে উঠিলাম। হার্বির বাড়ী যাইতে যে ষ্টেশনে নামিতে হয়, তাহা লণ্ডন হইতে প্রায় পনর ক্রোশ দূরে। যথা সময়ে সেই ষ্টেশনে আসিয়া পঁহুছিলাম। হার্বি সেইখানে অপেক্ষা করিতেছিল। আমাকে দেখিয়া বিস্তর অহ্লাদ প্রকাশ করিল। দুইজনে তাহার গাড়িতে চড়িয়া চলিলাম।

কিছুদূর হইতে নিজের বাটী দেখিতে পাইয়া হার্বি বলিল "ঐ আমার বাড়ী দেখা যাইতেছে, ঐ যে বাগানের চতুর্দ্দিকের বাটীগুলি দেখিতেছ এসব আমার বন্ধুদের বাটী।" আমার বাড়ী থেকে সকলকার বাড়ীতে টেলিগ্রাফের তার বসাইয়াছি। যে দিন আমার কোন বিশেষ কাজ থাকে না, একজনকে টেলিগ্রাফ করি, আমার সহিত দাবা খেলিবেত শীঘ্র আইস—না হয় ত অপরকে বলি—সময় থাকেত চল শীকার করিতে যাই।"

কথা কহিতে কহিতে ফটকের কাছে আসিয়া পঁহুছিলাম। হার্বি গাড়ি থামাইল। ফটক বন্ধ ছিল কিন্তু খুলিবার জন্য গাড়ি হইতে নামিবার উপক্রম করাতে, হার্বি আমাকে স্থির হইয়া বসিতে বলিল।

ফটক আপনি খুলিয়া গেল। আমি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম "বাঃ! ভারি মজাত! গেট আপনি খুলিয়া যায়।"

হাসিয়া হার্বি বলিল "কেন? বুঝিতে পারিলে না? গেটের দশ হাত এদিকে রাস্তায় একখানি লোহার পাত আছে, গাড়ি তাহার উপরে আসিতেই সেটা একটু নামিয়া গেল; এই লোহার পাতের আর ফটকের আংটার সঙ্গে মাটির নিচে দিয়া একটি লোহার শিক আছে। লোহার পাত নামিয়া যাওয়াতে ঐ শিক ফটকের আংটাকে ছাড়িয়া দিল; ফটকে স্প্রীং আছে, উহা আপনি খুলিয়া গেল। ভিতর দিকে ঠিক্ এই রকম আর একটা লোহার পাত আছে তাহার উপর দিয়া যখন গাড়ি যাইবে, ঠিক এইরূপে ফটক আপনি বন্ধ হইবে।"

আমি এরূপ কলের ফটক কই আর কোথাও দেখি নাই। ইহাতে তোমার ভারি সুবিধা হইয়াছে। হার্বি। সুবিধা নয়! আমাকে দরওয়ান রাখিতে হয় না।

গাড়ি বারাণ্ডার নিচে গাড়ি আসিল। দেখি, একজন সহিস দাঁড়াইয়া আছে; একজন চাকর ভিতরের দরজা খুলিতেছে। আমি কিছু না বলিবার পূর্ব্বেই হার্বি বলিল "দেখ, আমি কাহাকেও ডাকি নাই, তথাপি আমরা আসিয়াছি ইহারা জানিতে পারিয়াছে। ফটক খুলিবার লোহার পাত দেখিয়াছ, সেই পাতের সঙ্গে দুইটি ইলেক্‌ট্রিক্ তার আছে। আস্তাবলের ও চাকরদের ঘরের ঘণ্টার সহিত ঐ তারের যোগ আছে। লোহার পাতটি নামিয়া যাওয়াতে ঐ তারের দ্বারা দুইটি ঘণ্টা বাজিয়াছে। ঘণ্টার শব্দে ইহারা জানিতে পারিল যে, কেহ বাড়িতে আসিতেছে।"

আমি। এটাও বড় মন্দ নয়। কোন ভদ্রলোককে আসিয়া অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয় না।

বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলাম। হার্বির ভগিনী পাশের ঘরে বসিয়াছিলেন, আমাদের দেখিতে পাইয়া নিকটে আসিলেন, হার্বি পরস্পরের পরিচয় দিয়া দিল। মিস্ হার্বিকে দেখিয়া, হার্বির ভগিনী বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহার বয়স অনুমান ৫০ বৎসর। তাঁহাতে স্ত্রী জাতির মাধুর্য্য কিছুমাত্র নাই। তাঁহাকে দেখিলেই ইষ্টলিনের বর্ণীলিয়াকে মনে পড়ে। তিনি যথাসাধ্য মিষ্ট স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন মহাশয় আসিতে কোন কষ্ট হয় নাইত?" এইরূপ আরও দুই একটি কথার পর তাহার কোন গৃহ কার্য্য মনে পড়াতে চলিয়া গেলেন।

উঠিবার শিঁড়ীর বাম দিকে দেখিলাম, একটা মোটা লোহার শিকের গায়ে কতকগুলি বাঁকান লোহার কাটি আছে; এক একটি কাটিতে এক একখানি ব্রুস লাগান আছে। কলটি দেখিয়া কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না, জিজ্ঞাসা করিলাম "হার্বি, ওটা কি হে।"

হার্বি। কোন্‌টা! ওঃ। ওটি আমার ব্রুসের কল। দাঁড়াও তোমাকে বুঝাইয়া দিই। এই যে জমি হইতে এক ফুট উচুঁতে এক খানি চৌকি দেখিতেছ উহার উপর দাঁড়াইতে হয়, উহার উপর উঠিলেই তোমার ভরে আস্তে আস্তে চৌকি খানি নামিতে থাকে; আর নামিবার সময় তাহার মধ্যস্থিত কতকগুলি ঘড়ীর কলের মতন চাকাকে চালাইয়া দেয়, আর এই সকল বাঁকান ব্রুস লাগান শিক গুলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া তোমার কোট পেণ্টুলেন ও জুতা ব্রুস করিতে থাকে। কিন্তু সকল অপেক্ষা উপরের হ্যাট ব্রুসটিই মজার। এটি দেখিতে ঠিক যেন একটি হ্যাট বাক্স দুই ভাগ করা। এখন ইহাদের মধ্যে বিলক্ষণ—

আমি। চমৎকার! চমৎকার! একবার ওঠ না দেখি কেমন চলে।

হার্বি। তার আর আটক কি?

এই বলিয়া হার্বি চৌকির উপর উঠিয়া দাঁড়াইল; উঠিবামাত্র ব্রুসগুলি সুন্দর রূপে ঘুরিয়া কাপড় ঝাড়িতে লাগিল; কিন্তু উপকার টুপির ব্রুসটি যেমন তেমনি রহিল। যখন নিচের ব্রসগুলির কার্য্য অর্দ্ধেক হইল, উপরের ব্রুসটি নামিয়া টুপির চতুর্দ্দিকে বেগে বার দশ পনর ঘুরিয়া তফাৎ হইয়া পড়িল।

হার্বি নামিয়া আসিয়া বলিল "কেমন মজার কল? উঠে একবার ব্রুস হয়ে এস।

আমি। না, না, এখন থাক্। আর এক সময় তখন দেখা যাবে।

হার্বি। তবে ভাই তুমি একটু বস; আহারের উদ্যোগ কতদূর হইল একবার দেখিয়া আসি।

হার্বি চলিয়া গেলে, কলটি নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম। ইচ্ছা হইল একবার উঠিয়া দেখি কি রকম চলে। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম ঘরে কেহই নাই। চৌকীর উপর উঠিলাম, ব্রুসগুলি পরিস্কার রূপে কোট, পেন্টুলেন ঝাড়িতে লাগিল। আর টুপির ব্রুস! ও বাবা! একি বিপদ! প্রাণ যায় যে!

আমার যে মাথায় টুপি ছিল না তা মনেই নাই। ফলে এরূপ যন্ত্রণা কখন ভোগ করি নাই। উঃ। টুপির ব্রুস দুটি মুখের উপর যোড়া লাগিয়া গেল। ভিতরের দুটি আংটাদ্বারা কাণদুটিকে উত্তম রূপে চিম্‌টাইয়া মুখের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে লাগিল। নাকে যে চামড়া রহিল এরূপ বোধ হইল না। আমি যেন ছাঁওনা তলায় বর দাঁড়াইয়া রহিলাম। দুঃখের মধ্যে নাককান মলা খাইলাম কিন্তু কন্যারত্ন লাভ হইল না। মনে করিলাম নীচু হইয়া পলাই। বাবারে! যেমন নিচু হইব, পশ্চাৎ হইতে কাপড় ঝাড়া ব্রুস দুটী দুই গুঁতা মারিয়া খাড়া করিয়া দিল। সৌভাগ্যক্রমে শীঘ্রই যন্ত্রণার শেষ হইল। নামিয়া দেখি, হার্বি এক কোনে দাঁড়াইয়া হাসিতেছে; হার্বির আর হাসি থামে না। আমি কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া, সম্মুখের আরসিতে চেহারা দেখিলাম। প্রথমে হাসিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, এখন নিজের চেহারা দেখিয়া আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলাম না। মাথার চুলগুলি পাকাইয়া মন্দিরের চূড়ার মতন হইয়াছে। আর আমার সখের হুইস্কারের এক ভাগ কলের সাহায্যে গিয়াছে, অপরাংশ নাসিকা রক্ষা করিতে ব্যস্ত।

হার্বি কথঞ্চিৎ হাস্য সম্বরণ করিয়া বলিল "কি বিপদ! কলটা যে ঠিক আমার মাপের মতন; তা বুঝি ঠাওর নাই? আবার টুপি রাখিয়া উঠিতে গেলে কেন?" আমি বলিলাম যাক্, বেশ ব্রুস হওয়া গেল, আর ও কথায় কাজ নাই।"

"এখন কাপড় ছাড়িবে এস, আহার প্রস্তুত।" এই বলিয়া হার্বি আমাকে উপরের একটি ঘরে লইয়া গেল।

হার্বি। যে কয়দিন এখানে থাকিবে, এই ঘরটি তোমার।

আমি। বাঃ! ঘরটি ত বেশ বড়!

হার্বি। হাঁ, ঘরটি বড় বটে। যদি রাত্রিতে একলা এত বড় ঘরে থাক্‌তে ভয় হয়, আমি না হয় এই ছোট বিছানায় শোব।

আমি। না, না, এখন আর আমার বড় ঘরে শুয়ে ভয় হয় না।

হার্বি। (হাসিয়া) তবে ভাল। এই ঘরে অনেক রকম কল আছে, তোমাকে দেখাইতেছি। অন্ধকার হয়ে এল, আগে গ্যাসটা জ্বালা যাক্‌। আমার বাড়িতে গ্যাস আপনি জ্বলে, কাহাকেও জ্বালাইতে হয় না। নিচে কতক গুলি ব্যাটারি আছে। ব্যাটারির তার সমস্ত গ্যাসের সঙ্গে যোগ আছে। এই হাড়ের হাতোলটি টিপিলেই ব্যাটারি চলিবে; একটি তার সমস্ত গ্যাসের চাবি খুলিয়া দিবে, আর এইটিতে ইলেক্‌ট্রিসিটি দ্বারা গ্যাস জ্বালিয়া দিবে।

এই বলিয়া হার্বি হাতোলটি টিপিল। দেখিতে দেখিতে ঘরের গ্যাসগুলি দপ্‌ দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। আমি আবাক্‌ হইয়া রহিলাম।

আমি। আচ্ছা অত উঁচুতে একটা গ্যাস কেন? হার্বি। ঐ গ্যাসের উপর যে একটি পিতলের মোটা শিক দেখিতেছ, উহা কেবল পিতলের নয়; অন্য অন্য ধাতু মিশ্রিত ও এরূপ ভাবে তৈয়ারি যে অল্প উত্তাপেই বাঁকিয়া যায়; শিকটি বাঁকিয়া—

হার্বির কথার শেষ না হইতেই একে বারে ঘরের সমস্ত খড় খড়ি গুলি বন্ধ হইয়া গেল। জানালার পর্দ্দা আপনি পড়িয়া গেল। আমি যেন ভৌতিক ক্রীড়া দেখিতেছি, অবাক হইয়া হার্বির দিকে চাহিলাম। হার্বি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিতে লাগিল "ঐ শিকটি উত্তাপে বাঁকিয়া ছাতে ঠেকিয়া থাকে। ছাতে একটি টিপ্‌কল্‌ আছে, সেইটিকে টিপিয়া ধরে। খড় খড়ি খোলা থাকিলে এক রকম স্প্রীং দ্বারা আট্‌কান থাকে; টিপ্‌কল টিপিলে সেই স্প্রীং অল্‌গা হইয়া যায়; আর অপর স্প্রীং দ্বারা খড় খড়ি বন্ধ হইয়া পড়ে। আবার দেখ, খড় খড়ি বন্ধ হইলেই পর্দ্দার দড়ি আল্‌গা হইয়া আপনি পড়িয়া যায়।

আমি। ঐ যে আর একটি হ্যাণ্ডেল রহিয়াছে ওটিও ঠিক্‌ গ্যাস জ্বালিবার হ্যাণ্ডেলের মতন। উহাতে আবার A লেখা আছে। ওটি কিশের?

হার্বি। A মানে এলার্ম। প্রত্যেক ঘরে ঐরূপ এক একটি আছে। ছাতের উপর একটা প্রকাণ্ড ঘণ্টা আছে। নীচে একটি ইলেক্‌ট্রিক ব্যাটারির সহিত ঐ ঘণ্টার যোগ আছে। হ্যাণ্ডেল টিপিলেই ব্যাটারি চলে, আর ঘণ্টা ভয়ানক

শব্দ করিয়া বাজিতে থাকে। ঘণ্টার শব্দ শুনিলেই প্রতিবাসীরা জানিতে পারে যে, কোনরূপ বিপদ ঘটিয়াছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত ঘণ্টার ব্যবহার হয় নাই।

এই ঘরে আর দুইটি কল আছে, ঐ যে কোণে পর্দ্দা ফেলা রহিয়াছে, উহা স্নান করিবার স্থান; উহার ভিতর, মাথার উপর খুব বড় সাওয়ারবাথ্ আছে, প্রবেশ করিলেই জল পড়িবে, কোন রূপ কল টিপিতে হইবে না। প্রাতঃকালে না হয় ঐ খানে স্নান করিও।

আমি। তাহবে এখন; আমার বোধ হয় তোমার যা কিছু কলবল এই ঘরেই শেষ করিয়াছ।

হার্বি। না ভাই, প্রত্যেক ঘরেই কিছু না কিছু আছে। আচ্ছা একবার দেখে এসদেখি কলে জল আছে কি না?

আমি। আছে, এইমাত্র জল আসিতেছে।

হার্বি। এইমাত্র আসে নাই। তুমি দেখিতে যাইবার সময় একটি টিপকল তোমার ডান পাদিয়ে মাড়াইয়াছ তাহাতেই জল আসিয়াছে, আবার আসিবার সময় আর একটি মাড়াইবে তা হলেই কল বন্ধ হইবে।

আমি। আচ্ছাবুদ্ধি যাহ'ক। ভাবিয়া ভাবিয়া এত কাণ্ড করিয়াছ।

হার্বি। আর একটি জিনিষ এ ঘরে আছে। বিছানার কাছে এই যে তিনটি টিউব দেখিতেছ ইহা দ্বারা কথা কহা যায়। যাহাতে ১ লেখা আছে উহা আমার ঘর পর্য্যন্ত গিয়াছে, অপর দুইটি, একটি আমার ভগ্নির ঘরে ও আর একটি লিডির ঘরের সহিত যোগ আছে। শেষের দুইটি বোধ হয় তোমার কোন আবশ্যক হইবে না, তবে যদি লিডিকে সকালে চা আন্‌তে বল।

আমি। লিডি কে? দাসী নাকি? দেখিতে বেশ সুন্দর ত?

হার্বি। কেন দাসী হইলে কি সুন্দর হইতে নাই? কিন্তু এরি মধ্যে তোমার সেদিকে নজর পড়িয়াছে যে। দেখো, যেন কোন তামাসা করিও না, সে তামাসা বুঝে না।

আমি। ওকথা বল্লে যে? তুমি কি আমার চরিত্র জান না?

হার্বি। তোমার চরিত্র আমি বেশ জানি। তামাসা করিতেছিলাম মাত্র। এখন কাপড় ছাড়, আহার প্রস্তুত। আমিও কাপড় ছাড়িগে।

বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া মনে করিলাম একবার নল দিয়া কথা কহিয়া দেখি; ১ নম্বর নলে ফুঁ দিলাম, অপরদিক হইতে উত্তর আসিল "ব্যাপার কি," আমি বলিলাম "আমার হইয়াছে তোমার কি বিলম্ব হবে?" "আমারও হইয়াছে, আইস।"

নীচে একটি বড় ঘরে আমরা তিন জনে আহার করিতে বসিলাম। আহারের পর মিস্ হার্বি উঠিয়া গেলেন।

হার্বি আমাকে তাহার কল কৌশল দেখাইতেছে এমন সময়ে ঘরে একটি ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল।

হার্বি। এ নিশ্চয় ভব সাহেব টেলিগ্রাফ করিতেছে। দেখি কি বলে।

কট্ কট্ কট্ কট্ ... ...

ও বলিতেছে কাল বৈকালে উহার বাড়ীতে আহার করিতে হইবে। আমি বলি আমার এক বন্ধু আসিয়াছে।

কট্ কট্ কট্ কট্ ... ...

ওহে তোমাকেও নিয়ে যেতে বলে; কি বল?

আমি। তা হানি কি।

কট্ কট্ কট্ কট্ ... ...

হার্বি। তবে তাই ঠিক হইল।

ঘরে একটা পিয়েনো ছিল, হার্বি সেইটি বাজাইয়া গান গাইতে লাগিল। গান শেষ হইলে হার্বি বলিল, "এ পিয়েনোটি আপনি বাজে তা জান?

আমি। আপনি বাজে কি রকম, দম্ দিতে হয় বুঝি?

হার্বি। কিছু না। এই দেখ বাজিতে আরম্ভ হইল।

বাস্তবিক পিয়েনো বাজিয়া উঠিল চাবিগুলি উঠিতেছে পড়িতেছে, যেন কেহ বাজাইতেছে, অথচ নিকটে কেহই নাই। শেষে হার্বি ইহার রহস্য ভাঙ্গিয়া দিল। হার্বির বাড়ীর পাশে তাহার এক বন্ধু আছে; তাঁহারও ঠিক্ এই রকম একটি পিয়েনো আছে। সরু সরু তার দ্বারা একটীর চাবির সহিত অপরটির চাবির যোগ আছে। তারগুলি মাটির নীচে বসান আছে। একটীতে কোন গৎ বাজাইলে অপরটীতেও সেই গৎ বাজিতে থাকে।

এতক্ষণ হার্বি বাজাইতেছিল, এখন তাহার বন্ধু বাজাইতেছেন।

হার্বি। দেখ, আমি একটী বড় মজার চোর কল করিয়াছি যে, দরজা দিয়া বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিতে হয়, উহাতে দুইটী পিতলের হ্যাণ্ডেল আছে। উহার সহিত একটী গ্যালভানিক ব্যাটারির যোগ আছে; যখন শয়ন করিতে যাই, একটী চাপ্‌কল দিয়া ব্যাটারি চালাইয়া দিই, যদি কোন চোর আসিয়া বাটীতে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করে, তা হইলেই তাহার সর্ব্বনাশ। হ্যাণ্ডেল ধরিবামাত্র তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিবে; হাতের শিরগুলি এত অবশ হইবে যে, হাত তুলিয়া লইবার ক্ষমতা থাকিবে না, হ্যাণ্ডেল ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে। শেষে আমি আসিয়া ব্যাটারি বন্ধ করিয়া দিই।

আমি। মন্দ নয়! কিন্তু যদি তুমি টের না পাও, বোধ হয় তাহাকে সমস্ত রাত্রি ঐ রূপ যন্ত্রণা পাইতে হইবে?

হার্বি। হ্যাণ্ডেল ধরিলেই আমার ঘরে একটি ঘণ্টা বাজিবে, তা হইলেই আমি টের পাইব।

রাত্রি অধিক হইল। আমরা শয়ন করিতে গেলাম। হার্বি আমার ঘরের দরজা পর্য্যন্ত আসিয়া গুড্‌নাইট বলিল। যাইবার সময় বলিয়া গেল "যদি কিছু আবশ্যক হয়, টীউব দিয়া, বলিয়া পাঠাইও।

শয়ন করিলাম। অল্প ক্ষণের মধ্যেই নিদ্রা আসিল। স্বপ্নে বোধ হইল যেন রেলের গাড়ি চড়িয়া কোথাও যাইতেছি। এঞ্জিনের বাঁশী বাজিতেছে। হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। দেখি হার্বি নল দিয়া শিস্ দিতেছে; আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "খবর কি? উত্তর আসিল "বিশেষ কিছু নয়, কোন অসুখ হয় নাইত? আর বলিতেছিলাম যে প্রাতে নয়টার সময় আমরা আহার করিব।" আমি কতকটা রেগে বলিলাম "এতক্ষণ কোন অসুখ ছিল না, তুমি আমার ঘুম ভাঙ্গাইয়াছ, এরূপ আর জাগাইও না।"

"এরূপ আর জাগাইও না" বলিলাম বটে কিন্তু ঘুমাইলেত জাগাইবে; ঘুম আর হয় না; অনেক ক্ষণ এপাশ ও পাশ করিলাম নিদ্রা আসিল না। ভাবিয়া স্থির করিলাম, হার্বি যেমন আমাকে জব্দ করিয়াছে, আমিও উহাকে জব্দ করি। টিউব ধরিয়া হুইসল্ বাজাইলাম; কতকটা ঘুমন্ত স্বরে উত্তর আসিল "কেন?" আমি বলিলাম "আমার আর ঘুম হইতেছে না, হয় তুমি আমার ঘরে আইস, নতুবা আমি তোমার নিকটে যাই, তুমি আসিলেই ভাল হয়। যেমন বলিয়াছিলে, আসিয়া ছোট বিছানায় শোও।"

উত্তর। আমি! আমি তোমাকে কি বলিয়াছিলাম? পাজি, নচ্ছার, হতভাগা! তোর চরিত্র এত খারাপ! সকালে উঠিয়া হার্বিকে এবিষয় বলিয়া তোকে উচিত শাস্তি দেওয়াইব।

ও বাবা! কি সর্ব্বনাশ! ভুলে দুয়ের নম্বর টিউব দিয়া হার্বিকে ডাকিতে তাহার ভগিনিকে আসিতে বলিয়াছি! এখন উপায়! পুনরায় টিউব দিয়া বলিলাম" মেম্ সাহেব, আমার ভুল হইয়াছে, আমি তোমার ভ্রাতাকে ডাকিতে তোমাকে ডাকিয়া ফেলিয়াছি।" কোনও উত্তর নাই। আবার বলিলাম "মেম্ সাহেব শুনিতেছ কি?" কই, উত্তর নাই। নিশ্চয় ভয়ানক রাগ করিয়াছে, আমার আর কোন কথা শুনিবে না। চেষ্টা বিফল দেখিয়া শয্যায় শয়ন করিলাম। মনে মনে ঘৃণা যে হইল তাহা আর বলিবার নয়। কি লজ্জা! একটা ৫০ বৎসরের বুড়িকে

কি না আমার কাছে শুতে ডাকিয়াছি! ইহা অপেক্ষা আমার কেন মৃত্যু হইল না! আমি যেন মনে জানিলাম যে ভ্রম ক্রমে এরূপ হইয়াছে! মিস্ হার্বির ত তাহা বিশ্বাস হইল না। সকালে মুখ দেখাই কি করে! স্থির হইতে পারিলাম না; হার্বিকে জাগাইয়া এবিষয় বলিব মনে করিয়া পুনরায় হুইসেল দিলাম, বলিলাম "দেখ, নামে ভয়ানক ভুল হইয়াছে, দুই জনে একত্রে শয়ন করিব মনে করিয়া তোমাকে ডাকিতে মিস্ হার্বিকে ডাকিয়া বসিয়াছি; তিনি কি মনে করিলেন। যাই হোক, তার আর চারা নাই, এখন তুমি শীঘ্র আমার নিকটে আইস নতুবা আমি তোমার ঘরে যাইব"

উত্তর শুনিয়া আমার চক্ষু স্থির; অ মাতে আর আমি রহিলাম না। এতো হার্বির হেঁড়ে গলা নয়, এ যে জিলের আওয়াজ; এবারে সুন্দরী লিভি চাক রাণীকে ডাকিয়াছি। সে বলিতেছে "আ মরণ তোমার, আমার ঘরে আসিবে কেন যমের বাড়ী যাও না।" আমি তাড়াতাড়ী বলিলাম "ছি ছি, রাগ করিও না, আমার কথা আগে শোন।—" আমার কথা চাপা দিয়া বলিতে লাগিল" কি শুন্‌বো লক্ষ্মীছাড়া মিন্‌সে, এই কাগজ দিয়া নল বন্ধ করিলাম, আর সকল কথা সকালে বলিয়া দিয়া তোমার মুখে থ্যাংরা মারিব।

(ক্রমশঃ)

তত্ত্ব-সংগ্রহ।

কৃত্রিম হাতির দাঁত প্রস্তুত করণ। আমোনিয়া দ্রব্যে শঙ্খ গলাইয়া তাহাতে অক্সাইড অফ্ জিঙ্ক মিশ্রিত করিয়া উত্তাপ দ্বারা আমোনিয়া পৃথক করিয়া চূর্ণ প্রস্তুত করণান্তর তাহা ছাঁচে ঢালিয়া দৃঢ় বদ্ধ করিলে, নকল হাতির দাঁত প্রস্তুত হয়। [ভারত বন্ধু—৩ রা অগ্রহায়ণ।]

হস্তিদন্তকে কোমল করণ। হাতির দাঁতের গুঁড়া ৪৮ ঘণ্টাকাল অগ্নির উত্তাপে রাখিলে নরম হইবে এবং নরম হইলে যেরূপ আকৃতির দ্রব্য নির্ম্মাণ করিতে ইচ্ছা হয় অনায়াসে প্রস্তুত করা যায়। [মনোহর দর্পণ।]

কৃত্রিম বরফ প্রস্তুত করণ। কার্ব্বলিক এসিড্ এবং ইথার একত্র মিশ্রিত করিয়া কোন উষ্ণ ধাতুময় পাত্রে রাখিলে শীতল হইয়া বরফের ন্যায় জমিয়া যায় এবং তাহাতে জল প্রদান করিলে সেই জলও তৎক্ষণাৎ বরফ হইয়া উঠে। [তত্ত্ববোধিনী—১৬৮ সংখ্যা।]

অলঙ্কার দর্শন।

কোন একটী প্রবন্ধ লিখিতে গেলেই লেখ্য বিষয়ের সহিত দূর বা নিকট সম্পর্কীয় বস্তুর ছায়া মনোমধ্যে উপস্থিত হয়। নিকট সম্বন্ধীয় গুলি বাছিয়া পরস্পর যোজনা করিতে পারিলে আমি বিজ্ঞ বলিয়া গণ্য হইতে পারি। * দূর সম্পর্কীয় গুলি যোজনা করিলে লোকে আমাকে ক্ষিপ্ত বলে, কিন্তু এই দূর সম্পর্কীয় গুলিকে যদি সম্বন্ধ বিশেষ প্রদর্শন সহকারে যোজনা করিতে পারি, তবেই আবার আমাকে কবি বলিয়া মনে করে। প্রকৃতি পরম্পরায় কার্য্যকারণতা, সামান্য বিশেষ, পৌর্ব্বাপর্য্য প্রভৃতির জ্ঞান ও সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য জ্ঞানই দার্শনিকের লক্ষণ। আবার ঐ সকলই যাবতীয় অলঙ্কারের বৈচিত্র্য এই প্রকার জ্ঞান। বিশেষতঃ এই সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য জ্ঞান হইতে উৎপাদিত এবং যাবতীয় রস মনুষ্য প্রকৃতির জ্ঞান হেতুই উৎপাদিত হইয়া থাকে। এই সকল জ্ঞানের অভাবে সম্বন্ধ প্রদর্শন ব্যতিরেকে যে দূর সম্বন্ধের কথনাদি তাহাই বাতুলতা। বাতুলতা অজ্ঞানময় ও অন্ধকার সদৃশ। বিজ্ঞান দিবালোকের ন্যায় পরিস্কৃত হইলেও অজ্ঞদিগের নিকট অসহ্য; কিন্তু কবিতা জ্যোৎস্নালোকের ন্যায় মনোহর ও স্নিগ্ধ এবং সকলেরই সুখকর।

বিজ্ঞান ও কাব্য এ উভয়েই কল্পনা আবশ্যক। কল্পনাই সমুদায় উন্নতির মূল। জ্যামিতির ও অপরাপর বিজ্ঞানের কল্পনা † দ্বারা যেমন স্থূল, সূক্ষ্ম সমুদয় সত্যের নির্ণয় হয় ও তদ্দ্বারা জগতের অশেষবিধ মঙ্গল সাধন হয়, সেইরূপ কাব্যের কল্পনা দ্বারাও বহুবিধ সত্যের নির্ণয় হইয়া বহুবিধ মঙ্গল সাধিত হয়। প্রকৃত বস্তু বা ঘটনা সর্ব্বদা প্রত্যক্ষগোচর হয় না, কিন্তু বিজ্ঞান ও কাব্য দ্বারা সকল সময়েই প্রত্যক্ষ যোগ্য সমুদয় বস্তু ও সমুদয় অবস্থাই প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান হইতে পারে। বিজ্ঞানাদির অর্থ যেমন উন্নত সেইরূপ কষ্টসাধ্য। সহসা তাহাতে লোকের প্রবৃত্তি জন্মায় না, কিন্তু কাব্যের অর্থ এমন মধুর যে লোকে আপনা

* দূর ও নিকট সসম্পর্কীয় কি তাহা স্থানান্তরে কথিত হইয়াছে।

† যেমন "যাহার অংশও নাই, পরিমাণও নাই, তাহা বিন্দু," "যাহার দৈর্ঘ্য আছে, বিস্তৃতি নাই, তাহা রেখা" ইত্যাদি কল্পনা দ্বারা বিন্দু ও রেখা কি তাহা জানা যায়, এবং ঠিক গোল ঠিক সমকোণি ত্রিভুজ কিরূপ হইলে হয়, তাহাতে বুঝিতে পারি, সেইরূপ কাককূর্ম্মাদির কাল্পনিক কথায় যথার্থ সত্য নীতির উপদেশ পাই।

হইতেই তাহাতে প্রবৃত্ত হয় এবং একবার প্রবৃত্ত হইলে সহসা তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে পারে না। নিবৃত্ত হইলেও তাহার ভাবগুলি তাহাকে সহসা পরিত্যাগ করে না। সহসা কি তাহারা কখনই তাহাকে পরিত্যাগ করে না। ঐ ভাব গুলিই তাহার মনের সংস্কার হইয়া যায়। কাব্যে সৎ বলিয়া প্রতিপাদিত বস্তু গুলি সৎ ও প্রিয়, ও অসৎ বলিয়া প্রতিপাদিত বস্তুগুলি অসৎ ও অপ্রিয় হইয়া তাহার মনে দৃঢ় ও বদ্ধমূল হইয়া যায়। এই বদ্ধমূল সংস্কারই তাহার সংসারের একমাত্র প্রবর্ত্তক হইয়া উঠে। বুদ্ধি, তর্ক, মীমাংসা, সকলেই ইহার নিকট পরাস্ত। অতএব সৎকাব্য মানবহৃদয়ে যেরূপ কার্য্যকর, এমন আর কিছুই দেখা যায় না। কাব্যই তরুণবয়স্ক কোমলহৃদয় মানবদিগকে শিখাইবার পরম উৎকৃষ্ট উপায়। কিন্তু কোন একটি বস্তুর কি নাম, কি প্রয়োজন, অপরাপর বস্তুর সহিত তাহার কি সম্পর্ক এবং পাঠকের নিজের সহিতই বা তাহার কি সম্পর্ক এগুলি পূর্ব্বে না জানিলে যেমন উহার দর্শনে দর্শকের কেবল সামান্য প্রত্যক্ষ-জ্ঞান মাত্রই হয়, বিশেষ ফল প্রাপ্তি বা সুখোৎপত্তি হয় না, তদ্রূপ কাব্যের পরিচয় বা অলঙ্কার-বিজ্ঞান না জানিয়া কেবল কাব্যশাস্ত্র পাঠে পাঠমাত্রই হয়, বিশেষ ফলোপাধান হয় না।

অনেকে বলিতে পারেন যে, যেমন ভাষা-জ্ঞানের পর ব্যাকরণশাস্ত্র হইয়াছে সেইরূপ কাব্যশাস্ত্রের পরে অলঙ্কারশাস্ত্র হইয়াছে। তবে ব্যাকরণের আবির্ভাবের পূর্ব্বে কি কাহারও ভাষা পাঠে ফল হইত না এবং অলঙ্কারশাস্ত্রের আবির্ভাবের পূর্ব্বে কি কাব্য পাঠের ফল হইত না? অবশ্যই অনেকের হইত, কষ্টসহকারে হইত; কিন্তু ভাষার পরে ব্যাকরণ ও কাব্যের পরে অলঙ্কার সৃষ্ট হইয়াছে এরূপ মনে করাই ভ্রম। কারণ মনুষ্যের এমনই প্রকৃতি যে তাঁহার ভাষার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাকরণ ও কাব্যের সঙ্গে সঙ্গে অলঙ্কার প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল, কেবল গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ হইতেই বিলম্ব হইয়াছে। ব্যাকরণ ও অলঙ্কারের নিয়মাবলী ভাষা ও কাব্যের সহিত প্রাদুর্ভূত ও মনুষ্যসাধারণের সম্মত না হইলে তদনুযায়ী রচনাবলী কখনই জনসমাজে সমাদৃত হইত না। বরং ইহাই দেখা যাইতেছে যে, পূর্ব্বকালের কবিগণের মধ্যে যে সকল কবি ব্যাকরণ ও অলঙ্কারের নিয়মের প্রতি অনাদর করিয়াছেন বা ঐ শাস্ত্রদ্বয়ের নিয়মাদি প্রকৃতরূপে না জানাতে ভ্রম ও প্রমাদ প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের সেই ভ্রম ও প্রমাদগুলি ব্যাকরণে ও অলঙ্কারে দোষ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। যদি প্রকৃতই ভাষা ও কাব্যের পর ব্যাকরণ ও অলঙ্কার শাস্ত্রের সৃষ্টি হইত, তাহা হইলে এ দুই শাস্ত্রের পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত প্রাচীন কবিদিগের সেই ভ্রমগুলিও অনুকরণীয়, বলিয়া পরিগণিত হইত কখনই মন্দ বলিয়া

পরিত্যক্ত হইত না। এতদ্দ্বারা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, প্রাচীনদিগের ভাষা ও কাব্যই ব্যাকরণ ও অলঙ্কারের নিয়ম শিক্ষার মূল আদর্শ ছিল না, তাঁহাদের ভাষা বা কাব্য ভাল মন্দ বিচারের পরিমাপক ছিল না; কিন্তু তদতিরিক্ত এমন কোন অন্তর্নিহিত শাস্ত্র ছিল যাহার সূত্রের সহিত ঐক্য না হওয়াতেই ঐ ভ্রমগুলি অলংকার ও দোষ বলিয়া নিন্দিত ও পরিত্যক্ত হইয়াছে। সেই শাস্ত্রই ব্যাকরণ ও অলঙ্কার শাস্ত্র। দুটিই মানব প্রকৃতির ও বাহ্য প্রকৃতির বলে ভাষা ও কাব্যের সহিত সমুৎপন্ন হইয়াছে। মানব ও বাহ্য প্রকৃতি এ দুটিই পরস্পর উপযোগী। সেই উভয়ের উপযোগিতা অনুসারে ভাষার শব্দ সমুদয় প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। ভাষার তত্ত্ব ও শব্দমূল বা ধাতু প্রভৃতির প্রকৃতি বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে জানা যায় যে, বাহ্য বস্তুর গুণ বা ক্রিয়া ও মনুষ্য প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন এক একটি শব্দ হইতে সাদৃশ্যহেতু ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রতিপাদক শব্দসমূহের প্রচার হইয়াছে। * যদি বক্তা ও শ্রোতা সাদৃশ্যের এই পদার্থান্তর বোধনক্ষম অদ্ভুত শক্তি অনুভব না করিতেন, তাহা হইলে সাদৃশ্য দ্বারা কখনই কেহ কাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন না এবং একই শব্দ মূলধাতু হইতে সদৃশ বস্তু সমূহের নামকরণ হইত না। † যখন শব্দের উৎপত্তি হইতে এই সাদৃশ্য বুঝাইবার ও বুঝিবার চেষ্টা হইতেছে, তখন স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, ভাষার প্রথমাবস্থায় অলঙ্কার গ্রন্থকারে নিবদ্ধ না হইলেও যে সময় হইতে বাক্যের প্রয়োগ আরম্ভ হইয়াছে, সেই সময় হইতেই এই সাদৃশ্যমূলক অলঙ্কারেরও প্রয়োগ আরম্ভ হইয়াছে; কিন্তু সেই সকল ক্রমশঃ এত সাধারণ ও লুপ্ত মূল হইয়া গিয়াছে যে এক্ষণে আর তাহাতে বৈচিত্র্য দেখা যায় না। ঐ সকল অলঙ্কারের শক্তি এখন শব্দের মুখ্য শক্তি বলিয়াই পরিচিত হইতেছে। † এই রূপে ব্যাকরণেও অনেক ধাতু, বিভক্তি ও প্রত্যয় নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছে। এমন অনেক শব্দ আছে যাহার মূল খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, অনেক ধাতু আছে যাহার মধ্যে দুই তিন বা চারিটি প্রকৃত ধাতু একত্র দেখিতে পাওয়া যায়, এবং এমন অনেক বাক্যও আছে যাহা এক্ষণে শব্দ বা পদ বলিয়া গণ্য হইতেছে। অতএব লোকে যে ভাষার বাক্যে বা কাব্যের সৃষ্টির পর অলঙ্কারের সৃষ্টি বলিয়া থাকেন, তাহাতেও বড় বৈচিত্র্য দেখা যায় না। ইহাও অবশ্য স্বীকার্য্য যে, কোন শাস্ত্রই প্রথমাবস্থায় সাধারণের লক্ষ্য হয় না। কিন্তু ক্রমশঃ বিস্তীর্ণ ও উন্নত হইয়া উঠিলেই তাহা গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ করা আবশ্যক ও

* শব্দশক্তি পরিচ্ছেদ দেখ।

† শব্দশক্তি পরিচ্ছেদ দেখ।

† শব্দশক্তি পরিচ্ছেদ দেখ।

সাধারণের লক্ষ্য হইয়া উঠে, তদনুসারেই ব্যাকরণও এই অলঙ্কারশাস্ত্র কাব্যের বহুল প্রচারের পর বিশেষ মনোযোগের বিষয়, ক্রমশঃ প্রমাদশূন্য ও উন্নতিশীল হইতেছে। কিন্তু তাহা বলিয়াই কি এই সকল শাস্ত্র ছিল না, বা ইহার নিয়মাদি কেহ বুঝিত না, এরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে, বা ইহার চর্চ্চা আবশ্যক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। যদি পরম্পরায় শ্রুত, বা মনে মাত্র বিদিত তথ্যকে শাস্ত্র বলিয়া স্বীকার করা না হয়, তাহা হইলে অক্ষর রচনারও পূর্ব্বে রচিত। অতএব শ্রুতি, নিগম নামে প্রসিদ্ধ, প্রধান শাস্ত্র বলিয়া স্বীকৃত যে বেদ শাস্ত্র তাহাও শাস্ত্র বলিয়া গণ্য হইত না। ফলতঃ তৎকালের অলঙ্কার জ্ঞানকে শাস্ত্র বলা যাউক আর না যাউক তাহাতে আমার বিশেষ বক্তব্য নাই, তবে কাব্যের প্রাদুর্ভাবের সহিত যে এই শাস্ত্র সম্বন্ধীয় জ্ঞানেরও প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, ইহা প্রতিপাদন করাই আমার উদ্দেশ্য।

যেমন কোন বস্তু কথনই তাহার অবয়বের উপাদান সামগ্রী ব্যতিরেকে জন্মে না এবং থাকিতেও পারে না, সেই রূপ কাব্যও কথনই স্বীয় শরীরের উপাদানভূত সামগ্রী বিহীন হইয়া জন্মে নাই এবং তদ্ব্যতিরেকে থাকিতেও পারে না। বিবেচনা করিয়া দেখিলে শব্দ কাব্যের অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, প্রকৃতি, প্রত্যয়াদি তাহার মাংসপেশী, ব্যাকরণ তাহার শিরা, অর্থ তাহার প্রাণ, অলঙ্কার তাহার সৌন্দর্য্য এবং রস তাহার আত্মা। মনুষ্য যেমন শৈশবাবস্থায়ও এইগুলি রহিত হইয়া থাকে না, কাব্যও সেই রূপ ইহার শৈশবাবস্থায় এই সকল বিহীন হইয়া ছিল না। শিশু যেমন ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে গর্ভে বাস করে, কাব্যও সেই রূপ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে মনুষ্যের মনে বাস করে। শিশুর শৈশবকালের গতি বিধি আনন্দজনক হইলেও যেমন তাহা কাহারও লক্ষ্য হয় না, কাব্যেরও শৈশব সঞ্চার তদ্রূপ কাহারও বিশেষ লক্ষ্য হয় না। শিশু যেমন ক্রমশঃ উন্নত ও কার্য্যক্ষম হইলে ক্রমশঃ লোকের লক্ষ্য হইতে থাকে, কাব্যও সেইরূপ উন্নত ও কার্য্যক্ষম হইলে লোকের লক্ষ্য হয়। এই জন্য পূর্ব্বে কাব্যের প্রথমাবস্থার বৃদ্ধি সঞ্চার কেহ কখন লক্ষ্য করেন নাই, কিন্তু এখন সকল দেশেই সকল সভ্য সমাজেই কাব্যের প্রথমপ্রণেতাকে, তাহার বালচরিত্র কি, তাহার বাল্যকালের গঠন কেমন ছিল, কোন সময়ে ইহার জন্ম হয়, ইত্যাদি বিষয়ের আন্দোলন হয়, কিন্তু কেহই তাহার মীমাংসা করিতে পারেন না। ফলতঃ কাব্যের বর্ত্তমান শরীরের অবয়বাদি দৃষ্টে তাহার কিছুই নির্ণয় হইবার যো নাই। প্রকৃতিও এক্ষণকার চরিত্র দৃষ্টে কেবল ইহাই বলা যাইতে পারে যে, জন্ম হইতে ইহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি সকলই হইয়াছে এবং ইহার প্রতিপালনও অনেকের হস্ত দ্বারা হইতেছে।

অল্পবয়সে অল্প দিন পরেই ইহার জননী দেহলীলা সম্বরণ করিয়াছে। এ বাপের একমাত্র আদরের ধন। প্রতিবাসীর বড় যত্নের সামগ্রী। এর স্বভাব বড় কোমল, বচন অতি মধুর, এবং চরিত্র অতি হৃদয়গ্রাহী।

এ প্রবন্ধমধ্যে এ বিষয়ে আমার এত বক্তব্য ছিল না, কিন্তু ভাষা ও ব্যাকরণ অলঙ্কারাদি সম্বন্ধে এ ভ্রমটি অদ্যাপিও লোকসমাজে বর্ত্তমান আছে। এই জন্যই এ স্থলে তাহা বিশেষ করিয়া কহিলাম, কেবল এই সকল প্রমাণস্বরূপ দৃষ্টান্তগুলি শব্দশক্তির পরিচ্ছেদে উল্লেখ করিলাম। এক্ষণে আমার বক্তব্য এই যে অনেকেই এরূপ ভাবিয়া থাকেন যে, অলঙ্কার শাস্ত্রের জ্ঞান সহজ ও স্বাভাবিক, ইহার শিক্ষা আপনা হইতেই হয়, সুতরাং ইহার আলোচনা অনাবশ্যক। এই জন্যই ইহার আলোচনা অস্মৎসমাজ হইতে প্রায় তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে সে বিবেচনাও স্পষ্ট ভ্রম বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। সহজ ও স্বাভাবিক বলিয়া কেহ স্বয়ং কোন বিদ্যারই এককালে সমুদয় অধিকার করিতে পারে না। স্বচেষ্টায় সমুদয় অধিকার নিতান্ত দুরূহ। আমাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব পুরুষেরা সহস্র সহস্র বৎসরের পরিশ্রমে যাহা অধিকৃত ও বর্দ্ধিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে অধিকার না করিয়া, তাহাতে নূতন সংযোগ করিতে পারা দূরে থাকুক, স্বয়ং কে একাকী তৎপরিমাণে উপার্জ্জনও করিতে পারে? অবশ্যই পূর্ব্বপুরুষগণের সঞ্চিত ধনের অধিকার করিয়া পশ্চাৎ আলোচনা দ্বারা তাহার বৃদ্ধি করা কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা সুলেখক ও সুবক্তা হইতে অভিলাষ করেন, এ শাস্ত্র অধ্যয়ন করা তাঁহাদের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য। মনোভাব কথায় ব্যক্ত করাই যাঁহাদের প্রধান গুণ, সেই গুণেই যাঁহারা অন্য জীব হইতে স্বতন্ত্র ও শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন, সে গুণের উন্নতি করা তাঁহাদের কাহার না উচিত?

জগতে যে কয়টি প্রধান বিদ্যা আছে, তন্মধ্যে শিল্পবিদ্যাই মনুষ্যের নানাপ্রকার প্রয়োজনসাধক; কিন্তু উহা স্থূল স্থূল প্রয়োজনেরই সাধক ও স্থূল সুখের কারণ। প্রকৃত, অবিমিশ্র, উন্নত মানসিক সুখ কেবল ভাষা ও কাব্যেই পাওয়া গিয়া থাকে। মনুষ্যমনের অন্তরতম নিগূঢ় ভাব যেমন কাব্যে ব্যক্ত হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না। ভাষার যেমন অপরিসীম শক্তি, অদ্ভুত কৌশল ও সর্ব্বতোবিসারি প্রভাব, এমন আর কিছুতেই দেখা যায় না। সমুদয় থাকিয়াও যদি ভাষা না থাকিত, তবে সকলই বিফল হইত। ভাষার প্রভাবেই মনুষ্যজাতি পৃথিবীতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য। ভাষার প্রভাবেই মনুষ্য অদূর আকাশস্থ সূর্য্যচন্দ্রাদি গ্রহ, নক্ষত্র, বিদ্যুৎ ও সমীরণ পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতের উপর আধিপত্য করিতেছেন।

ভাষার প্রভাবেই তিনি সাগর, সরিৎ, পর্ব্বত, তৃণ, লতা, গুল্ম প্রভৃতির উপর প্রভুত্ব করিতেছেন। ভাষার প্রভাবেই তিনি পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ এ সমুদায়েরই উপর কর্তৃত্ব বিস্তার করিতেছেন। ভাষার প্রভাবেই তিনি চরাচর বিশ্বের এক অধীশ্বর। ভাষার অদ্ভুত মোহিনীশক্তি প্রভাবে দারুণ শোকসন্তপ্ত হৃদয় হইতেও অকস্মাৎ হাস্যধ্বনি উচ্ছলিত হইয়া উঠে। ভাষার প্রভাবেই প্রগাঢ়ধীসম্পন্ন ধীর-গম্ভীরপ্রকৃতি পুরুষেরও চক্ষু অশ্রুজলে প্লাবিত হয়। ভাষার গুণেই মনুষ্য অতি অকিঞ্চিৎকর সামান্যকেও অসামান্য জ্ঞানে তাহার অধিকারে উৎসুক হইয়া থাকেন এবং তন্নিমিত্ত সমুদয় সাংসারিক সুখের বাসনা বিসর্জ্জন করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, আবার ভাষার গুণেই তিনি তাদৃশ মহা অনিষ্টকর মোহ হইতে সত্বরেই প্রত্যাবৃত্ত হয়েন। ভাষার গুণেই শত্রু মিত্র ও মিত্র শত্রু হইতেছে। ভাষার গুণেই ধর্ম্মাসনস্থ বিচারপতিরা বিমোহিত হইয়া কখন ন্যায়কে অন্যায়, কখন অন্যায়কে ন্যায় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেছেন। ভাষার গুণেই পরাস্ত পলায়িত সৈন্যদল পুনরায় রণক্ষেত্রে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দুর্দ্দান্ত অরাতিকুল নির্ম্মূল করিয়া অতুল সম্পত্তি ও রাজ্যপদ অধিকার করিয়াছে। ভাষার একটি কথার প্রভাবে রাজ্য সাম্রাজ্য সকল উল্টিয়া যায়, আবার একটি কথার প্রভাবেই তৎসমুদয় রক্ষা পায়। ভাষার নিকট কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য এ সমুদায়ই পরাস্ত। অচিকিৎস্য উৎকট পীড়াও ভাষার এক কথায় শান্তি প্রাপ্ত হয়। মনুষ্য ভাষার দাস। মনুষ্যমন ভাষার অধীন। অহো ভাষার কি অনির্ব্বচনীয় শক্তি! যে ভাষার গুণে সহস্র যুগের অতীত কালের ঘটনাবলীকেও বর্ত্তমানের ন্যায় প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, যে ভাষার গুণে সহস্র সহস্র যুগের বিদ্যাও পৈতৃক ধনসম্পত্তির ন্যায় একত্রে অধিকার করিতে পারিতেছি; যে ভাষার গুণে আমাদের সমুদয় বল, সমুদয় জ্ঞান সমুদায় সুখ, সমুদ া সম্পত্তি সেই ভাষার কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! ভাষা হইতেই আমাদের সমুদায় উন্নতি হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে। ভাষাই সকল বিদ্যার মূল, ভাষাই মনুষ্যের প্রকৃতির আদর্শ, ভাষাই মনুষ্যের আলোচ্য, ভাষাই উন্নতির সোপান। ভাষার বিজ্ঞান জাতীয় বিজ্ঞান, ভাষার শক্তি জাতীয় শক্তি, ভাষার উন্নতি জাতীয় উন্নতি। ভাষার উন্নতি করিতে পারিলেই মনুষ্য দেবতা। অতএব ভাষার নিয়ম কৌশলাদি শিক্ষা করা ও তাহার উন্নতি সাধনে যত্নবান হওয়া যে সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য তাহা বিজ্ঞসমাজে বলা বাহুল্য মাত্র।

কিন্তু ভাষার উন্নতি সহজ নয়। ভাষার উন্নতি করিতে গেলে ভাষার [illegible] [illegible] প্রকৃতি [illegible] সমালোচনা [illegible] এবং কি সমালোচনার [illegible] বড় বড় [illegible] কোন্ স্থানে কি প্রণালীতে বিরল করিয়া-

ছেন তাহারও পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক। সেই জন্যই এই অলঙ্কার বিজ্ঞানের আবিষ্কার হইয়াছে। বড় বড় কবি ও সুলেখকদিগের পৃথক্ পৃথক্ রচনাবলি পৃথক্ পৃথক্ শ্রেণী বিভক্ত করিয়া সমালোচনার সহিত প্রদর্শন করাই এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত ইহার প্রথম পরিচ্ছেদে সামান্যতঃ মনুষ্যপ্রকৃতি পর্য্যালোচনা বিষয়ে দুই একটি ইঙ্গিত ও স্থানে স্থানে তাহার দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে এবং কাব্য কি ইহা বুঝাইবার নিমিত্ত প্রধানতঃ ভাব, রস, কাব্য-নির্ণয়, অলঙ্কার, শব্দশক্তি, কাব্যের পরস্পর ভেদ, ছন্দ ও দোষ এই আটটী বিষয় অপর আর আট্টী পরিচ্ছেদে পরিষ্কৃতরূপে প্রদর্শন করা গিয়াছে। কাব্যনির্ণয় প্রকরণেই গুণের বিষয় বলা হইয়াছে সুতরাং তন্নিমিত্ত অপর পরিচ্ছেদ করা হয় নাই। রীতি বা কাব্যের রচনা প্রণালীও উহার অন্তর্গত করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া গিয়াছে। ঐ সঙ্গে দুই একটী বড় বড় কবিরও সমালোচনা করা গিয়াছে।

প্রস্তাবটী পাছে বিস্তারিত ও দুর্ব্বোধ হয় এজন্য যতদূর পারিয়াছি সংক্ষিপ্ত ও সুস্পষ্ট করিতে যত্ন করিয়াছি। বিস্তারিতরূপে লিখিবার বাসনা থাকিলেও জন-সমাজে ইহার আদর পায় কি না, এই সন্দেহ বশতই সে বাসনা সংযত করিয়াছি। যদি ইহা ভাবাবিদ মহোদয়গণের সমালোচ্য হয় ও উৎসাহ পাই, তবে তদ্বিষয়ে বিস্তারিত ও অভিমতরূপে লিখিয়া গ্রন্থাকারে তাঁহাদিগের নিকট প্রকাশ করিব।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, সুবিখ্যাত বিজ্ঞবর শ্রীযুক্ত বাবু মদনমোহন ভট্ট মহাশয় এই প্রস্তাব লিখন বিষয়ে আমার বিস্তর উপকার করিয়াছেন। তিনি ইহার ভূরি ভূরি স্থানে সংশোধন প্রণালী প্রদর্শন পূর্ব্বক সবিশেষ সাহায্য করিয়াছেন ও যে সকল প্রয়োজনীয় বিষয় আমি পরিত্যাগ করিয়াছিলাম, তাহা লিখিতে পরামর্শ দিয়াছেন।

সাহিত্য-বিজ্ঞান। সম্বন্ধ-জ্ঞান।

আমরা যে কোন কর্ম্ম করি, বা যে কোন অবস্থায় থাকি, তাহা যে কেবল আমার শক্তিতেই হয় এমন নয়, পদার্থশক্তিও তাহার কারণ। যদি আমাদিগের চতু-র্দ্দিকে এই সকল পদার্থ বিদ্যমান না থাকিত ও এই এই রূপে প্রকাশিত না হইত, তবে কি আমরা কেবল নিজের শক্তিতেই দেখিতে, শুনিতে, আস্বাদ লইতে, স্পর্শ করিতে বা আঘ্রাণ করিতে সক্ষম হইতাম? কি ভাবিতাম? কি চিন্তা করিতাম? পদার্থ সকল না থাকিলে আমাদের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ এ সকলে কি আবশ্যক হইত? আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় কোথায় থাকিত? অতএব দেখা যাইতেছে যে, আমাদের যে, কিছু অবস্থা বা ক্রিয়া উৎপন্ন হইয়া

পদার্থ শক্তি ও অস্মদীয় শক্তি এই উভয় শক্তির যোগেই সাধিত হইতেছে। এই উভয় শক্তিই পরস্পর সাপেক্ষ। অতএব আমরা যে "আমি করি" "আমি হই" বলি, সে কথায় উভয়েরই শক্তি প্রকাশ পায়। আমরা উভয়ে মিলিয়া করি, উভয়ে মিলিয়া হই। উভয়ে মিলিয়াই আমি আমি হইয়াছি। পদার্থের সহিত আমাদের এইরূপ সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধকেই আমরা প্রয়োজনবশতঃ কখন পদার্থের গুণ কখন বা আমাদের গুণ বলিয়া থাকি। অতএব আমরা এখন বলিতে পারি যে আমরা দর্শনাদি গুণসম্পন্ন ও সমস্ত চরাচর দৃশ্যতাদি গুণসম্পন্ন হওয়াতে আমরা পরস্পর সম্বদ্ধ হইয়া আছি। অথবা সকল সুখ দুঃখই স্বভাববশতঃ উদ্রিক্ত ও অভ্যাস বশতঃ উন্নত হইয়া থাকে। বাল্যকালের সুখ সামান্য, ও বস্তুর সামান্য প্রত্যক্ষ দ্বারা উৎপন্ন এবং উত্তরকালের সুখ বিশেষ, ও বস্তুর বৈচিত্র্যবিশেষ প্রত্যক্ষ দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

জন্ম হইতে বস্তুর সহিত আমাদের এই সম্বন্ধটী জন্মিয়াছে এবং এই সম্বন্ধই আমাদের সমুদয় সুখ দুঃখের কারণ হইয়া আছে। বাল্যকালে সকল বস্তুই সমান দেখিতাম। পরস্পর কিছুই বিভেদ বুঝিতে পারিতাম না। নিতান্ত বাল্যকালে শৈশব শয্যায় যখন কোন দিকে দৃষ্টি স্থাপিত হইত, তখন দৃষ্টির সমান সমান দৃষ্টির সেই আয়তনের মধ্যস্থ সকল বস্তুই সমান শক্তি সহকারে আমাদের নিকট আভাসমান হইত। আমাদের নিকট সব একাকার বোধ হইত। কেহ কথা কহিলে অন্য শব্দের সহিত তাহার বিভেদ বুঝিতাম না। সুগন্ধ, দুর্গন্ধ, খাদ্য, অখাদ্য, স্পৃশ্য, অস্পৃশ্য সকলই আমাদের নিকট সমান। ছোট বড়, উচ্চ নীচ, ভাল মন্দ, ইষ্ট, অনিষ্ট, কিছুই আমাদের নিকট প্রকাশ পাইত না।

ক্রমে কাল সহকারে দৃষ্টির ঐ আয়তনস্থ বস্তুর মধ্যে পরিবর্ত্তন ও বিশেষ দেখিতে লাগিলাম। এক বস্তু হইতে অন্য বস্তু এক আকৃতি হইতে অন্য আকৃতি ও তাহাদিগের পরস্পর বিশেষ বুঝিতে লাগিলাম। ক্রমে শব্দ হইতে কণ্ঠ ও এক কণ্ঠ শব্দ হইতে অপর কণ্ঠ শব্দের বিশেষ বুঝিতে লাগিলাম। এইরূপে দৃশ্য, শ্রাব্য, সমুদয় বস্তুতেই সামান্য ও বিশেষ ভাব লক্ষ করিতে লাগিলাম, ও তৎসহকারে ক্রমেই সুখ ও দুঃখ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কতক কতক বস্তু প্রথমপ্রত্যক্ষ মাত্রেই আমাদের স্বভাববশতঃ ও কতক বস্তু অভ্যাসবশতঃ সুখ বা দুঃখজনক হয়। প্রথম প্রকারের উদাহরণ যেমন ক্ষুৎপিপাসার কষ্টের পর আহারের তৃপ্তিতে, অন্ধকারের পর চন্দ্র বা সূর্য্য দর্শনে, নিদ্রার পর মাতার কণ্ঠস্বর শ্রবণে ইত্যাদি। দ্বিতীয় প্রকারের উদাহরণ যেমন মাংসাদি ভক্ষণে, পলাণ্ডু প্রভৃতি আঘ্রাণে, দৈশিক প্রথাদি দর্শনে, কলাবত গান শ্রবণে, অধ্যয়নে, ক্রিড়ায় ইত্যাদি।

আমরা দেখিতে পাই যে জগতের সমুদয় বস্তুই বিবিধগুণের আধার। একত্র ঐ গুণ সমুদয়ের প্রত্যক্ষ হওয়াতেই উহা বিচিত্র হইয়াছে। আবার দেখিতে পাই যে এই সকল বস্তু যখন পরস্পর সংযুক্ত হয়, তখন পূর্ব্বাপেক্ষা বহুগুণ একত্র প্রত্যক্ষগোচর হয় এবং ঐ বৈচিত্র্য আরও বৃদ্ধি হয়; এতদ্দ্বারা স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে নানাগুণের একত্র সংস্থাপনই বৈচিত্র্য এবং সেই বৈচিত্র্যই সুখপ্রদ। বৃত্ত, সরল, মহৎ, ক্ষুদ্র, নীল, পীত, লোহিত, উচ্চে, নীচে, সম্মুখে, পার্শ্বে, দূরে, নিকটে, সংস্থান বা গতি-ভেদে ও সংখ্যা-যোগ-বিয়োগাদির শৃঙ্খলাভেদে নানাপ্রকারে বিচিত্র হইয়া আমাদের সুখ বিস্তার করে। অত্যুচ্চে সুবিস্তীর্ণ নীল আকাশে স্বর্ণকান্তি সুধাংশুবিম্ব অতি-বিচিত্র গগণার্দ্ধবিস্তৃত নীল, পীত, লোহিতাদি বিবিধ বর্ণ রঞ্জিত বিশাল ইন্দ্রধনু অতি বিচিত্র, সুস্নিগ্ধ জলদজালের মরকত কান্তি ছায়াতলে শ্বেতোৎপলমালা সদৃশ বলাকা পঁক্তি পক্ষ সঞ্চালন করিতে করিতে কিয়ৎক্ষণের মধ্যে অদৃশ্য হইল, ইহাও অতি বিচিত্র।

কেবল যে দর্শনেন্দ্রিয় গ্রাহ্য গুণ সমষ্টি একত্র অনুভূত হইলেই এই বৈচিত্র্য উৎপন্ন হয় এমন নয়। শ্রবণেন্দ্রিয় গ্রাহ্য গুণ সমষ্টিও অর্থাৎ ধ্বনি সুর, মাত্রা, আরোহ, অবরোহ, প্রভৃতিও যোগবিয়োগাদির শৃঙ্খলাভেদে বিচিত্র ও মনোহর হয়। এইরূপ তিক্ত, কষায়, অম্ল প্রভৃতি খাদ্যগুণ ঝাল, লবণ, মধুর প্রভৃতির সংযোগে বিবিধ প্রকারে বিচিত্র হইয়া সুখ প্রদান করে। চুয়া চন্দন, মল্লিকা, মালতী, জাতী, যুথী, আতর, গোলাপ, লেবেণ্ডার প্রভৃতি বিবিধ গন্ধের যোগও বিচিত্র হয়। কোমল কঠিনাদি স্পর্শ শীত উষ্ণাদির যোগে বিচিত্র ও মনোমত হইয়া সুখজনক হয়।

যেমন এক এক ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য গুণসমষ্টি মিলিত হইলে বৈচিত্র্য উৎপাদন করে সেইরূপ দৃশ্য শ্রব্যাদির বৈচিত্র্য পরস্পর সংযুক্ত হইয়া সমধিক বিচিত্র ও বিশেষ সুখপ্রদ হয়। নৃত্য গান বাদ্য একত্র হইলে অতিশয় মনোহর হয়। আবার ঐ নৃত্যাদি কোন সুশীলা সুরূপা বিবিধ বিচিত্র বেশ ভূষায় ভূষিতা কামিনীর কোকিলকণ্ঠনিঃসৃত সঙ্গীতের সহিত মিশ্রিত হইলে উহা আরও মনোহর হয়। আবার যদি ঐ স্থল গোলাপ প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্য সঞ্চার দ্বারা সুরভি, পুষ্পমাল্য চন্দন ও সুশীতল বায়ু সঞ্চালন দ্বারা সুস্নিগ্ধ এবং বিচিত্র কোমল আসনাদি দ্বারা সুখস্পর্শ করা যায় তবে ঐ চতুরিন্দ্রিয়ের যুগপৎ তৃপ্তিজনক বৈচিত্র্য আরও অধিক সুখজনক হইয়া থাকে।

ক্রমশঃ

শ্রীপ্যারীমোহন সেন।

উদ্ভিদ জীবন প্রক্রিয়া।

পরমেশ্বরের এই মহারাজ্য জগৎ সংসার জন্তু, উদ্ভিদ, ধাতু; এই ত্রিবিধ বস্তুতে পরিপূর্ণ। ধাতু আবার দুই ভাগে বিভক্ত, ধাতু এবং উপধাতু; কিন্তু আর্য্যদিগের বিভাগ বিশেষানুসারে সমস্ত বস্তু দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, প্রথমতঃ স্থাবর অর্থাৎ স্থিতিশীল ও জঙ্গম অর্থাৎ গমনশীল; উদ্ভিদ সকল স্থাবর মধ্যে পরিগণিত, ধাতুও এই শ্রেণীতে নিবিষ্ট; কিন্তু উদ্ভিদও ধাতু এই দুইয়ের অনেক পার্থক্য লক্ষিত হয়। উদ্ভিদ সকল, জন্তুগণের ন্যায় জীবিত পদার্থ এবং যন্ত্রবিশিষ্ট; উদ্ভিদ সকল যন্ত্রদ্বারা রসাকর্ষণ করিয়া পরিপাক করতঃ বৃদ্ধিশীল হইয়া থাকে। ধাতু সকল জীবিত এবং যন্ত্র বিশিষ্ট নহে। কেবল তুল্য বস্তুর সংযোগে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যদ্যপি জন্তু ও উদ্ভিদ এই দুই বস্তুর তুলনা করা যায়, তবে বাহ্য দর্শনে ইহাদিগের অনেক বিভিন্নতা প্রতীয়মান হয়। উদ্ভিদ সকল, শাখাপল্লব বিশিষ্ট এবং গতি শক্তি বিরহিত; জন্তুগণ সেরূপ নহে কিন্তু যদি উভয়ের অন্তরিন্দ্রিয় সকল দর্শন করা যায়, তবে ইহাদিগের মধ্যে কোন পার্থক্য লক্ষিত হইবে না। বরঞ্চ উভয়ে এক আদর্শে নির্ম্মিত ও রূপান্তরিত হইয়া বাহ্য দর্শনে বিভিন্ন অবস্থায় অবস্থাপিত আছে ইহাই প্রতীত হইবে। উদ্ভিদ সকলের শাখা প্রশাখা পল্লবাদির সহিত জন্তুগণের হস্ত পদ অঙ্গুলির সাদৃশ্য আছে। এবং উভয়ের যন্ত্র সকলও একরূপ; স্থাবর উদ্ভিদের সহিত স্পঞ্জ প্রাণীর বিষয়ে একতা আছে। বৃক্ষ শাখায় বৃক্ষান্তরের উৎপত্তির সহিত পুরুভুজের সাদৃশ্য দেখা যায়। এ উভয়ের অন্তরিন্দ্রিয় সকল স্থাপিত করিলেও এক প্রকার লক্ষিত হয়, কেবল আকারগত সামান্য বৈলক্ষণ্য মাত্র দেখা যায়; সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ মানবজাতি সম্পূর্ণ যন্ত্র বিশিষ্ট; যদি মনুষ্য হইতে নিকৃষ্ট জন্তু সকলকে দর্শন করা যায় তবে তাহাদিগের যন্ত্রেরও নিকৃষ্টতা লক্ষিত হইবে যথা মনুষ্য এবং বানর। বানর, মনুষ্য সদৃশযন্ত্র বিশিষ্ট বটে কিন্তু তাদৃশ জ্ঞান সম্পন্ন নহে। পরীক্ষাদ্বারা প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছে যে ইহাদের মস্তিষ্কের ভিতর কতক অংশের অভাব আছে এবং বাক্ যন্ত্রেরও অভাব আছে, বানর অপেক্ষা নিকৃষ্ট চতুষ্পদ জন্তুগণের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল দর্শন করিলে একতা লক্ষিত হয় না। বানরের হস্তের ন্যায় চতুষ্পদের হস্ত নাই তজ্জন্য কোন বস্তু ধারণের ক্ষমতাও নাই। আবার চতুষ্পদ অপেক্ষা নিকৃষ্ট দ্বিপদ পক্ষীজাতিকে দর্শন করিলে অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি

বিষয়ের অনেক অভাব দর্শন করা যায়। যদিও পক্ষীর পক্ষ হস্ত সদৃশ বটে কিন্তু বস্তু ধারণে সক্ষম নহে, কেবল আকাশে উড়িবার কালে সাহায্য করে। পক্ষী অপেক্ষা নিকৃষ্ট জীব সকল হস্ত পদাদি বিহীন যেমন সর্প, কৃমি ইত্যাদি।

অবশেষে সর্ব্ব নিকৃষ্ট ভাগে এক প্রকার জল কীট দর্শন করা যায়। তাহারা এত ক্ষুদ্র যে অনুবীক্ষণের সাহায্য, ভিন্ন নয়ন গোচর হয় না। ইহাদিগের কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নাই কেবল একটী কোষ মাত্র আছে। অঙ্গ এবং যন্ত্র সকলের অভাব বা বৈলক্ষণ্য প্রযুক্ত দেহের প্রক্রিয়া সকলের কোন ব্যাঘাত হয় না। (এই ক্ষুদ্র কীট সকল নরদেহেতেও অবস্থান করিয়া থাকে) ইহাদিগের দৈহিক কার্য্য অন্যবিধ যন্ত্র দ্বারা নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। সর্পজাতির হস্তপদাদি নাই কিন্তু দেহের সঙ্কোচন প্রসারণ দ্বারা গমনাগমন করিতে পারে। অপর যে জন্তুর ভক্ষ্য দ্রব্য সকল যে রূপ, তাহার ইন্দ্রিয় সকলেরও উপযোগিতা সেইরূপ; মনুষ্যেরা ত্রিবিধ দ্রব্য ভোজী এজন্য তাহাদের দন্তপংক্তি তিন প্রকার; কিন্তু অন্যান্য জীবের উক্ত প্রকার নাই। কেবল মাংসভোজীদিগের দুই প্রকার আছে।

জগৎপতি এই ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিয়া ত্রিবিধ প্রধান প্রক্রিয়া দ্বারা জীব সকলকে রক্ষা করিতেছেন। আহার দ্বারা দেহে নূতন রসের সঞ্চার হয়। নিদ্রা দ্বারা গ্লানি নষ্ট হইয়া যায় এবং সজীবতা সম্পন্ন হয়। বিহার দ্বারা মনের প্রফুল্লতা জন্মে তৎ সঙ্গে সঙ্গে জীব প্রবাহ পরিবর্দ্ধিত হয়।

জন্তুদিগের মধ্যে যেমন এই তিন প্রক্রিয়া দেখা যায় উদ্ভিদদিগের মধ্যেও তাহা লক্ষিত হইয়া থাকে। ভক্ষণ ক্রিয়া এমত আবশ্যক যে ইহা ব্যতীত কোন দেহই রক্ষা পাইতে পারে না। জীবোৎপত্তি হইবার পূর্ব্বেই প্রকৃতি দেবী অগ্রে আহারের আয়োজন করিয়া থাকেন। যেমন গর্ভের সঞ্চার হইলেই সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার অগ্রে স্ত্রীজাতির স্তনে দুগ্ধের সঞ্চার হয়। তেমনই উদ্ভিদের অঙ্কুর উৎপত্তি হইবার অগ্রেই অঙ্কুর দলের ভক্ষ্য দ্রব্যের উৎপত্তি হয়।

প্রকৃতির এই অনিবার্য্য প্রক্রিয়া দর্শনে, স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে জগৎ প্রারম্ভে কোন জীবের উৎপত্তি হয় নাই। অগ্রে ভক্ষ্য দ্রব্য সকলের উৎপত্তি হইলে, পরে জীব সকলের অবতার হইয়াছে। সর্ব্ব প্রথমে ধাতু, উপধাতু; তৎপশ্চাৎ ধাতু ও উপধাতুভোজী সামান্য উদ্ভিদ শৈবালাদির উৎপত্তি হইয়াছে। পরে জল বায়ু দ্বারা শৈবালজাত স্থানের যোগ বিয়োগ বিশেষে মৃত শৈবাল সংযোগে মৃত্তিকার উৎপত্তি হইলে, অপেক্ষাকৃত বৃহৎ বৃক্ষের উৎপত্তি হইয়াছে। এইরূপে ঐ সকল বৃক্ষের বিনাশে অধিক পরিমাণে সারাল মৃত্তিকার সঞ্চয় হইলে তদপেক্ষা বৃহৎ বৃক্ষ সকল

যথা ক্রমে উৎপন্ন হইয়াছে। পরে উদ্ভিদ সংখ্যা অধিক হইয়া ফল ফুলে সুশোভিত হইলে তদ্ভোজী সামান্য কীট পতঙ্গের আবির্ভাব হইয়াছে। এইরূপে যে পরিমাণে ভক্ষ্য দ্রব্যের প্রাচুর্য্য হইতে লাগিল সেই পরিমাণেই নূতন নূতন জীবের আবির্ভাব হইতে লাগিল। অবশেষে মনুষ্যগণ অবনীতে আগমন করিয়া আপনাদিগের আধিপত্য বিস্তার করিল। অদ্যাবধি মনুষ্য অপেক্ষা কোন উৎকৃষ্ট জীবের আর আবির্ভাব ঘটে নাই।

পৃথিবীর প্রথম অবস্থায় যে সকল উদ্ভিদ উৎপন্ন হইয়াছিল এক্ষণে সে সকল লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। তৎকালের প্রস্তরীভূত পদার্থে যে সকল উদ্ভিদের অবয়ব অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদের সহিত এখণকার ধান্য গোধূম যব আম্র নারিকেল প্রভৃতির ঐক্য হয় না। তাহারা এমন বিভিন্ন জাতি যে, কোন জাতীয় উদ্ভিদ তাহা নিশ্চয় করা যায় না। এবং তৎকালে যে সকল জন্তু ছিল তাহাদেরও অবয়ব ঐ প্রস্তর মধ্যে অঙ্কিত আছে, বর্ত্তমান সময়ে সেই আকৃতির জন্তু প্রায় নয়ন গোচর হয় না। আবার এদিকে প্রথমজাত প্রস্তর সকলে কোন প্রকার উদ্ভিদ কিম্বা জন্তুর চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না কিন্তু তৎপরজাত প্রস্তর সকলে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা দ্বারা এই অনুমান করা যায় যদি পৃথিবীর প্রথম অবস্থায় উদ্ভিদ কিম্বা জীবের উৎপত্তি হইত তবে অবশ্যই তাহাদিগের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যাইত।

আমাদের এই বঙ্গ রাজ্য মধ্যে ভূমির আট দশ হস্ত নিম্নে খনন করিলে এক প্রকার কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকা উঠিতে থাকে যাহাকে সামান্য ভাষায় বোদমাটী কহে। ইহা বাস্তবিক মৃত্তিকা নহে। কোন প্রকার উদ্ভিদ বিকৃত ভাব প্রাপ্ত হইয়া উক্ত প্রকার হইয়াছে। এই বোদমাটী মধ্যেও উদ্ভিদের পত্র ও শাখার চিহ্ন অঙ্কিত আছে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ঐ সকল শাখা পত্র কোন্ প্রকার পাদপের তাহা অবধারণ করা যায় না। পার্ব্বতীয় প্রদেশে ৬০। ৭০ হস্ত নিম্নে মৃদঙ্গার (পাথুরে কয়লা) পাওয়া যায়, তাহাও ঐ বোদমাটীর সদৃশ বস্তু মাত্র; যদি বোদমাটী ও পাথুরে কয়লার নিম্ন ভাগ খনন করা যায়, তবে বোদ মাটীর নীচে বালি, এবং পাথুরে কয়লার নিম্নে এক প্রকার প্রস্তর দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু তাহাতে উদ্ভিদের কোন চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না।

এই জগতে কতিপয় উপাদান আছে। তাহারাই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কারণ একথা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাহাদিগেরই যোগে এই পরিদৃশ্যমান স্থূল জড় বস্তু সকল উৎপন্ন হইতেছে। তাহাদিগেরই বিয়োগে অন্তর্হিত হইতেছে। আবার তাহারাই জীব বা উদ্ভিদের আহারীয় বস্তুরূপে পরিণত হইতেছে। এসমস্ত চিন্তা করিলে কাহাকে না বিস্মিত হইতে হয়। জন্তুগণ উদ্ভিদ ভক্ষণে

জীবিত থাকে, আবার উদ্ভিদ্ সকল জন্তুগণের মল মূত্র ভক্ষণ করিয়া পুষ্ট হয়। অধিক কি জন্তুগণ মরিলে তাহারা তাহাদের সার্ম্মৃত্তিকাময় সেই দেহ ভক্ষণ করিয়াই সুরস ফল প্রসব করে, জন্তুগণ পুনর্ব্বার তাহাই ভক্ষণ করিয়া দেহ রক্ষা করে। এই নিত্য পরিবর্ত্তনই জগতের স্বাভাবিক ধর্ম্ম; এই চক্রবৎ পরিবর্ত্তনেই, জগৎপতির জগৎ-সংসার রক্ষা পাইতেছে। তাঁহার বিচিত্র কৌশলকে ধন্য!! তাঁহার সৃষ্ট পরমাণুর বিনাশ নাই, তাঁহার কৃত নিয়মের পরিবর্ত্তন নাই, তাঁহার দয়ার অন্ত নাই, তাঁহার সহিত কেবল তাঁহারই তুলনা হয়।

ক্রমশঃ

শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায়।

কাচ।*

সৈকতক (Silica) ভিন্ন ভিন্ন ধাতুর † বেসের সহিত মিলিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন শিলিকেট (Silicate) উৎপন্ন করে। যথা—পটাসিয়ম, সোডিয়ম্, আলিউমিনিয়ম্,

---

* কাচ যে ভারতের নূতন পদার্থ তাহা নহে। অতি প্রাচীন কাল অবধি লবণ প্রস্তুত করিবার চাতরে শস্যাদি জন্মিলে তথায় অগ্নি দগ্ধ করিলে এক প্রকার কৃষ্ণবর্ণের চাকচিক্যশালী (ঝামার ন্যায়) বন্ধুর পদার্থ উৎপন্ন হইত, এবং উহাতে অগ্নির সন্তাপ দিলে গলিয়া যাইত, তখনকার লোকেরা ঐ গলিত দ্রব্যকে মৃত্তিকায় গর্ত্ত করিয়া তন্মধ্যে দিয়া উপরিভাগে কোন বস্তুর চাপ দিলে এক প্রকার পাত্র প্রস্তুত হইত, তাহাতে তরল বস্তু অনায়াসে রাখিতে পারিত। ভারতের প্রাচীন শিল্প সংহিতায় ইহার সবিশেষ বর্ণনা বর্ণিত হইবে।

† শিলিকন নামক একটী অধাতব পদার্থ (Nonmetalic Element) আছে, তাহার সহিত অকসিজনের যোগে শিলিকা প্রস্তুত হয়। তাহার সঙ্কেত (Formula) SiO_2। বালুকা এক প্রকার সিলিকা। এই সিলিকা দানাদার (Crystalised) ও গঠনবিহীন (Amorphos) অবস্থায় থাকে। শিলিকা ভিন্ন ভিন্ন প্রকার মৌলিক পদার্থেরসহিত মিলিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন সম্বন্ধ প্রকাশ করে। ধাতুর অক্সাইড্ যাহা এসিড্ সংযোগে লবণ উৎপন্ন করে তাহাকে বেস (base) কহে।

কালসিয়ম, পারদ, শিলিকেট ইত্যাদি। শিলিকেটসকল দ্রব করিতে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণের উত্তাপ লাগে। আলিউমিনিয়ম শিলিকেট দ্রব করিতে অত্যন্ত উত্তাপের আবশ্যক হয়। কালসিয়ম শিলিকেটও অধিক উত্তাপ গ্রহণ করে। শিশ শিলিকেট সোডিয়ম, পটাসিয়ম্ এবং লৌহ শিলিকেট অপেক্ষাকৃত কিছু অল্প উত্তাপে দ্রব হয়। কিন্তু এই সকল শিলিকেট পৃথক করিয়া দ্রব করিতে হইলে যে উত্তাপ লাগে; একত্র মিলিত করিয়া উত্তাপ দিলে তদপেক্ষা কিছু অল্প উত্তাপেই দ্রব হইয়া যায়।

কতকগুলি শিলিকেট ভিন্ন ভিন্ন অংশে মিশ্রিত করিয়া নির্দ্ধারিত পরিমাণে উত্তাপ দিলে কর্দ্দমের ন্যায় দ্রব হইয়া গঠনোপযোগী হইতে পারে। এবং শীতল হইলে দ্রবকালীন স্বচ্ছ অবস্থাতেই থাকে। এই রূপ পদার্থকে কাচ বলা যায়। * যে সকল পদার্থ সংযোগে কাচ প্রস্তুত হয়, তাহার মধ্যে ক্ষার জাতীয় শিলিকেট প্রধান, তৎসহকারে অন্যান্য বেসও থাকে। যেরূপ কার্য্যে ব্যবহৃত হইবে তদনুযায়ী কাচ প্রস্তুত কারবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে সিলিকেট দেওয়া যায়। এই সকল পদার্থ নির্দ্ধারিত পরিমাণে উত্তাপ প্রাপ্ত হইলে দ্রব হইয়া একবারে তরল হইয়া যায় না, এবং অত্যন্ত কঠিনও থাকে না। অর্থাৎ কর্দ্দমের অবস্থা ধারণ করে। এই অবস্থাতে কাচকে যন্ত্র বা ছাঁচ দ্বারা নানা প্রকার গঠনে পরিণত করা যাইতে পারে।

কাচ দ্রব অবস্থা হইতে শীতল হইবার সময় দানা বাঁধিয়া গেলে তাহার স্বচ্ছ অবস্থা থাকে না। উৎকৃষ্ট কাচের গুণ এই যে দ্রব অবস্থায় শীতল হইবার সময় দানা না বাঁধিয়া স্বচ্ছ অবস্থা ধারণ করে, এবং এই কাচের উপর ক্ষার এবং অম্ল কোন রাসায়নিক কার্য্য করিতে পারে না।

কাচের অত্যন্ত পাতলা পাত ও সূক্ষ্ম সূত্র প্রস্তুত করা যাইতে পারে। এই পাত ও সূত্র বিশেষ রূপে স্থিতি স্থাপক গুণবিশিষ্ট হয়।

ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে শিলিকেট ব্যবহার করিলে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে উত্তাপে কাচ দ্রব হয়। পদার্থানুসারে কাচ নিম্ন লিখিত কয় শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

---

* পরিষ্কৃত মৃত্তিকা কঙ্করাদিরহিত ক্ষুদ্র রেণু বিশিষ্ট শুভ্রবর্ণ বালুকা, সাজিমাটি, সোরা, কলাগাছের মূল ও পেটো অথবা আপাংক্ষার ও পটাশ এবং সিন্দুর বা মুদ্রা শঙ্খের ফুট দিলে শীঘ্র দ্রবীভূত হয়। স্বল্প পরিমাণে হরিতাল মিশ্রিত করিলে পরিষ্কৃত কাচ প্রস্তুত হয়।

ক্রাউন কাচ।

কোয়ার্জ বালুকা—১০০০ ভাগ।
চূণ — —৩৬´ „
সোডা অ্যাস —২৪´ „
সোডিয়ম্ সলফেট ১২´ „
আরসিণিক ট্রাই—১/৩´ „
চূর্ণ কাচ — ১০০ „

বোহেমিয়ান কাচ।

বিশুদ্ধ বালুকা—১০০০ ভাগ।
„ পারল আশ—৬০ „
খড়ি মাটি —৮ „
চূর্ণকাচ —৪০ „
(ডাই অক্সাইড্) অফ্‌মেঙ্গনিস ৩/৪ „

আয়নার কাচ।

বিশুদ্ধ বালুকা—১০০ ভাগ।
সোডা অ্যাস—৩৫ „
চূণ —৫ „
আর্সিণিক ট্রাই অক্সাইড ১/৩ „
চূর্ণ কাচ —১০০ „

ফ্লিণ্ট কাচ।

বিশুদ্ধ বালুকা—১০০ ভাগ।
মেটে সিন্দুর (রেড্‌লেড্)—২০ „
কার্ব্বনেট পটাশিয়ম —৪০ „
সোরা — ২ „
চূর্ণকাচ — ১০০ „

ক্রাউন কাচ ও বাতায়ন কাচ অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু বোহেমিয়ান কাচ অপেক্ষা অল্প উত্তাপে দ্রব হয় ইহাতে কিছু সবুজ রঙ থাকে। ইহাতে সোডিয়ম ও কালসিয়ম শিলিকেট থাকে।

বোহেমিয়ান কাচ, রঙ বিহান অত্যন্ত কঠিন, অত্যন্ত অধিক উত্তাপে দ্রব হয় ইহাকে পটাসিয়ম ও কালসিয়ম কাচ বলে।

পটাসিয়ম শিশ কাচ, ইহা অল্প উত্তাপে দ্রব হয় এবং অনায়াসে কাটা যায়—

ফ্লিণ্ট কাচ হইতে সাংসারিক নানা প্রকার ব্যবহার্য্য পাত্রাদি প্রস্তত হইয়া থাকে। আর একপ্রকার কাচ আছে তাহাকে বোতল কাচ কহে, ইহাতে লৌহ অকসাইড এবং ম্যাঙ্গানিস অকসাইড থাকে। ইহার রঙ লাল আভাযুক্ত হরিদ্রা হইতে কৃষ্ণবর্ণ সবুজ হইয়া থাকে।

ভিন্ন ভিন্ন কাচ ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য সংযোগে প্রস্তত হওয়াতে ভিন্ন ভিন্ন আপেক্ষিক গুরুত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

যথা—আয়নার কাচ—২´৪৮৭ আপেক্ষিক গুরুত্ব
বাতায়ন কাচ—২´৪৮৮ „
বোতল কাচ—২´৬৪২ „

নিম্নলিখিত দ্রব্য সমূহের সংযোগে কাচ প্রস্তত হয়।

(১) শিলিকা,—ইহা ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে ব্যবহৃত হইয়া থাকে যথা কোয়ার্জ বালুকা ইত্যাদি।

(২) বোরাসিক আসিড, সিলিকার—কিয়দংশের পরিবর্ত্তে ব্যবহার হয়।
(৩) কার্ব্বনেট অব পটাশিয়ম, এবং সোডা।

(৪) চুণ। (৫) অকসাইড লেড ইহা দ্বারা অপেক্ষিক গুরুত্ব বৃদ্ধি হয়। কাচ অধিক ভঙ্গুর ও স্বচ্ছ (৬) অকসাইড অব জিঙ্ক। (৭) অকসাইড অব বিসমত।

কাচ প্রস্তুত করিবার প্রথম অবস্থায় নানাপ্রকার রঙ প্রযুক্ত হইতে পারে, সেই রঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন বস্তু দ্বারা অন্তর্হিত করা যাইতে পারে। ম্যাঙ্গনিস ডাই অকসাইড কাচ রঙ বিহীন করিবার জন্য অল্প পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অধিক অধিক পরিমাণে দিলে ভায়লেট রঙ হইয়া যায়। ইহা ভিন্ন, সোরা, আর্সিনিয়াস্ আসিড, রেডলেড (মেটেসিন্দুর) ব্যবহার হইয়া থাকে।

যে পাত্রে কাচ গলান যায় তাহা মৃত্তিকা দ্বারা নির্ম্মিত, এবং অত্যন্ত অধিক উত্তাপ পাইলেও গলিয়া যায় না। এই পাত্র একবারে অগ্নির উপর সন্নিবেশিত করা হয়। ইহার আকার নানাপ্রকার হইয়া থাকে, কখন কটাহের ন্যায় মুখ বিস্তৃত, কখন কখন মুখ সঙ্কীর্ণ এবং মধ্যদেশ স্ফীত, কখন বা চতুষ্কোন বিশিষ্ট রুটি প্রস্তুত করিবার তুন্দুরের ন্যায় উনান প্রস্তুত করিতে হয়। ইহার মৃত্তিকাও অধিক উত্তাপে দ্রব হয় না। এই উনানের মধ্যে আটটা বা দশটা গলাইবার পাত্র বসাইতে পারা যায়। অগ্নি প্রস্তুত করিবার জন্য কাট কয়লা ও গ্যাস ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই উনান মধ্যে কাচ দ্রব হইবার সময়, উত্তাপের পরিমাণ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা ধারণ করে। ১২০০ ডিক্রি সেণ্টি-গ্রেট উত্তাপে কাচ দ্রব হইয়া তরল হয়। এই সময় যে সকল বস্তু কাচের সহিত না মিশে সে সকল গুরু হইলে পত্রের তলায় পড়ে এবং লঘু হইলে উপরে ভাসিয়া উঠে এবং কর্ম্মচারিরা তাহা উঠাইয়া ফেলিয়া দেয়। এইরূপে ক্রমশঃ পরিস্কার হয়। দ্রব হইয়া তরল হইলে কাচ এক পাত্র হইতে আর এক পাত্রে ঢালা যায়। উত্তাপে আরক্ত বর্ণ হইলে দুই খণ্ড কাচ একত্র করিয়া আঘাত প্রদান করিলে ধাতুর ন্যায় যোড়া যাইতে পারে। কাচ প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল গলা-ইবার সময় তাহার সঙ্গে কিছু চুর্ণ কাচ দিতে হয়।

কাচ প্রস্তুত করিয়া শীতল করিবার সময় বিশেষ যত্নবান হইতে হয়। তাহা একটী উত্তাপ বিশিষ্ট ঘরে রাখিয়া অল্পেঅল্পে শীতল করিতে হয়। কিন্তু অত্যন্ত বিলম্ব করিয়া শীতল করিলে কাচ স্বচ্ছ অবস্থা প্রাপ্ত না হইয়া চীনের বাঁসনের ন্যায় হইয়া যায়। আবার কাচ অতি শীঘ্র শীতল করিলে, অত্যন্ত ভঙ্গুর হইয়া পড়ে। বর্ত্তুলাকার ফাঁপা কাচের পাত্র প্রস্তুত করিয়া তৎক্ষণাৎ শীতল করিলে চমৎকার

অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই বর্ত্তুলের বহির্ভাগে হস্ত প্রদান করিলে কিছুই হয় না। কিন্তু অন্তর্দ্দেশে একটী বালুকা কণা নিক্ষেপ করিলেই তৎক্ষণাৎ ভয়ানক শব্দ হইয়া পাত্র চূর্ণ হইয়া যায়। তাহার কারণ এই যে হটাৎ শীতল করিলে কাচের সকল অংশ সমান ভাবে সঙ্কুচিত হইতে পারে না সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার টান ধরিয়া থাকে।

কাচ দ্রব অবস্থায় শীতল জলের উপর অল্পে অল্পে নিক্ষেপ করিলে এক প্রকার অবয়ব ধারণ করে। তাহার গোল অংশ হাতুড়ি দিয়া আঘাত করিলেও কিছু হয় না, কিন্তু সূক্ষ্ম অংশ অঙ্গুলি দ্বারা ভঙ্গ করিবা মাত্র তৎক্ষণাৎ ভয়ানক শব্দের সহিত তাহা চূর্ণ হইয়া ধূলির ন্যায় হইয়া যায়। যে সকল দ্রব্য সংযোগে কাচ প্রস্তুত হয় তাহাদিগকে একত্র করিয়া গলাইবার পূর্ব্বে উত্তাপ দ্বারা শুষ্ক করিয়া লইতে হয়। পরে উনান মধ্যে গলাইবার পাত্রে দিয়া প্রয়োজন মত উত্তাপ দিলে ঐ সকল দ্রব্য একত্র হইয়া গলিয়া যায়। এবং পটাস, সোডা, চুণ,আরসিনিয়াস আসিড প্রভৃতি মিলিয়া কাচ উৎপন্ন করে। কাচ দ্রব হইয়া তরল হইলে যে সকল পদার্থ মিলিত না হয় তাহা কতক নিম্নে পড়িয়া যায় কতক উপরে ভাসিয়া উঠে এবং তাহা ফেলিয়া দেওয়া হয়। এইরূপে পরিষ্কার হইলে উত্তাপ ক্রমশ হ্রাস করা হয়। তদ্দ্বারা কাচ কিছু গাঢ় হইয়া আইসে। এক্ষণে ইহার উত্তাপ ৭০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। কাচ তরল অবস্থা হইতে গাঢ় হইবার সময় নানারূপ দোষ প্রাপ্ত হইতে পারে। বায়ু তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া বুদবুদ জন্মাইয়া দেয়, বালুকা, কাঁকর আবদ্ধ থাকে, অসমান উত্তাপ প্রযুক্ত স্থানে সুত্রের ন্যায় হইতে পারে।

গাঢ় অবস্থা বিশিষ্ট কাচে নানাপ্রকার গঠন প্রস্তুত করা যাইতে পারে। এই অবস্থায় জানালার শার্শি প্রস্তুত করা যাইতে পারে। তাহার নিয়ম নিম্নে বলা যাইতেছে। প্রথমে এক ব্যক্তি একটী ফাঁপা লৌহের নল কাচের উনানের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া তাহার অগ্রভাগে কিছু কাচ লাগাইয়া লয়। তৎপরে তাহা বাহিরে আনিয়া সেই নলের মধ্য দিয়া ফুৎকার দিলে সংলগ্ন কাচ বর্ত্তুলাকারে পরিনত হয়। এই বর্ত্তুলাকার কাচ প্রস্তুত করিয়া পুনরায় উনান মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেয়। পরে উত্তপ্ত হইলে পুনরায় বাহির করিয়া লইয়া নিম্নভাগ কাটিয়া দিয়া সেই লৌহদণ্ড টেবিলের উপর রাখিয়া প্রবল বেগে ঘুর্ণায়ণ করিতে থাকে; তাহাতে সেই বর্ত্তুলাকার কাচ বিস্তৃত হইয়া থালার ন্যায় হইয়া উঠে। তৎপরে শীতল হইলে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া রাখে, নলের সহিত যে অংশ সংলগ্ন থাকে তাহা পরিত্যাগ করিতে হয়।

আর এক প্রকারে কাচের পাত্র প্রস্তুত হয় যথা। উনান মধ্যে ১ম চিত্র। ২য় চিত্র লৌহদণ্ড প্রবেশ করাইয়া পূর্ব্ববৎ কাচ লাগাইয়া লইয়া ফুৎকার দিয়া স্ফীত করে (১ম চিত্র)। তৎপরে ফুৎকার দিয়া ও ঘুরাইয়া তাহা বৃহৎ করে (২য়)। পরে তাহার তলদেশ কাটিয়া ও নানাপ্রকার কৌশল ও যন্ত্র দ্বারা একটা বড় ফাঁপা নলের ন্যায় প্রস্তুত করে। একটা উত্তপ্ত লৌহদণ্ড দ্বারা তাহার গলদেশ দণ্ড হইতে ভিন্ন করিয়া কাচের লম্বাদিকে কাটিয়া দেয় ও আর একটা উনান মধ্যে লইয়া যায়। তথায় প্রয়োজন মত উত্তপ্ত হইলে একটা টেবিলে রাখিয়া সেই দণ্ড দ্বারা বিস্তৃত করে। এক্ষণে ইহাকে সেই উনানের এক পার্শ্বে উত্তাপ বিশিষ্ট স্থানে রাখিয়া

দেওয়া হয়। কারণ হটাৎ বাহিরে লইয়া গেলে একবারে শীতল হইলে ভঙ্গুরও নানাপ্রকার দোষযুক্ত হয়। তজ্জন্য অল্পে অল্পে শীতল করিতে হয়।

বোতল কাচ এই কাচ হইতে সর্ব্বপ্রকার তরল বস্তু ধারণ জন্য আধার প্রস্তুত হয় ইহাতে বালুকা পটাস বা সোডা, বাসাণ্ট ইত্যাদি থাকে। এই কাচ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার অর্থাৎ সবুজ, সাদা, এবং বেলওয়ার (Crystal Glass.) এই কাচ হইতে নানাপ্রকার আধার প্রস্তুত করা যাইতে পারে। তন্মধ্যে বোতল প্রস্তুতের নিয়ম বলা যাইতেছে। এক ব্যক্তি লৌহ নল দ্বারা কিছু কাচ গলাইয়া উনান হইতে বাহির করিয়া ফু দিয়া তাহাকে স্ফীত করিয়া একটা ছাঁচের মধ্যে প্রবেশ কারাইয়া দেয়—এবং ফু দিতে থাকে তাহাতে ছাঁচের সকল অংশে কাচ বিস্তৃত হইয়া পড়ে। তৎপরে বাহির করিয়া একটা লৌহ দণ্ড দিয়া নিম্ন দেশ চাপিয়া ধরে তাহাতে বোতলের তলা হয়। পরে শীতল জল দ্বারা দণ্ড হইতে
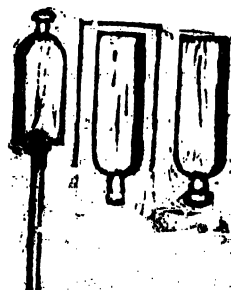
ভিন্ন করিয়া অপর একটা লৌহদণ্ডের গলিত কাচ দ্বারা বোতলের কানা প্রস্তুত করে এবং তৎপরে উত্তাপ বিশিষ্ট স্থানে রাখিয়া দেয়। কাচের নল উত্তপ্ত অবস্থায় টানিয়া প্রস্তুত করে। নানাপ্রকার খেলেনা, বাটী, রেকাব প্রভৃতি দ্রব্য

ছাঁচ দ্বারা প্রস্তুত হয়। (খোদাই কার্য্য করা পিত্তলের ছাঁচে দ্রব কাচ দিয়া প্রস্তুত করে।) কাচের বাটী করিতে হইলে এইরূপ পাত্রের মধ্যে কাচ রাখিয়া চাপিয়া ধরিলে বেশির ভাগ বাহিরে পড়িয়া যায় প্রয়োজন মত তাহার মধ্যে থাকে।

দৃষ্টির সাহায্যার্থে (Optical glass) যে সকল কাচ প্রস্তুত হয় অর্থাৎ চসমা, দূরবীক্ষণ, অনুবীক্ষণ, আতসী প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে বিশেষ যত্নের আবশ্যক, স্বচ্ছতা এবং দৃঢ়তার প্রয়োজন ও (Achromatism) রং বিহীন হওয়া আবশ্যক।

প্রায় সকল প্রকার মূল্যবান প্রস্তর কাচ দ্বারা অনুকরণ করা যাইতে পারে। কাচ প্রস্তুত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন ধাতুর অকসাইড্ দ্বারা রং করা হয় যথা—

কৃত্রিম গোদন্ত মণি—(Topaz)—পার্পল্ অব ক্যেশশ। (Purple of Cassius)

„ মরকত মণি বা পান্না (Emerald) অক্সাইড অব কপার (Oxide of Copper)

„ নীলকান্ত মণি বা নীলা—(Sapphire) অক্সাইড অব কোবল্ট এবং পারপ্ল অব ক্যেশশ (Oxide of Cobalt and purple of Cassius)

„ পদ্মরাগ মণি বা মাণিক—(Curbuncle) পারপ্ল অব ক্যেশাশ এবং পার অক্সাইড অব ম্যেঙ্গেনিজ্ (Perplo of Cassius and per Oxide of Manganese)

„ চুণি—(Ruby) সব অক্সাইড অব কপার। (SubOxide of Copper)

„ হীরক—(Diamond) অক্সাইড অব টিন (Oxide of Tin)

ভিন্ন ভিন্ন ধাতুর অকসাইড্ দ্বারা কাচ রঞ্জিত করা যাইতে পারে। লাল কাচ প্রস্তুত করিতে হইলে (Purple of Cassius, protOxide of Copper, Chloride of Gold) দিলেও লাল কাচ প্রস্তুত হয়—

বেগুনিয়া বর্ণ—অক্সাইড অব মেঙ্গেনিস (Oxide of Manganese)

পিঙ্গল—অক্সাইড অব আয়রন (Oxide of Iron)

নীলগন্ধী অর্থাৎ রক্ত ও নীল মিশ্রিত—অক্সাইড অব গোল্ড (Oxide of Gold)

হরিদ্রা—অক্সাইড অব সিলভার—(Oxide of Silver) অথবা এণ্টিমনিএট্ অব পটাশ (Antimoniate of Potash) ক্লোরাইড অব সিলভার এবং সালফিউরেট অব সিলভর (Cloride of Silver and Sulphuret of Silver) কিম্বা ইউরেনিয়াম অক্সাইড (Uranium Oxide)

নীল—অক্সাইড অব কোবল্ট, (Oxide of Cobalt)

সবুজ—ক্রোম অক্সাইড অব কপার এবং প্রোটো অক্সাইড অব আয়রণ, (Crom Oxide of Copper and proto Oxide of Iron)

বেগুনিয়া—ব্রেনাইট, অক্সাইড অব ম্যেঙ্গেনিস্ এবং সোরা, (Brannite, Oxide of Manganese and Sultpeter)

কাল—প্রোটো অক্সাইড অব আয়রণ—অক্সাইড অব কপার, ব্রেনাইট এবং প্রোটো অক্সাইড অব কোবল্ট। (Mixture of proto Oxide of Iron, Oxide of Copper, Brannite and proto Oxide of Cabalt)

যৎকালে উনানের উপর গলিতাবস্থায় চাপান থাকে তৎকালে, হিঙ্গুল, জাঙ্গাল নীল, ক্রমদানা, গ্যেম্বোজ প্রভৃতি নিক্ষেপ করিলে সেই সেই রঙ্গের কাচ প্রস্তুত হয়।

দর্পণ প্রস্তুত করিবার বিধি।

প্রথমতঃ এক খণ্ড কাচ লইয়া তাহাকে উত্তমরূপে পরিষ্কার করিতে হয়। তৎপরে কাচের মাপের মত একখানি টিনের (রাংঙ্গের) সূক্ষ্ম পাত একটা টেবিলের উপর রাখিতে হয়, এই পাত অতি উত্তম টিন হইতে প্রস্তুত করা আবশ্যক এবং তাহার উপরি ভাগ মস্রিণ ও সমতলযুক্ত হওয়া আবশ্যক। এই টিনের পাত টেবিলে রাখিয়া একটা ছিন্ন বস্ত্রের পুটুলির দ্বারা বিস্তৃত করিয়া দেওয়া হয়; যেন কোন কোচকা না থাকে। (কেন না তাহা হইলে হাওয়া জমিয়া থাকিয়া বুদ বুদ জন্মিতে পারে) তৎপরে এই টিনের উপর এরূপে পারদ ঢালিয়া দেওয়া হয় যে টিনের সর্ব্বস্থানে সমান রূপে পড়ে, তৎপরে কাচখণ্ড এক কোন হইতে আস্তে আস্তে ঠেলিয়া দিতে হয়। এইকাচ তাহার উপর এই রূপে ২৪ ঘণ্টা কাল রাখা আবশ্যক তৎপরে ইহাকে ডেস্কোর মত একটা কাষ্ঠের ঢালু স্থানে রাখিতে হয় এবং অল্পে অল্পে সমান করিয়া তুলিতে হয় ইহা দ্বারা অনাবশ্যকীয় (অধিক) পারদ বহির্গত হইয়া যায় এবং পারদ ও টিনের একত্র মিল হইয়া কাচের গায়ে লাগে। তাহার পর ফ্রেম লাগাইয়া লইতে হয়।

মতান্তরে।

কাচের এক পৃষ্ঠে নাইট্রেট অব সিলভার সলিউশন মাখাইবে পরে উক্ত কাচকে কাৎ করিয়া ধরিয়া তাহার জলীয় অংশ ফেলিয়া দিয়া শুষ্ক করিলে রৌপ্য অংশ কাচের গাত্রে লাগিয়া যায় তৎপরে তাহার উপর মোম ও চর্ব্বি একত্রে মিশ্রিত করিয়া মাখাইলে সহজে দর্পণ প্রস্তুত হয়।

কাচের উপর ফুল কাটিবার প্রণালী।

যে কাচের দ্রব্যের উপর নক্সা করিতে হইবে তাহা অগ্রে পরিষ্কার করিয়া মোম দ্বারা আবরিত করিতে হয়। তৎপরে একটা সীসার পাত্রে কিছু কালসিয়ম ফ্লুওরাইড (Calcium florid) রাখিয়া তাহাতে সলফিউরিক আসিড ঢালিয়া দিতে হয়।

তাহা হইতে তৎক্ষণাৎ হাইড্রু ফ্লু ওরিক (HydroflouricAcid) আসিড বাষ্প বহির্গত হইতে থাকে। তৎপরে একটী সূক্ষ্ম লৌহদণ্ড অথবা ছুঁচ দ্বারা সেই মোমের উপর নক্‌সা কটিতে হয়। সুতরাং নক্‌সার স্থান হইতে মোম উঠিয়া যায় ও কাচ বাহির হয়। পরে এই কাচ উক্ত সিসের পাত্রের উপর রাখিয়া দিতে হয়। হাইড্রফ্লু ওরিক আসিড কাচের অনাবৃত স্থান সকল আক্রমণ করে এবং কাচ হইতে সিলিকা হরণ সিলিকন টেট্রাফ্লু ওরাইড (Silicon Tetraflorid) প্রস্তুত করে। সুতরাং অনাবৃত করিয়া স্থান খাইয়া যায় এবং দাগ হইতে থাকে, তৎপরে টারপিন তৈল দিয়া মোম উঠাইয়া ফেলিলে পরিষ্কার নক্‌সা বাহির হয়।

কাচ পাত্রে অক্ষরাদি অঙ্কিত করিবার বিধি।

প্রথতমঃ দুইখণ্ড কাচকে নাইট্রিক এসিডে ডুবাইয়া রেশমের বস্ত্র দিয়া মুছিয়া শুষ্ক করিবে। পরে ঐ দুইখণ্ড কাচের মধ্যে অভিলষিত লিপি রাখিয়া টিনের পাতে ঐ কাচ খণ্ডদ্বয়কে মোড়ক করিয়া ক্ষণকাল পরে ঐ টিনের মধ্য হইতে খুলিয়া মুখের আব্ দিলে সুন্দর অক্ষর প্রকাশিত হইবে।

মতান্তরে।

দুইভাগ সীসা একভাগ এমারি ও অল্প পরিমাণে সফেদা পরিস্কৃত জল দিয়া উত্তমরূপে পেষণ করিয়া তাহাতে গঁদের জল দিয়া নরম করিবে। পরে তুলি দিয়া উহা কাচের বাহিরের দিকে অঙ্কিত করিবে। পরে উক্ত কাচকে মৃদু অগ্নির উত্তাপে উত্তপ্ত করিয়া নামাইয়া শীতল করিলে সুদৃশ্য অক্ষর দৃষ্ট হইবে।

শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বার্ত্তা শাস্ত্র

বা

জীবিকাতত্ত্ব।

প্রাণীমাত্রেই জীবিকার জন্য ব্যাকুল। কোন প্রাণী জীবিকাবিহীন হইয়া থাকিতে পারে না। মনুষ্য জীবের কথা দূরে থাকুক—সামান্য কীট পতঙ্গদিগকে প্রতি নিয়ত জীবিকার অন্বেষণ করিতে হয়। বিনা অন্বেষণে, বিনা চেষ্টায়, বিনা পরিশ্রমে কাহারও জীবিকা লাভ হইবার সম্ভবনা নাই। যখন যে প্রাণীর বংশ অধিকতর বর্দ্ধিত হয়—তখন সে প্রাণীর জীবিকা কিছু অধিকতর কষ্টসাধ্য হইয়া উঠে। মনুষ্যজাতি যখন অল্পসংখ্যক পরিবারে বিভক্ত ছিল তখন তাঁহাদের জীবিকা যেমন সুখ লভ্য ছিল এখন আর সেরূপ সুখলভ্য নাই। ইহার কারণ কি? তাহা পশ্চাৎ বিবৃত হইবে।

প্রাচীন শাস্ত্র সমূহ আন্দোলন করিলে দেখা যায় যে, অতি আদিম কালের প্রথমোৎপন্ন মানবেরা স্বচ্ছন্দে জীবিকা অবলম্বী ছিল। ক্রমে তাঁহাদের বংশ বৃদ্ধি ও জ্ঞান বৃদ্ধি সহকারে জীবিকার অনেকবিধ সুপ্রশস্ত পথ আবিষ্কৃত হইতে আরম্ভ হইল। বার্ত্তা শাস্ত্রের চর্চ্চার দ্বারা জানা যায় যে, ভারতবর্ষে এক সময়ে জীবিকার সুপ্রশস্ত পথ আবিষ্কার করণ ও তদ্বিষয়ক নিয়মাবধারনের জন্য বিলক্ষণ আন্দোলন হইয়াছিল।

মনুষ্য যখন অকৃষ্টপচ্য শস্য, স্বচ্ছন্দজাত ফল মূল ও অনায়াসলব্ধ পশু মাংসের দ্বারা প্রাণ ধারণ করিত, তখন নহে—তাহার অনেক পরে অর্থাৎ যখন মনুষ্যের বংশ বৃদ্ধি, হৃদয়ের সারল্য নাশ, ভোগেচ্ছায় প্রাবল্য,—তন্নিবন্ধন নানাবিষয়ের অভাব উপস্থিত হইয়া উঠিল তখন একবার এদেশে জীবিকা নির্ব্বাচনের জন্য আর্য্য ঋষিদিগের একটী বিপুল সভা হইয়াছিল।

"সরস্বত্যাং পরে পারে সমবেতা মহর্ষয়ঃ।
বৃত্তিং বিভাগশো দ্রষ্টুংসভাং চক্রুর্মনোরমাম্॥"

তৎকালে অসীম প্রতিভাশালী ঋষিগণ বহু অনুসন্ধানের পর যে সকল জীবিকা-সংক্রান্ত ব্যবস্থা প্রচার করিয়াছিলেন সেইগুলিকেই আজ্ কাল্ আমরা "বার্ত্তা শাস্ত্র" বলিয়া থাকি। সেই পুরাতন বার্ত্তা শাস্ত্রে তৎকালের উপযুক্ত অনেক প্রকার জীবিকার উপদেশ আছে; কিন্তু এক্ষণে আর সে সকল ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে খাটান যায় না। যাহাই হউক, পাঠকগণের কুতূহল উদ্দীপ্ত করিবার জন্য আমরা তাহার কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করিব এবং তাহাই অবলম্বন করিয়া "জীবিকা তত্ত্ব" শীর্ষক প্রস্তাবটী পরিবৃংহিত করিব।

সংসারে যতপ্রকার জীবিকা আছে, বা নিত্য নিত্য নূতন নূতন সৃষ্ট হইবে, একমাত্র দাসত্ব ভিন্ন সমস্তই স্বাধীন বলিয়া গ্রাহ্য। ফল, ভাবিয়া দেখিলে কোন প্রকার জীবিকাই যথার্থ স্বাধীন নহে। দাস জীবনে পরচিত্তানুবর্ত্তন করিতে হয়, অন্যান্য জীবিকায় তাহা করিতে হয় না, এই মাত্র প্রভেদ। ফলতঃ সকল জীবিকাতেই পরের অপেক্ষা আছে। ভারতবর্ষীয় জীবিকাশাস্ত্রে যে সকল জীবিকার উল্লেখ আছে তাহার সংখ্যা প্রধান কল্পে দ্বাদশ (১২), কিন্তু শাখা প্রশাখা অসংখ্য। নিম্নে যে দুইটী শ্লোক লিখিত হইল তাহাতে সেই ১২ প্রকার জীবিকার উল্লেখ এবং তাহার অভ্যন্তরস্থ শাখা প্রশাখা অনুসন্ধান করিলে শত শত সহস্র সহস্র জীবিকার বিস্তৃত পথ দৃষ্ট হইবে।

"বিদ্যা শিল্পং ভৃতিঃ সেবা, গোরক্ষা বিপণিঃ কৃষিঃ।
গিরির্ভৈক্ষ্যং কুসীদঞ্চ, দশ জীবন হেতবঃ॥"

"কৃষিঃ শিল্পং ভৃতির্বিদ্যা, কুসীদং শাকটং গিরিঃ।
সেবানূপং নৃপোর্ভৈক্ষ্যং, আপত্তৌ জীবনানিতু॥"

প্রদর্শিত বচন দুইটীর অর্থ প্রায় এক রূপ? পরবচনে কেবল "শাকটং" ও "আনূপং" এই দুইটী কথা অধিক আছে। দুই বচন একত্র করিলে সর্ব্বসমেত ১২ দ্বাদশ প্রকার হয়। উহাদের প্রত্যেক প্রকারের যে সহস্র সহস্র শাখা প্রশাখা আছে তাহা নিম্ন লিখিত ব্যাখ্যার দ্বারা প্রতিপন্ন হইবে। (১) বিদ্যা— বিদ্যা একটী প্রধান জীবিকা। বিদ্যার দ্বারা লোকে প্রভূত ধন মান উপার্জ্জন করিয়া থাকে। অধ্যাপকতা, চিকিৎসা, পৌরহিত্য, উপদেশ দান, (গুরু কার্য্য,) বাদ নিযুক্ততা (ওকালতি,) এবং গ্রন্থরচনা প্রভৃতি ইহার শাখা; তদ্ভিন্ন ইহার প্রশাখাও অনেক আছে। পূর্ব্বে ইহা স্বাধীন ও পরাধীন উভয় রূপ পরিগৃহীত হইত, এখন প্রায় পরাধীন রূপেই গ্রহণ করিতে হয়।

(২) শিল্প—শিল্প একটী বহু বিস্তৃত জীবিকা। ইহার শাখা প্রশাখা যে কত তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। নিত্য নূতন শিল্প প্রচারিত হইতে পারে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রাচীন জীবিকা শাস্ত্রে যে সকল শিল্পের উল্লেখ আছে তাহার কতক অংশ লুপ্ত হইয়াছে এবং তাহার অতিরিক্ত ও কতকগুলি নূতন শিল্প আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রচীনকালে শিল্পকে "কলা বিদ্যা" বলিত। এই কলাবিদ্যা বা শিল্প-বিজ্ঞান পূর্ব্বে ৬৪ চৌষট্টি প্রকার শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। ৬৪ প্রকার কি কি? তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

গীত (১)। বাদ্য (২)। নৃত্য (৩)। নাট্য (৪)। লেখ্য (৫)। বিশেষকচ্ছেদ্য(৬)। তণ্ডুল কুসুমবলিবিকার (৭)। পুষ্পাস্তরণ (৮)। দশনবসনাঙ্গরাগ (৯)। মণি ভূমি কর্ম্ম (১০)। শয়নরচনা (১১)। উদকবাদ্য (১২) উদকঘাত (১৩)। চিত্রযোগ (১৪)। মাল্যগ্রথনবিকল্প (১৫)। শেখরাপীড়যোজনা (১৬)। নেপথ্য যোগ (১৭)। কর্ণপত্র ভঙ্গ (১৮)। গন্ধযুক্তি (১৯)। ভূষণযুক্তি (২০)। ইন্দ্রজাল (২১)। কৌচুমার যোগ (২২)। হস্ত লাঘব ২৩। চিত্রভক্ষ্যক্রিয়া (২৪)। পানক রস যোগ (২৫)। সূচীবয়নকর্ম্ম (২৬)। সূত্রক্রীড়া (২৭)। প্রহেলিকা (২৮)। প্রতি মালা (২৯)। দুর্ব্বচন যোগ (৩০)। পুস্তক বাচন (৩১)। নাটিকা খ্যায়িকা প্রদর্শন (৩২)। কাব্যসমস্যা পূরণ (৩৩)। পট্টিকা-বেত্র-বাণবিকল্প (৩৪)। তর্ক কর্ম্ম (৩৫)। তক্ষণক্রিয়া (৩৬)। বাস্তুবিদ্যা (৩৭)। রূপ্য রত্ন পরীক্ষা (৩৮)। ধাতুবাদ (৩৯)। মণিরাগ বিজ্ঞান (৪০)। আকর বিজ্ঞান (৪১)। বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ (৪২)। মেষ-কুক্কুট-লাবক-যুদ্ধবিধি (৪৩)। শুক-সারিকাদি-লাপনা (৪৪)। উৎসাদন কর্ম্ম (৪৫)। কেশমার্জ্জন কৌশল (৪৬)। অক্ষরমুষ্টিসংখ্যাকথন (৪৭)।

ম্লেচ্ছ তর্ক বিকল্প (৪৮)। দেশ ভাষা বিজ্ঞান (৪৯)। পুষ্পশাকটিকা-নিমিত্ত জ্ঞান (৫০)। যন্ত্রমাতৃকা (৫১)। ধারণ মাতৃকা (৫২)। সম্পাদ্য কর্ম্ম (৫৩)। মানসী কাব্যক্রিয়া (৫৪)। কোশাছন্দো বিজ্ঞান (৫৫)। ক্রিয়া বিকল্প (৫৬)। ছলিতক-যোগ (৫৭)। বস্ত্র গোপনক (৫৮)। দ্যূত প্রভেদ (৫৯)। আকর্ষণ ক্রীড়া (৬০)। বালক্রীড়নক (৬১)। বৈয়াসাকী বিদ্যা (৬২)। বৈজৈয়িকী বিদ্যা (৬৩)। বৈনায়কী বিদ্যা (৬৪)।

শিল্প জীবিকার অঙ্গ স্বরূপ চৌষট্টি প্রকার কলা বিদ্যার নামোল্লেখ করা হইল, এক্ষণে প্রত্যেকটীর অর্থ বা স্বল্প বিবরণ দৃষ্ট কর।

১। গীত—গীত কি? তাহা কাহারও অবিদিত নাই। গীতে কোন শিল্প সংযোগ আছে কি না এবং গীত—শিল্পের দ্বারা লোকের অর্থোপার্জ্জন হয় কি না—তাহা সকলেই জানেন, সুতরাং গীত বুঝাইবার জন্য শব্দান্তর প্রয়োগ করিতে হয় না।

২। বাদ্য—বাদ্য ও গীতের সহচর সুতরাং ইহাও প্রসিদ্ধ।

৩। নৃত্য—নৃত্য কি? এবং নৃত্যে যে বিশেষ শিল্প আছে তাহাও অগোচরিত নহে।

৪। নাট্য—নাটকের অভিনয়। ইহাতে বিশেষ শিল্প আছে। ইহার দ্বারা বড় মন্দ অর্থোপার্জ্জন হয় না। নাটক লেখা ও তাহার অভিনয় করা এক্ষণে অনেকেরই জীবিকা হইয়াছে। এটীকে স্বাধীন জীবিকা বলিলেও বলা যায়।

৫। লেখ্য—চিত্র কার্য্যের নাম লেখ্য। লেখ্য ও চিত্রকার্য্য এক পর্য্যায় চিত্র কার্য্য যে একটী বিশেষ শিল্প—তাহা সকলেই জানেন। ইহা অতি উত্তম জীবিকা। এই জীবিকাটী সম্পূর্ণ স্বাধীন।

৬। বিশেষক ছেদ্য—পূর্ব্বকালে এদেশের নর নারীগণ চন্দন ও কুঙ্কুমাদির দ্বারা শরীর চিত্রিত করিত। সেই চিত্র রচনার (অলকা তিলকা প্রভৃতি) কৌশল বিশেষকে "বিশেষক ছেদ্য" বলিত। ইহা মালীর মেয়ে ও নাপতেনী প্রভৃতির জীবিকা ছিল। এক্ষণে লোক সভ্য হইয়াছে বলিয়া অলকা তিলকা পরে না ও কাযে কাযেই উহা এক্ষণে জীবিকা পদ বাচ্য নহে। কেবল নাপ্‌তেনীরা কখন কখন আল্‌তা পরাইয়া দুই এক পয়সা পায় মাত্র। বিশেষক ছেদ্য কি? তাহা বুঝাইবার জন্য এক্ষণে একটী মাত্র নিদর্শন পাওয়া যায়। কলিকাতায় ও কাশীর গঙ্গায় স্নান করিতে গিয়া উড়ে ও হিন্দুস্থানী ঘাটওয়ালার নিকটে যে চন্দনের ছাপা পরিয়া আইসে—তাহাই পূর্ব্বকালের বিশেষক ছেদ্যের অপভ্রংশ বা অনুকরণ। (ক্রমশঃ)

শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ।

রহস্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

চিৎপাত হইয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলাম। এই শীতকালে কুল্ কুল্ করিয়া ঘাম হইতে লাগিল। একে ঘর অন্ধকার, আবার সমস্ত খড় খড়ি বন্ধ, যেন নিশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। মারা যাই আর কি, থাকিতে পারিলাম না; খড় খড়ি খুলিব মনে করিয়া উঠিলাম। অন্ধকারে দেয়াল ধরিয়া আস্তে আস্তে যাইতে লাগিলাম; পর্দ্দায় হাত ঠেকিল, মনে করিলাম এই খানে জানালা আছে; উঁ হুঁ, এ যে ছোট বিছানার মশারি। আবার হাত বাড়াইয়া অগ্রসর হইলাম, দুই তিনবার চৌকিতে পা লাগিয়া "পপাত ধরণীতলে" হইবার উপক্রম হইল। একটা কিসের শব্দ হইল, ঠাওরাইয়া মনে করিলাম অন্ধকারে টিপ্‌কলে পা পড়াতে কলে জলের শব্দ হইতেছে। এইবার জানালা পাইয়াছি। পর্দ্দা সরাইয়া যেমন জানালা খুলিতে যাইব " বাবারে এ এ মাগো ও ও হি ই ই ই গেছি ই ই ই " লাফাইয়া যেমন পলাইব একখানি চৌকিতে পা লাগিয়া পড়িয়া গেলাম। এই শীতকালের রাত্রিতে বরফের চেয়ে ঠাণ্ডা জল শ্রাবণের ধারার ন্যায় মস্তকে বর্ষণ হইয়াছে। জানালা মনে করিয়া সাওয়ার বাথের ভিতর ঢুকিয়াছিলাম। কাঁপিতে কাঁপিতে পোর্টমেণ্টো খুঁজিয়া আর একটী ইজের পরিলাম। লেপ মুড়িদিয়া পুনরায় শয়ন করিলাম।

বিছানায় শুইলাম বটে কিন্তু অন্ধকারে প্রাণ যেন আইঢাই করিতে লাগিল। ঠিক্ যেন যমযন্ত্রণা হইল। হঠাৎ মনে হইল আমি কি বোকা, অন্ধকারে এত কষ্ট পাইবার অগে যদি গ্যাস জ্বালিতাম। আর গ্যাস জ্বালিতে কষ্ট নাই, হাতোলটা টিপিলেই হইবে।

পুনরায় উঠিয়া খুঁজিয়া খুঁজিয়া হাতোলটি টিপিলাম। কই গ্যাস জ্বলিল না? ও আবার কি? এতরাত্রে ঘণ্টা বাজে কেন? ঐ যা, গ্যাশ জ্বালিতে এলার্ম ঘণ্টা বাজাইয়া দিয়াছি। সর্ব্বনাশ করিয়াছি, ছাদের উপর ভয়ানক শব্দ করিয়া ঘণ্টা বাজিতেছে; এখনি পাড়ার লোক ছুটিয়া আসিবে। কি করি, শব্দ থামাইবার উপায় জানি না। দৌড়িয়া হার্ব্বির ঘরে যাই। এ ভিন্ন আর উপায় নাই; নল দিয়া কথা কহা, সেকাজ এ প্রাণ থাকিতে হইবে না। তাড়া তাড়ি যেমন যাইব, একটী টেবিলের উপর নানাবিধ খেলানা সাজান ছিল, ধাক্কা লাগিয়া সমস্ত হুড়মুড় করিয়া উল্টাইয়া পড়িল। এমন সময় হার্ব্বি আসিয়া পড়িল।

হার্ব্বি।—কি হইয়াছে, ব্যাপার কি?

আমি। আগে ভাই তোমার ঘণ্টাটা থামাও, তারপর বলিতেছি।

হার্বি। এই নাও ঘণ্টা থামিয়াছে, এখন নিচে যাই, পাড়ার লোক সব উঠিয়া টেলিগ্রাফ করিতেছে, তাহাদের বুঝাইয়া আসি।

হার্বি টেলিগ্রাফ দ্বারা সকলকে বলিয়া আসিল, ভ্রমক্রমে এরূপ হইয়াছে; বাস্তবিক কোন বিপদ ঘটে নাই। আসিয়া গ্যাস জ্বালিয়া দিল।

আমি। ভাই কিছু মনে করিও না, অন্ধকারে কেমন ঘুম হইল না, গ্যাস জ্বালিতে গিয়া এই কাণ্ড করিয়াছি।

হার্বি। তার আর কি হইবে। এখন আমি শুইগে, দেখ, আমার জামা গায়ে দিবার সাবকাশ হয় নাই, শশব্যস্তে ছুটিয়া আসিয়াছি। বড় শীত ভাই পলাই।

আমি। দাঁড়াও, দাঁড়াও। আমার আর একটা কথা আছে। আমি আর এক বিপদে পড়িয়াছিলাম। টিউব দিয়া তোমাকে ডাকিতে গিয়া মিশ হার্বিকে ডাকাতে তিনি—

হার্বি। থাক্, থাক্, সেকথা কাল শুনবো। তার জন্য ভাবনা কিসের? কাল সব ঠিক হইয়া যাইবে। আমি যাই।

হার্বি চলিয়া গেল, আমার সব কথা বলা হইল না। সকালে মুখ দেখান ভার হইবে। এস্থান হইতে যদি কোন প্রকারে পলাইতে পারিতাম। ভাবিলাম না পারিই বা কেন? ঘড়িতে সবে ৪টা বাজিয়াছে, যদি যাইতে হয়ত এই সময় যাওয়াই ভাল। একটু পরেই লিডি নিশ্চয়ই উঠিবে, তাহার সহিত দেখা করা হইবে না। সঙ্গে রেলওয়ে গাইড ছিল দেখিলাম ৫ টার সময় একখানি গাড়ি লণ্ডনে যাইবে। তাহ'লে এই বেলা যাওয়াই শ্রেয়। ছোট পোর্টমেণ্টোটা সচ্ছন্দে হাতে করিয়া লইয়া যাইতে পারিব।

একখানি কাগজে লিখিলাম "আমি না বলিয়া চলিয়া গেলাম, কিছু মনে করিও না; আমার সম্বন্ধে যদি কেহ কিছু বলে, সে সব মিথ্যা জানিবে। লণ্ডনে যাইয়া সমস্ত বিষয় পত্র দ্বারা জানাইব।"

টেবিলের উপর কাগজখানি রাখিয়া আস্তে আস্তে দরজা খুলিয়া বুট জোড়াটী হাতে করিয়া সিঁড়িতে নামিলাম। নিচে আসিয়া বুট পায়ে দিলাম। সম্মুখেই দরজা। দরজার ভিতর দিকে ভাল সবুজ সাটিনের পর্দ্দা। সরাইয়া দরজা ঠেলিলাম; বন্ধ; হ্যাণ্ডেল ঘুরাইলে খুলিতে পারে ভাবিয়া যেমন হ্যাণ্ডেল ধরিলাম— আ আ আ আ উ উ উ খুউন খুউউন। হার্বির চোর কলে পড়িয়াছি। দক্ষিণ হস্ত দ্বারা হ্যাণ্ডেল ধরিয়াছিলাম। উহাও আমার হস্তকে উত্তমরূপে ধরিয়াছিল।

আমি ছাড়িলে সে ছাড়ে না পোর্টমেণ্টো ফেলিয়া বামহস্ত দ্বারা দক্ষিণ হস্ত উঠাইতে গিয়া দুটী হাতই তাহাতে লাগিয়া গেল। কেবল হাতের যন্ত্রণা হইলে রক্ষা ছিল। সমস্ত শরীর তাড়িত বেগে (Galvanic shock) অস্থির।

হঠাৎ কাঁপুনি থামিল; নিকটে একখানি চেয়ারে ধপাস করিয়া বসিয়া পড়িলাম। সম্মুখেই হার্বি; সে আমার যন্ত্রণা দেখিয়া অপ্রস্তুত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "কিরূপে চোর কলে আসিয়া পড়িলে" হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিলাম "বাড়ী যাইতেছিলাম; সমস্ত রাত্রি যথেষ্ট কষ্ট ভোগ করিয়াছি, শেষে কষ্টের ধাড়ি পাইয়াছি। উঃ! ইহাতে আমাকে আধমরা করিয়াছে। এখন দরজা খুলিয়া দাও, আমি চলিয়া যাই।

হার্বি। বিলক্ষণ; এস উপরে এস; যাবে কোথা?

আমি। না, আমি থাকিব না, আমি নিশ্চয়ই যাইব। তোমার যে বাড়ী, এদিকে নল ওদিকে টিপকল, সেদিকে ব্যাটারি, সেখানে তার, মাথায় ঘণ্টা, যেন ভূতের আড্ডা। এখানে কি ভদ্রলোকে থাকিতে পারে। খোল দরজা খোল আমি যাই। আবার কি ট্রেণ ফেল হ'ব।

হার্বি। নেহাত যাইবে? তবে দাঁড়াও সহিসকে গাড়ি তৈয়ার করিতে বলি, আমি তোমাকে ষ্টেসনে রাখিয়া আসিব। ততক্ষণ লিডিকে কিছু খাবার আনিতে বলি। সে এতক্ষণ উঠিয়াছে।

এতক্ষণ কড়া কড়া কথা বলিতেছিলাম, লিডির নাম শুনিয়া হৃৎকম্প হইল। বলিলাম "না, না, খাবার কাজ নাই। আমি এই চলিলাম, গুড্‌বাই"।

হার্বি। সে কিহে, পাঁচ মিনিট দাঁড়াইতে পার না?

আমি। না ভাই মাপ কর, তার উঠিবার আগেই আমি চলিলাম, গুডবাই, গুডবাই।

হার্বি। তবে এক মিনিট দাঁড়াও, আমি কাপড় ছাড়িয়া আসি, তোমার সঙ্গে যাইব। আমি। না ভাই, তোমার পায়ে পড়ি—

এমন সময়ে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হইল। আর দাঁড়াই, গুডবায় বলিয়াই দৌড়। ফটক পর্য্যন্ত দ্রুত আসিয়া মনে পড়িল এখানেও কি কেমন তার তোর আছে। পিছনে চাহিয়া দেখিলান হার্বি দাঁড়াইয়া। উচ্চৈস্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম "কেমন হে, এখানে কোন রকম কষ্ট আছে?

হার্বি। কষ্ট আবার কি। কোনও ভয় নাই।

আমি। কোন রকম টিপ্‌কল নাই?

হার্বি। না, না, তুমি সচ্ছন্দে যাও।

পা দিয়া দরজা খুলিলাম। হাত দিলাম না। পাছে দরজা গায়ে ঠেকে, সাবধানে বাহির হইলাম।

রাস্তায় আসিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম। ধড়ে যেন প্রাণ আসিল।

যথা সময়ে লণ্ডনে আসিয়া পঁহুছিলাম। এখন আর আমার হুইস্কার নাই।

দুই দিন পরে হার্ব্বির এক পত্র পাইলাম। যদিও তামাসা করিয়া লিখিয়াছে তথাপি পড়িয়া আমার রাগ হইল। পত্রের কিয়দংশ এইরূপ—ছি, ছি, লিডির ঘরে যাইতে চেষ্টা করিয়াছিলে। ভাল কর নাই। ভদ্রলোক হইয়া দাসীর প্রতি ওরূপ ব্যবহার অতি ঘৃণার্হ। বিশেষ, বন্ধু বান্ধবের ভিতর ওরূপ চরিত্রের লোক হইলে বড় দুঃখ হয়।

পত্রখানি খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলাম। প্রত্যুত্তর লিখিলাম না।

কিছু দিন পরে হার্ব্বি স্বয়ং আসিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করাতে পুনরায় তাহার সহিত আলাপ করিয়াছি, কিন্তু প্রতিজ্ঞা করিয়াছি আর তাহার বাড়ী যাইব না। দেখি বাঙ্গালীর প্রতিজ্ঞা রক্ষা হয় কি না।

শ্রীহেমলাল দত্ত।

ভারতের প্রাচীন ইতিহাস।

পূঃ খ্রীঃ অব্দ	বুদ্ধনির্ব্বাণাব্দ
৪৭৮—বুদ্ধ নির্ব্বাণ ...	১
৩১৬—চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের ২৪বর্ষ রাজ্য	১৬৩
২৯২—বিন্দুসর ২৮ র্ষব রাজ্য	১৮৭
২৭৭—অশোক উজ্জয়িনীর রাজা	২০৩
২৭৬—মাহীন্দ জন্ম	২০৪
২৬৪—অশোকের ভ্রাতৃবিবাদ	২১৫
২৬০— „ অভিষেক	২১৯
২৫৭—বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী	২২২
২৫৬—আন্টিওকস সহসন্ধি	২২৩
২৫৫—মাহীন্দ্র পুরোহিত নিযুক্ত	২২৪
২৫১—পাহাড়ে প্রথম আজ্ঞা খোদিত	২২৮
২৪৯—ঐ দ্বিতীয়	২৩০
২৪৮—পার্থিয়ার আরছেক বিদ্রোহ	২৩১

পূঃ খ্রীঃ অব্দ	বুদ্ধনির্ব্বাণাব্দ।
২৪৬-বাক্ত্রিয়ায় ডাইওডাস বিদ্রোহ	২৩৩
২৪৪—মোগলিপুত্রের অধীন তৃতীয় বৌদ্ধ মহাধিবেশন	২৩৫
২৪৩—মাহীন্দের সিংহলাগমন	২৩৭
২৪২—বরাবরের গুহালিপি	২৩৭
২৩৪ —শিলাস্তম্ভ খোদিত	২৪৫
২৩১—অসন্ধমিত রাণীর মৃত্যু	২৪৮
২২৮—অশোকের দ্বিতীয় বিবাহ	২৫১
২২৬—রাণীর বোধিতরু ছেদ চেষ্টা	২৫৩
২২৫—অশোকের সন্ন্যাস	২৫৪
২২৪—রূপনাথ ও সাসীরাম আজ্ঞা	২৫৫
২২৩—অশোকের মৃত্যু	২৫৬
২১৫-দশরথের নাগার্জ্জন গুহা লিপি	২৬৩

অবদানশতক নামক বৌদ্ধ গ্রন্থানুসারে অশোক বুদ্ধ নির্ব্বাণের ২০০ বর্ষ পরে সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই মত ভারতের উত্তর বিভাগে প্রচলিত ছিল। দাক্ষিণাত্য বাসীরা বুদ্ধ নির্ব্বাণের ২১৪ বর্ষ পরে অশোক রাজা হন এইরূপ স্থির করিয়া গিয়াছেন। তিব্বত ও মঙ্গোলীয়াবাসীরা কহে বুদ্ধদেবের ১১০ বর্ষ পরে অশোক নামে এক ব্যক্তি রাজা হইয়াছিলেন। সিংহলদেশীয় বৌদ্ধদের মতানুসারে অশোক বুদ্ধ নির্ব্বাণের ২৩৪ বর্ষ পরে রাজ্য লাভ করেন। চীন দেশীয় মত তিব্বত ও মঙ্গোলীয় মতের ছায়া মাত্র। বুদ্ধঘোষ নামক বৌদ্ধ পণ্ডিত এই সকল ভিন্ন ভিন্ন মতের সমন্বয় করিতে অসমর্থ হইয়া দুই জন অশোক স্বীকার করিয়াছেন। শেষাবস্থায় বৌদ্ধরাও কহিত যে কালাশোক নামে আর এক ব্যক্তি ছিল। তাঁহারই সময় বৌদ্ধদের দ্বিতীয় সমাধিবেশন হয়। যাহা হউক এতদ্দ্বারা জানা যাইতেছে যে, প্রাচীন কালেই বৌদ্ধেরা বুদ্ধ নির্ব্বাণ শক বিস্মৃত হইয়াছিল। তজ্জন্য নানা দেশে নানা মত প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু স্থূল-গণনায় ভারতবর্ষীয় মতে বুদ্ধ নির্ব্বাণের ২০০ বর্ষ পরে এবং চীন তিব্বত ও মঙ্গোলীয় মতে বুদ্ধ নির্ব্বাণের ১০০ বর্ষ পরে অশোক সিংহাসন গ্রহণ করেন। খোদিত লিপি বিচার করিয়া ২১৯ বর্ষ পরে অশোকের অভিষেক স্থিরীকৃত হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ভারত প্রচলিত মতের সহিত পাষাণ লিপির নাম মাত্র অনৈক্য আছে। চীন তিব্বত ও মঙ্গোলীয়া মত যে ভ্রান্তিমূলক তাহার সন্দেহ নাই। পূর্ব্বতন বৌদ্ধেরা এ বিষয় জ্ঞাত হইয়া কেবল মর্য্যাদা রক্ষার্থ দ্বিতীয় অশোক স্বীকার করিয়াছেন।

অশোক রাজার খোদিত লিপি ভারতের নানা স্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সকল লিপি তিন প্রধান ভাগে বিভক্ত হইতে পারে;

১ম। খোদিত পর্ব্বত।

২য়। খোদিত শিলাস্তম্ভ।

৩য়। খোদিত পর্ব্বত গুহা।

খোদিত পর্ব্বত পঞ্চ প্রধান ভাগে বিভক্ত।

১। সাবাজ ঘড়ির পাহাড়। পেশোয়ারের ৪০ মাইল উত্তর পূর্ব্বে ও অটকের ২৫ মাইল উত্তর পশ্চিমে সুদন উপত্যকা মধ্যে এই পর্ব্বতের গাত্র খোদিত আছে।

২। খালসীর পাহাড়। যেখানে যমুনা হিমালয় ত্যাগ করিয়া দেহারায় ভারতভূমি প্রবেশ করিতেছে, তাহারই পশ্চিম দিকে এই পাহাড় বিদ্যমান আছে।

৩। গিরনারের পাহাড়। সোমনাথ পট্টনের ৪০ মাইল উত্তরে কাট্টিবার দেশে এই পর্ব্বত সংস্থিত।

৪। ধাবলি পাহাড়। কটকের ২০ মাইল দক্ষিণে ও জগন্নাথ ক্ষেত্রের ২০ মাইল উত্তরে এই পর্ব্বত দেখিতে পাওয়া যায়।

৫। জোগড়ের পাহাড়। জোগড় উড়িষ্যার দক্ষিণস্থ গঞ্জামের ১৮ মাইল উত্তর পশ্চিমে সংস্থিত আছে।

এতদ্ব্যতীত সাসীরাম প্রদেশের কাইমুর পর্ব্বতে জব্বলপুরের সন্নিধানে বিরাটের ভীমগুহ পর্ব্বতে আরও খোদিত দেখা যায়।

প্রথম পর্ব্বত গাত্রে এইরূপ খোদিত আছে—

১ নং। "দেবতাদিগের প্রিয়দাসী রাজার এই ধর্ম্ম লিপি। পূজা জন্য হউক বা বিবাহ জন্য হউক আর জীব হিংসা হইবে না। এইরূপ সভায় অনেক হিংসা হয়। দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী প্রজার পিতা স্বরূপ। একরূপ উপাসনাই বিধি-মত কার্য্য। পূর্ব্বে দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শীর দেবালয়ে প্রত্যহ সহস্র সহস্র বলি হইত। যখন এই ধর্ম্মশাসন চলিতেছে, তখনও দুই এক জীব হিংসা হইতেছে। অতএব পুনরায় আনন্দের শব্দ উঠিতেছে যেন পশুহিংসা আর না হয়।"

এই ধর্ম্ম লিপি দ্বারা এই ইতিহাস সংগ্রহ করা যায় যে অশোকের পূর্ব্বে দেব মন্দির ছিল এবং সেই সকল মন্দিরে বলি হইত। বিবাহ কালেও মাংস ভোজনাদি প্রথা প্রচলিত ছিল।

২ নং। "দেব প্রিয় প্রিয়দাসী রাজার রাজ্যে এবং চোলি পীড় সত্যপুত্র কেরলপুত্র, তম্বপাণী প্রভৃতি ধর্ম্মে বিশ্বাসকারিগণের রাজ্যে এবং আণ্টিওকস যবনের রাজ্যে সর্ব্বস্থানে দুই চিকিৎসালয় সংস্থাপিত হউক। এক চিকিৎসালয়, মনুষ্যের জন্য ও আর এক পশুর জন্য। ঔষধাদির সুবিধার জন্য যে দেশে ঔষধ নাই তথায় ঔষধের বৃক্ষাদি রোপিত হউক। মনুষ্য ও জীবের জন্য বিস্তীর্ণ পথ সকল প্রস্তুত হউক। তাহার পার্শ্বে বৃক্ষ রোপিত হউক এবং কূপ সকল স্থানে স্থানে খাত হউক।"

এতদ্দ্বারা এই ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে যে, বর্ত্তমান কালের ন্যায় ভারতবাসী রাজারা কেবল স্বরাজ্যের উন্নতি সাধনে ব্যগ্র ছিলেন এরূপ নহে, পরকীয় রাজ্যের প্রতিও বিশেষ মনোযোগ করিতেন। গ্রীসের ইতিহাস পাঠ করিয়া জানা যায় যে, আণ্টিওকস আলেক্জাণ্ডারের সেনাপতি ছিলেন। তাঁহার রাজ্য পারস্য ও অফগানিস্থানের উত্তরে বাক্ত্রিয়া নামক স্থানে ছিল। অশোক তাঁহার রাজ্যে চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। অতএব গ্রীকদিগের সহিত অশোকের আলাপ ও পরিচয় থাকা সম্পূর্ণরূপ সম্ভব। বাক্ত্রিয়ার সহিত এইরূপ সম্পর্ক বাহির হওয়াতে বক্ত্রিয়ার গ্রীকগণের ভারতবর্ষে নানা কার্য্যের

জন্য আসা অসম্ভব নহে। বোধ হয় অনেক গ্রীক শিল্পিরা অশোকের নিকট কর্ম্মচারী নিযুক্ত হয়। এই জন্য ভারতের স্থানে স্থানে গ্রীকশিল্পের পরিচয় পাওয়া যায়। অপিচ অশোক কেবল চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছিলেন এরূপ নহে, তাঁহার সময়ে বটানিকেল গার্ডেনও ছিল। তিনি ভারতবর্ষে অনেক বিস্তীর্ণ পথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। (ক্রমশঃ।)

তত্ত্ব-সংগ্রহ।

চুণ মাথাইয়া রাখিলে লোহার জিনিস পত্রাদি নষ্ট হয় না; এই জন্য জল যাইবার বড় বড় লোহার নল, লৌহ নির্ম্মিত চৌবাচ্ছা প্রভৃতিতে চুণকাম করিয়া রাখার প্রথা আছে; এবং রাজমিস্ত্রীরা এইজন্যই তাহাদের কর্ণিকে চুণ মাখাইয়া রাখে। বহুদিনের পুরাতন ইমারত আদি ভাঙ্গিবার সময় দেখা যায় যে, কড়ি, বরগা প্রভৃতির যে অংশ টুকু চুণ সুরকির গাঁথনির ভিতর থাকে তাহা প্রায়ই খারাপ হয় না। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে প্রতি বৎসর দশ লক্ষ টাকা, ইউয়ের দৌরাত্ম্য নিবন্ধন, কাষ্ঠ নির্ম্মিত পুল প্রভৃতি মেরামত করিতে খরচ করিতে হয়। অতএব চুণের জল কিম্বা চুণকাম দ্বারা লৌহ ও কাষ্ঠের দ্রব্যাদি কতদূর রক্ষিত হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে বহুল পরীক্ষাদি হইলে বিশেষ উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা আছে।

চুণের পরিষ্কারক ও স্বাস্থ্য বিধায়ক গুণ অনেকেই অবগত আছেন। চিত্রের কোন স্থানে তেল কিম্বা চর্ব্বির দাগ হইলে চিত্রকরেরা তাহা পরিষ্কার চুণের জল দ্বারা উঠাইয়া থাকে (আমাদের দেশের বালক মাত্রেই জানে যে পুস্তকাদিতে তেল পড়িয়া গেলে তাহা চুণ লাগাইয়া উঠাইতে হয়); এবং পাইপের মুখের ভুসার কালি পড়িলে গরম চুণ মিশ্রিত জল দিয়া তাহা উঠাইয়া থাকে। বাস-গৃহ, ঘোঁড়ার আস্তাবল প্রভৃতি স্থানে চুণকাম করিলে যে বায়ু পরিষ্কৃত হয় এবং সকল প্রকারের বিঘ্ন জনক পদার্থ নষ্ট হইয়া যায় ইহা চির প্রসিদ্ধ। লৌহ কাষ্ঠাদিতে চুণ মাথাইয়া রাখিলে যদ্যপি উক্ত দ্রব্যগুলি বেশ শুষ্ক থাকে এবং কোন মতে না ভিজিয়া উঠে তাহা হইলেই (Scientific American.) তাহারা উত্তমরূপে সংরক্ষিত হয়।

২। অনেকে শ্বেত হস্তীর কথা শুনিয়াছেন, কিন্তু শ্বেত হস্তী যে বাস্তবিকই আছে ইহা অনেকে নিশ্চিত রূপে জানেন না। শ্যাম দেশে শ্বেত হস্তীর বড় সম্মান সমাদর; হিন্দুরা যেরূপ গাভীকে ভগবতী বলিয়া পূজা করিয়া থাকে,

শ্যামের লোকেরা সেইরূপ শ্বেত হস্তীর পূজা করিয়া থাকে, ও রাজ সরকারের রাজ আজ্ঞা অনুসারে শ্বেতহস্তী মহা জাঁকজমকে রক্ষিত হয়। শ্বেতহস্তী কোন্ জাতীয় হস্তী এবং কিরূপেই বা তাহার উৎপত্তি? তাহা জানিতে বোধ হয় সকলেরই ইচ্ছা হইতে পারে। বর্ত্তমান কালে পৃথিবীতে কেবল দুই জাতীয় মাত্র হস্তী আছে—ভারতবর্ষের হস্তী ও আফ্রিকার হস্তী। পূর্ব্বকালে পৃথিবীতে আরও কয়েক জাতীয় হস্তী বিদ্যমান ছিল এবং বর্ত্তমান কালের হস্তী অপেক্ষা ঐ সকল হস্তী বৃহৎকায় ও অধিক বলবান্ ছিল। এক্ষণে ঐ সকল হস্তী মামথ্ (Mammoth) ও মাস্তোদন্ (Mastodon) নামে বিখ্যাত। ঐ মামথ্ ও মাস্তোদন এখন আর জীবিত নাই; অপরাপর অসংখ্য প্রাণী ও উদ্ভিদাদির সহিত তাহারা ও চিরকালের নিমিত্ত লয় প্রাপ্ত হইয়াছে; তবে পৃথিবীর স্থানে স্থানে ভূগর্ভ হইতে তাহাদিগের অস্থি পাওয়া গিয়াছে এবং ক্রমে ক্রমে ঐ অস্থি গুলি যথা স্থানে সংযোজিত করিয়া তাহাদের অস্থিময় শরীর প্রস্তুত হইয়াছে। [কলিকাতার জাদুঘরে হাতীর দাঁতের আকারের মামথের অতি প্রকাণ্ড প্রস্তরীভূত দন্ত ও মস্তকাস্থি অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন।]

বর্ত্তমানে পৃথিবীতে কেবল ভারতবর্ষীয় ও আফ্রিক এই দুই জাতীয় হস্তী দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু অপরাপর জীব জন্তুর ন্যায় হস্তীর ও জাতি বৈষম্য (Variation) ঘটিয়া থাকে। সিংহল ও সুমাত্রা দ্বীপে যে হস্তী দেখিতে পাওয়া যায় তাহাকে কোন কোন প্রাণীতত্ত্ববেত্তা এক ভিন্ন জাতীয় হস্তী বলিয়া গণ্য করিয়া থাকেন; কিন্তু অধিকাংশ প্রাণী তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতদের মতে ইহা ভিন্ন জাতীয় হস্তী নহে, ইহা কেবল ভাতবর্ষীয় হস্তীরই একটী উপজাতি মাত্র; ইহার সহিত ভারতবর্ষীয় হস্তীর সৌসাদৃশ্যই অধিক, প্রভেদ সামান্য মাত্র; অতএব সিংহল ও সুমাত্রার হস্তীকে ভিন্ন জাতীয় বলা যুক্তিসিদ্ধ নহে। সেই রূপ শ্বেত হস্তী ও ভিন্ন জাতীয় নহে; ইহা ভারতবর্ষীয় হস্তীর কটা (Albino) উপজাতি মাত্র। শ্বেত হস্তীর সহিত ভারতবর্ষীয় হস্তীর বর্ণ ব্যতিরেকে আর কিছুতেই প্রভেদ নাই। অনেকে অতিশয় কটা মনুষ দেখিয়াছেন; কোন অজ্ঞাত কারণ বশতঃ তাহাদের শরীরের স্বাভাবিক বর্ণ উৎপন্ন হয় না, এবং সেই কারণে তাহারা অধিক আলোক সহ্য করিতে পারে না বলিয়া দিনের বেলায় তাহারা চক্ষু বুজিয়া থাকে; অন্য অন্য জন্তুদিগের মধ্যেও কটা জন্তু দেখা যায়। সাদা ইঁদুর, সাদা বিড়াল, সাদা খরগোস, প্রভৃতি ঐ ঐ জাতীয় কটা জন্তু ভিন্ন আর কিছুই নহে। শ্বেতহস্তী ও ঐ রূপ সামান্য হস্তীর কটা উপজাতি মাত্র। ডারুইন (Darwin) বলেন শরীরের এইরূপ কটা রং পুরুষানুক্রমে সংক্রামিত হইয়া থাকে। *Belgravia*, June, 1882.

বেদ ও দর্শন বিষয়ক প্রস্তাব।

"যথা স্ত্রীণাং তথা বাচাং সাধুত্বে দুর্জ্জনো জনঃ।"

দর্শন শাস্ত্রই বিজ্ঞানের দক্ষিণ হস্ত। কিন্তু দর্শনশাস্ত্রের আন্দোলন করিতে হইলে, আমাদিগের মহাবিপদ্ উপস্থিত হয়। কোন্ সময়ে কোন্ মহাত্মা এই অলৌকিক কৌশলের সূত্রপাত করিয়াছিলেন, কোন্ সময়ই বা ইহার যৌবন অবস্থা এবং কোন্ কোন্ সময়েই বা কোন্ কোন্ দেশের লোকেরা ইহার উন্নতিসাধন করিয়া জগতের উন্নত অবস্থার পথ-প্রদর্শক হইয়াছিলেন, এ সকল বিষয় জানিবার জন্য অনেকেরই কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু তদ্বিষয়ের পুঙ্খানুরূপ অনুসন্ধান ও যথার্থরূপ মীমাংসা করা কাহার সাধ্য? কে বলিতে পারে আমি ঠিক্ বলিতেছি, তবে সকলেই চেষ্টিত ও যত্নবান্ হইয়া প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করিলে যে, ক্রমশঃ সত্যের পথ পরিষ্কৃত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

ইতিপূর্ব্বে অনেক অনেক মহাত্মারা এই সকল বিষয়ের মীমাংসা করিতে গিয়া, গভীর গভীর যুক্তি সকল প্রদর্শন করিয়া আপনাদের অনুসন্ধিৎসা ও বুদ্ধিমত্তারও প্রচুর পরিমাণে পরিচয় দিয়াছেন। ঐ সকল লিপি পাঠ করিলে তাঁহাদিগকে আর মানুষ বলিয়া বোধ হয় না, মনোমধ্যে সহসাই ভক্তির আবির্ভাব হইয়া থাকে, বুদ্ধিবৃত্তি শ্রদ্ধাসহকারে তাঁহাদিগের স্তুতি ও প্রশংসা করিতে ত্রুটি করে না। সুতরাং জিজ্ঞাসাসুলভ মানব-প্রকৃতিও যে ক্রমশঃ তাহার পক্ষপাতী হইয়া উঠিবে, তাহা আশ্চর্য্য নহে। ফলতঃ যে সকল মহাত্মারা এই সকল বিষয়ের মীমাংসাপথে পদার্পণ করিয়াছেন, সকলকেই যুক্তি ও অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া চলিতে হইয়াছে, অনুমান যথার্থও হইতে পারে, মিথ্যাও হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়াই যে, আমরা একবারে অনুমান ত্যাগ করিতে বলিতেছি, এমত নহে। যেহেতু অতি প্রাচীন অনিশ্চিত বিষয়ের সিদ্ধান্ত করিতে গেলে প্রকারান্তরে অনুমান ব্যতীত আর কিছুই উপায় নাই। সুতরাং প্রামাণিক ও যুক্তিযুক্ত অনুমানই পুরাতত্ত্ব নিরূপণের আলম্বন। মনুষ্যের সমাজ, ধর্ম্মানুশীলন, ব্যবহার চর্চ্চা এবং প্রাকৃতিক বিষয়ের তারতম্য প্রভৃতিই তাহার প্রধান সহায়।

অনেকে অনুমান করেন যে, কোন দেশেই পরিস্ফুটভাবে ও অন্য শাস্ত্র নিরপেক্ষ হইয়া দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা হয় নাই। কিন্তু ভারতবর্ষ ও গ্রীস্ ঐ নিয়মের

বহির্ভূত। এই উভয় দেশের লোকেরাই বহুদিন হইতে দর্শনশাস্ত্রের অনুশীলন করিয়া আসিতেছেন, ভারতবর্ষ হইতে চীন, পারস্য, সিরিয়া, মিসর প্রভৃতি এবং গ্রীস হইতে সমুদায় ইউরোপ দর্শনশাস্ত্রের আলোক লাভ করিয়াছে, সে অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না, কিন্তু কোন্ সময়ে যে, ভারতবর্ষ ও গ্রীস্ এই উভয় দেশে দর্শন শাস্ত্রের প্রথমানুশীলন হইয়াছিল, তাহার মীমাংসা সহজ নহে।

ইদানীং যে পৌরাণিক সময়কে (১) আমরা অতি প্রাচীন বলিয়া গণনা করিয়া থাকি, ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের উৎপত্তি-কালের সহিত সেই পৌরাণিক সময়ের যে কত অন্তর তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। পদ্মপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে যখন দর্শনশাস্ত্রের সবিশেষ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, (২) তখন পৌরাণিক সময়ের পূর্ব্বে যে

---

(১) কলির ৬৫৩ বৎসর গত হইলে যদি কুরুপাণ্ডবদিগের যুদ্ধ হইয়া থাকে, "শতেষু ষট্সু সার্দ্ধেষু ত্র্যধিকেষু চ ভূতলে কলের্গতেষু বর্ষাণামভবন্ কুরুপাণ্ডবাঃ" কলির ১০০০ বৎসর পর অতীত সময়েই যদি জনমেজয়ের রাজ্যকালে নৈমিষারণ্যীয় ঋষিদিগের দ্বারা মহাভারত প্রচার হওয়া সপ্রমাণ হয় এবং পৌরাণিক সময়ের সহিত যদি মহাভারত প্রচারের ৫০০ বৎসর ব্যবধান থাকে, তবে কলির ১৫০০ বৎসরকে পৌরাণিক সময় বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে দোষ হয় না। প্রসিদ্ধ রামদাস বাবু ঐতিহাসিক রহস্যে ইহা প্রমাণ করিয়াছেন। পৌরাণিক সময় সম্বন্ধে একটী নূতন প্রবন্ধ লিখিতে আমাদের ইচ্ছা রহিল।

এখনকার সময়ে কল্যব্দ ৪৯৫৩ বৎসর, তাহার ১৫০০ বৎসর বাদ দিলে ৩৪৫৩ বৎসরকে পৌরাণিক সময় বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে। " নবশৈলেন্দু-রামাঢ্যাঃ শকাব্দাঃ কলিবৎসরাঃ " শকাব্দার সহিত ৩১৪৯ যোগ করিলে কল্যব্দ হইবে।

(২) " কণাদেন তু সম্প্রোক্তং শাস্ত্রং বৈশেষিকং মহৎ
গৌতমেন তথা ন্যায়ং সাংখ্যন্তু কপিলেন বৈ।
দ্বিজন্মনা জৈমিনিনা পূর্ব্বং বেদ ময়ার্থতঃ
নিরীশ্বরেন বাদেন কৃতং শাস্ত্রং মহত্তরং
ধিষণেন তথা প্রোক্তং চার্ব্বাকমতিগর্হিতং
দৈত্যানাং নাশনার্থায় বিষ্ণুনা বুদ্ধরূপিণা
বৌদ্ধশাস্ত্রমসৎপ্রোক্তং নগ্ননীলপটাদিকং॥"

সাংখ্যপ্রবচনভাষাধৃত———

পদ্মপুরাণ।

কণাদ বৈশেষিক, গৌতমন্যায়, কপিল সাংখ্য, জৈমিনি পূর্ব্বমীমাংসা, বৃহস্পতি চার্ব্বাক এবং বুদ্ধের নগ্ননীলপটাদি দর্শন শাস্ত্র সকল রচনা করিয়াছেন।

প্রচলিত দর্শনশাস্ত্র সমূহের সম্পূর্ণরূপ আলোচনা এক প্রকার শেষ হইয়াছিল, ইহা বলা বাহুল্য। তবে বলিতে পারা যায় যে, ভারতবর্ষে ৩,৪৫৩ বৎসর পূর্ব্বে যে সকল দর্শনশাস্ত্র রচিত হইয়াছিল, তাহারাই অপ্রতিহত প্রভাবে দেশ বিদেশে আর্য্য-গৌরব ঘোষণা করিতেছে. এবং ন্যায় শাস্ত্রের দুই চারিজন পণ্ডিত ও একমাত্র শ্রীহর্ষ ব্যতীত অতি অল্প সংখ্যক লোকেই দর্শন বিষয়ের নূতন প্রবন্ধ লিখিতে যত্নবান হইয়াছিলেন। ন্যায় শাস্ত্রের পণ্ডিতগণ প্রাচীন মতের অনুসরণ করিয়াছেন। তেজীছেলে শ্রীহর্ষ ষড়দর্শনের মত খণ্ডন করিয়া নিজের নূতন মত সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। শ্রীহর্ষ-প্রণীত দর্শনের নাম খণ্ডন উহা অতি চমৎকার গ্রন্থ. বিবিধ যুক্তিতে পরিপূর্ণ এবং ইহাতে নানাপ্রকার বিচার-কৌশলের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। তৎপ্রণীত নৈষধ চরিতে তাহার আভাষ পাওয়া যায়। "ষষ্ঠঃ খণ্ডনখণ্ডতোঽপি সহজাৎ ক্ষোদক্ষমেতন্মহা, কাব্যেয়ং ব্যগলন্নলস্য চরিতে সর্গোনিসর্গোজ্জ্বলঃ।"

ভট্ট মোক্ষমুলারের মতে খৃঃ পূঃ ৬০০ বৎসর হইতে ২০০ বৎসর পর্য্যন্ত ভারতীয় দার্শনিক সময়ের প্রশস্তি, সুতরাং অনূন ২৫০০ পূর্ব্বে তিনি দর্শনের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, কিন্তু একথা বলিয়াছেন যে, পৃথিবীর সমস্ত জাতির ধর্ম্মপুস্তক অপেক্ষা হিন্দুদিগের বেদ পুরাতন এবং পৃথিবীতে বেদের পূর্ব্বে কোন জাতিরই ধর্ম্মগ্রন্থ স্ফূর্ত্তি পায় নাই।

হৌগ সাহেব বলেন;—খৃঃ পূঃ ২৪০০ বৎসর হইতে ২০০০ বৎসর মধ্যে বেদ রচিত হইয়াছিল এবং খৃঃ পূঃ ১২০০ বৎসর মধ্যে বৈদিক ব্রাহ্মণভাগ প্রচার হইয়াছিল। অন্যান্য ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে প্রায় অনেকেই বেদকে অনূন ৫০০০ বৎসরের অধিককালের গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করেন না। কিন্তু বেদের পূর্ব্বের রচিত আর কোন প্রকার গ্রন্থ পাওয়া যায় না। এবিষয়ে প্রায় অনেক পণ্ডিতেরই ঐকমত্য লক্ষিত হইয়া থাকে।

১২৮২ সালের বঙ্গদর্শন ৩৮৯ পৃষ্ঠায় বলেন। ২১,৬৪,৯৭৬ বৎসর পূর্ব্বে সূর্য্যসিদ্ধান্ত রচিত হইয়াছিল। যদিও তিনি স্পষ্ট বলেন নাই, কিন্তু বেদ ইহার পূর্ব্বের রচিত গ্রন্থ বলিয়া প্রকারান্তরে তাহার একরূপ সম্মতি ব্যতীত অসম্মতি বোধ হয় না।

এদিকে শতশত স্থানে অতি প্রাচীন প্রাচীন ঋষিরা বেদকে নিত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহাদের মতে বেদের নির্ম্মাতা কেহ নাই। বেদ ঈশ্বরের বাক্য বলিয়া সর্ব্বত্র সমানিত হইয়া আসিতেছে, বড় বড় দার্শনিকেরাও বেদকে মানুষের রচিত বলিয়া অনুমান করেন না। ভগবান্ স্বয়ম্ভুর চতুর্ম্মুখ হইতে নিশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় অবলীলাক্রমে চতুর্ব্বেদ নিঃসৃত হইয়াছিল। কেহ বলেন,

প্রলয়ের পর যখন মনুষ্য সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার আদিপুরুষ ব্রহ্মা। নিদ্রোত্থিত ব্যক্তির স্বপ্নবৃত্তান্তের ন্যায় আপনিই হউক, স্বভাবতই হউক. আর ঈশ্বরের অনুগ্রহেই হউক, বেদ তাঁহার স্মৃতিপথে আসিয়াছিল। যাহা হউক. আমাদের মহাশঙ্কট উপস্থিত। এদিকে ধরিতে গেলে ঋষিদিগের মতের উপর অনাস্থা করিয়া ব্রহ্মাদির দেবত্ব না উড়াইলে আর নিজের মত প্রকাশ করিয়া বাচালতার পরিচয় দেওয়া যায় না। যথার্থপক্ষে মনুষ্যের সমাজ, ধর্ম্মানুশীলন, আচার ব্যবহার ও প্রাকৃতিক অবস্থা অনুযায়িক প্রামাণিক যুক্তি অবলম্বন করিয়া বিচার করিতে গেলে আমাদের মতের সহিত অন্যান্য পণ্ডিতগণের মতের অনেক বৈষম্য হইয়া পড়ে।

আমরা বেদ ও দর্শনশাস্ত্রকে সমসাময়িক বলিয়া উল্লেখ করিতেছি। মনুষ্য সৃষ্টির অব্যবহিত পরেই সমান সময়ে বেদ ও দর্শনশাস্ত্র রচনায় সূত্রপাত হইয়াছিল এবং ব্যাসের সময় পর্য্যন্ত এই সুদীর্ঘকাল মধ্যে আলোচ্য শাস্ত্রদ্বয় সম্পূর্ণরূপে পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে। যেমন বেদের অনেক স্থলেই চার্ব্বাক দর্শন প্রণেতা বৃহস্পতির নামোল্লেখ ও নাস্তিকের নিন্দা দেখিতে পাওয়া যায় তেমনি আবার দর্শন শাস্ত্রেও বেদের সম্পূর্ণরূপ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বেদ এক ব্যক্তির বা এক সময়ের রচিত নহে, দর্শনও এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক বা এক সময়ে লিখিত হয় নাই। উক্ত সুদীর্ঘকাল মধ্যে সময়ে সময়ে বৈদিক ঋষিগণ কর্ত্তৃক বৈদিক স্তোত্রনিচয় রচিত হইয়াছিল। লঙ্গনীলপট, চার্ব্বাক ন্যায়, মীমাংসা, বৈশেষিক, সাংখ্য প্রভৃতি দর্শন শাস্ত্র সকল বুদ্ধ, বৃহস্পতি, গৌতম ও কপিল প্রভৃতি দ্বারা ক্রমশঃ লিখিত হইয়াছে, কিন্তু পরস্পরের অগ্রপাশ্চাত্য সম্বন্ধে অতিরিক্ত বাঁধা আছে। দর্শনশাস্ত্রের নিত্য নূতন মত হওয়ায় অতি প্রাচীনকালের গ্রন্থগুলি একবারে লুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছে এবং এক ভাবের রচনা নানাপ্রকার হওয়ায় বেদেরও অনেক অংশ কালকবলে অন্তর্হিত হইয়া রহিয়াছে। যথার্থপক্ষে আজ যে সকল যুক্তিযুক্ত বৈজ্ঞানিক মত আমাদিগের চমৎকারিত্ব জন্মাইয়া দিতেছে, কল্য তাহা ভ্রমাত্মক বা অসম্পূর্ণ বলিয়া একবারে পরিত্যক্ত হইতেছে। যাহা হউক, বেদের অনেক স্থলেই যখন দার্শনিক বা অন্যান্য ঋষিগণের সম্পূর্ণরূপ নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তখন দার্শনিকমত সংস্থাপনের পরে বৈদিক স্তোত্রনিচয়ের সেই সেই অংশ রচিত হইয়াছিল কি না? ইহা পণ্ডিতমাত্রেরই বিচার্য্য। যথার্থপক্ষে বিচার করিতে গেলে বেদের কতক অংশ দর্শনের পরেই রচিত বলিয়া বোধ হয়।

আমরা ঋষিবাক্যের প্রতি অনাস্থা বা নাস্তিকতা অবলম্বন করিয়া একথা বলিতেছি না যে, যাঁহারা বেদকে ঈশ্বরের রচিত বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহাদের

মতে বৃহস্পতি, শুক্রাচার্য্য, মনু, বশিষ্ঠ এবং অন্যান্য বৈদিক ঋষিগণ ঈশ্বরের পূর্ব্বেও বর্ত্তমান ছিলেন। কিন্তু পাঠক যদি পূর্ব্ব সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া অন্ধ-চক্ষে দৃষ্টিপাত করেন, তবে আমাদের এত পরিশ্রম বৃথা, এইরূপ অভিনব মতে বিশ্বাস করিলে কোনপ্রকার ধর্ম্মের বিঘ্ন হইবে, এমন আশঙ্কা যাঁহাদের মনে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে, তাঁহাদের নিকট আমাদের এ বিচার কেবল অরণ্যে রোদনমাত্র। শত শত প্রমাণ দেখাইলেও তাঁহাদের চক্ষু প্রস্ফুটিত হইবে না। তবে এই বিজ্ঞান সভ্যতার সময়ে যাঁহারা সত্যতত্ত্ব-বুভুৎসু, সত্যবিষয়ের আবিষ্কার হইলে যাঁহারা আন্তরিক আহ্লাদিত হন, পক্ষপাত-শূন্য হইয়া যাঁহারা বিচার করিতে ভাল বাসেন, তাঁহাদের জন্যই আমাদের এপ্রকার যত্ন, পরিশ্রম ও আগ্রহ।

৫০০০ বৎসরকেই যাঁহারা বেদের উৎপত্তিকাল বলিয়া অনুমান করেন, প্রকারান্তরে তাঁহাদের ইহাও বলা হইল যে, ৫০০০ বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর কোন জাতিই সভ্য হয় নাই এবং কোন দেশেই কোনপ্রকার গ্রন্থাদিরও প্রচার হয় নাই। তাই বলি, কালনিরূপণ সম্বন্ধে যতক্ষণ আমাদের প্রাচীন মতের অভাব পর্য্যন্তও পাওয়া যাইবে, ততক্ষণ কেন আমরা অন্যের কুহকে ভুলিয়া অতি প্রাচীন কালের আর্য্যগ্রন্থ সকলের ব্যাপ্যত্ব ধ্বংস করিয়া তাহাদের দুই চারি দিনত্ব প্রতিপাদন করিতে যত্নবান হইব? কাল নিরূপণ সম্বন্ধে প্রাচীন আর্য্যগণ মনুষ্যের অবস্থা চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। তাহার এক একটী ভাগের নাম সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি। অথচ কেবল যে বিভাগ করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন তাহা নহে, তাহাদের এক একটী নির্দ্দিষ্ট পরিমাণও করিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে এই চারি যুগের বিবরণ হইতে যতটুকু সত্যের আকর্ষণ সম্ভব, পাঠক তাহাই পাইবেন। যেমন কল্যব্দ লইয়া সর্ব্বত্র গণনা করা যাইতেছে, তেমনি ভূসৃষ্ট্যব্দ সত্যাব্দ প্রভৃতি লইয়া গণনা করিয়া দেখিলেই সমস্ত সন্দেহ দূর হইতে পারে। এখনকার সময়ে ভূসৃষ্ট্যব্দ ১৯৫৫৮৮৪৯৮৩ বৎসর (ক)

ক্রমশঃ

(ক) "ভূসৃষ্টিতস্ততীতাহব্দা দ্বাপরান্তে ভবন্ত্যমী
খচতুষ্ক-গজাষ্টেষু বাণনন্দনিশাকরাঃ
অতঃপরমমীযুক্তা গতকল্যব্দসংখ্যয়া।"

ভূসৃষ্টি অবধি দ্বাপরের শেষ পর্য্যন্ত অব্দগণ ১৯৯৫৮৮০০০০ বৎসরের সহিত কলিযুগের আরম্ভ হইতে বর্ত্তমান শক পর্য্যন্ত অব্দগণ যোগ করিলে ভূসৃষ্টি হইতে অতীতাব্দ হইবে। দ্বাপরের শেষ অব্দগণ ১৯৯৫৮৮০০০০ ইহাতে বর্ত্তমান ১৮০৪ শকের কল্যব্দ ৪৯৮৩ যোগ করিলে ১৯৫৫৮৮৪৯৮৩ বৎসর হইল। ইহাই ভূসৃষ্ট্যব্দ বলিয়া গণিত হইতেছে।

পৌরাণিক তত্ত্ব।

প্রথম অধ্যায়।

রামায়ণ।

এ দেশের লোকের ধারণা এই যে, পূর্ব্বপুরুষগণ যাহা মানিয়া গিয়াছেন এবং যাহা বিশ্বাস করিয়াছেন, জড়ব্যক্তির ন্যায় আপনার বুদ্ধির চালনা না করিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে তাহাতেই বিশ্বাস স্থাপন করা কর্ত্তব্য ; সে বিষয়ে আর উচ্চবাচ্য কখনই করিবে না। ইহা যে কতদূর অজ্ঞতার ও অনভিজ্ঞতার পরিচায়ক, তাহা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রেই বিবেচনা করিতে পারিবেন। আমাদের এ বিষয়ে অভিমত এই যে, আপনার জ্ঞান ও বুদ্ধি আছে, তদ্দ্বারা যাহা সত্য বলিয়া অনুভূত হইবে তাহাতেই বিশ্বাসস্থাপন করা কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যখন আমরা বিজ্ঞান অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তখন পূর্ব্বপুরুষগণ যাহা অনুমোদন করিয়াছেন, সত্য বলিয়া প্রতীয়মান না হইলে সে বিষয় কখনই অনুমোদন করিতে পারি না, তাহা করিলে বিজ্ঞান অনুশীলনের উদ্দেশ্য কখনই সাধিত হয় না। নিরপেক্ষভাব অবলম্বন করিয়া বিবেচনা না করিলে কোন বিষয়ের যাথার্থ্যতা নিরূপিত হয় না কারণ কুসংস্কার বা পূর্ব্বসংস্কার মনোমধ্যে জাগরূক থাকিলে, বুদ্ধিবৃত্তি স্ফূর্ত্তি পায় না, বিবেকশক্তিও হ্রাস হইয়া থাকে। সুতরাং কোন বিষয়ের সূক্ষ্মরূপে অনুসন্ধান করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রেই সে বিষয়ের পূর্ব্বসংস্কার পরিত্যাগ করা অতীব আবশ্যক ; অন্যথা আবশ্যকীয় ফল লভ্য হয় না। পুরাণ-বিষয়ক সত্যতা নিরূপণ করণার্থ এই মুখবন্ধের অবতারণা করা হইল। সর্ব্বাগ্রেই রামায়ণ-বিষয়ক সত্যতা নির্ণয় করা যাইতেছে, অতএব আমরা তাহা নিরপেক্ষভাবে অনুসন্ধান করিব।

রামায়ণ বাল্মীকি-প্রণীত একমাত্র গ্রন্থ। বাল্মীকিরচিত আর কোন গ্রন্থ আছে কি না, তাহার প্রকাশ নাই। এ দেশের অনেক লোকেই বলেন, রামায়ণ-প্রণেতা এক জন মুনি ছিলেন, তিনি তপস্যাবলে রাম জন্মিবার ৬০০০০ বৎসর পূর্ব্বে জ্ঞাত হইয়াছিলেন যে, বিষ্ণু অবতার রাম দশরথের ঔরসে ও কৌশল্যার গর্ভে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া লঙ্কেশ্বর রাবণের সবংশে বিনাশসাধন করিবেন। একথা কতদূর সঙ্গত ও সত্য, তাহা সংস্কৃত রামায়ণ পাঠক মাত্রেই

বিবেচনা করিতে পারিবেন। মূলগ্রন্থের কোন অংশেই রাম জন্মগ্রহণ করিবার ৬০০০০ বৎসর পূর্ব্বে বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করেন, একথা দৃষ্ট হয় না। তবে কি প্রকারে এরূপ বাক্য উদ্ধৃত হইল? অবশ্যই ইহার কোন কারণ আছে। কীর্ত্তিবাস নামক একজন কবি রামায়ণের উপন্যাস ভাগটী লইয়া বাঙ্গালাভাষায় এক রামায়ণ রচনা করেন, তাহাতেই এইরূপ প্রসঙ্গ উত্থিত হইয়াছে। ফলতঃ মূলগ্রন্থে এরূপ প্রস্তাব দৃষ্টিগোচর হয় না। এতদ্দেশে সংস্কৃতভাষানভিজ্ঞ ব্যক্তির অভাব নাই এবং পূর্ব্বপুরুষানুমোদিত বিষয়ে বিশ্বাসী ও অনুমোদনকারী কুসংস্কার ও পূর্ব্ব-সংস্কার-পূর্ণ অন্ধ মূর্খলোকেরও অভাব নাই, সুতরাং তাঁহারা যে কীর্ত্তিবাসের সেই কথায় বিশ্বাস সংস্থাপন করিবেন, তাহাতে বিচিত্র কি? যদি তাঁহাদিগকে কেহ বলেন, কীর্ত্তিবাসের এরূপ লেখা স্বকপোল-কল্পিত, মূলগ্রন্থে এরূপ লেখা নাই, তাঁহাকে তাঁহারা উপহাস করিয়া থাকেন এবং বলেন, "যাহা পূর্ব্ব পুরুষগণ মানিয়াছেন, তাহা তুমি মান না, তুমি কি তাহাদের অপেক্ষা পণ্ডিত হইয়াছ?" এবং অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের সমীপে কীর্ত্তিবাসের এরূপ লেখা ভ্রমমূলক একথা বলিলে তাহারা অনায়াসে ও অবলীলাক্রমে বলিয়া থাকেন, "বাবু তুপাত ইংরাজি পড়ে একেবারে ঠাকুর দেবতা মানেন না; যাহা বাপ পিতামহ মানিয়া আসিল, তাহাও মানেন না।" সে যাহা হউক, আমরা বলিতে বলিতে নিয়মিত পথের অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। এক্ষণে ফলকথা এই যে, কীর্ত্তিবাসের এই কথা যে কতদূর সঙ্গত, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন।

বাল্মীকি কোন্ সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য; এ বিষয়ে অনেকের অনেক প্রকার মত দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু আমাদের বিবেচনায়, বাল্মীকির জন্মলগ্ন এপর্য্যন্ত কেহই স্থির করিতে সমর্থ হন নাই; এবং স্থির না হইবারও বিশেষ প্রতিবন্ধক লক্ষিত হইয়া থাকে। হিন্দুদিগের ইতিহাস নাই, সুতরাং কোন্ সময়ে কোন্ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কোন্ সময়েই বা তিনি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইত্যাদি বিষয় নিরূপিত হইতে পারে না। সুতরাং এ বিষয়ে নিরস্ত থাকাই একান্ত উচিত ছিল, কিন্তু এবিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত দেখিয়া কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে। আমরা যে তাঁহার জন্মলগ্ন স্থির করিব, এরূপ স্পর্দ্ধা করি না। সংস্কৃত ভাষায় ইতিহাস নাই, তবে কোন কোন কাব্যমধ্যে ইহার কথামাত্র লক্ষিত হইয়া থাকে, কিন্তু সেই ঐতিহাসিক কথা কাব্যের কাল্পনিক এবং অলঙ্কার বর্ণনার সহিত এতদূর মিশ্রিত যে তাহা হইতে যথার্থ ঘটনা নির্বাচন করা দুরূহ। কিন্তু লেখার তারতম্য অনুসারে কোন্ কাব্য কাহার অগ্রে রচিত হইয়াছে, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। এই উপায় [illegible]

কৌশল-দ্বারা বাল্মীকি কোন্‌কালে পৃথিবীতে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয় আলোচন করা যাইতেছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বাল্মীকি কোন্ কালে ভূতলে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন মত দেখিতে পাওয়া যায়। এক্ষণে সেই সকল মত ক্রমে বিবৃত করা যাইতেছে। হুইলার (Wheeler) সাহেব বলেন যে বাল্মীকি খৃষ্টাব্দের ৮০০ বৎসর পরে রামায়ণ প্রকটন করেন। ইনি যে এবিষয়ে বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, তদ্বিষয়ে অনুমাত্রও সংশয় নাই। প্রথমতঃ তিনি বলেন, রামায়ণ মহাভারতের পরে প্রকটিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা হইলে মহাভারতের অন্তর্গত বনপর্ব্বে রামায়ণপর্ব্ব বলিয়া কোন পর্ব্বের উল্লেখ কথনই হইত না। এবং পুস্তকদ্বয় পাঠ করিলে রামায়ণোল্লিখিত ব্যক্তি, বীর বা বংশের পুত্র পৌত্রাদি অবরোহ প্রণালীক্রমে মহাভারতে কথনই উল্লিখিত হইত না। দ্বিতীয়তঃ রামায়ণের ভাষা পাঠে বিলক্ষণ উপলব্ধি হইবে যে উহা সমাজের আদিম অবস্থার কাব্য, মহাভারতের ভাষা তদপেক্ষা বহুদূর উন্নতিশালী। সুতরাং রামায়ণ কাব্য যে মহাভারত অপেক্ষা প্রাচীন, ইহা স্পষ্টই উপলব্ধি হইতেছে। পাঠ করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে কবিতাসৃষ্টির প্রাক্কালেই উহা রচিত হইয়াছে; এবং বাল্মীকিকে সকলেই আদি কবি বলিয়া থাকেন। সুতরাং হুইলার (wheeler) সাহেবের এই অনুমান যে ভ্রমমূলক, তাহাতে আর সংশয় কি?

বুকনান (Buchnan) সাহেব বলেন, খৃষ্টাব্দের ১৫০০ বৎসর পূর্ব্বে বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করেন। ইনিও বাল্মীকির সময় ঠিক নিরূপণ করিয়াছেন তদ্বিষয়ের নিশ্চয়তা কি? তিনি খৃষ্টিয়ান হইয়া কিরূপে তাঁহার ধর্ম্মপুস্তক বাইবেলকে মিথ্যা করেন; কারণ খৃষ্টাব্দের ৪০০৪ বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছিল, সুতরাং তাঁহাকে সেই পক্ষ সমর্থন করিয়া বাল্মীকির সময় নিরূপণ করিতে হইয়াছিল। সুতরাং তাহাতে তাঁহার অপরাধ নাই।

সার উইলিয়ম জোনসাহেব (Sir William Jones) অনুমান করেন রামচন্দ্র খৃষ্টাব্দের ২০২৯ বৎসর পূর্ব্বে ভূতলে বর্ত্তমান ছিলেন, সুতরাং প্রচলিত কিম্বদন্তী অনুসারে বাল্মীকি তৎসাময়িক লোক বলিয়া, তিনি ও ঐ সময়ে ভূতলে উপস্থিত ছিলেন। জোনস্ সাহেব কি প্রকারে এই অসঙ্গত অনুমান করেন, তাহা নির্দ্দেশ করা আমাদিগের সাধ্যায়ত্ত নহে।

বেণ্টলী (Bentley) বলেন, খৃষ্টাব্দের ৯৫০ বৎসর পূর্ব্বে এবং কর্ণেল টড (Col. Todd) বলেন, খৃষ্টাব্দের ১১০ বৎসর পূর্ব্বে রামচন্দ্র রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহাদের মতের যাথার্থ্যতার প্রমাণ কি?

মেজর ফর্বস (Major Forbes) বলেন *, শ্রীলঙ্কাপুরের অধীশ্বর রাবন খৃষ্টাব্দের ২৩৮৭ বৎষর পূর্ব্বে রাম কর্ত্তৃক যুদ্ধে নিহত হন। কারণ সিংহলের ইতিহাস রাজাবলীতে লিখিত আছে, বৌদ্ধাব্দের ১৮৪৪ বৎসর পূর্ব্বে রাবণের মৃত্যু হয়। কিন্তু খৃষ্টাব্দের ৫৪৩ বৎসর পূর্ব্বে বৌদ্ধাব্দ প্রচলিত হয়। সুতরাং খৃষ্টাব্দের (১৮৪৪+৫৪৩) অর্থাৎ ২৩৮৭ বৎসর পূর্ব্বে রাবনের মৃত্যু হইয়াছিল। কিন্তু বাল্মীকি তৎসাময়িক লোক। সুতরাং তিনি ও সেই সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। আমরা ফর্ব্বস সাহেবের মতের পোষকতা করিতে পারি না।

কেহ কেহ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ত্রয়োদশ শতাব্দিকে বাল্মীকির সময় বলিয়া নিরূপণ করেন। তাঁহারা রামচন্দ্র ও সুমিত্রের মধ্যবর্ত্তী ৫০ জন নৃপতির রাজত্বকাল গড়ে ২৪ বৎসর পরিগণিত করিয়া এই সময় নিরাকরণ করিয়াছেন। ইহাও যে আনুমানিক তাহা বলা বাহুল্য।

এক্ষণে এবিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত দেখিতে পাওয়া যায়। কাহার মত কতদূর সঙ্গত তাহাও নির্ণয় করা সহজ ব্যাপার নহে। যাহাই হউক এবিষয়ের স্থিরসিদ্ধান্ত করা একান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহা বলিয়া সূক্ষ্মরূপে অব্দ, মাস ও তারিখ নির্ণয় করা কোন প্রকারেই সম্ভব নহে।

অবশেষে এবিষয়ে আমাদিগের বক্তব্য এই যে ঋক্ আদি চতুর্ব্বেদ প্রকাশিত হইবার কিছু কাল পরে এবং মহাভারত প্রকটিত হইবার ন্যূনাধিক ১৭৫ বৎসর পূর্ব্বে রামায়ণ রচিত হইয়াছিল। † মহাভারত কোন সময়ে প্রকটিত হইয়াছিল যদ্যপি নির্ণীত হয়, তাহা হইলে রামায়ণ কোন সময়ে প্রকটিত হইয়াছিল, ইহাও নির্ণয় করা যাইতে পারে এবং মহাভারতে উল্লিখিত রাজন্যবৃন্দের ও বীরগণের পূর্ব্বপুরুষদের কীর্ত্তিকলাপ ও কার্য্য রামায়ণে দৃষ্ট হয় এবং রামায়ণে বর্ণিত বীরগণের পুত্র পৌত্রাদি অবরোহপ্রণালীক্রমে মহাভারতে দৃষ্ট হয় বলিয়া উক্ত অনুমান বোধ

* See Eleven years in Ceylon by Major Forbes, 78th Highlanders London 1840.

† হরিবংশে লিখিত আছে, রামচন্দ্রের কণিষ্ঠ ভ্রাতা শত্রুঘ্ন লবণাসুরকে বধ করিয়া মধুরানগরী স্থাপন করেন এবং অন্ধককে সেই রাজ্য প্রদান করেন। এক্ষণে পাণ্ডবগণ অবরোহপ্রণালীক্রমে সেই বংশের সপ্তম পুরুষ, এবং যদ্যপি গড়ে ২৫ বৎসর করিয়া প্রত্যেকের রাজত্বকাল গণনা করা যায়, তাহা হইলে রামচন্দ্র ও পাণ্ডবগণের মধ্যে ১৭৫ বৎসর ব্যবধান হইবে।

হয় নিতান্ত অসঙ্গত না হইতে পারে। * বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে মগধরাজ নন্দ সিংহাসনে আরোহণ করিবার ১০১৫ বৎসর পূর্ব্বে অর্জ্জুনের পৌত্র পরীক্ষিতের জন্ম হয় এবং নন্দের রাজত্বের ১০০ বৎসর পরে চন্দ্রগুপ্ত মগধরাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত খৃষ্টাব্দের ৩১৫ বৎসর পূর্ব্বে রাজা হন। সুতরাং পরীক্ষিত খৃষ্টাব্দের ১৪৩০ বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাতে মহাভারতের সময় স্থূলরূপে নির্ণয় করা যাইতে পারে। সুতরাং এই গণনা অনুসারে রামায়ণ খৃষ্টাব্দের ১৬০৫ বৎসর পূর্ব্বে প্রকটিত হইয়াছিল বলা যাইতে পারে।

কথিত আছে, বাল্মীকি প্রথমে চিত্রকূট পর্ব্বতে বাস করিতেন। ইহা বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত বান্দা জেলার একটী রমণীয় স্থান। ইহা যমুনার দক্ষিণ তট হইতে বড় অধিক দূর নহে। এ স্থলে বৈষ্ণবদিগের অনেকগুলি মন্দির আছে এবং ইহা উঁহাদের একটী তীর্থ বলিয়া সময়ে সময়ে বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের অনেকলোক এস্থলে উপস্থিত হইয়া থাকেন। কিন্তু বাল্মীকি শেষাবস্থায় গঙ্গোপকূলবর্ত্তী বিঠুর নামক স্থানে আসিয়া বাস করেন। এবিষয়ে আমাদের কিছুই বক্তব্য নাই।

বাল্মীকি প্রচেতা অর্থাৎ বরুণের পুত্র, সেই জন্য তাঁহার অপর একটি নাম প্রচেতা। ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে আমরা অক্ষম। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, আপনাকে উচ্চ করিবার আশয়ে দেবজাত বলিয়া আপনার পরিচয় দেওয়া নিতান্ত অসম্ভব নহে।

অধ্যাত্মরামায়ণ-পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, বাল্মীকি যৌবনকালে একজন দস্যু ও অত্যন্ত কুকর্ম্মপরতন্ত্র ছিলেন; সর্ব্বদাই পশু পক্ষী হনন করিয়া এবং চৌর্য্য-বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক বেড়াইতেন। একদিবস সপ্তর্ষিগণকে আক্রমণ করাতে তাঁহারা তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া পাপ-কার্য্য হইতে নিরস্ত করেন এবং 'রাম' নাম উচ্চারণ করিতে শিক্ষা প্রদান করেন। কিন্তু বাল্মীকি রাম উচ্চারণ করিতে অসমর্থ হইয়া "মরা" "মরা" বলিতে লাগিলেন। বহুকাল পরে ঋষিরা সেইস্থলে আগমন করিয়া দেখেন যে, বল্মীকের মধ্যে বাল্মীকি অবস্থান করিতেছেন এবং তখন তাঁহার দিব্যজ্ঞান লাভ হইয়াছে। তজ্জন্যই তাঁহার নাম বাল্মীকি হইয়াছে। একথা কতদূর সঙ্গত, তাহা পাঠকমাত্রেই বিবেচনা করিতে পারেন। বাল্মীকি এই নামটি

---

* বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থাংশের চতুর্থ অধ্যায়ে লিখিত আছে, অর্জ্জুনপুত্র অভিমন্যু কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে রাজা বৃহদ্বলকে বিনাশ করেন। এই বৃহদ্বল রামচন্দ্রের পুত্র কুশের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। হরিবংশের ১৫ অধ্যায়ে ও বৃহদ্বল কুশের বংশজাত বলিয়া উল্লিখিত আছে।

কি প্রকারে ও কেন হইল, তাহারই কারণ নির্দ্দেশ করিবার জন্য এই অদ্ভুত উপন্যাসের যে সৃষ্টি হইয়াছে, তদ্বিষয়ে বিস্তারিত বলিবার আবশ্যকতা নাই।

সকলেই বাল্মীকিকে আদিকবি বলিয়া থাকেন। একথা যথার্থ বলিয়া বিশ্বাস করা যাইতে পারে। কথিত আছে, একদিন বাল্মীকি তমসা * নদীতে স্নানার্থ গমন করিয়া দেখিলেন এক ব্যাধ কামমোহিত ক্রৌঞ্চ-মিথুনের একটীকে বধ করিল। অমনি ক্রোধভরে তাঁহার কণ্ঠ হইতে অনুষ্টুপছন্দে এক কবিতা নির্গত হইল। † এই কবিতা হইতেই অনুষ্টুপ্‌ছন্দের সৃষ্টি হইল বিশ্বাস করা যাইতে পারে। বেদ রামায়ণের পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে ছন্দবিশিষ্ট কোন কবিতা দৃষ্টিগোচর হয় না; সুতরাং বাল্মীকিকে আদিকবি বলা বোধ হয় অসঙ্গত নহে।

রামায়ণে লিখিত আছে যে, উপর্য্যুক্ত কবিতা বাল্মীকি-মুখ হইতে নির্গত হইবামাত্রই ব্রহ্মা ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন এবং বাল্মীকিকে রামায়ণ প্রকটন করিতে আদেশ করিলেন। বাল্মীকিও ব্রহ্মার আদেশানুসারে রামায়ণ রচনা করিলেন। ব্রহ্মার আদেশে লিখিত হইয়াছে বলিলে, বাল্মীকি দৈবিশক্তিধারী প্রমাণ হইবে, এই জন্য এই উপন্যাসের সৃষ্টি হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবি লা আঁ।

সূর্য্য।

যখন পূর্ব্বদিগ্বিভাগ নানারাগে রঞ্জিত করিয়া ও সুষুপ্তি-নিমগ্ন জগতে চেতন সঞ্চার করিয়া ভগবান্‌ মরীচিমালী উদিত হয়েন, তখন কাহার না নয়ন মন আনন্দে প্রফুল্ল হইতে থাকে? সমুদয় জীবজন্তু অন্ধকারপাশ হইতে মুক্ত হইয়া

---

* এই নদীকে ইংরাজীতে একণে টনসি (Tonse) বলে। ইহা বুন্দেলখণ্ডের মধ্যে প্রবাহিত হইয়া রেওয়ার মধ্য দিয়া গঙ্গায় পতিত হইয়াছে।

† "মা নিষাদ প্রতিষ্ঠা ত্বমগম শাশ্বতী সমা।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতং॥

আহ্লাদেই যেন তাঁহার অভিনন্দন করিতে থাকে! আবার যখন তিনি ধরাতলকে অন্ধকার-মধ্যে নিক্ষিপ্ত করিয়া পশ্চিম-গগনে বিলীন হয়েন, তখন পৃথ্বী যেন সূর্য্যবিরহেই নীরব ও নিশ্চল হইয়া থাকে। বাস্তবিক জগদীশ্বর সূর্য্যের সৃষ্টি না করিলে আমাদের কি শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইত, তাহা বলিতে পারি না। সূর্য্য না থাকিলে আমরা কিছুই দেখিতে পাইতাম না; প্রিয়জনসমূহের সুন্দর আনন, শস্যপূর্ণ শ্যামল ক্ষেত্র, নদী-নির্ঝর-সকুল সুদৃশ্য ভূধর, নয়ন-মোহিনী কৌমুদী নিশা কিছুই আমাদের চিত্তবিনোদ করিত না; আমরা কমনীয় ফুলফল-শোভিত উদ্যানরাজি উপভোগ করিতে পাইতাম না; আমরা নিয়ত যে সকল উপাদেয় খাদ্যাদি উপভোগ করিতেছি, সংসারে তাহার কিছুই উৎপন্ন হইত না; আমাদিগকে চিরতমসাচ্ছন্ন এক বিভিন্নরূপ পৃথিবীতে বাস করিয়া অতিকষ্টে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইত। প্রাচীন আর্য্য ঋষিরা সূর্য্যের এই সকল উপকারিত্ব দেখিয়াই ইহাঁকে দেববোধে বেদগানে ইহাঁর স্তুতিগান করিয়াছেন। এতাদৃশ প্রভূত সুখাদির নিদানভূত সূর্য্যের সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিলে বোধ হয় পাঠকবর্গের উপেক্ষনীয় হইবে না।

সূর্য্য যখন আপনার পূর্ণ প্রভায় কিরণ প্রদান করিতে থাকেন, তখন অনাবৃত চক্ষুতে উহার দিকে দৃষ্টিপাত করা কঠিন; কিন্তু গাঢ় রঞ্জিত এক খণ্ড কাচের মধ্য দিয়া দেখিলে উহাকে উজ্জ্বল থালার ন্যায় দেখায়। বৎসরের সকল সময়ে ঐ থালার আয়তন ঠিক সমান থাকে না। পৃথিবীর কক্ষ সম্পূর্ণ গোলাকার না হওয়ায় পৃথিবী সূর্য্য হইতে সকল সময়ে সমদূরে অবস্থান করে না। এই দূরের বিভিন্নতা অনুসারে সূর্য্যের আয়তন কমবেশী বলিয়া বোধ হয়। সকলেই অবগত আছেন, দূরের বিভিন্নতা অনুসারে বস্তু সকলের আয়তনও বিভিন্ন বলিয়া বোধ হয়। এমন কি, একটী পয়সাকেও বাহু-পরিমিত দূরের মধ্যে সম্পূর্ণ সূর্য্য অপেক্ষা বৃহত্তর দেখায়! সূর্য্যকে থালার ন্যায় ছোট দেখাইলেও বাস্তবিক উহা পৃথিবী অপেক্ষা অনেকগুণে বড়। উহা আমাদের নিকট হইতে বহুদূরে অবস্থিত বলিয়াই উহাকে এরূপ ক্ষুদ্র বলিয়া বোধ হয়। জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতেরা গণনা করিয়াছেন যে, উহা পৃথিবী হইতে প্রায় নয়কোটী দশলক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত; ও সূর্য্যের ব্যাস পৃথিবীর ব্যাসের ১০৭ গুণেরও অধিক; যদি পৃথিবীর ঘনফলের সহিত সূর্য্যের ঘনফলের তুলনা করা যায়, তাহা হইলে দৃষ্ট হইবে যে, যদি সার্দ্ধ দ্বাদশলক্ষ পৃথিবীর একত্র সমাবেশ করিয়া একটী বর্ত্তুল উৎপাদন করা যায়, তাহা হইলে সূর্য্যের ঘন পরিমাণ উহা অপেক্ষাও কিয়ৎ পরিমাণে অধিক হইবে। বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্ জন হার্শেল সূর্য্যের দূরত্ব সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, যে গোলা প্রতি সেকেণ্ডে ১২০০

ফুট বেগে গমন করে, তাহা ঐ বেগে সমভাবে গমন করিলে ত্রয়োদশ বৎসরের ন্যূনে সূর্য্যমণ্ডলে পঁহুছিতে পারিবে না।

দূরবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কারের পর সূর্য্যমণ্ডলসম্বন্ধে অনেক বিষয় অবগত হওয়া গিয়াছে। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে দৃষ্ট হইয়াছিল যে, সূর্য্যমণ্ডল সর্ব্বাংশে সমান উজ্জ্বল নহে; উহাতে সচরাচর অনেক কৃষ্ণবর্ণ দাগ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল দাগের আকৃতি একরূপ নহে ও তাহারা সর্ব্বদা একস্থানে অবস্থান করে না। কখন কখন এরূপ দাগ একেবারেই দেখিতে পাওয়া যায় না ও সূর্য্যমণ্ডল সম্পূর্ণ নিরঙ্ক বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু এরূপ ঘটনা কদাচ ঘটিয়া থাকে। যদি প্রতিদিন ঐ দাগ সকল পর্য্যবেক্ষণ করা যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে তাহারা সকলেই অতি মৃদুবেগে মণ্ডলের পূর্ব্বপ্রান্ত হইতে পশ্চিম পার্শ্বে গমন করে এবং প্রায় চৌদ্দ-দিবসে পরিক্রমণ শেষ করে। একপক্ষ পরে দৃষ্ট হয় যে ঐ দাগ সকলের কোন কোনটী অদৃশ্য থাকিয়া পুনর্ব্বার কিয়ৎপরিমাণে আকৃতি পরিবর্ত্তন করিয়া সূর্য্য-মণ্ডলের পূর্ব্ব প্রান্তে উদিত হয়। ঐ দাগ সকলের নিয়মিত গতি দেখিয়া পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে সূর্য্য পৃথিবীর ন্যায় আপন মেরুদণ্ডে ঘুরিতেছে। আমাদের ২৬ ছাব্বিশ দিবসে সূর্য্য আপন মেরুদণ্ডে একবার ঘুরে। ঐ দাগ সকলের আকৃতি পরিবর্ত্তন দৃষ্টে ইহা সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, সূর্য্য বর্ত্তুলাকার। যখন একটী খর্ব্ব দাগ ঐ বর্ত্তুলের প্রান্তভাগে উপস্থিত হয়, তখন তাহার সম্মুখভাগ হ্রাস হইয়া আইসে এবং উহাকে মণ্ডলের মধ্যভাগে যেরূপ দেখা গিয়াছিল, তাহা হইতে বিভিন্ন আকৃতিবিশিষ্ট বলিয়া বোধ হয়। সূর্য্যমণ্ডলস্থ দাগ-সকল সর্ব্বদা সমভাবে কৃষ্ণবর্ণ থাকে না। কেহ কেহ বলেন যে ঐ সকল দাগ বৃহৎ বৃহৎ গুহা ব্যতীত আর কিছুই নহে; এবং ঐ সকল গহ্বরের গভীরতার তারতম্যানুসারে তাহাদের বর্ণের ঘোরত্বেরও তারতম্য হয়। কোন কোন দাগ এত বৃহৎ যে, উহা সূর্য্যমণ্ডলের উপরিভাগে বহুলক্ষ মাইল বিস্তৃত হইয়া আছে।

ভূতলবিহারী কোন ব্যক্তি যে বহুলক্ষ-যোজনদূরস্থ সূর্য্যের রাসায়নিক প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছুমাত্র অবগত হইতে পারিবে, ইহা অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু বিগত বিংশতি বৎসরের মধ্যে পণ্ডিতেরা এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন; তদ্দ্বারা সূর্য্যের রাসায়নিক প্রকৃতি ও উপাদান সম্বন্ধে অনেক বিষয় পরিজ্ঞাত হওয়া গিয়াছে। আমরা এই প্রণালী সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিব।

যদি একটী সূর্য্যরশ্মিকে প্রাচীরস্থ এক ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়া এক অন্ধকারময় গৃহে প্রবেশ করিতে দেওয়া যায়, এবং তাহার পর তাহাকে একটী ত্রিকল কাচখণ্ডের মধ্য দিয়া যাইতে দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাহার গতির দিক্ পরিবর্ত্তন হইয়া

যায় ও উহা একটী শ্বেত আলোক-বিন্দুর ন্যায় পতিত না হইয়া একটী বিস্তৃত রশ্মিমেখলায় (spectrum) পরিণত হয় এবং ঐ মেখলায় রামধনুর সমুদয় বর্ণগুলি দৃষ্ট হয়। নিম্নবর্ত্তী চিত্রে এইরূপ একটী রশ্মির গতি প্রদর্শিত হইল।
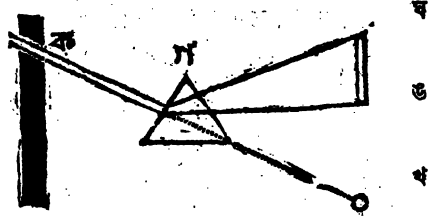
ক প্রাচীরস্থ ছিদ্র, ইহার মধ্য দিয়া রশ্মি প্রবেশ করিয়াছে, গ ত্রিফল কাচ খণ্ড ; খ নামক স্থানে শ্বেত আলোক স্বরূপ না পড়িয়া রশ্মি আপন আদীম পথ পরিত্যাগ করিয়াছে এবং ঘ ঙ রূপ বহুবর্ণবিশিষ্ট মেখলারূপে পরিণত হইয়াছে। ইহার এক প্রান্তে লোহিতবর্ণ ও অপরপ্রান্তে বায়লেট (violet.)

এই প্রকারে সূর্য্যরশ্মির স্পেকট্রম (spectrum) উৎপাদন করিয়া মনোযোগ-পূর্ব্বক দেখিলে প্রতীয়মান হইবে, যে উপরিভাগ দিয়া কতকগুলি অতি সুক্ষ্ম ঘোর রেখা চলিয়া গিয়াছে। কোন অগ্নিশিখা বা বৈদ্যুতিক আলোক হইতে যে রশ্মিমেখলার (spectrum) প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে সূর্য্যরশ্মিমেখলার ন্যায় ঘোর রেখা থাকে না। কিন্তু যদি উদজন (Hydrogen) বা অন্য কোন বাষ্প কৃত্রিম আলোর গতিপথে দগ্ধ করা যায়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ ঐ স্পেকট্রমে রেখা সকল উৎপাদিত হয়। এই প্রকারসম্ভূত রেখানিচয়ের স্পেকট্রমমধ্যে নির্দ্ধারিত অবস্থিতি স্থান আছে। সদৃশ রাসায়নিক পদার্থ সদৃশ অবস্থায় সদৃশ রেখা উৎপাদন করিয়া থাকে। এতদ্দারা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে সৌর স্পেকট্রম মধ্যে এই সকল রেখার অবস্থিতি মনোযোগ পূর্ব্বক দেখিয়া ও তাহাদিগকে পার্থিব পদার্থের দাহন-সম্ভূত রেখা-সমূহের সহিত তুলনা করিয়া সূর্য্যস্থিত পদার্থ সমূহের নির্ণয় করা যাইতে পারে। এই প্রকারে রশ্মি বিশ্লেষণদ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, সূর্য্যমণ্ডলে উদজন, সোডিয়ম, লিথিয়ম, কেলসিয়ম, বেরিয়ম, ম্যাগনিসিয়ম, দস্তা, লৌহ, মেঙ্গেনিজ, নিকেল, কোবাল্ট, ক্রোমিয়ম, ও তাম্র প্রভৃতি বহুসংখ্যক ভৌতিক পদার্থ আছে।

কিন্তু সূর্য্যস্থ পদার্থসমূহ পৃথিবীস্থ পদার্থ সমূহ হইতে বিভিন্ন অবস্থায় অবস্থান করে। আমরা যে সকল ধাতুর অতি অল্প পরিমাণমাত্র বিশেষ কৌশলদ্বারা অতি কষ্টে দ্রবীভূত করিতে পারি, ঐ সকল ধাতু সূর্য্যমণ্ডলে প্রদীপ্ত বাষ্পরূপে অবস্থিতি করে। আবার যে সকল পদার্থ পৃথিবীতে চিরবাষ্পরূপে বিদ্যমান আছে, হয় ত

তাহারা সূর্য্যমণ্ডলের কোন কোন অংশে তরল বা কঠিন পদার্থরূপে অবস্থিতি করে। *

সূর্য্যমণ্ডলের উপরিভাগ হইতে প্রভূত পরিমাণে আলোক ও উত্তাপ চতুর্দ্দিকে অনবরতই শূন্যমার্গে বিকীর্ণ হইতেছে। সূর্য্যের সহিত তুলনায় পৃথিবী অতি ক্ষুদ্রকায় বলিয়া ও সূর্য্য হইতে ইহা বহুদূরে অবস্থিত বলিয়া পৃথিবী সূর্য্যমণ্ডল-বিকীর্ণ আলোকোত্তাপের অতি অল্প পরিমাণমাত্র প্রাপ্ত হয়। বস্তুতঃ গণনাদ্বারা স্থির করা হইয়াছে যে, পৃথিবী সূর্য্যের আলোকোত্তাপের $\frac{১}{২০০০,০০০,০০০}$ অংশেরও কম পাইয়া থাকে।

সূর্য্য ইহার চতুর্দ্দিকে ঘূর্ণায়মান গ্রহ ও উপগ্রহ সকলকে কেবলমাত্র আলোক ও উত্তাপ প্রদান করিতেছে এমন নহে। ইহা তাহাদিগকে তাপনাশক কক্ষ মধ্যে ধরিয়া রাখিয়াছে। এই জগতের যাবতীয় পদার্থই মাধ্যাকর্ষণ শক্তির অধীন। সকল বস্তুই পরস্পরকে আকর্ষণ করিতেছে। যে বস্তু যত বৃহৎ, তাহার আকর্ষণ-শক্তিও তত অধিক। সূর্য্য অন্যান্য গ্রহ সকলের অপেক্ষা অসংখ্যগুণে বৃহৎ। ইহা সৌরজগতের কেন্দ্রস্থানে থাকিয়া ইহার চতুর্দ্দিকে ঘূর্ণায়মান গ্রহ উপগ্রহ সকলকে আকর্ষণ করিতেছে ও তাহারাও সূর্য্যকে আকর্ষণ করিতেছে। এই মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বলেই তাহারা স্ব স্ব নিরূপিত কক্ষে রক্ষিত হইয়াছে। যদি একগাছি রজ্জুর প্রান্তে একটী ইষ্টক খণ্ড বাঁধিয়া উহাকে সজোরে ঘুরাণ যায়, ও এই প্রকারে ঘুরাইতে ঘুরাইতে যদি সহসা রজ্জুগাছটী কাটিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে ঐ কন্দুকটী বৃত্তাকারে না ঘুরিয়া সহসা সরলভাবে চলিতে থাকিবে ও অবশেষে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তিদ্বারা ভূতলে পতিত হইবে। পৃথিবী ও সূর্য্যের পরস্পরের আকর্ষণকে এই রজ্জুর সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। যদি কোন কারণে পৃথিবীর ও সূর্য্যের মধ্যস্থ এই আকর্ষ-ণরজ্জু ছিন্ন হইয়া যায়, তাহা হইলে পৃথিবীও শূন্যমার্গে সরলভাবে প্রবলবেগে চলিতে থাকিবে। অতএব পৃথিবী যে প্রায় বৃত্তাকৃতি কক্ষে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে, এই মাধ্যাকর্ষণ শক্তিই তাহার কারণ।

এক্ষণে আমরা আমাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহার্থ সূর্য্য হইতে যে সকল উপকার প্রাপ্ত হইয়া থাকি, তাহার দুই একটী কথা বলিয়া এই প্রস্তাবের উপসংহার করিব। আমরা যে বৃষ্টির জল প্রাপ্ত হইয়া থাকি, তাহা বায়ুস্থিত জলীয় বাষ্পের ঘনীভাব ব্যতীত আর কিছুই নহে। কিন্তু ঐ বাষ্প সূর্য্যের উত্তাপদ্বারাই বায়ুমণ্ডলে উত্তো-

* R. A. Proctors' The Physical condition of the Sun.

লিত হয়। আমাদিগের বাণিজ্যাদির প্রধানসাধন নদীসমূহ সাক্ষাৎ বা অসাক্ষাৎ সম্বন্ধে বৃষ্টির জলদ্বারা পরিপোষিত হয়। অতএব সূর্য্যই যে আমাদিগের নদী সকলের নিদানভূত, তদ্বিষয়ে অল্পমাত্র সন্দেহ নাই। আবার বায়ুরাশি স্থির ও প্রবাহশূন্য হইলে বৃষ্টি সকলস্থানে ব্যাপ্ত হইতে পারিত না। কিন্তু সূর্য্যের উত্তাপই বায়ুরাশির সাম্যাবস্থার অন্যথা করিয়া বায়ুপ্রবাহ উৎপাদন করে। সূর্য্য না থাকিলে বায়ুপ্রবাহের সৃষ্টি হইত না; সুতরাং বৃষ্টিও সকল স্থানে ব্যাপ্ত হইত না। আবার মহাসমুদ্রে যে সকল স্রোত আছে, সূর্য্যই সেই সকলের আদিকারণ।

এক্ষণে পৃথিবীর জীবজন্তুগণ যে অবস্থায় জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে, সূর্য্য না থাকিলে এইরূপ জীবনের বিকাশ অসম্ভব হইত ও এই পৃথিবীকে জীবশূন্য হইয়া থাকিতে হইত। সূর্য্যের উত্তাপ না থাকিলে পৃথিবী শীতল হইত সুতরাং আমরা জীবন ধারণ করিতে পারিতাম না। সূর্য্য না থাকিলে একটীমাত্রও হরিদ্বর্ণ বৃক্ষ জীবিত থাকিতে পারিত না। কারণ সূর্য্য কিরণের সাহায্যেই তাহারা বায়ুস্থিত দ্ব্যঙ্গারক বাষ্পকে বিশ্লিষ্ট করিয়া উহা হইতে অঙ্গারক গ্রহণ পূর্ব্বক আপনাদের দেহসংগঠন করিয়া থাকে।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে সূর্য্য ঈশ্বর কৃপার প্রদীপ্ত উদাহরণ। সূর্য্যসম্বন্ধে এই সকল বিষয় আলোচনা করিয়া দেখিলে কাহার হৃদয় না ঈশ্বর-প্রেমে মগ্ন হইয়া পড়ে? কে তাঁহার অপার মহিমায় মুগ্ধ না হইয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে?

শ্রীরসময় মিত্র।

যন্ত্র-বিজ্ঞান।

যে উপায় দ্বারা এক স্থানে প্রযুক্ত বল অন্যস্থানে ভিন্ন প্রকারে কার্য্য করে তাহাকেই যন্ত্র বলে। সুতরাং ঢেঁকি, ঘানিগাছ, লাঙ্গল, নৌকারডাঁড়, জাঁতা ইত্যাদি এক একটী যন্ত্র। যখন ঢেঁকির দ্বারা ধান্যাদি হইতে তাহাদের খোসার সংযোগ নষ্ট করিতে হয়, তখন উহার একপ্রান্তে বল প্রযুক্ত হইয়া থাকে; কিন্তু ঐ বল অপরপ্রান্তে ভিন্ন প্রকারে কার্য্য করে, অর্থাৎ পৃষ্ঠদেশে প্রযুক্ত বলদ্বারাই সম্মুখস্থ মুখদ্বারা ধান্যাদির আবরণ বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে। ঘানিগাছের গরু অবিরত মণ্ডলাকারে পরিভ্রমণ করাতে, উহার বল ঘানিগাছের উপরিভাগে পতিত হয়, কিন্তু বল উপরিভাগে প্রযুক্ত হইলেও ঘানিগাছের অভ্যন্তরস্থ শর্ষপাদি মর্দ্দিত হয় ও তদ্দারা তৈল নিঃসৃত হইয়া থাকে। লাঙ্গলের ফাল সরল রেখায় চলিয়া যায় এবং কৃষক লাঙ্গলের

মুখটি মৃত্তিকার বলপূর্ব্বক প্রোথিত করাতে মৃত্তিকা দুই পার্শে বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে। এস্থলেও মনুষ্যের বল লাঙ্গলের উপরিভাগে প্রযুক্ত হয়; কিন্তু তদ্দারা মৃত্তিকা কাটিয়া যায়। এই প্রকারে ভূরি ভূরি প্রমাণ দেখান যাইতে পারে। সুতরাং ইহারা সকলেই এক একটী যন্ত্র।

যদ্দারা যন্ত্র চালিত হইয়া থাকে, তাহাকে বল কহা যায়। লাঙ্গল মনুষ্য ও বলদের বলে চালিত হইয়া মৃত্তিকা বিস্ফারিত করে; ঢেঁকি মনুষ্যের বলে উঠিয়া থাকে; গরুর বলে ঘানিগাছের অভ্যন্তরস্থ শর্ষপাদি মর্দ্দিত হইয়া উহা হইতে তৈল নিঃসৃত হয়; নৌকার দাঁড় মাজির বলে উঠিয়া জল আলোড়ন করে; সেইরূপ বাষ্পের বলে বাষ্পীয় পোত, বাষ্পীয় শকট, চালিত হয়। সুরকী কোটা, কাষ্ঠ চেরাই, ময়দা ও কাগজ প্রস্তুত করণ, মুদ্রাঙ্কন কার্য্য ইত্যাদি বাষ্পের বলে হইয়া থাকে। বায়ুর বলে বোমায় জল উঠে এবং স্থিতিস্থাপক স্প্রিঙ্গের বলে ঘটিকা যন্ত্রের কাঁটা চলে।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, যন্ত্রের এক ভাগে অবশ্যই কোন বল প্রয়োগ করিতে হয়, অন্যথা কার্য্য সম্পাদিত হয় না। যন্ত্রের যে ভাগে বল প্রয়োগ করা যায়, তাহাকে প্রয়োগ-স্থান বলে। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে যন্ত্রের দ্বারা যে প্রকার কার্য্য সম্পন্ন হউক না কেন, সেই কার্য্য সাধনের জন্য অবশ্যই কোন প্রকার প্রতিবন্ধক নিবারণ করিতে হয়। সেই প্রতিবন্ধককে বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ ভার বলিয়া থাকেন। "ভার" এই বাক্যটীর অর্থ নির্দ্দেশ করা দুরূহ। যে বলদ্বারা মৃত্তিকা একত্র সংযুক্ত হইয়া থাকে, তাহাকেই ভার বলা যায় এবং লাঙ্গল দ্বারা যখন ঐ মৃত্তিকা উৎপাটিত হয়, তখন বলা যায় যে কৃষকের বলে প্রতিবন্ধক নিবারণ হইল অর্থাৎ মৃত্তিকা যে বল দ্বারা সংযত ছিল, সেই বল অর্থাৎ ভার নষ্ট হইয়া গেল। ঘানিগাছ দ্বারা শর্ষপাদি পেষিত হইয়া উহা হইতে তৈল নিঃসৃত হয়; যে বলে শর্ষপাদির আবরণ-ত্বক্ তৈলের উপর আবৃত হইয়া থাকে, তাহাকেই তাহার ভার বলা যায়। সুতরাং যন্ত্র দ্বারা যে প্রকার কার্য্য সাধিত হউক না কেন, বল প্রয়োগ করিলেই ভার নষ্ট হইয়া থাকে। যন্ত্রের যে ভাগে 'ভার' নষ্ট হয়, তাহাকে কার্য্যস্থান বলে।

বলপ্রয়োগ ব্যতীত কেবল যন্ত্রদ্বারা কোন কার্য্যই হয় না; কিন্তু বল প্রয়োগ করিলে বহুবিধ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু বল এবং তদ্দারা যে সকল কার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহাদিগের পরিমাণ করিতে হইলে সকলপ্রকার বল ও সকল প্রকার ভারকে এক জাতির অন্তর্গত করিতে হয়। কারণ উহারা এক জাতির অন্তর্গত না হইলে উহাদের পরস্পর তুলনা কোনপ্রকারে হয় না। যেমন একখানি

শকট মনুষ্যের বল দ্বারা চালিত হইতে পারে, ঘোটকের বল দ্বারা চালাইতে পারা যায় এবং বাষ্পীয় বলেও চালান যায়। সুতরাং এই তিনপ্রকার বলের পরস্পর তুলনা করিতে হইলে, ঐ তিন প্রকার বলকেই একজাতীয় করা আবশ্যক; অর্থাৎ একপ্রকার সঙ্কেতদ্বারা প্রকাশ করা আবশ্যক অর্থাৎ এইরূপ বলিতে হয় যে একটী ঘোটকদ্বারা ৫ জন মনুষ্যের কার্য্য হয় এবং বাষ্পীয় যন্ত্রদ্বারা ১০০ মনুষ্যের কার্য্য হইয়া থাকে; এইরূপ বলিলেই বুঝা যায় যে ঐ স্থলে এক ঘোটকের বল ৫ জন মনুষ্যের বলের সমান এবং বাষ্পের বল ১০০ ব্যক্তির সমান। ইহাকেই এক-জাতি-করণ বলা যায়।

ইদানীন্তন বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ সর্ব্বপ্রকার বলকে একজাতীয় করিবার অভিলাষে উহাকে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ বলের সহিত তুলনা করিয়া থাকেন। তাহার কারণ এই যে মনুষ্য ঘোটক বা বাষ্পের বল সর্ব্বসময়ে ও সর্ব্বস্থানে ঠিক সমান থাকে না, কিন্তু পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের বল সর্ব্বস্থানে ও সর্ব্বসময়ে সমান থাকে, স্থানবিশেষে তাহার বৈপরীত্য দৃষ্ট হয় না অর্থাৎ তাহার শক্তির ন্যূনাধিক্য হয় না। একটি বস্তুকে একটি মনুষ্য একদিকে টানিতেছে এবং ঐ বস্তুকে অন্য কোন বলদ্বারা টানা হইল। এই উভয় বলদ্বারা পৃথক পৃথক আকৃষ্ট হইয়া ঐ বস্তু সমান দূর গমন করিল সুতরাং যেদিকে ঐ বস্তু টানা হইতেছিল, সেই দিকে কৌশলপূর্ব্বক এরূপ ভারীদ্রব্য দিবে, যে যদ্দারা উহার গতি পূর্ব্ববৎ থাকিবে, এই কারণে সকল প্রকার বলকে একজাতীয় করা উচিত হইতেছে। ঐ ভারীদ্রব্যের অর্থাৎ ভারের পরিমাণ স্থির হইলেই পূর্ব্বোক্ত বস্তু কতবলে আকৃষ্ট হইতেছিল, তাহা জানা যাইতে পারে। ইহা স্পষ্টরূপে বোধগম্য হইতে পারে। বিবেচনা কর, একটি কাষ্ঠ-নির্ম্মিত টেবিলের উপর কোন বস্তু আছে, ঐ বস্তুর একদিকে দড়ি বান্ধিয়া উহাকে টানা যাইতেছে, এক্ষণে মনে কর যে, ঐ বস্তু রজ্জুদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া দুই ইঞ্চি সরিয়া আসিয়াছে। এক্ষণে যদ্যপি এরূপ একটি ভারীদ্রব্য সেই দিকে বান্ধিয়া দেওয়া হয়, যদ্দারা ঐ বস্তু দুই ইঞ্চি সরিয়া আইসে, তাহা হইলে ঐ ভারের পরিমাণ করিলেই উহা কত বলে টানা হইতেছিল স্থির করা যাইতে পারে। নিম্নলিখিত চিত্রে ইহা প্রদর্শিত হইল।
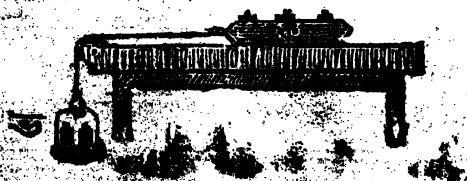
সচরাচর সকলেই বলেন যন্ত্রের সাহায্যে অল্প বলে অধিক বলের কার্য্য হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা তাঁহাদের বিষম ভ্রম। বাস্তবিক অল্পবলে অধিক বলের কার্য্য কখনই সম্পন্ন হয় না। সকল যন্ত্রেরই একটী অংশ আছে, তাহাকে অবলম্ব কহে। সেই অবলম্ব ভারের অধিকাংশই বহন করে। ইহা বিশদরূপে বুঝিতে হইলে, অবলম্ব কাহাকে বলে ইহা অগ্রে বুঝা উচিত। যদি একখানি বৃহৎ কাষ্ঠের নিম্ন ভাগে এক-খণ্ড বাঁশের এক প্রান্ত প্রবেশ করাইয়া এবং ঐ বাঁশের নিম্নভাগে একখণ্ড ইষ্টক রাখিয়া যদি বাঁশের অপর প্রান্তে কোন ব্যক্তি চাপ প্রদান করে, তাহা হইলে সেই কাষ্ঠ ও ভূমিতল হইতে কিঞ্চিৎ উন্নত হইয়া থাকে। নিম্নভাগে ইহার প্রতিকৃতি প্রদর্শিত হইল।

কখ কাষ্ঠ, গ ইষ্টক খণ্ড, এবং ঘঙ বাঁশ। ঐ বাঁশের এক প্রান্ত অর্থাৎ ঘ, কাষ্ঠের নীচে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং বংশখণ্ডটী গ নামক ইষ্টকখণ্ডে রাখিয়া অন্য প্রান্তে অর্থাৎ ঙ নামক স্থানে এক-জন মনুষ্য দুই হস্তের দ্বারা চাপ দিতেছে। ইহার মধ্যে গ কে অবলম্ব কহ। যায়। ঐ কাষ্ঠ অবশ্যই উত্তোলিত হইবে। কিন্তু তাহা বলিয়া কি মনুষ্যের বলে উত্থিত হইল। বাস্তবিক তাহা নহে। ঐ বংশখণ্ডের অবলম্ব ইষ্টকখানি ঐ কাষ্ঠের ভার বহন করিতেছে। অবলম্ব না থাকিলে ঐ মনুষ্যদ্বারা কখনই ঐ কাষ্ঠ উত্থিত হইত না। সুতরাং অবলম্ব যন্ত্রের একটী প্রধান অংশ।
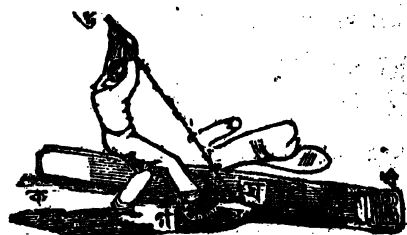
অতি প্রাচীন কাল হইতে আমাদিগের দেশে নানাবিধ যন্ত্রের ব্যবহার আছে, এবং তদ্দ্বারা অবশ্যই বহুবিধ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে। এদেশে বহুকাল হইতেই চরকা, তাঁত, ঢেঁকি, লাঙ্গল, ঘানিগাছ, কাতারী, তুলাদণ্ড প্রভৃতির ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইউরোপে আজকাল যন্ত্রের সংখ্যা অত্যন্ত পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে এবং সেই সমস্ত দ্বারা যে সকল অদ্ভুত কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে, তাহা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। ইউরোপে প্রায় সকল কার্য্যই যন্ত্রের দ্বারাই সম্পাদিত হইয়া থাকে। সুরকীকোটা, বস্ত্র প্রস্তুতকরণ, মুদ্রাঙ্কন, কৃষিকরণ, তৈল প্রস্তুত করণ, কাষ্ঠ চেরাই, ময়দা প্রস্তুতকরণ, কাগজপ্রস্তুত করণ, প্রভৃতি সকল কার্য্যই যন্ত্রদ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য সম্পন্ন হয় বলিয়া এরূপ বিবেচনা করা উচিত নহে, যে তাহারা এক একটী পৃথক পৃথক যন্ত্র। তাহাদের

প্রকার ভেদ যতই হউক না কেন, আদৌ তাহারা দুই ভাগে বিভক্ত; যথা বিশুদ্ধ এবং বিমিশ্র। উপরে প্রদর্শিত চিত্র একটী বিশুদ্ধ যন্ত্রের প্রতিকৃতি; কিন্তু চরকা একটী বিমিশ্র যন্ত্র; কারণ উহাতে অনেক গুলি ভাগ আছে; সেই এক একটী অংশ এক একটী বিশুদ্ধ যন্ত্র। উহারা প্রথমে পরস্পরের প্রতি কার্য্য করে, পরে অভিপ্রেত কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে। চরকার কর্ণ প্রথমে ঘুরাইতে হয়, কিন্তু কর্ণ ঘুরিবামাত্র সূত্র প্রস্তুত হয় না; প্রথমে কর্ণ ঘুরিলেই কাঠি ও হাঁড়ি ঘুরে এবং হাঁড়ির সঙ্গে যে তাঁত থাকে তাহা ঘুরে; তদ্দারা টক্রু ঘুরিতে থাকে; অবশেষে টক্রু ঘুরিলে তুলার পাক লাগিয়া ক্রমশঃ সূত্র প্রস্তুত হইতে থাকে।

যন্ত্র ব্যতীত মনুষ্য হস্ত দ্বারা বলপ্রয়োগ অসংখ্য প্রকারের নহে। প্রায় সকল কার্য্যেই যন্ত্রের সাহায্য আবশ্যক করে। মনুষ্য জাতি যত প্রকার যন্ত্রের সাহায্যে কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে, এমন কি এক খণ্ড কাষ্ঠ হইতে, যদ্বারা অসভ্যজাতিরা ভূমি কর্ষণ করে, অত্যুত্তম বাষ্পীয় যন্ত্র পর্য্যন্ত যদ্দারা সমস্ত কার্য্যই সাধিত হইয়া থাকে—সকল গুলিই কতিপয় অবিচলিত নিয়মের বাধ্য এবং সেই সকল নিয়ম বহুদর্শিতা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারাই আবিষ্কৃত হইয়াছে।

কোন বিমিশ্র যন্ত্র দ্বারা কত কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে তাহা নিরাকরণ করিতে হইলে অগ্রে সেই যন্ত্র যতগুলি বিশুদ্ধ যন্ত্রের সংযোগে জন্মিয়াছে সেই গুলির কার্য্য ক্ষমতা পরিমাণ করিতে হয়। সেই গুলির কার্য্যক্ষমতা একত্র করিয়া যত হইবে, বিমিশ্র যন্ত্রের কার্য্য ঠিক তাহাই হইবে। সুতরাং অগ্রেই বিশুদ্ধ যন্ত্রের প্রকৃতি নির্ণয় করা উচিত।

বিশুদ্ধ যন্ত্র সর্ব্বসমেত তিন প্রকার; যথা;——

(১) অবলম্ব সমন্বিত কঠিন দণ্ড,

(২) নম্য রজ্জু বা শৃঙ্খল, এবং

(৩) কঠিন ও মসৃণ ক্রমে নিম্ন ধরাতল।

যেমন ইংরাজি ভাষায় যতই শব্দ থাকুক না কেন, সেই শব্দ গুলি ২৬ টী বর্ণের সংযোগে হইবে, সেইরূপ যন্ত্র যত প্রকারের হউক না কেন, উহা কেবল উপর্য্যুক্ত তিন প্রকার বিশুদ্ধযন্ত্রের সংযোগ মাত্র।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবি, লা, আ।

অলঙ্কার দর্শন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পূর্ব্বাস্বাদিত সুখাদ্যদ্বারা শরীরের পুষ্টিকার্য্য হইতে থাকিলে, পূর্ব্বোক্ত সুখের আরও আধিক্য হয় বটে, কিন্তু ঐ সকলের সহিত যুগপৎ আস্বাদন অধিক বৈচিত্র্য ও সুখজনক হয় না। খাদ্য সুখ এত স্থূল * ও নিকৃষ্ট যে ইহাকে সাধারণে পূর্ব্বোক্ত সুখসমষ্টির পরিপন্থী বলিয়া থাকেন। ইহা কোনমতেই যুগপৎ অনুভবনীয় নহে। খাদ্যদ্বারা কেবল পূর্ব্বোক্ত সুখভোগের অধিকারীই হওয়া যায়। ইহার যথেষ্টতা আমাদিগকে ঐ সুখের উপযোগী করে। অতএব ইহা যুগপৎ সেবনীয় না হইলেও ইহাকে ঐ চতুরিন্দ্রিয়-সেব্য সুখের পরম্পরা কারণ মধ্যে গণনা করা যাইতে পারে, সাক্ষাৎকারণ মধ্যে নহে।

এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের পঞ্চ বিষয়ের যোগে যে বিবিধ বৈচিত্র্য উৎপন্ন হয়, তদতিরিক্ত আর এক প্রকার অদ্ভুত বৈচিত্র্য আছে। ইহা ঐ সকল বৈচিত্র্যের সারস্বরূপ। প্রত্যক্ষমাত্রেই সমুদয় বিষয়েরই অনুরূপ এক প্রকার অস্থূল, অজড় প্রতিরূপ—অথবা কি তাহা আমরা বলিতে পারি না,—কিন্তু বলিতে পারি যে ঐ বস্তুশক্তি ও মদীয় শক্তির এক প্রকার আবির্ভাব হইয়া থাকে। ঐ আবির্ভাবকে আমরা মনোভাব বলিয়া থাকি। এই ভাবের যোগে যে বৈচিত্র্য হয় তাহাকেই প্রকারভেদে আমরা অর্থের, অলঙ্কারের, ভাবের বা রসের বৈচিত্র্য বলিয়া থাকি। পূর্ব্বোক্ত বৈচিত্র্য সকলের সহিত যদি এই সকল বৈচিত্র্যের যোগ হয়, তবে কি আর অলীক

---

* বিবেচনা করিয়া দেখিলে অনুধাবন হইতে পারে যে স্পর্শ, আস্বাদন, ঘ্রাণ, শ্রবণ ও দর্শন ইহারা পরম্পর ক্রমশঃ সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর বস্তুর সহিত সাক্ষাৎভাবে সংযুক্ত হইয়া আমাদের সুখ উৎপাদন করে। স্পর্শ স্বয়ং সর্ব্বাপেক্ষা স্থূল ও স্থূল-বস্তুর সহিত সক্ষাৎভাবে সংযুক্ত হয়। কিন্তু চক্ষু সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম ও সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম ছায়ামাত্রের সহিত সংযুক্ত হইয়া সুখপ্রদ হয়। এই জন্যই চক্ষুর সর্ব্বাপেক্ষা প্রাধান্য। এই জন্যই লোকে চক্ষুর সুখকে সূক্ষ্ম, সভ্যজনোচিত, নির্ম্মল, পবিত্র, উন্নত ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করিয়া থাকেন। শ্রবণ সুখকে তাহার নীচেই গণনা করেন, কিন্তু স্পর্শ ও খাদ্যসুখকে স্থূল, অনুন্নত, অতিসাধারন, নিকৃষ্ট ও অপবিত্র মনে করিয়া থাকেন। ফলতঃ এই কারণ ভিন্ন ইহাদিগকে ঐরূপ বলিবার আর কোন হেতু নাই। তবে মনের অভিপ্রায় অনুসারে দর্শন সুখকে যে কেহ কেহ কখন অপবিত্র বলিয়াছেন, বিবেচনা করিয়া দেখিলে, সে কেবল সেই চক্ষু সুখের সহিত অপর প্রকার স্থূল সুখের লালসা থাকাতেই জানিবেন।

স্বর্গসুখের নিমিত্ত কেহ প্রার্থনা করে? ঋষিগণ "রসো বৈস" ইত্যাদি বলিয়া যে অপূর্ব্ব ভূমানন্দের বিষয় বারম্বার উল্লেখ করিয়াছেন, সেই রসের বৈচিত্র্য ইহার সহিত যোগ হইলে, স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, পান, আহার ,মিত্রা এসকল কোথায় থাকে? কোথায় বাহ্য প্রকৃতি, কোথায় বাহ্য দৃষ্টি, কোথায় বাহ্য জ্ঞান? আমি আপনাকেই আপনি ভুলিয়া যাই। আমার সত্তা কিয়ৎকালের নিমিত্ত যেন এই মর্ত্ত্যলোক পরিত্যাগ করে।

জগতের বস্তু সমস্ত যেমন বিচিত্র হইয়া আছে, আমরাও তেমনই শারীরিক উপাদেশাদিভেদে ও নানাপ্রকার ঘটনা, অবস্থা ও দর্শনভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হইয়া আছি। মূলে সকলে এক হইলেও অবান্তরভেদে সকলে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে গুণবান্ হইয়া রহিয়াছি। যেমন দেখিয়া শুনিয়া যেরূপ হইয়াছি, সেইরূপ দর্শন শ্রবণ আমাদের ভাল লাগে। যেরূপ ঘটনায় যেরূপ অবস্থায় যেমন হইয়াছি সেইরূপ ঘটনা সেইরূপ অবস্থা দর্শন শ্রবণাদি আমাদের মনোমত হয়। তাহার বিরুদ্ধ মনোমত হইতে পারে না। কিন্তু পুনঃ পুনঃ অভ্যাস পাইয়া যখন ঐ বিরুদ্ধও আমাদিগেতে স্থির হইয়া যায়, তখন উহা আর আমাদের নিকট বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না। তাহাই আমাদের স্বভাবের অন্তর্গত হইয়া যায়। অতএব যেরূপ দেখিয়া শুনিয়া যেরূপ হইয়াছি, সেইরূপ দেখিলে শুনিলেই, আমরা সুখী হইয়া থাকি। এইরূপে স্বভাব বা অভ্যাস বশতঃ বস্তু সকল মনোমত বা অমনোমত হয়। এই জন্যই কোন কোন বৈচিত্র্য একের ও কোন কোন বৈচিত্র্য অপরের মনোমত হইয়া থাকে। এই মনোমত বৈচিত্র্যই সুখের কারণ। কিন্তু যে বৈচিত্র্য সাধারণের মনোহর হয় , তাহাই প্রকৃত বৈচিত্র্য, তাহাই জগতের আনন্দকর।

বৈচিত্র্য উৎপাদনই সমুদয় বিজ্ঞানের, সমুদয় শিল্পের, সমুদয় কাব্যের, অধিক কি সমুদয় মনুষ্যকার্য্যের এক মহান্ উদ্দেশ্য। জগতে বৈচিত্র্য ভিন্ন সুখকর আর কিছুই নাই। বৈচিত্র্য উৎপাদন চেষ্টাই সমুদয় উন্নতির মূল। অতএব কিরূপে এই বৈচিত্র্য উৎপাদন করা যাইতে পারে তাহার আলোচনা ও তদনুরূপ চেষ্টা করাই আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য।

পরস্পর সুসংবদ্ধ বস্তুনিচয়ের বা বিবিধ গুণের যে সুশৃঙ্খলায় অবস্থান তাহাকে বৈচিত্র্য বলা যায়। অতএব কোন বিষয়ের বৈচিত্র্য উৎপাদন করিতে হইলে অগ্রে বস্তুসমূহের পরস্পর সম্বন্ধ জ্ঞান ও ঐ সম্বন্ধসমূহ মধ্যে প্রস্তুত বিষয়ে কোন্ সম্বন্ধটী নিকট, কোনটী দূর এগুলি জানা বিশেষ আবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ নিকট সম্বন্ধগুলির যোগ ও দূরে সম্বন্ধগুলির বিয়োগ কি প্রণালীতে করিতে হইবে তাহাও জানা নিতান্ত আবশ্যক। তৃতীয়তঃ [illegible] জ্ঞান বা মনুষ্যগণের চিত্তজ্ঞান থাকাও নিতান্ত

প্রয়োজনীয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে কোন বস্তু বিচিত্র করিতে হইলে অন্ততঃ তদ্গুণযুক্ত সমুদয় বিশেষজ্ঞান শিখিতে বা অতি সূক্ষ্মতত্ত্ব সকল বাহুল্যরূপে জানিতে হইবে। একখানি দর্পণের ফ্রেম প্রস্তুত করিতে হইলেও অগ্রে কাষ্ঠের গুণ দোষ, তাহার সহিত অস্ত্রাদির ও রৌদ্র, বার্ণিস প্রভৃতির কিরূপ সম্বন্ধ। তাহা কি প্রকারে সরল, সমান ও পরস্পর সংযুক্ত করিতে হইবে, কি প্রকারে অপ্রয়োজনীয় অংশ পরিত্যাগ করিতে হইবে ও কি প্রকার আকৃতি পরিমাণ বর্ণাদি করিলে লোকের মনোমত হইবে এসমুদয় বিশেষরূপে জানিতে হইবে। এ সকল না জানিলে কোন-মতেই কার্য্য সিদ্ধি হইবে না। ফলতঃ সম্বন্ধজ্ঞান ও যোগবিয়োগের প্রণালী জ্ঞানই মনুষ্যের মাহাত্ম্যের পরিচায়ক। গৌতম, ভাস্করাচার্য্য, নিউটন, লাপ্লাস্, র‍্যাফেল্, কালিদাস, সেক্সপীয়ার প্রভৃতি পণ্ডিতগণ যে জগতে মহামান্য মহাত্মা বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন সে কেবল সম্বন্ধ জ্ঞান ও যোগ বিয়োগ ক্রিয়ারই প্রভাব। অতএব সম্বন্ধ কিরূপে হয় ও তাহার উন্নতি কি প্রকারে সাধিত হইতে পারে, তাহাই প্রথম দর্শনীয় হইতেছে। কাব্যের এই সকল সম্বন্ধ জ্ঞান নিতান্ত অনায়াস লভ্য নহে, বিবিধ প্রকার পুস্তকাদি পাঠ, ভাল মন্দ কার্য্য, জীবগণের ভাষা ও চিত্তবৃত্তির পর্য্যবেক্ষণ, অধিক কি, প্রকৃতির নিগূঢ় তত্ত্ব সমুদয়ের নিয়ত দৃষ্টি রাখিলে এই জ্ঞান লাভ করা যাইতে পারে। এই জ্ঞান সামান্য বিজ্ঞানের সংযত ও বদ্ধ দৃষ্টি দ্বারা পাওয়া যায় না। ইহা কল্পনার অসীম অনন্ত দৃষ্টিসম্ভূত। ইহা সাধারণের অসম্ভূত চমৎকার জ্ঞান। একজন পাণ্ডুমূর্খও তাহার অন্যান্য অজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে এরূপ জ্ঞান পাইতে পারে, একটি শিশুও কখন কখন প্রকৃতির বশতাপন্ন হইয়া সেই রূপ জ্ঞানের বাক্য প্রকাশ করিয়া ফেলে, আবার এক জন অশেষ বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত ও সহস্র চেষ্টায় তাদৃশ জ্ঞানের বাক্য প্রয়োগ করিতে পারেন না। নিশ্বাস কার্য্যের ন্যায়আমাদের অন্তঃকরণে স্বয়ং প্রবহমাণ যে ভাবশ্রেণী উদিত হইতে থাকে, যাহা জগতের অনন্তসম্বন্ধে সম্বদ্ধ সেইভাবশ্রেণী হইতেই ইহার জন্ম।

যদিও বস্তুশক্তি ও শক্তি আমাদিগের অনুসারে এই ভাবশ্রেণী আমাদিগের প্রত্যক্ষ বিবিধ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। বস্তু দর্শনাদিতে স্বয়ং উদ্ভূত হয়, এবং শোক হর্ষাদি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তদনুরূপ ভিন্ন ভিন্ন পর্য্যায় অবলম্বন করিয়া প্রবাহিত হয় তথাপি আমরা ইচ্ছা দ্বারা ঐ প্রবাহের গতিরোধ বা উহাকে অন্যান্তর পর্য্যায় প্রবাহিত করিয়া দিতে পারি। ইহাই আমাদের প্রভুত্ব, ইহাই আমাদের মাহাত্ম্য। স্বয়ং উদিত বিবিধ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ সেই প্রবাহের উপর আমাদের এই শক্তি, এই যোগ বিয়োগ ক্ষমতাই কার্য্যে পরিদৃশ্য নাম হইয়া আমাদের মহত্ত্ব বা নীচত্ব প্রখ্যাপন করে। এই উদিত প্রবাহের যোগ বিয়োগই জগতের জীবগণকে বিশেষ করিয়াছে।

অনেকে ইচ্ছার সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব মনে করেন, কিন্তু ইচ্ছাও বস্তুশক্তি, জ্ঞান ও অভ্যাসের আয়ত্ত। অতএব যিনি মাহাত্ম্যলাভের ইচ্ছা করেন, তাঁহার বস্তুজ্ঞান ও অভ্যাস দ্বারা সম্বন্ধ বাছিয়া যোগ বিয়োগের শক্তি সঞ্চয় করা আবশ্যক। তাহা হইলে ঐ বস্তু শক্তিও তাঁহার শক্তিরূপে পরিণত হইবে।

কাব্যের বস্তুজ্ঞান বিজ্ঞানের বস্তুজ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বাক্যের সম্বন্ধও বিজ্ঞানের সম্বন্ধ হইতে অন্যবিধ। এই সকল স্বতন্ত্ররূপে অনুভব করিতে হয়। আমরা বিজ্ঞানের দ্বারা নির্ণীত কার্য্য কারণাদি সম্বন্ধকে নিকট সম্বন্ধ বলিয়া থাকি ও কাব্যের সাদৃশ্য সম্বন্ধ সমুদয়কে দুর-সম্বন্ধ বলি। বিজ্ঞানে যাহা সদৃশ ও সম্বন্ধ বলিয়া প্রসিদ্ধ, কাব্যে তাহা সাদৃশ্য সম্বন্ধের অযোগ্য বলিয়া পরিত্যাগ করি। আবার কাব্যে যাহাকে সদৃশ ও সম্বন্ধ বলি বিজ্ঞানে তাহাকে সদৃশ বলিয়াই মনে করিতে পারি না। বিজ্ঞানে বস্তুসকলের সদৃশ্যাদি যথাবৎ খ্যাপন হইয়া থাকে, কিন্তু কাব্যে (বিজ্ঞানানুসারে) অসদৃশ্য অসম্বন্ধরূপে প্রসিদ্ধ বস্তুকে সুসাদৃশ ও সুসম্বন্ধবৎ প্রতীতি করিয়া দেয়। বিজ্ঞানে এক জাতীয় দুইটী বস্তুর মধ্যে অনায়াসে অনুভবনীয় কোন সাধারণ গুণ ক্রিয়াদি লইয়া সাদৃশ্য দেখান হয়, কিন্তু কাব্যে সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতীয় দুইটার মধ্যে সহৃদয় সংবেদ্য কোন সাধারণ গুণ ক্রিয়াদি লইয়া সাদৃশ্য প্রদর্শিত হইয়া থাকে। বিজ্ঞানে প্রসিদ্ধ কারণ কার্য্যের পৌর্ব্বাপর্য্য প্রদর্শিত হয়, কিন্তু কাব্যে কার্য্যকারণরূপে সংবদ্ধ নয়, এরূপ বস্তুদ্বয়ের মধ্যে কার্য্যকারণ ভাব প্রদর্শিত হয়। বিজ্ঞানে যে ব্যাপ্য ব্যাপক ধর্ম্ম লইয়া সামান্য বিশেষ ভাব সূচিত হয়, কাব্যে সে রূপ ব্যাপ্য ব্যাপক ধর্ম্ম অবলম্বন করেনা। এই রূপে সাধারণ বিজ্ঞানের ও কার্য্য বিজ্ঞানের প্রণালী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা বলিবেন দূর্ব্বা জাতি দেখিতে বংশের সদৃশ্য, তাহার পর্ব্ব, গ্রন্থি ও পত্র সকল অবিকল তদনুরূপ এবং বংশ পত্র যেমন গবাদির ভক্ষ্য ও পুষ্টিকর, দূর্ব্বাও সেইরূপ গবাদির ভক্ষ্য ও পুষ্টিকর, অতএব দূর্ব্বা ও বংশ একই জাতির অন্তর্গত। কেবল দূর্ব্বা আকৃতিতে হ্রস্ব।

কিন্তু কবিরা সদৃশ্য বলিতে হইলে বলিবেন,

> বিননিয়া বিনোদিয়া বেণীর শোভায়।
> সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকায়॥

অর্থাৎ সর্প ও কাল রঙের, বেণী ও কাল রঙের, সর্প ও দীর্ঘ, বেণী ও দীর্ঘ অতএব বেণী সর্প সদৃশ, কেবল সর্প বিবরে থাকে।

ক্রিয়ার সাদৃশ্য সম্বন্ধ দেখাইয়া বৈজ্ঞানিকেরা বলিবেন স্বর্ণ ও উত্তাপে ভস্মশেষ হয় না; রৌপ্য ও ভস্মশেষ হয় না, অতএব এ দুইকে ধাতু বলা যায়, ইহারা এক শ্রেণীরই অন্তর্গত। কিন্তু এক জন কবি বলিবেন,

পুরাণ বসন ভাতি, অবলাজনের জাতি,
রক্ষা পায় অনেক যতনে।

অর্থাৎ পুরাতন বস্ত্র ও অবলার সতীত্ব এত অল্পেই নষ্ট হয় যে অনেক যত্ন করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিতে হয়। অতএব সতীত্ব পুরাতন বস্ত্র সদৃশ। উহারা উভয়েই স্পর্শ সহ্য করে না। এজন্য উভয়েই তুল্য।*

বিজ্ঞানবিৎপণ্ডিতেরা স্পষ্ট করিয়া প্রকৃত কার্য্য কারণভাব দেখাইয়া দিবেন, কিন্তু কবি হয় প্রকৃত কার্য্যকারণ স্থলে অন্যবিধ বা তদ্বিপরীত কার্য্যকারণ ভাবপ্রদর্শন করিবেন, অথবা যে কার্য্যকারণভাব প্রদর্শন করিতে ইচ্ছা আছে, তাহা সোজা কথায় না বলিয়া বাক্যভঙ্গিদ্বারা প্রকারান্তরে ব্যক্ত করিবেন। যথা—

সজল জলদজাল করিছে গর্জ্জন।
বরষিছে অবলার যুগল নয়ন।
বাহুলতা মূলে আসি পড়ে সেই জল;
বিরহ লতায় তাহে ফলে নানা ফল॥

* বিজ্ঞানে সামান্য বিশেষ সম্বন্ধ যেরূপ দর্শিত হইয়া থাকে কার্ব্যে সেরূপ নহে। ইহাতে বিজ্ঞানের অলক্ষ্য কোন সাধারণ ব্যাপ্যব্যাপক ধর্ম্ম লইয়া সামান্য বিশেষ ভাব প্রদর্শিত হয়। বিজ্ঞান অনুসারে মনুষ্য বাঙ্গালী বিশেষ। কিন্তু কাব্যে আক্রমণ সদৃশ, আক্রমণ সাধর্ম্মে মনুষ্য ও ধূলি কণার ন্যায় সামান্য ও বিশেষ ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। যেমন

পাদাহত হইলে মাথার পরে চড়ে।
পথের যে ধূলা সেও না করে বিচার॥
শত অপমানে তবু যে জাতি না নড়ে।
তাহা হতে সেই ধূলি বড় শতবার॥

জলধর গর্জ্জন অন্তর বর্ষণ করিয়া থাকে ইহাই প্রসিদ্ধ কিন্তু এস্থলে জলধর গর্জ্জন করিল, কিন্তু অবলার নয়নযুগল বর্ষণ করিল; এই কার্য্যকারণের বৈপরীত্য বর্ণন দ্বারা কবি জলধরগর্জ্জন শ্রবণে বিরহ বিধুরা অবলার পতি স্মরণ ও তন্নিমিত্ত তাহার চক্ষুদ্বয় হইতে অশ্রুবর্ষণ সূচিত করিলেন। অনন্তর বৃষ্টিজল যে লতার মূলে পড়ে তাহাকেই বর্দ্ধিত করে; কিন্তু কবি, সেই অশ্রুজল বাহুলতায় আসিয়া পড়িল এবং তাহাতে বিরহলতা বৃদ্ধি পাইয়া ফল প্রকাশ করিল, এই কার্য্যকারণের বৈপরীত্য কথনদ্বারা তাঁহার বর্ণনা আরও চমৎকার করিবেন।

(ক্রমশঃ।)

শ্রীপ্যারিমোহন সেন গুপ্ত।

ব্যবস্থা-দর্শন।

ব্যবস্থা বা আইনের বিকাশ ও উপচয়।

ব্যবহার। স্মৃতি। সংহিতা।

সকল বৈজ্ঞানিক তথ্য নিরূপণে প্রবৃত্ত হইতে হইলে ঐ শাস্ত্রের অতীত ইতিহাস জ্ঞাত হওয়া অবশ্যক। কোন বিশেষ শাস্ত্রঘটিত পদগুলি কিরূপে সেই সেই শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণের চিন্তাশীলতায় উত্তরোত্তর পরিস্ফুটতা লাভ করিয়া ক্রমে সেই শাস্ত্রীয় ভাব-বিশেষের পরিচায়ক হইয়া উঠিয়াছে, ও কালসহকারে পণ্ডিতগণের চেষ্টা ও উদ্যমে উহার মৌলিক তত্ত্ব সকল কিরূপ অভিব্যক্ত ও বিকসিত হইয়াছে, ইতিহাসের সাহায্য ব্যতিরেকে উহার সর্ব্বাঙ্গীন জ্ঞান লাভ সাধ্যায়ত্ত নহে। এদিকে আবার বিজ্ঞান বিশেষের অনুশীলন পক্ষে সেই বিজ্ঞানের প্রকৃতি এবং তাহার আলোচ্য বিষয়গুলি, অবান্তর বিষয় হইতে পূর্ব্বেই পৃথক করিয়া লওয়া উচিত। এই শ্রেণী-বন্ধন এবং নির্ব্বাচন প্রণালী বিজ্ঞানের জীবন।

ব্যবস্থাশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ ব্যবস্থা-বিজ্ঞানে এই দুইটী মৌলিক তত্ত্বের অপলাপ করাতে আজিও সভ্য জগতে ব্যবস্থা-বিজ্ঞানের অভাব দেখা যাইতেছে। অতি অল্প দিন মাত্র সুশিক্ষিত সভ্য য়ুরোপ ও আমেরিকায় ব্যবস্থা-বিজ্ঞান উচ্চ শিক্ষার অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। এপর্য্যন্ত কৃতবিদ্যগণ ব্যবহারাজীবদিগের হস্তে উহা ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন। আমাদিগের দেশ রাজনৈতিক যত্নে যেরূপ হীনদশাপন্ন, এবং প্রভু ও শ্রেণীপরতন্ত্রতা আমাদিগের জাতীয় জীবনে আয়া-

দিগের অস্থি মজ্জায় যেরূপ সংক্রামিত, তাহাতে চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন যে, আমাদিগের দেশে ব্যবস্থাশাস্ত্র বা আইনের বিশেষ অনুশীলন আবশ্যক ও ব্যবস্থা-বিজ্ঞানের বহুল প্রচার প্রার্থনীয়। এই উদ্দেশে আমরা বিজ্ঞানদর্পণের বর্ত্তমান সংখ্যা হইতে সময়ে সময়ে ব্যবস্থাশাস্ত্র ও উহার মৌলিক তত্ত্ব সকল পর্য্যালোচনা করিব।

সম্প্রতি জর্ম্মণি, ফ্রান্স ও ইংলণ্ড দেশীয় কতিপয় বিখ্যাত পণ্ডিত আইনের বিকাশ উপচয় ও অতীত ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া নির্ণয় করিয়াছেন যে আধুনিক আইনের বহুপূর্ব্ব হইতেই, মানবজাতির সমাজ বন্ধনের সঙ্গে সঙ্গেই উহার ভিত্তিমূল স্বরূপ কতকগুলি পারিবারিক ও সামাজিক নিয়ম লক্ষিত হইয়া থাকে। পিতা মাতা, পুত্র কন্যা, পতিপত্নী প্রভৃতি পারিবারিক সম্বন্ধ এবং ভূমি, ক্ষেত্র, পশু, পক্ষি শস্যাদিতে নিজের ও প্রতিবেশিবর্গের অধিকার নির্ণীত হয়। ঐ সকল সম্বন্ধ ও অধিকারের বিপ্রাচরণে সমাজের ক্ষতি অনুভূত হইতে থাকে এবং তদুল্লঙ্ঘন কারীও দণ্ডিত হয়। এইরূপ নিয়মের পুনঃ পুনঃ সার্থকতা ও ভূয়োদর্শনে ঐ নিয়মগুলি ব্যবহারবদ্ধ বা ব্যবহার (Custom) রূপে পরিণত হইয়া যায়। পূর্ব্ব-পুরুষগণ যে নিয়মে চলিতেন, আমরা সেই নিয়মে চলিতেছি ও ঐরূপ কার্য্যপ্রণালী বরাবর অদ্যাবধি চলিয়া আসিতেছে, এই জ্ঞানই ব্যবহারের মূল। হিন্দুদিগের ঔর্দ্ধদেহিক দাহ শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া, মুসলমানদিগের বহুবিবাহ ইত্যাদি এইরূপে ব্যবহার হইয়া গিয়াছে। ভূবিজ্ঞান শাস্ত্রে পৃথিবীর আদিম স্তর সকলের ন্যায় আইনের পুরাতত্ত্বে এই ব্যবহার সকল আইনের অঙ্কুর স্বরূপ। উহাই পুষ্ট বর্দ্ধিত এবং ক্রমে বিকসিত ও পূর্ণাবয়ব হইয়া আধুনিক আইন সৃষ্টি করিয়াছে। বস্তুতঃ হিন্দুদিগের পরিবার দায় ও উত্তরাধিকার সম্বন্ধীয় যাবতীয় আধুনিক ব্যবস্থা এই আদিম ঊর্দ্ধদেহিকাদি ব্যবহারের অভিব্যক্তি ও বিকাশমাত্র।

সমাজের স্থায়িত্বের জন্য পরিবার ও অন্যোন্যের প্রতি কর্ত্তব্য জ্ঞান যত স্পষ্টীকৃত ও মানুষের কার্য্যপ্রণালী ও অন্যোন্যের প্রতি আচরণ যত একাবয়ব হয়, ততই এই ব্যবহার শক্তি সমাজে বদ্ধমূল হইতে থাকে এবং উহার ব্যতিক্রমকারী সমাজের শত্রু বলিয়া ঘৃণিত ও দণ্ডিত হয়। এই দণ্ডদান সময়ে ব্যবহার ঘটিত প্রকৃততত্ত্ব সকল বিচারিত ও ক্রমে নির্ণীত হইতে থাকে *। ভারতবর্ষের চির-

* ব্যবহারান্ নৃপঃ পশ্যেৎ। যাজ্ঞবল্ক্য। রাজ্ঞঃ প্রজাপালনং পরমো ধর্ম্মঃ। তচ্চ দুষ্ট নিগ্রহমন্তরেণ ন সম্ভবতি। দুষ্ট পরিজ্ঞানঞ্চ ব্যবহার দর্শনমন্তরেণ ন সম্ভবতি। অতো ব্যবহারদর্শনমহরহঃ কর্ত্তব্যং। মিতাক্ষরা ২অ ১।

প্রচলিত পুরাতন পল্লিসমাজ বা মধ্যস্থ বা প্রাড়্ বিবাক; ইঁহারাই আদিম মানব-সমাজের নিয়ন্তা রূপে সামাজিক নিয়মের ব্যতিক্রমকারীকে দণ্ডদান কালে নিজ নিজ ভূয়োদর্শন মত এবং যেরূপ স্মরণ আছে, সেইরূপ বিচার করিতেন। এই ভূয়োদর্শন ও স্মরণই ব্যবহার ও স্মৃতিরূপে ভারতীয় আইনের মূল হইয়া রহিয়াছে।

এইরূপেই অব্যাহত পুরুষ পরম্পরাগত ব্যবহার বিবাদভঞ্জন কালে ক্রমশঃ উদাহৃত হইতে থাকে এবং উহাই পরিণামে বিচারপতিগণের হস্তে সূত্র ও বিধি রূপে পরিণত হয়। এস্থলে ইহাও বিচার করা আবশ্যক যে বিচারপতিদিগের এই নিয়ন্তৃত্ব কোথা হইতে আসিল? ইতিহাস আন্দোলনে ইহাই লক্ষিত হয়। যে মানুষের আদিম সমাজ সংগঠনকালে রাজা, ব্যবস্থাপক বা আইন স্রষ্টা না হইয়া বহুলরূপে বিধি প্রয়োজক বা বিচারকরূপে পরিচিত ছিলেন। মানবধর্ম্মশাস্ত্রে বিচার কার্য্যের সৌকর্য্যার্থ রাজার নানা কর্ত্তব্য অভিহিত হইয়াছে, কিন্তু সুব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য আধুনিক ব্যবস্থাপকদিগের ন্যায় আইন সৃষ্টির গুণগ্রাম কোথাও লক্ষিত হয় না। প্রাচীন গ্রীক জাতির ইতিহাসেও ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। আধুনিক সুসভ্য ইংলণ্ডও এই প্রাচীন সংস্কার বহির্ভূত নহেন। ইংলণ্ডীয় কুইন্‌স বেঞ্চ (Queen's bench) আদালতের এবং উহারই অনুকরণীভূত ভারতীয় হাইকোর্টের দাণ্ডিক (Criminal) বিভাগের প্রত্যেক অধিবেশনে রাজার উপস্থিতি কল্পনা করা হয় ও তাহার উপস্থিতি সূচক রাজকিরীট ও দণ্ড সুরক্ষিত হয়। আজিও ইংলণ্ডীয় প্রধান বিচারপতি রাজকীয় বিবেক রক্ষি (Keeper of King's Conscience) বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন।

ফলতঃ কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিয়া দেখিলেই বোধ হইবে, যে আধুনিক আইনের বহু পূর্ব্ব হইতেই এই সকল ব্যবহার এবং বিচারপতিদিগের ব্যবহার সিদ্ধান্ত সকল স্থিরীকৃত হইয়াছিল। প্রাচীন মধ্যস্থগণ বা পল্লীসমীতি বা প্রাড়্ বিবাক যিনিই মানব জাতির আদিম বিচারক থাকুন না কেন এবং পূর্ব্ব প্রচলিত জনশ্রুতি বৃদ্ধ পরম্পরাগত স্মৃতি বা যে কোন বিধিদ্বারা এই বিচার কার্য্য সাধিত হইয়া থাকুক না কেন, ঐ বিচারক সম্প্রদায়ের প্রত্যেক অধিবেশনেই যে প্রাচীন ব্যবহার সকল অধিকতর দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছিল তাহার সংশয় নাই।

বিবাদ ভঞ্জনের জন্য প্রত্যেক মোকদ্দমাতেই এই প্রাথমিক ব্যবহার সকলের নির্ব্বাচন ও বিশদীকরণ হইত; এবং উত্তরোত্তর বিচারক সম্প্রদায়কৃত এই সকল নির্দ্ধারণ আদিম ব্যবহারমালার টীকার মত অন্যতর ব্যবহার শ্রেণী হইয়া উঠিল। এদিকে আবার রাজ কর্ত্তব্য বিবাদ ভঞ্জন ক্রমশঃ অপর হস্তে ন্যস্ত হইতে

ন্যাসিল। গ্রীক ইতিহাসে প্রাথমিক সমাজ ও প্রাচীন ভারতে বেদপারগ ব্রাহ্মণ * এবং মধ্য সময়ে ইংলণ্ডীয় অলারেজিস (Aula Regis) প্রভৃতি পণ্ডিত সভার হস্তে এই বিচার ভার অর্পিত হয়। ইঁহারাই অনিশ্চিত ও পরস্পর অপ্রাসঙ্গিক প্রাচীন ব্যবহার হইতে ব্যবহার নির্ণায়ক স্মৃতি, সূত্র ও বিধি সকল প্রণয়ন করেন।

ব্যবহার হইতে যেরূপ প্রণালীতে আদিম সূত্র ও স্মৃতি উল্লিখিতরূপে প্রবিত হইয়াছিল, সেই প্রণালীতেই ব্যবহার ও স্মৃতিযুগের পর সংহিতা যুগের প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হয়। সংহিতাকারকদিগের হস্তে বিচার ভার ক্রমশঃ ন্যস্ত হইয়া ইঁহারা তর্ক ও যুক্তি দেখাইয়া প্রাচীন ব্যবহার সকলের শ্রেণীবন্ধন ও অসঙ্গতি দোষ পরিহার করিয়াছিলেন; তাঁহারা আইনের প্রতিষ্ঠাতা নহেন বটে; কিন্তু প্রাচীন ব্যবহার ও স্মৃতির-টীকা এবং তাহার পূর্ণাবয়ব সম্পাদন করিয়াছেন। বিচারকগণ ইহা-দিগের যুক্তিমূলক মত সকল যতই গ্রহণ করিয়াছেন ততই ইহাদিগের প্রমাণ বদ্ধমূল হইয়াছে; প্রাচীন রোমে জষ্টিনিয়ন, ইংলণ্ডে কোক ও লিটলটন, ভারতে মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, বৃহস্পতি, পরাশর প্রভৃতি ঋষিগণের সংহিতা প্রচলিত রহিয়াছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীডঃ——

তরল সমসংস্থান।

পদার্থদর্শনবিৎ পণ্ডিতগণ ভূমণ্ডলস্থ যাবতীয় পদার্থকে স্থূলরূপে তিন ভাগে বিভাগ করিয়াছেন; যথা দৃঢ়, তরল এবং বাষ্পীয়। পৃথিবীতে আমরা যত দ্রব্য দেখিতে পাই, তাহারা এই তিন শ্রেণীর এক শ্রেণীভুক্ত নিশ্চয়ই হইবে। এবং এক বস্তুকে অন্য দুই অবস্থাপন্ন সহজেই করা যাইতে পারে। যেমন জল একটী তরল পদার্থ, ইহাকে দৃঢ় করাও যায় এবং বাষ্পীয় করাও যায়। জল অত্যন্ত শীতল হইলে জমিয়া বরফ হয় এবং অধিক উত্তপ্ত হইলে বাষ্পাকার ধারণ করিয়া বাষ্পে পরিণত হয়। পদার্থের এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা কেবল পরমাণু সংযোগ অনুসারে ঘটিয়া থাকে। অর্থাৎ যে প্রকারে পরমাণু সকল সংযুক্ত থাকে, সেই প্রকারে পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা উৎপন্ন করে।

* শ্রুতাধ্যয়নসম্পন্না ধর্ম্মজ্ঞাঃ সত্যবাদিনঃ। রাজ্ঞা সভাসদঃ কার্য্যা রিপৌ মিত্রে চ যে সমাঃ॥ যাজ্ঞবল্ক্য। তেচত্রয়ঃ কর্ত্তব্যা বহুবচনস্যার্থবত্ত্বাৎ। যস্মিন্দেশে নিষীদন্তি বিপ্রা বেদবিদস্ত্রয় ইতি মনু স্মরণাচ্চ। বৃহস্পতিস্তু সপ্ত পঞ্চ ত্রয়ো বা সভাসদো ভবন্তি। মিতাক্ষরা ২অ ২।

পরমাণু সকলের মধ্যে যখন যোগাকর্ষণের আধিক্য হয়, তখন পদার্থ দৃঢ় অবস্থায় থাকে; যখন তাহাদের মধ্যে বিপ্রকর্ষণের আধিক্য হয়, তখন পদার্থ বাষ্পীয় আকার ধারণ করে; কিন্তু যখন যোগাকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ সমান অংশে পদর্থে অবস্থান করে, তখন পদার্থ তরল অবস্থায় নীত হয়। সুতরাং সকল পদার্থেই এই দুই আকর্ষণ সর্ব্বদাই অবস্থান করে, কেবল পরিমাণের তারতম্যানুসারে পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা ঘটিয়া থাকে। এই সকল আকর্ষণশক্তিকে পারমানবাকর্ষণ কহে।

তরল এবং বাষ্পীয় পদার্থ সমপ্রকৃতিধারী কারণ উভয়ের পরমাণু সকলের মধ্যে ঘর্ষণমাত্রই লক্ষিত হয় না। সেই জন্য ইহাদিগকে বহমান পদার্থ বলিলেও বলা যায়। কিন্তু এই বহমানগুণেরও তারতম্য আছে। কতকগুলি বহমান পদার্থ অত্যন্ত গাঢ় যেমন মধু, আলকাতরা ইত্যাদি। জল অপেক্ষা এলকোহল (Alcohol) অত্যন্ত বহমান। বাষ্পই সর্ব্বাপেক্ষা অত্যন্ত বহমান।

তবে স্থিতিস্থাপকতা গুণের জন্যই তরল হইতে বাষ্পীয় পদার্থ ভিন্ন। বিবেচনা কর, ঘন এক ফুট বাষ্পকে চাপদ্বারা অনায়াসে অর্দ্ধ ফুট করা যায়; বেশী চাপদ্বারা এক ফুটের চতুর্থাংশ করাও যাইতে পারে; কিন্তু চাপ সরাইয়া লইলে উহা পূর্ব্বায়তনবিশিষ্ট হইবেই হইবে। কিন্তু জলে যত চাপ প্রদান করা যাউক না কেন উহাকে কোন প্রকারেই সঙ্কুচিত করা যায় না। সেই জন্য বাষ্পকে স্থিতি স্থাপক বহমান * পদার্থ কহে এবং জল প্রভৃতি তরল বস্তুকে অস্থিতিস্থাপকবহমান † পদার্থ কহে। তরল পদার্থের প্রাকৃতিক নিয়মাবলী শিক্ষা করিতে গেলে দুইটী শাস্ত্রের আবশ্যক। তরল সমসংস্থান এবং তরল গতি-বিজ্ঞান। এ প্রবন্ধে আমরা পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রের অনুশীলন করিব।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, তরল পদার্থ সামান্য বলদ্বারা সঙ্কুচিত হয় না। তরল সমসংস্থান শাস্ত্রের এবং প্রত্যক্ষসিদ্ধনিয়মাবলী অনুসারে ইহা যথার্থ বটে। কিন্তু তাহা বলিয়া উহা যে বেশী চাপ প্রদানে সঙ্কুচিত হয় না তাহা নহে। মনে কর একখানি জাহাজ সমুদ্রগর্ভে ৬০০০ ফুট জলমগ্ন হইয়াছে। সে স্থলে এক বর্গ ইঞ্চি পরিমিত স্থানে জলের ভার প্রায় ১৩২৪ সের পতিত হইতেছে। এক্ষণে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে বিলক্ষণ প্রতীয়মান হইবে যে জাহাজ স্থিত প্রত্যেক বিংশতি ঘন ইঞ্চি পরিমিত জলে এক ঘন ইঞ্চি করিয়া হ্রাস হইয়াছে, অর্থাৎ চাপদ্বারা জল বিংশতি ভাগের একাংশ কমিয়া যায়। যদ্যপি বায়ুর ন্যায় চাপ-

* Elastic fluid.

† Non-elastic fluid.

প্রদত্ত হয় অর্থাৎ যদি এক ইঞ্চি পরিমিত স্থানে ৭।৹ সের ভার প্রদান করা যায়, তাহা হইলে ১০০০০০০ ঘন ইঞ্চি পরিমিত জলে, ৪৫ ইঞ্চি কমিয়া যাইবে।

তরল পদার্থ সমূহের প্রাকৃতিক গুণ সকল বলিতে হইলে, জল একটী প্রধান ও অত্যাবশ্যকীয় তরল পদার্থ বলিয়া উহার বিষয় অগ্রে বলা উচিত। অম্লজান ও অজ্ঞান নামক দুইটী বাষ্পের সংযোগে জল উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা এস্থলে বলিবার আবশ্যকতা নাই। তাহা রসায়নবিদ্যা পাঠে শিক্ষা করা যায়। অম্লজান এবং অজ্ঞান বাষ্পের পরমাণু সংহতি দ্বারা কি প্রকারে জল নির্ম্মিত হইল, ইহাই আমরা এই প্রবন্ধে নির্ণয় করিব। জলের পরমাণু সকল চক্ষুদ্বারা কোন প্রকারে দৃষ্টিগোচর হয় না, সুতরাং বালুকা রাশির সহিত ইহার অত্যন্ত বিভিন্নতা দৃষ্ট হইয়াছে। যত উত্তম বালুকা হউক না কেন, ইহার প্রত্যেক বীজ চক্ষুদ্বারা দৃষ্টিগোচর হয় এবং অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখিলে এক একটী বীজ এক এক প্রস্তর খণ্ড বলিয়া বোধ হয় কিন্তু জলের পরমাণু গুলি এত ক্ষুদ্র যে তাহা কোন প্রকারেই দৃষ্টিগোচর হয় না। বালুকা রাশির পরমাণু মধ্যে বিষম ঘর্ষণ বর্ত্তমান আছে, কিন্তু জলের পরমাণু মধ্যে ঘর্ষণ মাত্র লক্ষিত হয় না। বালুকা রাশির মধ্যে যোগাকর্ষণ শক্তি নাই, কিন্তু জল মধ্যে স্পষ্ট না থাকিলেও যোগাকর্ষণ শক্তি আছে উহা স্বরূপ অনুভূত হইবে। একটী লেখনি বালুকারাশিতে নিমগ্ন কর; পরে উত্তোলন করিলে দেখিতে পাইবে, উহাতে বালুকার একটী পরমাণু ও সংলগ্ন নাই। কিন্তু উহা মসীপাত্রে নিমগ্ন করতঃ তুলিয়া লইলে দেখা যাইবে, যে এক বিন্দু কালী তাহাতে অবশ্যই সংলগ্ন থাকিবে। দৃঢ় এবং তরল পদার্থের বিভিন্নতা বহুবিধ কারণে লক্ষিত হইয়া থাকে। দৃঢ় এবং তরল উভয় পদার্থেরই পরমাণুসমূহ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয় না সত্য, তবে এই কারণে উহাদের মধ্যে বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়, যে জলের পরমাণু সমূহ আপনাপন নিরূপিত স্থান পরিত্যাগ করে না কিন্তু দৃঢ় পদার্থের পরমাণু সমূহ আপনাপন নিরূপিত স্থান পরিত্যাগ করে। ইহা দৃষ্টান্তরিত করা যাইতেছে। জলের দুইটী পরমাণুকে একত্র সংযুক্ত দুইটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলা বলিয়া মনে কর এবং যদাপি উহার একটীকে ঠেলিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে উহা অপরটীর গাত্রে সংলগ্ন হইয়া উহার চতুর্দ্দিকে গড়াইতে থাকিবে। কিন্তু দৃঢ় পদার্থের পরমাণুকে এইরূপে ঠেলিলে উহা অপর পরমাণু হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে, সেই জন্যই দৃঢ় পদার্থ সমূহের নিরূপিত আকৃতি ও গঠন আছে; কিন্তু তরল বা বাষ্পীয় পদার্থের কোনরূপ আকৃতি নাই; যে পাত্রে উহাকে রাখা যায়, তাহারই আকার ধারণ করে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবি, লা, আ।

তত্ত্বসংগ্রহ।

আয়র্লণ্ডের রাজকীয় জ্যোতির্বেত্তা প্রোফেসর বল (Prof. Ball) সম্প্রতি এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন—বর্ত্তমান কালে চন্দ্র পৃথিবী হইতে ২৪০০০০ দুইলক্ষ চল্লিশ হাজার মাইল দূরে অবস্থিতি করে; কিন্তু এমন এক সময় ছিল, যখন চন্দ্র ইহার এক ষষ্ঠাংশ অর্থাৎ ৪০০০০ চল্লিশ হাজার মাইল মাত্র দূরে ছিল। প্রত্যহ জোয়ারের সময় সমুদ্রে যে জগদ্ব্যাপী বিপুল তরঙ্গ উত্থিত হয়, তাহা এক্ষণে যদ্যপি ৩ ফুট উচ্চ হয়, তাহা হইলে চন্দ্রের সান্নিধ্য বশতঃ পূর্ব্বকালে যদ্যপি ঐ তরঙ্গ ২১৬ গুণ বড় হইত বলিয়া ধরা যায়, তবে স্পষ্টই বুঝা যায় সে সময়ে জোয়ারে সমুদ্রের জল ৬৪৮ ফুট উঁচু হইতে। অতি প্রাচীন কালে যে এইরূপ এবং ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী উঁচু জোয়ার হইত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই মহাব্যাপার পৃথিবীর ভূতত্ত্বে কি পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে একবার দেখা যাউক। পৃথিবীর বাসযোগ্য স্থান সমুদায় সচরাচর সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৫০০ ফুট উঁচু; অতএব তখনকার বার আনা রকম জোয়ার হইতে না হইতেই বড় বড় জনপদ জলে ডুবিয়া যাইত; এবং পূরা জোয়ারের সময় আমাদের মস্তকের উপর প্রায় দেড়শত ফুট জল উত্থিত হইত। আবার ঘণ্টা কতককর মধ্যে ভাঁটার সময় এই সমস্ত জল রাশি জনপদ ছাড়িয়া, সাগর উপকূল ছাড়িয়া, বহুদূরে অপসৃত হইত, এবং জল সরিয়া যাওয়ায় কত কত দেশ মহাদেশ, দ্বীপ উপদ্বীপ, একসা হইয়া গিয়া এক সুবিস্তীর্ণ শুষ্ক ভূমি খণ্ডে পরিণত হইত। পুনরায় কিছুক্ষণ পরে এই বিস্তীর্ণ ভূভাগ পূর্ব্বের ন্যায় মহাপ্লাবনে প্লাবিত হইত।—(Phrenological Journal, May 1882.)

লিখিবার কালিতে ছাতা পড়া নিবারণ করিবার উপায় কালির বোতলে দুই চারিটা লবঙ্গ ফেলিয়া রাখা। কোঁটা কতক যে কোন (Essential oil) নামক তৈল মাখাইয়া রাখিলে চামরায় ছাতা ধরে না। (এইরূপ তৈল ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।) শেষোক্ত উপায় দ্বারা বাঁধান পুস্তকাদিতে ছাতা পড়া অনায়াসে নিবারণ করা যাইতে পারিবে। —(Indian World.)

রাসায়নিক ক্রিয়া মাত্রেই প্রায় তাপ নির্গত হইয়া থাকে। ইহার প্রমাণ স্বরূপ সলফুরিক আসিডের (Sulphuric acid) সহিত জল মিশ্রণ কালে ও গোঁড়া চুণে জল ঢালিয়া দিলে যে তাপ নির্গত হয়, ইহা রসায়ন পাঠক মাত্রেই জানেন। তেঁতুলের সঙ্গে, পানের সহিত খাইবার চুণ মিশ্রিত করিলে ও ঐরূপ তাপ নির্গত হয় এবং হাতে বেশ উত্তাপ অনুভব করা যায়। বাঁধিবার হাঁড়ির তলা ফাটিয়া গেলে এইরূপ তেঁতুল ও চুণ মিশাইয়া লাগাইয়া দিয়া ফাটা হাঁড়ি আঁটিয়া থাকে।

জ্যোতিষ-শাস্ত্র।

নভোমণ্ডলস্থ জ্যোতিঃ সংক্রান্ত বিবিধ বিষয়ের বিদ্যাকে জ্যোতির্ব্বিদ্যা কহে ও ঐ বিদ্যার উপদেশ যে শাস্ত্রে পাওয়া যায় তাহার নাম জ্যোতিষ-শাস্ত্র। অন্যান্য শাস্ত্রের ন্যায় জ্যোতিষ শাস্ত্রও মনুষ্যজাতির আদিম অবস্থায় অঙ্কুরিত ও জ্ঞানোন্নতির সহিত ক্রমশঃ পরিশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া বর্ত্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। সূর্য্য চন্দ্র ও অন্যান্য জ্যোতির্গণের প্রকৃতি এরূপ অদ্ভুত ও বিস্ময়জনক যে ইহা সচেতনমাত্রেরই মন আকৃষ্ট করে। মনুষ্যের আদিমঅবস্থায় ইহা সকলজাতিকেই আকর্ষণ করিয়াছিল এবং সকল জাতিরই বিদ্যাবুদ্ধি অনুসারে এই শাস্ত্র বিষয়ক কিছু কিছু জ্ঞান ছিল। অতএব কাল্‌ডীয়, মিশর, চীন, ভারতবর্ষ, গাল, পেরুবীয় প্রভৃতি প্রাচীন জাতির প্রত্যেকেই যে আপনাদিগকে জ্যোতিঃ শাস্ত্রের প্রথম প্রবর্ত্তক বলিয়া মনে করে তদ্বিষয়ে কিছুই আশ্চর্য্য নাই। যদিও অন্যান্য জাতির গ্রন্থাদিতে তাহাদেরপক্ষে বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না, তথাপি ৫০০০বৎসরেরও পূর্ব্বতন বলিয়া নির্ণীত শ্রুতি শাস্ত্রে তাহার প্রমাণ স্বরূপ হিন্দুদের পূর্ব্বপুরুষের বা আর্য্যজাতির এই শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তির লক্ষণ দৃষ্ট হয়। যখন এত প্রাচীনগ্রন্থে এরূপ উন্নতি দেখা যায় তখন যে বহুকাল পূর্ব্বহইতে আর্য্যজাতির মধ্যে এই শাস্ত্রের আলোচনা হইয়া আসিতেছে ও পৃথগ্‌ভূত এবং নিকবর্ত্তী অন্যান্য উন্নত জাতি সমুদায়েও তাদৃশ আলোচনা চলিবার সম্ভাবনা ছিল, তদ্বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ করিবার কিছুই নাই।

ভারতবর্ষে আর্য্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত, বরাহমিহির, মুঞ্জাল, ভট্টোৎপল, শ্বেতোৎপল, বরুণভট্ট, ভোজরাজ, ভাস্কর, কল্যাণচন্দ্র প্রভৃতি, গ্রীসদেশে থেল্‌স, এনেক্সিগোরস, মিটিয়ন, প্লেটো,রোবাক্‌, আরিষ্টটল সিথিউস প্রভৃতি,মাসিডনে আরিষ্টিলন,ইউক্লিড্‌, আর্কিমেডিস্‌, হিপার্কস, টলেমি প্রভৃতি, আরবে আলবার্টগাল, ইবন্‌জুনিয়স্‌, উলুকবেগ্‌ প্রভৃতি, ও ইদানীং সমস্ত ইউরোপের মধ্যে পর্ব্বাচ্‌, কেপ্‌লার, গালিলিও, হরক্স, কাসিলি, নিউটন, ব্রাড্‌লি, সিবিলি,লিলি, হার্সেল, ডিলাম্বার,ড্যানেম্বার্ট, ইউলার, লাগ্রেঞ্জ, লাপ্লাস্‌, ইয়ং, টিণ্ডাল প্রভৃতি প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্‌ গণ প্রাদুর্ভূত হইয়া এই শাস্ত্রের মহৎ উন্নতীসাধন করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে উন্নত জ্যোতিষ সাধারণের বোধের নিমিত্ত নিম্নে সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইতেছে। আমরা স্থলে স্থলে আর্য্যদিগের জ্যোতিষের সহিত ইহার তুলনা করিব।

জ্যোতিষ শাস্ত্র তিন প্রকারে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ১ গণিত জ্যোতিষ, এতদ্বারা গ্রহনক্ষত্রাদির আকার সংস্থাপনাদির যথার্থ তত্ত্ব গণিতাঙ্কর দ্বারা বিশিষ্ট

রূপে নির্ণয় করা যায়; ২ প্রাকৃত জ্যোতিষ, এতদ্বারা গ্রহনক্ষত্রাদির প্রকৃতি অর্থাৎ তাহাদের গতি, বেগ ও অন্যান্য গ্রহের সহিত তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ নির্ণয় করা যায়। ৩। ধ্রুবজ্যোতিষ, এতদ্বারা ধ্রুব অর্থাৎ গতিহীন নক্ষত্রাদির বিবরণ অবগত হওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন ব্যবহার জ্যোতিষ নামেও আর এক বিভাগ করা যাইতে পারে। এতদ্দ্বারা জ্যোতিষ শাস্ত্র সম্পর্কীয় নানা প্রকার যন্ত্র, জোতিষিক নিয়ম ও গণনার প্রক্রিয়া জানা যায়। প্রকৃত জ্যোতিষ না জানিয়াও এই নিয়মাদি অবগত হইয়া জ্যোতির্ব্বিদের ন্যায় কার্য্যকরা যায়, এজন্য ইহার নাম ব্যবহার জ্যোতিষ বলা যাইতে পারে।

ভারতবর্ষীয় প্রাচীন পণ্ডিতেরা জ্যোতিষ শাস্ত্রকে প্রথমতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করেন, যথা ফলিত ও সিদ্ধান্ত; যাহাদ্বারা গ্রহনক্ষত্রাদির সঞ্চারাদি দর্শনে পৃথিবীস্থ প্রাণিগণের ভাবি অবস্থা ও মঙ্গলামঙ্গল নির্ণয় করা যায় তাহার নাম ফলিত ও যাহাদ্বারা স্পষ্ট ও অভ্রান্তরূপে গণনা করিয়া গ্রহ নক্ষত্রাদির গতিসংস্থানাদির নিয়ম,তাহাদের প্রকৃতি ও তজ্জন্য ফলাফল দৃঢ়রূপে সিদ্ধান্ত করা যায়,তাহার নাম সিদ্ধান্ত; অতএব দেখা যাইতেছে যে ইংরাজদের Astrology ও Astronomy যথাক্রমে ইহাদের ফলিত ও সিদ্ধান্ত। সিদ্ধান্ত জ্যোতিষকে আর্য্যেরা গণিত জ্যোতিষও কহিতেন। যথা "দ্বিবিধ গণিতমুক্তং ব্যক্তমব্যক্তরূপম্" ইত্যাদি সিদ্ধান্তশিরোমণি গোলাধ্যায়। অতএব ইহাদের মতে গণিত বা সিদ্ধান্ত জ্যোতিষ দুই প্রকার ব্যক্ত ও অব্যক্ত। যদ্দ্বারা গ্রহনক্ষত্রাদির আকার, সংস্থান, সঞ্চার, বেগ ও গ্রহান্তরের সহিত সম্বন্ধ ও তজ্জন্য ফলাফল, গণিত অঙ্কদ্বারা বিশেষ রূপ ব্যক্ত করা যায়, তাহার নাম ব্যক্ত ও তদন্যতরের নাম অব্যক্ত।

সিদ্ধান্ত জ্যোতির্ব্বিদেরা ফলিত জ্যোতিষের নিন্দাবাদ করিয়াছেন। সিদ্ধান্ত শিরোমণি কহেন যে গণিতশাস্ত্রের একদেশ মাত্র জাতক সংহিতা; সমস্ত জানিয়াও যে ব্যক্তি অনন্তযুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত জ্যোতিষ না জানেন, তিনি চিত্রময় রাজা অথবা কাষ্ঠময় সিংহের তুল্য।

গণেশ বলেন জন্মকালীন গ্রহ নক্ষত্রাদির অবস্থান দর্শনে এই কালে আমার সুখ এই কালে আমার দুঃখ হইবে, ইহা জানিয়া কোন ফল নাই। সে বিষয় এত নিষ্প্রয়োজন যে সে বিষয়ে বিচারও কর্ত্তব্য নহে। ফলতঃ সুখ দুঃখের সময় জ্ঞানও সম্ভাবিত নহে।

আমরাও সে বিষয়ের বিচারে এখন প্রবৃত্ত হইব না। এখন কেবল সিদ্ধান্ত জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় প্রস্তাব লইয়া অবতরণ করিব।

আমরা আকাশের দিকে নেত্রপাত করিলে চতুর্দ্দিকে অসংখ্য নক্ষত্রপুঞ্জ অবলোকন করিয়া থাকি। এই সকল নক্ষত্রপুঞ্জ ঘণ্টায় ঘণ্টায় প্রথম দৃষ্ট স্থল হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পশ্চিমে অপসৃত হইয়া যায়, দেখিলে বোধ হয় যেন কোন গোলযন্ত্রে এই সকল নক্ষত্র আছে ও তাহার অপসরণে এই সকল নক্ষত্রপুঞ্জ ক্রমশঃ পশ্চিমাভিমুখে অপসৃত হইয়া শেষে অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে এবং উহার অপর পার্শ্বস্থ নক্ষত্ররাজি ক্রমশঃ দৃশ্যমান হইতেছে। যখন দক্ষিণদিকে নেত্রপাত করি, তখন দেখি যে যে সকল নক্ষত্র পূর্ব্ব দক্ষিণে উদিত হইয়াছে, ঐ সকল নক্ষত্র ক্রমশঃ যখন অত্যুচ্চে উঠে, তখন দক্ষিণদিকে দৃষ্ট হয় ও শীঘ্র শীঘ্র দক্ষিণ পশ্চিমে গিয়া অস্ত যায়। আবার যখন উত্তরদিকে দেখি তখন দেখিতে পাই, যে কতকগুলি নক্ষত্রদল সমস্ত রজনীই এক নির্দ্দিষ্ট স্থলের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করে ও ঐ নির্দ্দিষ্ট স্থলের দূরত্ব অনুসারে বৃহৎ বা ক্ষুদ্র গোল পথ পরিভ্রমণ করে। এইরূপ দেখিতে দেখিতে আমরা আনায়াসেই জানিতে পারি যে, একদিনের মধ্যেই উহার একবার ভ্রমণ সম্পন্ন হয়। এই ভ্রমণ কাল ঠিক্ যে আমাদের দিনের সমকাল তাহা নহে। কারণ যদিও প্রত্যেক দিন উদয় কালে ঐ সকল নক্ষত্রপুঞ্জকে প্রায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি বিশেষ রূপে নিরীক্ষণ করিলে দেখা যাইবে যে ঐ নক্ষত্রপুঞ্জের ঐ ঐ স্থলে উদয় প্রত্যহ ঠিক এক সময়ে হয় না। প্রতিদিন প্রায় ৪ মিনিট করিয়া অন্তর হইয়া যায়। অতএব আমাদের দৃষ্টিতে প্রায় ১৫ দিনে উহাদের (৪ × ১৫ = ৬০) এক ঘণ্টায় ও ত্রিশ দিনে দুইঘণ্টায় পরিভ্রমণ হয়, এবং একবৎসরে উহাদের ভ্রমণ সম্পূর্ণ হইয়া যায়। তখন উহাদিগকে পূর্ব্বে যে যে স্থলে যে যে সময়ে দেখা গিয়াছিল, পুনর্ব্বার সেই সেই সময়ে সেই সেই স্থলে দেখা গিয়া থাকে।

উপরে লিখিত বাক্যদ্বারা বোধ হইতেছে যে সূর্য্যের সহিত এই সমুদয় ভুপঞ্জর আপন আপন কীলকে থাকিয়া সূর্য্য অপেক্ষা প্রায় ৪মিনিট ন্যূন চব্বিশ ঘণ্টায় পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করিয়া পরিভ্রমণ করিতেছে। বস্তুতই উহারা পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করে কি না তাহা জানিবার উপায় প্রথমতঃ একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে থাকিয়া বিশেষ সতর্ক হইয়া পরিদর্শন; ও দ্বিতীয়তঃ স্থানান্তর হইতে পরিদর্শন করিলে পূর্ব্ব-দর্শন ফলের সহিত কিরূপ প্রভেদ হয় তাহার পরীক্ষা; প্রথম প্রকার পরিদর্শনের নিমিত্ত আকাশের দৃষ্টি সীমা বন্ধক দৃশ্যমান কোন চক্র স্থির করিতে হয়। দর্শক যেখান হইতে ঐ চক্র স্থির করেন, ঐস্থল ঐ চক্রের ঠিক মধ্যস্থল ও তাঁহার দৃষ্টিরেখা সকল ঐ বৃত্তের ব্যাসরেখা। ঐ আকাশচক্র অচলও অভ্রমণশীল; সুতরাং ইহাতে ভ্রমণশীল নক্ষত্রবৃন্দের গতিবিধি অনায়াসেই লক্ষিত ও স্থিরীকৃত হইতে পারে।

দক্ষিণ ভাগে যে আকৃতি দর্শন করিতেছ, মনে কর প উ পূ দ ইহার দর্শচক্র,উ উত্তর,দ দক্ষিণ,পূ পূর্ব্ব, ও প পশ্চিম। দনিউ ও পনিপূ পরস্পর সমকোন করিয়া আছে, শি চিহ্নিত স্থল দর্শকের ঠিক উপরিভাগে উহার নাম শিরোবিন্দু, যদি কে চিহ্ন শিকেউ এই বৃত্তচতুর্থাংশের এমন স্থলে দেওয়া যায় যে কেউ ৫১॥ অংশ হয়, যে উহা আকাশের এরূপ একটী নিকৃষ্ট স্থল হয়
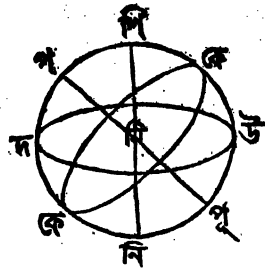
যে কেনিকে দৃশ্যমান নক্ষত্রমণ্ডলের মধ্যস্থ কাল্পনিক কীলকস্বরূপ হয়, তাহা হইলে কেকে চিহ্নদ্বয়কে আকাশের কেন্দ্র কহা যায়, তন্মধ্যে কে কেন্দ্রকে নিকটস্থ দর্শকের দৃষ্ট কেন্দ্র ও কে কেন্দ্রকে অদৃষ্ট কেন্দ্র বলে, কারণ পূর্ব্বোক্ত কেন্দ্র দর্শকের দৃষ্টিপথে ও শেষোক্ত দৃষ্টির বহির্ভূত কেকে রেখাকে কেন্দ্রকীলক বলা যায়। ও উপূদপ বৃত্তে সমকোনকৃৎ নির্ব্যূদ্ধ রেখার ব্যূর্দ্ধবিন্দুকে ব্যূর্দ্ধ কহা যায়, ও নিনী রেখার নীবিন্দুকে নীচবিন্দু কহা যায়। অন্য যে কোন বৃহৎ বৃত্ত ব্যূনীর মধ্য দিয়া যায়, যেমন দনীউব্যূ, অথবা পনীপূব্যূ, তাহাকে দণ্ডবৃত্ত (vertical circle) কহে। যে দণ্ডবৃত্ত দব্যূকেউনী দিয়া গমন করে, তাহাকে ব্যূর্দ্ধবৃত্ত (meridian circle) কহে ও উহার তলকে (meridian) কহে; সূর্য্য এই বৃত্তস্থ হইলে ঠিক মধ্যাহ্ন হয়।

যে সকল নক্ষত্র অস্ত যায় না তাহাদিগকে ধ্রুবনক্ষত্র বলে। ঐ সকল নক্ষত্র বস্তুতঃ যে কোন কক্ষ ভ্রমণ করে না এমন নয়, কিন্তু উহাদের ভ্রমণপথ ঊর্দ্ধে পৃথিবীর চক্রের সমান্তরালও এত দূরবর্ত্তী যে তাহারা সেখানে পরিভ্রমণ করিলেও আমাদের চক্ষে সততই এক স্থলে দৃষ্ট হয়। ঐ স্থলটীকে আমরা আকাশস্থ উত্তর কেন্দ্র কহি। ঐ স্থল হইতে আমাদের দিকে যে সরল রেখা মনে করা যায়, ঐ রেখার পরিবর্দ্ধন কল্পনা করিলে আমাদের নীচে ও ব্যবস্থানের ঠিক বিপরীত দিকে যে স্থল তাহাকে আমরা দক্ষিণ কেন্দ্র কহি। এই দুই স্থল ঐ কল্পিত রেখার সীমাবিন্দু বা অক্ষ। নক্ষত্র পঞ্জর (axis) প্রত্যহ এই সীমাবিন্দুর অন্তর্গত ঐ কল্পিত রেখার চতুর্দ্দিকে প্রত্যহ নক্ষত্রমণ্ডল পরিভ্রমণ করে। ঐ সীমাবিন্দুদ্বয় পৃথিবীর কেন্দ্র ও বিষুবরেখাতে দুই সমকোণ করিয়া অবস্থিত; পৃথিবীর যে কোন স্থল হইতে ঐ কেন্দ্রদ্বয় ঐ একই ভাবে দৃষ্টিগোচর হয়, গ্রহাদি স্থলের ন্যায় তাহার কোন পরিবর্ত্তন হয় না।

আকাশের প্রায় উত্তর কেন্দ্রে যে একটী উজ্জ্বল নক্ষত্র আছে তাহাকে ভারতবর্ষীয় প্রাচীন পণ্ডিতেরা উত্তরধ্রুব, ধ্রুবতারা বা ধ্রুবনক্ষত্র কহেন। প্রাচীন পণ্ডিতেরা নক্ষত্র চয়ের পরিচয়ার্থ চিত্র প্রস্তুত করিতেন ও পর পর দৃশ্য নক্ষত্রচয়ের মূর্ত্তি একত্র

দৃষ্ট হইলে মৎস্যাকৃতি দেখাইত বলিয়া ঐ মুর্ত্তিকে ধ্রুবমৎস্য কহিতেন; "কিং গণ্যং তব বৈগুণ্যং দ্বৈগুণ্যং যো বৃথা কথা। ভার্কেন্দুনাং বিলোক্যাহ্না ধ্রুবমৎস্য পরিক্রমং॥" ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা উহাকে ভল্লুকাকৃতি বোধে বেয়ার (bear) বলিতেন।

নিম্নে তাহার প্রতিকৃতি দেওয়া গেল।—
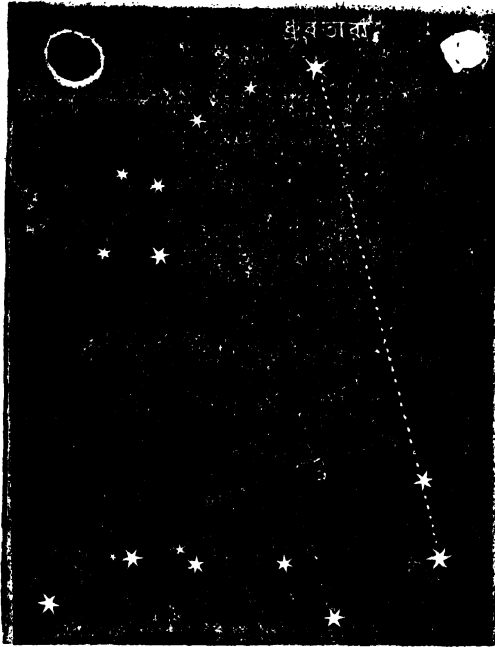
বামদিকের প্রতিকৃতিকে little bear ও দক্ষিণদিকেরটীকে great bear কহিতেন। ক্ষুদ্রভল্লুকের লাঙ্গুলাগ্রভাগে যে একটি তারা দেখা যায়, উহাই ধ্রুবতারা। ইহাকে অনায়াসেই চেনা যায়। সপ্তর্ষিমণ্ডল বা সাতভেয়ে বলিয়া প্রসিদ্ধ যে সাতটি নক্ষত্র আছে, তদ্বারাই ইহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া গিয়া থাকে। ঐ সাতভাইচম্পা যেখানে থাকুক না কেন, যদি উহাদের মধ্যে ক ও খ চিহ্নিত নক্ষত্রদ্বয়ের মধ্যে একটী রেখা কল্পনা করা যায়, ও ঐ রেখা বর্দ্ধিত করা যায়, তবে উহা ধ্রুব নক্ষত্রের অতি নিকট-বর্ত্তী হয়। এই জন্যে ঐ দুই নক্ষত্রকে প্রদর্শক নক্ষত্র কহে।

এই সপ্তনক্ষত্র গ্রেটব্রিটেনে অস্তগত হইয়া অদৃশ্য হয় না। কখন কখন উহাদি-গকে ধ্রুব ও কুচক্রের মধ্যে কখন কখন ধ্রুবের পূর্ব্ব বা পশ্চিম আকাশের উচ্চতর ভাগে প্রায় শিরোবিন্দুর নিকট দেখা গিয়া থাকে।

যদি উত্তর দিক্‌টী জানা থাকে তবে ধ্রুবনক্ষত্র অনায়াসেই চিনিতে পারা যায়। আমাদিগের দেশ হইতে দৃষ্টি করিলে কুচক্রের কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে নিয়ত স্থিরভাবে যে

নক্ষত্রকে দেখি তাহাই ধ্রুবনক্ষত্র। দক্ষিণ কেন্দ্রের দিকেও ঐ রূপ ধ্রুবনক্ষত্র আছে। এবিষয়ে ভাস্করাচার্য্য কহেন ;—

"নিরক্ষদেশে ক্ষিতিমণ্ডলোপগৌ ধ্রুবৌ নরঃ পশ্যতি দক্ষিণোত্তরৌ।
তদাশ্রিতং খে জলযন্ত্রবত্তথা ভ্রমদ্ভচক্রং নিজমস্তকোপরি॥
উদগ্দিশং যাতি যথা যথালয়স্তথা তথাস্যান্নতমৃক্ষমণ্ডলং।
উদগ্ধ্রুবং পশ্যতি চোন্নতং ক্ষিতে স্তদন্তরে যোজনজাঃ ফলাংশকাঃ॥"

উদগ্দিশং যাতি যথা যথা নর ইত্যনেন অপসার যোজনৈরনুপাতঃ সূচিতঃ, যদি ভূপরিধি যোজনৈশ্চক্রাংশা লভ্যন্তে তদাপসারযোজনৈঃ কিমিতি ফলমক্ষাংশাঃ। যদি চক্রাংশমিত পরিধিনা ভূপরিধিলভ্যতে তদা অক্ষাংশৈঃ কিমিতি ফলং নিরক্ষ-দেশ স্বদেশারন্তর যোজনানি স্যুঃ, শেষং স্পষ্টং। এবং নিরক্ষদেশাৎ ক্ষিতি চতুর্থাংশে কিল মেরুস্তত্র নবতিঃ (৯০) ফলাংশাঃ।

অতএব যে স্থান হইতে চক্র দৃষ্ট হয়, সেই স্থানের অক্ষাংশের যে পরিমাণ, চক্র হইতে কেন্দ্রের উচ্চতারও সেই পরিমাণ।

যেমন পৃথিবীর উত্তর দক্ষিণ বিন্দুকে কেন্দ্র করিয়া পৃথিবীর সমস্ত স্থানের মান-চিত্র করা যায়, সেইরূপ ঐ দুই কেন্দ্রকে সৌরজগতের কেন্দ্র করিয়া সমুদয় সৌর-জগতের ও আকাশের মানচিত্র করা যায়।
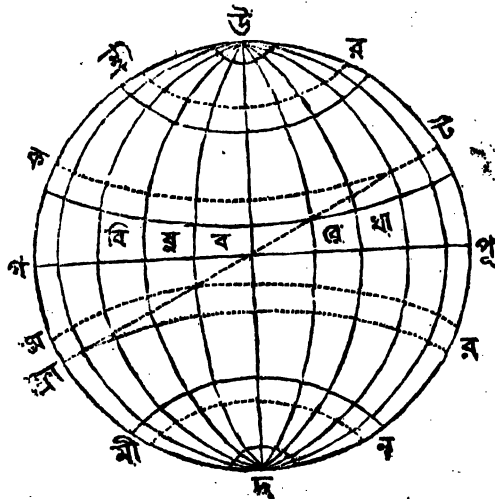
উপরিলিখিত মানচিত্র আকাশের মানচিত্র হইয়াছে। ইহার মধ্যস্থানে পৃথিবী। পৃথিবীর উত্তর দিক্ ইহার উত্তর দিক্ যথা উ, এইরূপ পূ, দ, প, ক্রমান্বয়ে পূর্ব্ব,

দক্ষিণ ও পশ্চিম। উ ও দ ইহার দুই কেন্দ্র, ঐ কেন্দ্রদ্বয় হইতে সমান দূরবর্ত্তী যে খতলস্থ বৃত্ত, তাহাকে বিষুবদ্বৃত্ত ও যে কল্পিত রেখা দ্বারা ঐ বৃত্ত হয়, তাহাকে বিষুবদ্রেখা বা বিষুবরেখা বলে। সূর্য্য এই স্থলে গমন করিলে (অথবা পৃথিব্যাদির গতি ও এই স্থল অবস্থিত হইলে) উহা আকাশের ঠিক্ মধ্যস্থলে অবস্থিত হয়। সুতরাং ঐ সময়ে পৃথিবীর সর্ব্বত্র দিন ও রাত্রি সমান হয়। পৃথিবীর বার্ষিক গতি বশতঃ সূর্য্যের বৎসরে দুইবার অর্থাৎ ১১ ই আশ্বিন ও ১১ ই চৈত্রে, ইং ২০ মার্চ্চ ও ২২ সেপ্টেম্বরে, ঐ রেখা উপরিস্থ হইতে হয়।

খগোলস্থ যে সমস্ত কল্পিত রেখা বা বিষুবরেখার সমান্তরাল, তাহাদিগকে অপম সম বা অপম চক্র বলে ও যে মণ্ডলাকার পথ দিয়া সূর্য্য পরিভ্রমণ করে তাহাকে ক্রান্তিকক্ষ কহে।

ক্রান্তিকক্ষ ও বিষুবরেখার মিলনে যে কোন হয়, তাহা ২৩॥০ অংশ পরিমিত। এখান হইতে সূর্য্য উত্তরায়ণ পথে ৬৬॥০ অংশ পর্য্যন্ত দূরে গমন করে। এইরূপ দক্ষিণায়ন পথে ও ৬৬॥০ অংশ পর্য্যন্ত গমন করে। সুতরাং খগোলস্থ উত্তর কেন্দ্র হইতে সূর্য্যের ১১৩॥ অংশ পর্য্যন্ত দূরে গতি হইয়া থাকে।

২১ এ জুন দিবসে সূর্য্য উত্তরায়ণের সুদূর স্থলে গমন করে ও তখন কর্কট রাশিতে সমমণ্ডলস্থ (vertical) হয়। ২১ এ ডিসেম্বর তারিখে যখন দক্ষিণায়নের সুদূর পথে উপস্থিত হয়, তখন capricorn সমমণ্ডলস্থ হয়, এবং যখন বিষুবরেখার উপরে আসে, তখন বিষুবরেখার সমমণ্ডলস্থ হয়।

ক্রান্তিকক্ষের উত্তরাংশে যে স্থলে জুন মাসে সূর্য্যোদয় হয়, উহার কিঞ্চিৎ দক্ষিণে যে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র উদিত হয়, তাহাকে কপিল বলে। এই কপিল নক্ষত্র বৃহৎ ভল্লুকের পশ্চিমাংশে ও উত্তরকেন্দ্রের অনেক দূরে অবস্থিত।

বিষুবরেখা হইতে আকাশস্থ নক্ষত্রাদির, দক্ষিণ বা উত্তরদিকে যে দূরত্ব, তাহাকে অপম বলা যায়, যখন সূর্য্য ২১ এ জুনে ২৩॥০ অংশ উত্তর পথে অবস্থিত। অতএব আকাশমণ্ডলের অপম পৃথিবীর অক্ষাংশের তুল্য।

যে সকল বৃত্ত খগোলস্থ দুই কেন্দ্রের মধ্যে কল্পনা করা যায়, তাহাদিগকে হোরা চক্র (celestial meridian) বলে। সমমণ্ডল অর্থাৎ প্রথম হোরাচক্র হইতে জ্যোতির্মণ্ডলের যে পূর্ব্বাভিমুখে দূরত্ব, তাহাকে বিক্ষেপ বলা যাইতে পারে (Right Ascension); বিক্ষেপ ভূগোলের দীর্ঘাক্ষের (Longitude) তুল্য। কিন্তু পৃথিবীর দ্রাঘিমা যেমন পূর্ব্ব পশ্চিম উভয় দিক হইতে গণনা করা যায়, বিক্ষেপ পাত নির্ণয় সেরূপ করিয়া হয় না, ইহার গণনা পূর্ব্বদিকের ০° স্থল হইতে আরম্ভ করিয়া পুনর্ব্বার ঐ ০°

শূন্যস্থলের নিকটবর্ত্তী ৩৬০ অংশে শেষ হয়। যে স্থলে সূর্য্য (২০এ মার্চ্চে) বিষুবরেখায় গমন করেন, যে স্থলে মেষরাশির প্রথম গৃহ (কোষ্ঠ) বলিয়া প্রসিদ্ধ, যে স্থলে সূর্য্যের আগমনে বসন্তকালে দিন রাত্রের ইংরাজিতে যে স্থানকে Vernal বা Spring পরিমাণ সমান হয় বলিয়া (Equinox) বাসন্তিকসাম্য বলা যায়, সেই স্থল দিয়া যে হোরা বৃত্ত চলিয়া যায়, তাহাকে প্রথম হোরাচক্র বলা যায়। পূর্ব্বপ্রদর্শিত মানচিত্রে প পূ যদি বিষুবরেখা মনে করা যায় এবং ক্রান্তিকে ক্রান্তিবৃত্ত মনে করা যায়, তবে মানচিত্রের ঠিক মধ্যস্থ যে অংশে ঐ উভয় বৃত্তের সম্পাত হইয়াছে, তাহাকেই মেষরাশির প্রথম কক্ষ, বাসন্তসম্পাত অথবা মহাবিষুব সংক্রান্তি কহে। ঐ খানেই সূর্য্যের সংক্রমন হইলেই দিন রাত্রি পরিমাণের সমতা হয়। এইরূপ স্থল ভেদ করিয়া যে হোরাচক্র গমন করে, যাহা উদ রেখা দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাকে প্রথম হোরাচক্র বলে। এই প্রথম হোরাচক্রই মেষ রাশির প্রথম কক্ষ, ইহাই ১ লা বৈশাখ; এখান হইতে আমাদের নববর্ষ আরম্ভ হয়। বিক্ষেপাংশের পরিমাণ ও প্রতি ১৫ অংশে হোরার পরিমাণ ঐ সকল চক্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

ঐ মানচিত্রের গোলে ৩৬০ অংশ আছে। ২৪ ঘণ্টায় ঐ সমুদয় অংশ একবার ঘুরিয়া যায়। একারণ খগোলের প্রতি অংশ ঘণ্টায় ১৫ অংশ পশ্চিমে যায়। অতএব হোরাচক্রকে অংশ না বলিয়া কখন কখন হোরা বা ঘণ্টা বলা যায়। সময়ের সহিত পৃথিবীর দ্রাঘিমারও এইরূপ সম্পর্ক আছে। দীর্ঘাংশের প্রতি অংশ ঘণ্টায় ১৫ অংশ পূর্ব্বদিকে সরিয়া যায়।

ক্রান্তিচক্র দ্বাদশ সমভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক ভাগ ৩০ অংশের তুল্য। এই সকল ভাগের নাম রাশিপ্রকোষ্ঠ। মেষ রাশির প্রথমাংশ হইতে ইহার গণনা আরম্ভ হয়। নিম্নবর্ত্তী তালিকায় ঐ সকল রাশির নাম ও তন্মধ্যে সূর্য্যের প্রবেশ কাল প্রদর্শিত হইতেছে।

অবরোহণ
১ মেষ ১ বৈশাখ ২০মার্চ মহাবিষুব বাসন্ত সংক্রান্তি, সর্ব্বত্র দিবা রাত্র সমান।
২ বৃষ, ১ জ্যৈষ্ঠ, ২০ এপ্রেল, বিষ্ণুপদী।
৩ মিথুন, ১ আষাঢ়, ২১ মে, ষড়শীতি।

উৎক্রেপ আরোহণ
৪ কর্কট, ১ শ্রাবণ, ২১ জুন, দক্ষিণায়ণ গ্রীষ্ম সংক্রান্তি, গ্রীষ্মের মধ্যভাগ।
৫ সিংহ, ১ ভাদ্র, ২৩ জুলাই, বিষ্ণুপদী।
৬ কন্যা, ১ আশ্বিন, ২৩ আগষ্ট, ষড়শীতি।
৭ তুলা, ১ কার্ত্তিক, ২৩ সেপ্টেম্বর, জলবিষুব শারদ সংক্রান্তি, সর্ব্বত্র দিবারাত্র সমান।
৮ বৃশ্চিক, ১ অগ্রহায়ণ, ২৩ অক্টোবর, বিষ্ণুপদী।
৯ ধনু, ১ পৌষ, ২৩ নবেম্বর, ষড়শীতি।

শিশির অবরোহণ
১০ মকর, ১ মাঘ, ২২ ডিসেম্বর, উত্তরায়ণ সংক্রান্তি শীতসংক্রান্তি, দক্ষিণ গোলার্দ্ধে গ্রীষ্ম।
১১ কুম্ভ, ১ ফাল্গুন, ২১ জানুয়ারি, বিষ্ণুপদী।
১২ মীন, ১ চৈত্র, ১৮ ফেব্রুয়ারি, ষড়শীতি।

সমতা, বৎসরের মধ্যে আর একবার শরৎকালে হইয়া থাকে। ২৩এ সেপ্টেম্বর বা ১লা কার্ত্তিক সংক্রান্তি, সূর্য্য যখন তুলার প্রথম প্রকোষ্ঠে সংক্রমণ করেন, তখনই ঐ রূপ দিনরাত্রের সাম্য হয়; তুলারাশির ঐ স্থানের নাম জলবিষুব সংক্রান্তিস্থল।

১লা শ্রাবণ বা ২১ এ জুনে সূর্য্য কর্কট রাশিতে যে স্থানে গমন করিয়া সমমণ্ডলস্থ (vertical) হন। ঐ স্থানের নাম দক্ষিণায়ন সংক্রান্তি, ঐ স্থান হইতে সূর্য্য পুনরায় দক্ষিণে সংক্রমণ করেন; এজন্য ঐ স্থানকে দক্ষিণায়ন সংক্রান্তি বলা যায়। ঐ স্থান হইতে সরল রেখা চলিয়া দক্ষিণে আসিলে, সূর্য্যপথের যে অংশে আসা যায়, তাহা মকর রাশির অন্তর্গত। এখান হইতে সূর্য্য ক্রমে উত্তরাভিমুখে সংক্রমণ করিতে থাকেন, এজন্য ঐ স্থানের নাম উত্তরায়ণ সংক্রান্তি।

সূর্য্য দক্ষিণায়ণে যাইবার পূর্ব্বে যে দিন উত্তরায়ণের শেষ ভাগে কিয়ৎকাল স্থিরভাবে থাকে, সেই সময়ের দিনকে উত্তর গ্রীষ্ম মধ্য ও যে দিন উত্তরায়ণে যাইবার পূর্ব্বে দক্ষিণায়ণের শেষ ভাগে অবস্থান করে, সে দিনকে দক্ষিণ গ্রীষ্ম মধ্য কহে। ২১ এ জুন বা ১ লা শ্রাবণকে উত্তর গ্রীষ্মমধ্য ও ২২ এ ডিসেম্বর বা ১লা মাঘ কে দক্ষিণ গ্রীষ্মমধ্য কহে।

রাশিচক্রস্থ সকল রাশিতেই সূর্য্যের সংক্রমণ হইয়া থাকে। উপরিউক্ত চারি রাশিতে সূর্য্যের সংক্রমণে বিশেষ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়, এই জন্য ঐ ঐ রাশিতে সংক্রমণের বিশেষ বিশেষ নাম প্রদত্ত হইয়াছে। বিষুবরেখার উত্তরস্থ যে ছয়টী রাশি তাহাকে উত্তরষটক্ ও দক্ষিণস্থ ছয়টীকে দক্ষিণষটক্ বলা যাইতে পারে। সূর্য্যের দক্ষিণ রাশি হইতে উত্তরাভিমুখে গমনকে উত্তরায়ণ ও উত্তর হইতে দক্ষিণাভিমুখে গমনকে দক্ষিণায়ণ কহে।

প্রথম হোরাচক্রে উত্তর কেন্দ্র হইতে ২৩॥০ অংশ পর্য্যন্ত, ক্রান্তিক্ষেত্র যে কোন স্থল হইতে ৯০ অংশ পর্য্যন্ত স্থানের একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানকে ক্রান্তিকেন্দ্র (Pole of the ecliptic) কহে। ঐ স্থলটী বৃহৎ ভল্লূকের নিকটবর্ত্তী ড্রেকো নামক ধ্রুব নক্ষত্রের মধ্যে।

আকাশমণ্ডলের উত্তর কেন্দ্র এরূপ ভাবে সরিতে থাকে, যে ২৫৮৬৮বৎসরে ক্রান্তিক্ষেত্রকে বেষ্টন করিয়া একটি গোষ্পথ হয়। এই গতি এরূপ অলক্ষ্য যে কেহ সমুদয়

জীবিত সময়ের মধ্যে ও তাহা অনুভব করিতে পারে না। কিন্তু যখন ইহার গতি আছে, তখন অবশ্যই ঐ উত্তর কেন্দ্র যে বর্ত্তমান কেন্দ্রতারা ধ্রুব হইতে দূরবর্ত্তী হইয়া পুনরায় ক্রমে পূর্ব্বস্থানে আসিবে তাহার আর সন্দেহ নাই।

এই প্রকার গতি হেতু বিষুব রেখার সম্পাতস্থল ক্রান্তিমণ্ডলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ এক একটু করিয়া সরিয়া যায়, সুতরাং রাশিচক্রের সকল রাশি তত্রত্য ধ্রুবতারার আকারানুসারে নাম প্রাপ্ত হইলেও, এক্ষণে নিজতারা হইতে দূরবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছে ও অপর তারা তাহার স্থলীয় হইয়াছে। মহাবিষুব সংক্রান্তিস্থল বা সামন্ত সংক্রমণ স্থান হইতে প্রথম ত্রিশ অংশকে মেষ রাশি বলা যাইত, কিন্তু এক্ষণে ঐ মেষ রাশি মীন স্থানীয় হইয়াছে; বৃষ রাশি মেষ স্থানীয় হইয়াছে; মিথুন বৃষ স্থানীয় হইয়াছে। এই রূপে পূর্ব্বস্থলনির্দ্দিষ্ট রাশি এক এক র শি অন্তরে এক এক রাশির চিহ্ন পশ্চাৎ সরিয়া পড়িয়াছে।

বৃহৎ তল্লূকের সর্ব্বাপেক্ষা যে তারাটি উজ্জ্বল, যেটী প্রদর্শক বিন্দুদ্বয়ের একটি তাহাকে ধ্রুব বলা যায়। ঐ তারাটি প্রথম হোরাচক্রের ১০ হোরা ৫৩ মিনিট স্থানে অথবা প্রায় ১৬৩ অংশে ও নতি (declination) ৮২। ৩৭ অংশে আছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্যারিমোহন সেন কবিরত্ন।

বার্ত্তাশাস্ত্র

বা

জীবিকাতত্ত্ব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

৭। তণ্ডুল-কুসুম-বলি-বিকার—পূজা কি যাগযজ্ঞের সময় তণ্ডুলের নৈবেদ্য রচনা, পুষ্পের স্তবক রচনা, উপহার দ্রব্যের সংস্থান রচনা। পূর্ব্বকালের অকর্ম্মণ্য ব্রাহ্মণেরা এই কার্য্য করিত। এখন আর ইহা নাই, একেবারে লোপ হইয়াছে।

৮। পুষ্পাস্তরণ—ফুলের শয্যা ও ব্যজন প্রভৃতি নির্ম্মাণ করা। মালীরা এই কার্য্য করিত। এখন ও ফুলের স্তবক (তোর্ া), পাখা ও হার প্রভৃতি রচনা করিয়া মালীরা অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকে।

৯। দশন-বসনাঙ্গ-রাগ দন্তরঞ্জন, বস্ত্ররঞ্জন ও অঙ্গরঞ্জন। পূর্ব্বকালের লোকেরা

দাঁতে নানা প্রকার ছক্ কাটিত। গাত্রে উল্‌কী পরিত। সে সকল এক্ষণে সভ্য-সমাজ হইতে দূর হইয়াছে। বস্ত্ররঞ্জক ও অঙ্গরাগের মধ্যে আল্‌তাপরা এই দুইটী কেবল বিলাসিনীরা অদ্যাপি পর্য্যন্ত বজায় রাখিয়াছে। বস্ত্ররঞ্জকেরা বিলক্ষণ দশটাকা পায়, কিন্তু অঙ্গরঞ্জনটী তাহারা আপনাআপনিই নির্ব্বাহ করে।

১০। মণিভূমিকর্ম্ম—মণি অর্থাৎ প্রস্তর। তদ্দারা চত্বর, পিণ্ডিকা, প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করণ। ইহা একটী প্রধান শিল্প। ইহাতে পারগ হইতে পারিলে বিশিষ্টরূপ উপার্জ্জন হয়। এই জীবিকাটী বরং পূর্ব্বাপেক্ষা এখন অধিক গৌরবের ও উপার্জ্জনের হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

১১। শয়নরচনা—খাট্, পালঙ্, তক্তাপোষ প্রভৃতি শয়নীয় দ্রব্য নির্ম্মাণ করণ। এটী ও স্বাধীন ও উত্তম জীবিকা।

১২। উদকবাদ্য—জলে কোন পাত্র রাখিয়া, কিম্বা পাত্রে জল রাখিয়া তারা তালে বাদ্য করণ। ইহাতে লোকে চমৎকৃত ও আনন্দিত হইয়া অর্থ পুরস্কার করিয়া থাকে। এ সকল আমোদের জীবিকা, সুতরাং ইহা ব্যাপক নহে। পাঠকগণ বোধহয়, জলতরঙ্গ নামক উদকবাদ্য অবগত আছেন।

১৩। উদকঘাত—প্রাচীন পুস্তকে, উদকঘাত শব্দের "জলস্তম্ভ বিদ্যা" এইরূপ অর্থ দেখা যায়। মহাভারতে উল্লেখ আছে, দুর্যোধন জলস্তম্ভ বিদ্যা জানিতেন; তদ্বলে তিনি দ্বৈপায়ন হ্রদে লুক্কায়িত হইয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন উদক শব্দের অন্য কোন অর্থ আমরা জানি না। জলমগ্ন জাহাজের বস্তুউত্তোলনকারী ডুবুরীরাই এক্ষণে জলস্তম্ভ বিদ্যার অনুকরণ করিয়া থাকে মাত্র। প্রকৃত জলস্তম্ভ জানিলে বিপুল অর্থ উপার্জ্জনের সম্ভাবনা।

১৪। চিত্রযোগ—অদ্ভুত কার্য্য প্রদর্শন করণ। ইহা এক প্রকার বাজী।

১৫। মাল্যগ্রন্থনবিকল্প—নানা প্রকার মালা বা হার প্রস্তুত করণ।

১৬। শেখরাপীড়যোজনা—শিরোভূষণ অর্থাৎ টুপী, পাগড়ী, তাহার অলঙ্কার প্রস্তুত করণ।

১৭। নেপথ্যযোগ—রঙ্গরচনা, অভিনেতাদিগকে সাজান, তাহার উপকরণ প্রস্তুতকরণ প্রভৃতি।

১৮। কর্ণপত্রভঙ্গ—পূর্ব্বকালে স্ত্রীলোকেরা মৃগমদ ও চন্দনাদির তিলক শ্রেণী ধারণ করিত তাহাই কর্ণ পত্র ভঙ্গ নামে ব্যবহৃত হইত। যে নারী এই কার্য্যে কুশলা সেই নারীই পূর্ব্বে রাজমহিষীগণের নিকট "সৈরিন্ধ্রী" নামক দাসী পদ প্রাপ্ত হইতেন।

১৯। গন্ধযুক্তি —নানাপ্রকার সুগন্ধ প্রস্তুত করণ। পার্‌ফিউম্‌ এখন পূর্ব্বাপেক্ষা উপার্জ্জনের প্রশস্ত পথ।

২০। ভূষণযুক্তি —অলঙ্কার নির্ম্মাণ ও তাহার গ্রন্থনাদি। নির্ম্মাণ কার্য্যটী এক্ষণে স্যাক্‌রার হস্তে এবং গ্রথন কার্য্যটী পাট্‌ওয়ারী দিগের হস্তে আছে?

২১। ইন্দ্রজাল —ভোজ বাজী। এটী অতি আশ্চর্য্য জীবিকা। ইহাও সম্পূর্ণ স্বাধীন।

২২। কৌচুমারযোগ —নানাপ্রকার লিপি ক্রিয়াকে কৌচুমারযোগ বলে। ইতর ভাষায় যাহাকে "জাল" বলে, পূর্ব্বে তাহা কৌচুমার শব্দে অভিহিত হইত। এটী বড় অসাধু ব্যাপিকা। ইহাকে তস্করজীবিকা বলিলেও বলা যায়।

২৩। হস্তলাঘব —অলক্ষ্যে অতিশীঘ্র হস্ত সঞ্চালন দ্বারা বস্তুর পরিবর্ত্তন করণ। ইহা এক চমৎকার বাজী। এখনও অনেক হস্ত লাঘব পটু বাজীকার আছে।

২৪। চিত্রভক্ষ্যক্রিয়া —আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত করণ। ইহাতে বিলক্ষণ শিল্প সংযোগ ও অর্থাগম আছে। একজন কেরাণী অপেক্ষা একজন বাবুর্চীর বেতন অনেক অধিক। হালুই কারেরাও বড় অল্প উপার্জ্জন করেনা।

২৫। পানক রসযোগ —মদ্য, নানাপ্রকার সরবৎ ও আচার, মোরব্বা, প্রভৃতি প্রস্তুত করণ। এটী ও শিল্প ঘটিত ও আয়ের পথ।

২৬। সূচী-বয়নকর্ম্ম —সূচীকার্য্য ও বস্ত্র বয়ন কার্য্য। ইহা একটী বিশেষ শিল্প। স্বাধীনভাবে অর্থ উপার্জ্জনের প্রধান পথ। এক্ষণকার অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তিই সূচী কার্য্যের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন বটে, কিন্তু কেহই বয়নকার্য্যে যাইতেছেন না। যাইবেন কি? যাইবার পথ বিদেশীয়দিগের দ্বারা অবরুদ্ধ। ইংরাজেরা বস্ত্রের কল প্রস্তুত করাতে তাঁতীরা নিরন্ন হইয়াছে বটে, তথাপি চেষ্টা করা আবশ্যক।

২৭। সূত্রক্রীড়া—সূত্রসংযোগে পুত্তলিকা পরিচালন (পুতুলের নাচ্‌)। এটী অতি হীন ও সঙ্কীর্ণ জীবিকা।

২৮। প্রহেলিকা—কবিতার গোপনীয় অর্থ পরিজ্ঞান। পূর্ব্বে ইহাতে লোক চমৎকৃত হইয়া অর্থ পুরস্কার করিত, কিন্তু এখন ইহা কেহ শুনে না।

২৯। প্রতিমালা—বস্তুর প্রতিরূপ বস্ত্র প্রস্তুত করণ। উনবিংশ শতাব্দীতে এই বিদ্যার একটী অভিনব শাখা বাহির হইয়াছে, তাহার নাম "ফটগ্রাফ্‌।"

৩০। দুর্ব্বচনযোগ—যে সকল বাক্যের লিপির অর্থ সাধারণ লোকে বলিতে পারে না, তাহা বলা। এই বিদ্যাটী পুরাতত্ত্বানুসন্ধায়ীগণের বিশেষ উপকারী।

৩১। পুস্তকবাচন—অতিশীঘ্র বিলুপ্তবর্ণ যোজনা করিয়া পুস্তক পড়া এবং নানা প্রকার অক্ষর পড়িতে পারা। এটী ও পুরাতত্ত্ব জিজ্ঞাসুদিগের সাহায্যকারী।

৩২। নাটিকাখ্যায়িকাপ্রদর্শন—ইহা এক প্রকার যাত্রাওয়ালার কার্য্য কিম্বা নাটকাভিনয় দেখান।

৩৩। কাব্যসমস্যাপূরণ—কাব্যের কিম্বা শ্লোকের একাংশ বলিলে তৎক্ষণাৎ তাহার অবশিষ্টাংশ পূরণ করিয়া দেওয়া। পূর্ব্বে ইহা বিশেষ আদরের ছিল, এক্ষণে কেবল রমা বাইকেই ইহার দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে দেখা যায়।

৩৪। পট্টিকা বরত্রা বাণবিকল্প—হস্তি, ঘেটক ও উষ্ট্র প্রভৃতির সাজ প্রস্তুত করণ এবং যুদ্ধাস্ত্র নির্ম্মাণ।

৩৫। তর্কু-কর্ম্ম—ভ্রমিযন্ত্র ও তাহার সূক্ষ্ম লৌহ শলাকার নাম তর্কু। তদ্বারা বহুবিধ স্থূল সূক্ষ্ম সূত্র প্রস্তুত করা। এই কার্য্যটী সম্পূর্ণ স্বাধীন ও অর্থাগমের দ্বার স্বরূপ। এই কার্য্যের উৎকর্ষ দেখাইতে পারিলে এখনও এ দেশে ইহার দ্বারা অর্থাগম হইবার সম্ভাবনা আছে।

৩৬। তক্ষণক্রিয়া—কাষ্ঠের কার্য্য। ছুতার মিস্ত্রিরাই ইহার দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

৩৭। বাস্তুবিদ্যা—গৃহনির্ম্মাণকার্য্য।

৩৮। রূপ্যরত্নপরীক্ষা—সোণা, রূপা ও হীরকাদি রত্নের পরীক্ষাকরা। জহুরীরাই ইহার উপকারীতা জানে।

৩৯। ধাতুবাদ—স্বর্ণ প্রভৃতি ধাতুর সাঙ্কর্য্য পরিহার করণ ও তাহা প্রস্তুত করণ বিধি।

৪০। মণিরাগজ্ঞান—হীরক প্রভৃতি রত্নের বর্ণ, পরীক্ষা ও নির্ম্মল করণ প্রভৃতি জানা।

৪১। আকরবিজ্ঞান—পরীক্ষার দ্বারা কোথায় কোন্ বস্তুর খনি আছে তাহা জানা। এই শিল্পে উত্তম অভিজ্ঞ হইতে পারিলে বিশেষ উপকার সাধিত হয়।

৪২। বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ—বৃক্ষ, লতা, গুল্ম প্রভৃতি উদ্ভিদগণের রোপণ, সংরক্ষণ, বৃদ্ধিকরণ ও চিকিৎসা বিষয়ক বিজ্ঞান। ভাল ভাল মালীরা এই শিল্পের দ্বারা বিলক্ষণ দশ টাকা রোজগার করিয়া থাকে।

৪৩। মেষ-কুক্কুট-লাবক-যুদ্ধবিধি—ম্যাড়ার লড়াই, কুক্কুটের যুদ্ধ, বটেরর লড়াই,—এ সকল এখন নাই বটে; কিন্তু মুসলমান বাদসাহদিগের সময়ে উক্ত শিল্পের দ্বারা প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন হইত।

৪৪। শুক-সারিকা-লাপনা—পক্ষীদিগের বুলি শিখান। এসকল জীবিকা এখন আর নাই।

৪৫। উৎসাধন কর্ম্ম—কৌশলে শত্রুর বাস উচ্ছেদ করা। ইহা এক প্রকার দস্যুবৃত্তি মধ্যে গণ্য; পূর্ব্বে ইহার বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব ছিল। নীতিবিশারদ চাণক্য যে সুচারু কৌশল অবলম্বন করিয়া বিপুল নন্দবংশের উচ্ছেদ সাধন করিয়াছিলেন, তাহা এই উৎসাধন কর্ম্মের অঙ্গীভূত।

৪৬। কেশমার্জ্জনকৌশল—চুলের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিবার বিবিধ উপায়। পূর্ব্বে ধনাঢ্য ব্যাক্তিরা এই কার্য্যের জন্য ভৃত্য নিযুক্ত করিত। এখনও বিদেশীয় পরামাণিকেরা একবার ক্ষৌর করিলে অন্যূন ১৲ টাকা লইয়া থাকেন।

৪৭। অক্ষয়মুষ্টিসংখ্যাকথন—সাঙ্কেতিক লিপিবিজ্ঞান।

৪৮। ম্লেচ্ছতর্কবিকল্প—ম্লেচ্ছভাষা ও ম্লেচ্ছ শাস্ত্র জানা। এখনও ইহার দ্বারা যৎকিঞ্চিৎ আয়ের সম্ভাবনা আছে।

৪৯। দেশভাষাবিজ্ঞান—ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন ভাষা পরিজ্ঞাত থাকা।

৫০। পুষ্পশাকটিকা-নিমিত্তজ্ঞান—পুষ্পশাকটিকা নামক বিদ্যার মূল উপকরণ জানা। পুষ্পশাকটিকাবিদ্যা কি? তাহা আমরা জানি না।

৫১। যন্ত্রমাতৃকা—অল্প আয়াসে কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য বিবিধ যন্ত্র নির্ম্মাণ করা।

৫২। ধারণমাতৃকা—পূজার নিমিত্ত, ধারণের নিমিত্ত শাস্ত্রোক্ত রেখাময় যন্ত্র রচনা করিতে জানা। পূর্ব্বে তান্ত্রিক গুরুরা এই ব্যবসায় দ্বারা বিলক্ষণ দশ টাকা পাইতেন। এখন আর কেহ পুজাও করেনা, কবচ ধারণও করেনা।

৫৩। সম্পাদ্যকর্ম্ম—মণিমুক্তাদি রত্নের কৃত্রিম নির্ণয় করা এবং কৃত্রিম রত্ন প্রস্তত করা।

৫৪। মানসীকাব্যক্রিয়া—অন্যের মনের ভাব ছন্দের দ্বারা প্রকাশ করা। এরূপ কৌতুক আর এখন নাই।

৫৫। কোশ-ছন্দোবিজ্ঞান—শব্দশাস্ত্রে পারদর্শী হওয়া।

৫৬। ক্রিয়াবিকল্প—একটি কার্য্য বহু উপায়ে নির্ব্বাহ করিতে শিক্ষা করা।

৫৭। ছলিতকযোগ—পর প্রতারণার কৌশল। ইহাও এক প্রকার বাজী বিশেষ।

৫৮। বস্ত্রগোপনক—এক বস্ত্র লইয়া অন্য প্রকার বস্ত্র দেখান। অর্থাৎ কার্পাস বস্ত্রকে রেশমী বস্ত্র করিয়া দেখান। এ শিল্পটীর মর্ম্ম আমরা বুঝিতে অক্ষম।

৫৯। দ্যূতপ্রভেদ—নানাপ্রকার জুয়াখেলা। এখনও অনেক লোক জুয়া খেলার দ্বারা জীবিকা চালায়।

৬০। আকর্ষণক্রীড়া—ইহাও এক প্রকার খেলা বটে, কিন্তু ইহা যে পূর্ব্বে কিরূপ ছিল তাহা বুঝিতে পারা যায় না।

৬১। বালক্রীড়নক—বালকদিগের জন্য নানাপ্রকার খেলনা প্রস্তুত করা। এই শিল্পটী পূর্ব্বাপেক্ষা এখন অধিকতর উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে।

৬২। বৈয়াসকীবিদ্যা।
৬৩। বৈজয়িকী বিদ্যা।
৬৪। বৈনায়কী বিদ্যা।

} এই তিনটী শিল্পের অর্থ আমরা জানি না। সুতরাং ইহার আংশিক ভাবও পাঠকগণকে বুঝাইতে পারিলাম না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ।

অলঙ্কার-দর্শন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অবশেষে যখন আমি "তবে আসি" বলিয়া তাহার নিকট বিদায় চাহিলাম, তখন সেই মৃগনয়না দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বাষ্পাকুল একটী নেত্র একবার মাত্র আমার দিকে তির্য্যক্‌ভাবে ফিরাইয়া পালিত মৃগপোতের প্রতি কহিল বাছা! আজ্ হইতে আমার সখীরা তোমাকে পালন করিবেন।

এস্থলে সখীগণকর্ত্তৃক মৃগপোতের পালন হইবে এই বলাতে, তোমার গমনের সঙ্গে সঙ্গে আমারও জীবনলীলা সম্বরণ হইবে; এই বিষয়টী প্রিয়তমাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। অতএব তোমার গমন আমার মৃত্যুর কারণ ইহা বাগ্‌ভঙ্গিতে বলা হইল। এস্থলে বিদায় চাওয়ার পর নায়িকার সমুদয় বর্ণিত কার্য্যগুলিও কার্য্য কারণ ভাবে সম্বদ্ধ। তাহার দ্বারা তাহার মনোভাবের প্রতি কবি লক্ষ্য করিয়া দিতেছেন।

শশী যায় পুন হয় তারার উদয়।
যৌবন গেলে ত আর নূতন না হয়॥

এস্থলে চন্দ্র ও যৌবনের ক্রিয়ার বৈসাদৃশ্য হেতু তাহাদের সাদৃশ্য প্রতিপাদন হইয়াছে।

যৌবন জনমের মত যায়। সে ত আশা পথ নাহি চায়।
কি দিয়ে গো প্রাণসখি রাখিব তাহায়॥

এস্থলে আশার আশয়েই যৌবনের অবসান হইল,তথাপি কান্তসমাগম হইল না; এই কথাটী বলিবার নিমিত্ত কবি পূর্ব্বোক্ত বাক্যে প্রিয়তমের দীর্ঘপ্রবাস হেতু নায়িকার বলবতী উৎকণ্ঠা ব্যক্ত করিতেছেন। সে উৎকণ্ঠাও যৌবনের অনিবার্য্য গতি কথনদ্বারা ব্যক্ত হইতেছে। কারণ সে আমার ন্যায় মানুষ নয়, যে আশা অবলম্বন করিয়া থাকিবে, অথবা এমন নয় যে তাহাকে কোন বস্তু দিয়া ভুলাইয়া রাখিব। এতদ্দ্বারা যুবতীর উৎকণ্ঠা যে যৌবনের মনুষ্যত্ব পর্য্যন্ত কল্পনা করিয়াছিল ইহা অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হইতেছে। এস্থলে গতিক্রিয়া সাদৃশ্যে যৌবনে মনুষ্যত্ব কল্পনাই করা হইয়াছে।

যে দেহে নিয়ত রহে নিখিল ভুবন।
সেই হরি দেহে, দেখ এলে তপোনিধি।
নাহি ধরে উথলিল আনন্দ-বারিধি।
সমস্ত শরীরে তাই রোমাঞ্চ দর্শন।

এস্থলে আনন্দের আতিশয্যে রোমাঞ্চ ফল ও ঐ ফল আধার আধেয় ভাবদ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। রোমাঞ্চকে আহ্লাদের তরঙ্গ স্বরূপ বলা হইয়াছে। এখানে আনন্দরাশিতে বারিধির সাদৃশ্য হেতুক আধার আধেয় সম্বন্ধের বৈচিত্র্য প্রদর্শিত হইয়াছে।

এইরূপে সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য, সামান্য বিশেষত্ব, কার্য্যকারিত্ব, আধার আধেয়ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধ অবলম্বন করিয়া কবিরা নানাপ্রকার কৌশল বা উক্তি বৈচিত্র্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই উক্তি বৈচিত্র্যকে আলঙ্কারিকেরা কবি প্রৌঢ়োক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতি গূঢ় ও সূক্ষ্ম ভাব সকল অল্প কথায় ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত ও বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবার নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে অর্থাৎ ভাবগুলি বর্ণনা দ্বারা প্রকাশ করিতে না গিয়া কেবল বাক্যমাত্রের ইঙ্গিতদ্বারা ঐ ভাব সহৃদয় পাঠককে স্বয়ং অনুভব করিয়া লইতে দেওয়া হয়। তখন পাঠক আপনার অন্তরস্থ সেই ভাব স্বয়ং অনুভব করেন। পূর্ব্বে সেই ভাব যাঁহারা সংগ্রহ করিয়াছেন তাঁহাদিগকেই সহৃদয় বলা যায়; এবং তাঁহারাই ঐ সকল ভাব বুঝিতে পারেন। এই জন্যই আলঙ্কারিকেরা রসভাবকে সহৃদয় সংবেদ্য বলিয়া গিয়াছেন। পাঠকের আপনারই হৃদয়ের ভাব কিরূপে তাঁহাকে চমৎকৃত করে, একথা জিজ্ঞাস্য হইলে তাহার উত্তর কেবল ভাববৈচিত্র্য। এই ভাববৈচিত্র্য কখনই কেহ কাহাকে

বুঝাইতে পারেন না। কোন প্রকারে দেখাইতে পারেন না, বা কোন উপায়ে কাহারও হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিতে পারেন না। কেবল "যে জানে সে জানে"। অতএব এই ভাব বৈচিত্র্য যাহার সংগ্রহ করা আছে, সেই সেই ভাববৈচিত্র্য বুঝিতে পারে, অন্যে বুঝিতে পারে না। ইহাতে কবিবাক্য কেবল ইঙ্গিত মাত্র। উহা কোন প্রকারেই ঐ ভাববৈচিত্র্যের বাচক নয়।

কবিদিগের এই ইঙ্গিত প্রক্রিয়া কেবল বস্তুসকলের পরস্পর সংবদ্ধ ও রচনা বিশেষের জ্ঞানদ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। উপরে যতগুলি সম্বন্ধ প্রদর্শিত হইয়াছে চতুর্থ উদাহরণ ব্যতীত আর সকলগুলিতে সাদৃশ্যসম্বন্ধই মূল কারণ। প্রায় সমুদায় অলঙ্কার বৈচিত্র্যই এই সাদৃশ্য অবলম্বন করিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে।

কেবল যে বস্তুর গুণ ক্রিয়াদির সাদৃশ্যে বৈচিত্র্য উৎপাদিত হইয়া থাকে এমন নয়। শব্দও অর্থাদির সাদৃশ্য হেতু ও বৈচিত্র্য উৎপন্ন হইয়া থাকে।

শব্দসাদৃশ্যে বৈচিত্র্য যথা ;—

আটপণে আনিলাম আট সের চিনি।
অন্যলোকে ভুরা দেয় ভাগ্যে আমি চিনি॥

এ স্থলে পূর্ব্ববাক্যস্থ চিনি ও পরবাক্যস্থ চিনিতে কেবল বর্ণগত একতা হেতু শব্দগত সাদৃশ্যই হইয়াছে এবং এই শব্দগত সাদৃশ্যই বৈচিত্র্য উৎপাদন করিতেছে। এই দুই চিনি শব্দের অর্থগত বিভিন্নতা না থাকিলে অর্থাৎ একার্থমাত্র প্রতিপাদক হইলে সম্পূর্ণ একতা হেতুক এস্থলে সাদৃশ্যও হইত না এবং বৈচিত্র্যও থাকিত না। যথা ;

আটপণে আনিলাম আট সের চিনি,
অন্য লোকে ভুরা আনে আমি আনি চিনি।

চূত-মুকুল-কুল, সঞ্চলদলিকুল,
গুণ গুণ রঞ্জন তানে।
মদকল কোকিল, কলরব সঙ্কুল,
রঞ্জিত বাদন তানে॥

এস্থলে সমান সমান বর্ণগত পৌর্ব্বাপর্য্যনিবন্ধন শব্দগত সাদৃশ্য বৈচিত্র্য করিয়া দিতেছে।

অর্থগত সাদৃশ্য হেতু বৈচিত্র্য যথা—

অল্পেতে উন্নতি আর অল্পে অধোগতি।
অতএব তুল্য তুলা আর খল মতি॥

এস্থলে একপক্ষে জড় তুলাদণ্ডের ও অপর পক্ষে অজড় মনের উন্নতি ও অধোগতি এই শব্দদ্বয় এক হইলেও সদৃশ অর্থদ্বয়ের প্রতীতি করিয়া লওয়াতে সাদৃশ্য হেতু অর্থ বৈচিত্র্য হইয়াছে ; এই রূপ—

অনেকের পতি তেঁই পতি মোর বাম।

তাপান্বিত হল দিন, বিভাবরী হল ক্ষীণ,

যেন দ্বন্দ্ব করি পরস্পর। ইত্যাদি সকল স্থলে অর্থের বৈচিত্র্য হেতুই উক্তির বৈচিত্র্য সম্পাদন করিতেছে। পূর্ব্বোক্ত—এই সমুদায় উক্তি বৈচিত্র্যই কবি প্রৌঢ়োক্তি। অতএব আলঙ্কারিকেরা যে কবি প্রৌঢ়োক্তি কৃত বৈচিত্র্যকে কাব্যবলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা যথার্থই হইয়াছে।

দুর্দ্দৈব যখন ধরে, ভালকর্ম্ম মন্দ করে,

অন্নদার উপজিল রোষ।

অনুগ্রহ হল নাশ, নিগ্রহে ঠেকিলা ব্যাস,

ভাগ্যবশে গুণ হৈল দোষ॥

এস্থলে, ভাল হওয়ার জন্য লোকে তপস্যা করে, তপস্যা দ্বারা ভাল হয়, অতএব তপস্যা গুণ। কিন্তু ব্যাসের তপস্যার দ্বারা মন্দ হইয়াছে, অতএব তপস্যা দোষ।

কিন্তু গুণ ও দোষ পরস্পর বিরুদ্ধ। গুণ কখন দোষ হয় না; কিন্তু কবি স্বীয় প্রৌঢ়োক্তি দ্বারা গুণ ও দোষ হয় ইহা প্রতিপন্ন করিতেছেন।

শিবের কপালে বয়ে, প্রভুরে আহুতি লয়ে,

না জানি বাড়িল কিবা গুণ।

একের কপালে রহে, অন্যের কপাল দহে,

আগুণের কপালে আগুণ॥

এস্থলে প্রথমতঃ কপাল পোড়ার মুখ্যার্থ কপাল দগ্ধ হওয়া ও লক্ষ্যার্থ তীব্র কষ্টদায়ক অনিষ্ট ঘটনা ; এই দুই অর্থ লইয়া এবং পুরাণ বর্ণিত কল্পিত শিবমূর্ত্তি কর্ত্তৃক কল্পিত কামমূর্ত্তি সংহারের বাস্তবত্ব গ্রহণ করিয়া কবি কার্য্য কারণের বৈপরীত্য সম্বন্ধ প্রদর্শন পূর্ব্বক এই বৈচিত্র্য দেখাইতেছেন, যে যেস্থলে অগ্নি সংলগ্ন হয়, তাহাই দগ্ধ হয়, ইহা পূর্ব্বাপর প্রসিদ্ধ আছে কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ শিবের কপালে অগ্নি রহিল অথচ আমার কপাল দগ্ধ হইল। এই প্রকারে সাধারণ ভ্রম বা সংস্কারাদি স্বীয় উক্তির অনুকূল পক্ষে লইয়া বৈচিত্র্য প্রদর্শনকেও কবিপ্রৌঢ়োক্তি বলা যায়। এইরূপে কবি প্রৌঢ়োক্তি যে কত প্রকার সম্বন্ধে কত প্রকার করা যাইতে পারে তাহার ইয়ত্তা নাই।

এই সকল দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে যেমন বাহ্য জগতে বিশেষ বিশেষ স্থলে যথাযোগ্য গুণ সমূহের যোগে বৈচিত্র্য উৎপন্ন হয়, তেমনই কাব্যেও বিশেষ বিশেষ বর্ণনায় তদুপযুক্ত গুণসমূহের যোগে বৈচিত্র্য উৎপন্ন হইয়া থাকে।

অর্থাদির বৈচিত্র্য ও বাহ্য জগতের বৈচিত্র্যের অনুযায়ী। বাহ্য জগতে যেমন সর্ব্বদা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর মনোমত গুণ সমূহের যোগ নিতান্ত দুর্লভ, মানস জগতেরও সেইরূপ সর্ব্বদা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গুণযোগ নিতান্ত দুর্ল্লভ। বাহ্য জগতে বৈচিত্র্য করিতে হইলে যেমন তাহার উপকরণ সামাগ্রী সকল পূর্ব্বে আহরণ করিতে হয়, মানস জগতেও অবিকল সেই রূপ। অগ্রে ভিন্ন ভিন্ন ভাব সকল দর্শনাদি করিয়া বিবিধ মানসিক ভাবরাশি সঞ্চয় না করিলে কোন মতেই কবিতার বৈচিত্র্য উৎপাদন করিতে পারা যায় না। বাহ্য বস্তুর যোগ বিয়োগের নিমিত্ত তত্তৎ কালের শারীরিক যত্নবিশেষ ও সমায়াতিরেক আবশ্যক হয়। কিন্তু পূর্ব্বাহৃত মনোভাবের যোগ করিতে তাদৃশ যত্ন বা সময়ের আধিক্য আবশ্যক হয় না। মানসজগতে আমরা ইচ্ছামাত্র সহস্র সহস্র যোগ বিয়োগ কার্য্য সমাধা করিতে পারি এবং বাক্য দ্বারা তাহা প্রকাশও করিতে পারি। কেবল যোগ্য যোজনার নিমিত্ত আমাদের নিয়ত বস্তু সকলের সম্বন্ধ দর্শন করিতে হয় ও উদ্যানপালের ন্যায় ঐ সকল সংবদ্ধ বস্তুর রোপণ, অধিবর্দ্ধিত অংশের ছেদন ও হীন অংশের যোগ করিয়া সুশৃঙ্খল ও মনোমত করিয়া লইতে হয়। প্রয়োজনবশতঃ কখন কখন গুণের সহিত দোষ এবং দোষের সহিত গুণেরও যোগ করিতে হয়। কখন কখন অযোগ্যের যোজনা করাও আবশ্যক হইয়া উঠে। ফলতঃ যখন যেরূপ প্রয়োজন হয় ইচ্ছানুসারে আমরা তাহাই করিতে পারি।

এই প্রকারে মানসোদিত ভাবসকলকে যোগ বিয়োগ দ্বারা সুশৃঙ্খল করাই রচনা। কিন্তু যেমন কোন ভাব চিত্রিত করিতে হইলে উপযুক্ত তুলিকা ও বর্ণাদি সমুদায় সত্বেও লেখকের সম্বন্ধ জ্ঞান ও চিত্রে অভ্যাস থাকা আবশ্যক। সেই রূপ অন্যান্য উপাদান সত্বেও কবির সম্বন্ধ জ্ঞান ও রচনায় অভ্যাস থাকা নিতান্ত আবশ্যক। ইহা ব্যতিরেকে কেহ কখনই সুলেখক হইতে পারেন না। যেমন যে ব্যক্তি কখন চিত্রকার্য্য শিক্ষা করে নাই সে কেবল পুস্তকে সম্বন্ধসকলের জ্ঞানমাত্র লাভ করিয়া চিত্র করিতে সক্ষম হয় না। সেই রূপ যে কখন ভাব সমুদায় যোজনা করিতে অভ্যাস করে নাই, সে বিশিষ্ট সম্বন্ধজ্ঞানের অধিকারী হইলেও অভ্যাসের অভাবে কখনই প্রকৃত লেখক বা কবি মধ্যে গণ্য হইতে পারে না। অতএব অভ্যাস না করিয়া লোকে যে সুকবি বা সুলেখক হইতে পারিলাম না বলিয়া আক্ষেপ করেন,

অথবা এক কালে কালিদাস বা সেক্সপীয়ার হইতে পারিব না বলিয়া হতাশ্বাস হন, ইহাই বড় আক্ষেপ ও হতাশ্বাসের বিষয়। কালিদাস ও সেক্সপীয়ারও এককালে কালিদাস ও সেক্সপীয়ার হন নাই। কেহ কেহ মনে করেন আগে উপযুক্ত হই, পশ্চাৎ চেষ্টা করিব। কিন্তু সন্তরণ শিখিয়া যাঁহারা জলে নামিবার ইচ্ছা করেন তাঁহাদের কখনই সন্তরণ শিক্ষা হয় না। সকল জ্ঞানই ক্রমে ক্রমে হইয়া থাকে। যুগপৎ সমুদায় জ্ঞান হয় না। বস্তুশক্তি সমুদায়ই নিয়ত ক্রিয়াশীল, কেবল নিজ শক্তির প্রয়োগ করিলেই উহা বস্তুশক্তির সহিত মিলিত হইয়া অদ্ভুত বৈচিত্র্য উৎপাদন করিতে পারে। আমরা সেই শক্তির প্রয়োগ করিতে অভ্যাস কেন না করি? শৈশবকাল হইতেই আমাদের অর্থাভাবাদির যোজনা করিতে শিক্ষা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। বাল্যকাল হইতে বালকদিগকে ভাল ভাল কাব্য পাঠ ও রচনা করিতে দেওয়া ও শিশুদিগের মন সেই দিকে প্রধাবিত করিয়া দেওয়া এবং ভিন্ন ভিন্ন সম্বন্ধ দর্শনে ইঙ্গিত করা আমাদিগের সম্পূর্ণ আয়ত্ত।

আমরা এপর্য্যন্ত যে সকল কথা কহিয়াছি, তাহাতে সামান্যতঃ বাহ্য প্রকৃতি দর্শন করিয়া সংক্ষেপে সকল প্রকার বৈচিত্র্যেরই কথা বলিয়াছি এবং তাহার উদাহরণ ও প্রদর্শন করিয়াছি; কিন্তু একটী বৈচিত্র্যের কথা কিছুই বলি নাই। এই বৈচিত্র্য যদিও অনেকাংশে বাহ্য প্রকৃতির গুণযোগে সমুৎপন্ন, সুতরাং অনেকাংশে বাহ্যপ্রকৃতির বৈচিত্র্যেরই সদৃশ, তথাপি সমুদায় জগতের বৈচিত্র্য হইতে ইহাতে বিশেষ বিভিন্নতা আছে। উত্তরোত্তর তুলনা করিয়া দেখিলে ইহার বিভেদ বুঝিতে পারা যাইবে।

১। সামান্য বস্তুতে আকৃতি, পরিমাণ, বর্ণ প্রভৃতি গুণসমূহের যোগ সর্ব্বদা সকলেরই অনুভূত হইয়া থাকে। নিয়ত অভ্যাসহেতু এই সকল গুণযোগের বৈচিত্র্য নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু ঐ সকল গুণের মধ্যে যদি একটিরও কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, তবে তাহাতেই উহা সাতিশয় বিচিত্র হয়। যেমন সামান্য আম্র বিচিত্র নয়, কিন্তু এক হস্ত দীর্ঘ, অথবা দুগ্ধের ন্যায় শ্বেতবর্ণ, অথবা সম্পূর্ণ গোল আম্র বিচিত্র। এইরূপ উদ্যানাদির বর্ণনা। পর্ব্বত সাগর প্রভৃতির বর্ণনা।

২। এই সকল আকৃতি, পরিমাণ, বর্ণ প্রভৃতি সামান্য বস্তু গুণের সহিত যদি নানা প্রকার সামান্য জীবক্রিয়া ও বিশেষ বিশেষ মানসিক গুণের একত্র সংযোগ দৃষ্ট হয় ও তন্মধ্যে কোনটীর আতিশয্য অনুভূত হয়, তবে তাহাতে যে বৈচিত্র্য হয় তাহা পূর্ব্বোক্ত বৈচিত্র্য অপেক্ষা ও অধিক হৃদয়াকর্ষক হয়। যেমন উদ্যানাদি বর্ণনার সহিত পশু পক্ষীদিগের বিহার বর্ণন। যেমন শকুন্তলাতে তপোবনমধ্যে রথবেগ

দর্শনে মৃগের ভয় ও পলায়ন বর্ণনা, হস্তির ভয় ও তজ্জনিত উৎপাত বর্ণনা ইত্যাদি।

৩। আবার যদি ঐ বৈচিত্র্য মানবপ্রকৃতির কোন একটী সামান্য গুণ সংযোগে সমুৎপন্ন হয় তবে উহা তদপেক্ষাও হৃদয়াকর্ষক হয়। যেমন শকুন্তলাদর্শনে রাজার, ও রাজদর্শনে শকুন্তলার মনোবিকার।

কিন্তু যেখানে পরস্পর পরস্পরের প্রতি নানাপ্রকার অনুরাগাদিসূচক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অন্তরের নিগূঢ়তম ভাব ব্যক্ত করিতেছে ও তৎসহকারে নানা প্রকার অঙ্গ ভঙ্গি ও নানা প্রকার ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতেছে এরূপ সংযোগ দৃষ্ট হয়; সেখানে যে কি অপরিসীম বৈচিত্র্য উৎপন্ন হয়, তাহা বলিতে পারি না। যেমন শকুন্তলা দুষ্মন্ত প্রভৃতির কথোপকথনাদিতে। এই প্রকার মানব প্রকৃতিগত বৈচিত্র্যই রস। এই রস রূপ অদ্ভুত ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট বৈচিত্র্য প্রদর্শনের পূর্ব্বে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আমরা মানবীয় প্রকৃতির সামান্যতঃ সমালোচনা করিব।

ইতি প্রথম পরিচ্ছেদ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্যারীমোহন সেন কবিরত্ন।

কাগজ।

সভ্যজগতে মনুষ্যের ব্যবহারোপযোগী যত প্রকার দ্রব্য আছে তন্মধ্যে কাগজ একটী প্রধান আবশ্যকীয় বস্তু। কাগজের সৃষ্টি না হইলে আমাদের বিশেষ কষ্ট পাইতে হইত। কাগজ না থাকিলে আমরা আপনার মনের ভাব অপরকে বিবৃত করিতে পারিতাম না, বহুদূরস্থিত ব্যক্তির কোন সংবাদ প্রাপ্ত হইতামনা; অতীত এবং বর্ত্তমান লেখকের প্রকটিত পুস্তক পাঠ করিতে পারিতাম না এবং আমাদিগের নিজের মনের ভাব বা কার্য্য আমাদিগের সন্তান সন্ততিগণ অবগত হইতে পারিত না। ইতিহাস, কাব্য, অলঙ্কার, জীবনচরিত প্রভৃতি রচনাবলীর প্রকটনে কোন ফল লাভ হইত না, কারণ কাহারই পাঠ করিবার কোন উপায় থাকিত না। ফলতঃ জগৎ তাহা হইলে অসার ও বিষময় বোধ হইত; চিরদিনই ইহা অসভ্য জগতের ন্যায় নিবিড় তমসাচ্ছন্ন হইয়া থাকিত। তাহা হইলে বিজ্ঞান আলোকের দ্বারা কোন

উন্নতির সম্ভাবনা থাকিত না এবং মূকব্যক্তির ন্যায় আমাদিগেবর মনের ভাব ও ধারণাশক্তি মনমধ্যেই বিলয় প্রাপ্ত হইত। কিন্তু কাগজ দ্বারা যে অনির্ব্বচনীয় ফল লাভ হইয়াছে, জগৎ যে উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং মানবমাত্রেরই যে প্রকার উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে, তাহা সকলেই বিলক্ষণ অবগত আছে তদ্বিষয়ে অতি বিস্তারের আবশ্যকতা নাই। কিন্তু মানবের এরূপ প্রধান ব্যবহারোপযোগী দ্রব্য—এরূপ অত্যাবশ্যকীয় বস্তু—এরূপ অনির্ব্বচনীয় ফলপ্রসূ সামগ্রী—যদ্বারা আমাদের সর্ব্বপ্রকার সৌকর্য্যতা সম্পাদিত হইয়া থাকে, তাহা কি প্রকার অদ্ভুত কৌশল দ্বারা প্রথমে প্রস্তুত হইল, কে ইহার প্রথমে সূত্রপাত করেন, বর্ত্তমান কালে কোন ব্যক্তিই বা কি প্রকারে এই আবশ্যকীয় বস্তু প্রস্তুত করিতেছেন, তাহা অনেকেই অবগত নহেন। সেই সকল তথ্য জানিবার জন্য অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি মাত্রেরই কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইয়া থাকে। তজ্জন্য আমরা এই প্রবন্ধে তদ্বিষয়ক তথ্য নিরাকরণ করিব।

অনেকেই বলেন খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে চীন জাতিরাই এই দ্রব্য প্রস্তুত করিয়াছিল। কিন্তু কতকগুলি লোক এই মতের পোষকতা করেন না। তাঁহারা বলেন চীন জাতিরা প্রাচীন বটে, কিন্তু তাহা বলিয়া গ্রীস, মিসর, কেলডিয়া বা হিন্দুদিগের অপেক্ষা প্রাচীনতর নহে। যদিও চীনজাতিরা এক দেশেই বহুকালাবধি একাধিপত্য করিয়া আসিতেছে, যদিও তাহারা বহুদিন হইতেই সভ্যতালোক প্রাপ্ত হইয়া আপনাদের উন্নতি সাধন করিয়া আসিতেছে, কিন্তু তাহা বলিয়া তাহারাই যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন জাতি এবং তাহারাই যে এই অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের প্রথমে সূত্রপাত করিয়াছিল একথা কখনই স্বীকার করা যাইতে পারে না। তাহারা খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে ইহা প্রস্তুত করিতে শিক্ষা করিয়াছিল হইলেও হইতে পারে। কিন্তু খৃষ্টাব্দের বহুকাল পূর্ব্বে গ্রীকজাতিরা সূত্রনির্ম্মিত বস্ত্র এবং কার্পাসের তন্তু হইতে কাগজ প্রস্তুত করিয়াছিল। সুতরাং তাঁহাদের মতের পোষকতা করিলে বলিতে হইবে যে গ্রীক জাতিরাই সর্ব্বাগ্রেই এই দ্রব্যের জন্মপ্রদান করিয়াছিল। কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে মিসরবাসীরাই সর্ব্বাগ্রে এই দ্রব্য প্রস্তুত করিয়াছিল। তখন তাহারা পেপিরস (Papyrus) নামক গুল্মের তন্তুসকল উহা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া এবং একত্র সংযুক্ত করিয়া কাগজ প্রস্তুত করিত এবং উত্তম না হইলেও একপ্রকার কার্য্যোপযোগী হইয়াছিল। কিন্তু চীন জাতিরাই চীরখণ্ড হইতে কাগজ প্রস্তুত করা সর্ব্বাগ্রে আবিষ্কার করে। আরব জাতিরাই চীন দেশ হইতে ইহা প্রস্তুত করিবার প্রণালী শিক্ষা করে এবং ইউরোপীয়েরা উহাদের নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। খৃষ্টাব্দের চতুর্দ্দশ শতাব্দিতে জর্ম্মন দেশের অন্তঃপাতি নরেম্বর্গ (Nuremberg) নগরে কাগজের

কল প্রথম স্থাপিত হয় এবং ১৫৮৮খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ এলিজাবেথের রাজত্বকালে ইংলণ্ডের অন্তঃপাতি ডার্টমাউথ (Dartmouth) নগরে এক জন জর্ম্মনকর্ত্তৃক একটী কল সংস্থাপিত হয়। কিন্তু খৃষ্টাব্দের ১৭৭০ সালের পূর্ব্বে ইহার বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হয় নাই। ফলতঃ এই বৎসরেই সুবিখ্যাত জে হোয়াটমেন (J. Whatman) সাহেবকর্ত্তৃক ইংলণ্ডের অন্তঃপাতি মেডষ্টোন (Maidstone)নগরে কাগজের কল সংস্থাপিত হয়। ইহার পূর্ব্বে হলেণ্ড (Holland) ও ফ্রান্স (France) দেশ হইতেই ইংলণ্ডে কাগজ আমদানী হইত। কিন্তু বিগত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে ইহার বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে, কারণ এই সময়েই কলদ্বারা ও ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের দ্বারা ইহা প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

কাগজ প্রস্তুত করা যান্ত্রিক কৌশলে নির্ভর করে সত্য বটে, কিন্তু রসায়ণ বিদ্যার সাহায্যে ইহার বিশেষ সৌকর্য্য সম্পাদিত হইয়াছে। বিশেষতঃ কার্পাস ব্যতীত অন্যান্য তন্তুর দ্বারা ইহা প্রস্তুত করিবার প্রণালী রসায়ণ বিদ্যা দ্বারাই আবিস্কৃত হইয়াছে। কার্পাস তন্তু দ্বারা ইহা প্রস্তুত করা বহুব্যয়সাপেক্ষ বলিয়া ধান্যের তৃণ হইতে ইহা প্রস্তুত করিবার প্রণালী আবিস্কৃত হইয়াছে। কিন্তু এই কাগজ মসৃণ নহে এবং ইহাতে এক প্রকার বিকৃত শব্দ হয় বলিয়া তাহার মূল্য কম। বর্ত্তমান সময়ে সর্ব্বপ্রকার উদ্ভিদতন্তুদ্বারা ইহা নির্ম্মিত হইতেছে এবং একজন সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি প্রস্তর হইতে ইহা প্রস্তুত হইতে পারে আবিস্কার করিয়া আপনার চিন্তাশীলতার, জ্ঞানের ও ভূয়োদর্শিতার বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন।

কাগজ প্রস্তুত করিবার প্রণালী দুরূহ নহে। সামান্য উপায়ে ইহা প্রস্তুত হইয়া থাকে। কতিপয় চীরখণ্ডকে প্রথমে চূর্ণ করিতে হয়। পরে ঐ চূর্ণ গুলিকে জল মিশ্রিত করিয়া মণ্ড মত করিতে হয়। পরে ঐ মণ্ডকে ক্ষুদ্র ছিদ্রবিশিষ্ট এক খানি চালনিতে রাখিয়া উহার উপর চাপ প্রদান করিতে হইবে। উহা হইতে সমস্ত জল অপসৃত হইলে উহাকে সূর্য্যের উত্তাপদ্বারা শুষ্ক করিবে। শুষ্ক হইলে কাগজ প্রস্তুত হইবে।

কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে ইংলণ্ড বা জর্ম্মনি দেশে এ প্রণালী অনুসারে কাগজ প্রস্তুত হয় না। আজ কাল কলদ্বারা ইহা নির্ম্মিত হইয়া থাকে। কলঘরে পুরাতন চীরখণ্ড আসিবামাত্রই উহাকে চারি বা পাঁচ ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভাগ করা হয় এবং উহা হইতে বোদাম, আলপিন, রেশমী বা পশমী বস্ত্র পৃথক করা হয়। কারণ উক্ত দ্রব্যসমূহ দ্বারা কল নষ্ট হইতে পারে। পরে ঐ চীর খণ্ডগুলিকে ছুরিকাদ্বারা ৪ ইঞ্চি পরিমিত খণ্ডে বিভাগ করিয়া উত্তমরূপে ঝাড়িয়া ধূলা ইত্যাদি হইতে পরিস্কার

করিতে হয়। তৎপরে সেইগুলিকে কার্বনেট অব সোডার (carbonate of soda) সহিত গরম জলে সিদ্ধ করিতে হইবে। দেড়মন চীরখণ্ড সিদ্ধ করিতে হইলে উহার সহিত ২ নাগাইদ ৫ সের পর্য্যন্ত সোডা মিশ্রিত করিবে।

ঐ চীর খণ্ডগুলি সিদ্ধ হইবার পর ধৌত করিবার জন্য প্রস্তর নির্ম্মিত গামলায় নিক্ষেপ করিতে হয় এবং উহাতে নির্ম্মল জলদ্বারা উহাদিগকে পরিস্কৃত করিতে হয়। ইহাতে ধৌত করিলেই চীর খণ্ডের সমস্ত দুষিত পদার্থ দূর হইয়া যায়। তৎপরে উহাদিগকে পেষণ যন্ত্রে নিক্ষেপ করিয়া চূর্ণ করিতে হইবে। কলদ্বারা ১৷৷০ ঘণ্টা কাল চূর্ণ হইয়া থাকে। এবং অবশেষে ঐ চূর্ণ গুলি ড্রেনবাক্সতে আসিয়া পড়ে। ড্রেন বাক্সে আসিলে উহাদিগকে ক্লোরাইড অব লাইম (Chloride of Lime) দিয়া ধৌত করিতে হয়। উপর্যুক্ত মিশ্রপদার্থ দ্বারা ধৌত করিলেই উহারা শুভ্রবর্ণ ধারণ করে; পরে জলদ্বারা উহাদিগকে ধৌত করিতে হয়। তৎপরে ঐ চূর্ণের সহিত ফটকিরি ও সাবান, এবং সুজির নির্যাস বা অন্য কোন প্রকার মণ্ড চূর্ণ করিয়া মিশ্রিত করিতে হয়।

এই প্রকারে ঐ মিশ্রিত পদার্থগুলি কাষ্ঠনির্ম্মিত একটী লম্বা গামলায় নিক্ষেপ করিতে হইবে। এই গামলায় এরূপ একটী যন্ত্র আছে যদ্দারা ঐ চূর্ণ গুলি এরূপ ভাবে সংস্থাপিত হইবে যাহাতে তাহারা সর্ব্বদেশে সমান বলযুক্ত থাকিবে। সেই স্থলে উহাদিগকে ঠিক দুগ্ধের সারবৎ প্রতীয়মান হইবে। সেই গামলা হইতে একটী নলদ্বারা প্রস্তুত করিবার কলে উহারা নীত হয় এবং সেস্থলে উপস্থিত হইলেই কাগজ প্রস্তুত হয়।

যে কলের বিষয় আমরা উপরে উল্লেখ করিলাম, তাহা সমুদায়ে ১৪ ফুট লম্বা এবং ইহা প্রতি মিনিটে ২৫ হইতে ৪০ ফুট পর্য্যন্ত চলিয়া থাকে। কলের এক পার্শ্বে দধির ন্যায় তরল পদার্থ চলিতেছে দেখিতে পাওয়া যাইবে এবং অপর পার্শ্বে কাগজ প্রস্তুত হইয়া বহির্গমন করিতেছে। যে পার্শ্ব দিয়া কাগজ বহির্গত হইতেছে, সেই দিকে একটী টক্রু যন্ত্র সংস্থাপিত থাকে; ইহাতে কাগজ আসিবামাত্রই আপনার ইচ্ছামত পরিমাণে কাটিয়া লইতে পারা যায়।

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ওয়াট (Watt) সাহেব কাষ্ঠ হইতে কাগজ প্রস্তুত করিবার প্রণালী আবিষ্কার করেন এবং সেই বৎসরেই রিজেণ্টস্ পার্ক (Rejents park) নামক স্থানের অন্তঃপাতি (Victoria wharf) ভিক্টোরিয়া হোয়ার্ফে যে সাধারণ মেলা হয় তাহাতে এই কাগজ প্রথম প্রদর্শিত হইয়াছিল। ইংলণ্ডে যদিও এ প্রণালী অনুসারে কাগজ প্রস্তুত হয় না বটে, কিন্তু আমেরিকায় কাষ্ঠের কাগজ প্রায় ২৫ বৎসর প্রস্তুত

হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং সেই সকল কাগজ ইংলণ্ডদেশে আমদানি হইয়া থাকে এবং তাহাতে উত্তমোত্তম পুস্তকাদি মুদ্রিত হইতেছে। উপর্য্যুক্ত মেলায় ঐ কাগজে মুদ্রিত সংবাদপত্র, ব্যাঙ্কনোট এবং নানা চিত্র চিত্রিত করিয়া প্রদর্শিত হয়। সকলেই সুন্দর মুদ্রাঙ্কন কার্য্য দেখিয়া কাগজের ভূয়োসী প্রসংশা করিয়াছিল। এক্ষণে কেশে ঘাশ এবং কলাগাছের মাজ হইতে কাগজ প্রস্তুত হইতেছে এবং অন্যান্য অনেক প্রকার বৃক্ষাদি হইতেও প্রস্তুত হইতেছে। যে বৃক্ষের, গুল্মের বা লতার তন্তু আছে, তদ্বারা কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে। এই সকল দ্রব্য দ্বারা প্রস্তুত হইতেছে বলিয়াই কাগজের মূল্য ক্রমেই হ্রাস হইয়া আসিতেছে। এদেশে বালির কাগজের দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শিয়াছে। টিটাগড়ে একটী কাগজের কল শীঘ্রই নির্ম্মিত হইবে। ইংলণ্ডে ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ৪১৩ টী কাগজের কল সংস্থাপিত ছিল এবং তদ্বারা ২ কোটী টাকার কাগজ প্রস্তুত হইয়াছিল। এক্ষণে ইহার সংখ্যা পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে সন্দেহ নাই।

শ্রীবি ঃ—

—o*o—

সমসংস্থান বা জড়বিজ্ঞান।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পূর্ব্বোক্ত আকর্ষণ-শক্তি ব্যতীত জড়ের আর এক প্রকার আকর্ষণ-শক্তি আছে। তাহাকে কৈশিক-আকর্ষণ বলে। কৈশিক-আকর্ষণ অসমসংযোগের একটী বিশেষ কার্য্যফল মাত্র। যদি একটী কেশবৎ সূক্ষ্ম ছিদ্রসমন্বিত কাচনির্ম্মিত নলের এক প্রান্ত জলমধ্যে নিমগ্ন করা যায়, তাহা হইলে ঐ নলের ছিদ্রমধ্যে জল আপনি উঠিয়া আসিবে। প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে জল ঊর্দ্ধে উঠিবে। ইহাকেই কৈশিকাকর্ষণ কহে। কিন্তু যদি কতকগুলি কাচনির্ম্মিত নল জলমধ্যে মগ্ন করা যায়, এবং তাহাদের অভ্যন্তরস্থ ছিদ্রগুলির আয়তন কাহারও সহিত কাহারও ঐক্যতা না থাকে, তাহা হইলে, সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রছিদ্রযুক্ত নলমধ্যে জল অধিকদূর ঊর্দ্ধে উঠিবে এবং উঠিয়া ন্যুব্জাকৃতি ধারণ করিবে, এবং তদপেক্ষা কিঞ্চিদধিক ছিদ্রসংযুক্ত নলের জল তদপেক্ষা নিম্নে থাকিবে। এইরূপে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ছিদ্রসংযুক্ত নলের জল সকলের নিম্নে থাকিবে। ইহা এই চিত্রে প্রদর্শিত হইল।
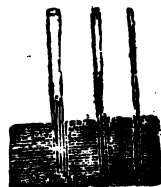
তরলপদার্থ সূক্ষ্ম নলাভ্যন্তরে সর্ব্বদা উঠে না ; কিন্তু কঠিন পদার্থ আর্দ্র হইলেই ঊর্দ্ধগামী হইয়া থাকে। যদ্যপি একটী বসা অর্থাৎ চর্ব্বী পরিপূর্ণ কাচনির্ম্মিত নল জলমধ্যে মগ্ন করা যায়, তাহা হইলে

সেই নলাভ্যন্তরস্থ তরল পদার্থ ঊর্দ্ধগামী হয় না বরং নিম্নগামী হইয়া থাকে এবং সেই তরল পদার্থের উপরিভাগ ন্যুব্জাকৃতি না হইয়া কুব্জাকৃতি ধারণ করে।

নলাভ্যন্তরস্থ তরল পদার্থের ঊর্দ্ধ গমন এবং নিম্নগমন যোগাকর্ষণ ও অসমসংযোগের তারতম্য অনুসারে ঘটিয়া থাকে। যখন তরল পদার্থ নলকে আর্দ্র করে, তখন ঐ তরল পদার্থের উপরিস্থিত পরমাণুগণের ভারের কিয়দংশ অসমসংযোগ বল দ্বারা রক্ষিত হইয়া থাকে। যখন ঐ নলাভ্যন্তরস্থ তরল পদার্থের পরমাণুগণের মধ্যে যোগাকর্ষণ শক্তির আধিক্য হয়, তখন ঐ শক্তির দ্বারা ঐ তরলপদার্থ নলাভ্যন্তর হইতে নামিয়া বহির্গত হইয়া থাকে।

বিজ্ঞানতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলেন যদ্যপি কঠিন এবং তরল পদার্থের অসমসংযোগ, তরল পদার্থের পরমাণুগণের যোগাকর্ষণ শক্তির অর্দ্ধাংশের সমতুল্য হয়, তাহা হইলে তরল পদার্থ ঊর্দ্ধে গমন করিবে না এবং নিম্নেও গমন করিবে না। কিন্তু যদি উহা যোগাকর্ষণ শক্তির অর্দ্ধাংশের অধিক হয়, তাহা হইলে তরলপদার্থ ঊর্দ্ধগামী হইবে এবং অর্দ্ধাংশের কম হইলে নিম্নে গমন করিবে।

কৈশিক-আকর্ষণের দৃষ্টান্ত সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। যদ্যপি একখণ্ড স্পঞ্জ বা কিয়দংশ চিনি এপ্রকারে স্থাপিত করা যায়, যে ইহার নিম্নভাগ জল-স্পর্শ হয়, তাহা হইলে ঐ জল ঊর্দ্ধে উঠিয়া উহার সমস্ত শরীরকে আর্দ্র করিয়া ফেলিবে। আলোকের শিখা তৈল হইতে অন্ততঃ দুই ইঞ্চি দূরে থাকে, কিন্তু কৈশিক-আকর্ষণ শক্তির দ্বারা তৈল ঊর্দ্ধে উঠিয়া আলোকের শিখাকে দীপ্যমান করিয়া থাকে। একখানি বস্ত্রের কোন অংশে এক বিন্দু জল পতিত হইলে, সেই আর্দ্র স্থানের চতুর্দ্দিক আর্দ্র হইয়া থাকে। যদ্যপি এক খণ্ড শুষ্ক কাষ্ঠ পর্ব্বতের কোন অংশে প্রোথিত করা যায়, পরে ঐ কাষ্ঠখণ্ডকে খুলিয়া জলে আর্দ্র করত পুনরায় সেই অংশে প্রোথিত করা যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে পর্ব্বতের ঐ অংশ স্ফীত হইয়া ফাটিয়া যাইবে। উপর্যুক্ত সকলগুলিই কৈশিক-আকর্ষণের প্রত্যক্ষ উদাহরণ। মেজের উপর একটী গেলাস ভূমি হইতে দুই ইঞ্চি উচ্চে স্থাপন কর এবং অপর একটী গেলাস তাহার পার্শ্বে মেজের উপর স্থাপন কর। তাহা হইলে দ্বিতীয় গেলাস প্রথম গেলাসটী অপেক্ষা একটু নিম্নে স্থাপিত হইবে। পরে প্রথম গেলাসটীতে কিয়ৎপরিমাণে জল এবং তৈল রাখিবে এবং তুলা-নির্ম্মিত একটী শলিতা প্রস্তুত করিয়া উহাকে জলদ্বারা আর্দ্র করিবে এবং উহাকে দুইটী গেলাসের অধঃ প্রদেশ পর্য্যন্ত মগ্ন করিয়া দিবে। তাহা হইলে এক বা দুই ঘণ্টা পরে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে প্রথম গেলাসস্থিত সমস্ত জল

দ্বিতীয় গেলাসে আসিয়া উপস্থিত হইবে; কিন্তু তৈল প্রথম গেলাসেই থাকিবে। যদ্যপি ঐ শলিতা তৈলদ্বারা আর্দ্র করা যায় তাহা হইলে প্রথম গেলাসস্থিত তৈলভাগ দ্বিতীয়টীতে উপস্থিত হইবে।

যখন দুই খণ্ড সোলা জলে ভাসিতে থাকে, নিকটস্থ হইবামাত্রই তাহারা শীঘ্র একত্রীভূত হইয়া যায়। লঘুদ্রব্যমাত্রেরই এই গুণ আছে। ইহাও উপর্যুক্ত আকর্ষণ জন্য ঘটিয়া থাকে। কারণ ঐ ভাসমান পদার্থদ্বয় জলদ্বারা আর্দ্র হইলে, জল উহাদের চতুর্দ্দিকে উত্থিত হয় এবং এই উত্থিত জল ইহাদের চতুর্দ্দিকে ভারস্বরূপ সংলগ্ন হইয়া থাকে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত জল সমভাবে উত্থিত হয়, পদার্থদ্বয়ের কোন গতি থাকে না। কিন্তু যখন পদার্থদ্বয় পরস্পর পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হয়, উভয়ের মধ্যস্থিত স্থান কেশের ন্যায় ক্ষুদ্র ছিদ্রবিশিষ্ট নলের অভ্যন্তরস্থ স্থানের সমতুল্য হয় এবং পদার্থদ্বয়ের অন্যদিক অপেক্ষা সেইদিকে জল ঊর্দ্ধগামী হইয়া থাকে। সুতরাং পদার্থদ্বয় ও সেইদিকে নিকটবর্ত্তী হইয়া একত্রীভূত হইয়া থাকে। যদ্যপি ভাসমান পদার্থদ্বয় জলদ্বারা আর্দ্র না হয়, তাহা হইলে তাহারা উভয়ে পৃথক হইয়া যায় এবং যদ্যপি ভাসমান পদার্থদ্বয়ের একটীকে তৈল সংযুক্ত করা যায় তাহা হইলেও তাহারা পৃথক হইয়া যাইবে।

কৈশিক-আকর্ষণের মধ্যে অন্তর্গমন অদ্ভুতব্যাপার বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ইহা কৈশিক-আকর্ষণের রূপান্তর ব্যতীত আর কিছুই নহে। ইহাকে শোষণ ও চোষণ বলিলেই স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। সচ্ছিদ্র পদার্থের ছিদ্রের মধ্যে তরল বা বাষ্পীয় পদার্থ প্রবেশকে শোষণ ও চোষণ বলা যাইতে পারে; কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে শোষণ তরল ও বাষ্পীয় দুই প্রকার পদার্থেরই হইতে পারে, কিন্তু চোষণ কেবল তরল পদার্থেরই হইয়া থাকে। মৃদঙ্গার একটী সচ্ছিদ্রপদার্থ, সুতরাং ইহা অধিক শোষণ করিতে পারে। সেই জন্য জল পরিশ্রুত করিতে হইলে মৃদঙ্গার ব্যবহার করা যায়, কারণ মৃদঙ্গার দ্বারাই জল হইতে অপরিষ্কার দ্রব্য শোষিত হইয়া থাকে। উদ্ভিদ-রাজ্যে দৃষ্টিপাত করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে বৃক্ষাদি মূল ও পত্রদ্বারা জল শোষণ করিয়া থাকে। প্রাণীরাজ্যেও শোষণ ক্রিয়া সুরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে কারণ পারদ, হরিতাল প্রভৃতি পদার্থ মনুষ্য বা অপর কোন জীবের দেহে লাগিলে বা তাহার ঘ্রাণে উৎকট পীড়ার সঞ্চার হইয়া থাকে। চোষণের বহুল উদাহরণ দেখা যায়। চিনি, কাগজ, বস্ত্র, বালুকা প্রভৃতি পদার্থগুলিতে চোষণের কার্য্য স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়। কাষ্ঠও একটী চোষক

পদার্থ, সুতরাং কাষ্ঠনির্ম্মিত পাত্রে যদ্যপি তামাক রাখা যায়, তাহা শীঘ্র শুখাইয়া যায়। কিন্তু ধাতুপাত্রে রাখিলে উহা শুকাইয়া যায় না।

কোন পদার্থ জল চুষিয়া লইলেই উহার আয়তন পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। একখানি কাগজ ভিজাইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে উহার আয়তন পূর্ব্বাপেক্ষা বাড়িয়াছে। কিন্তু শুকাইবামাত্রই পূর্ব্বায়তন বিশিষ্ট হইবে। জলে আর্দ্র করিলে সমস্ত দ্রব্যই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু রজ্জু জল শোষণ করিলেই কমিয়া যায়। কারণ একখণ্ড রজ্জু কতিপয় তন্তুর সমষ্টিমাত্র। জলসংলগ্ন হইবামাত্রই ঐ তন্তুসমূহ স্ফীত হইয়া উঠে; সুতরাং সেই রজ্জুর দৈর্ঘ্যতা কমিয়া যায়। নূতন বস্ত্রও সেই কারণে জলে আর্দ্র করিবামাত্রই উহার আয়তন কমিয়া যায়।

যাবতীয় জড় পদার্থের অবস্থা ত্রিবিধ; যথা, দৃঢ়, তরল, এবং বাষ্পীয়। ইহা তরল সমসংস্থান প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে জড়ের যে সকল গুণ পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, তাহা সকল গুলিই জড়ের সাধারণ গুণ। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ জড়ের কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন গুণ আছে। তন্মধ্যে এক্ষণে দৃঢ় পদার্থের কতকগুলি বিশেষ-বিশেষগুণের বিষয় বিবৃত করা যাইতেছে।

দৃঢ় পদার্থের প্রথম গুণ কঠিনতা। যে সকল পদার্থের পরমাণু এরূপ ঘনসন্নিবিষ্ট, যে বিশিষ্ট বল প্রয়োগ না করিলে তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, তাহাদিগকেই কঠিন বলাযায়। কাঁচ একটী দৃঢ় পদার্থ; ইহা কঠিনতা গুণ আছে। কিন্তু ইহা হীরক অপেক্ষা কঠিন নহে। কারণ হীরক দ্বারা ইহার পরমাণু বিভিন্ন করা যায়। সুতরাং যে পদার্থদ্বারা যাহার পরমাণু বিচ্ছিন্ন হয় সে তাহা অপেক্ষা কঠিন। হীরক দ্বারা সকল পদার্থেরই পরমাণু বিভিন্ন করা যায়। সুতরাং হীরক সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন। কাঁচ স্বর্ণ অপেক্ষা কঠিন। কারণ কাঁচ দ্বারা স্বর্ণকে বিভক্ত করা যায়। এবং লৌহ ও স্বর্ণ অপেক্ষা কঠিন। বিশুদ্ধ ধাতু অপেক্ষা মিশ্রিতধাতু কঠিন।

ইহার দ্বিতীয় গুণ উদ্বর্ত্তনীয়তা। কতকগুলি পদার্থকে হাতুড়ীদ্বারা পিটিয়া অতি সূক্ষ্ম করা যায়। যে সকল পদার্থ এই প্রকার অবস্থায় নীত হয়, তাহাদিগকেই উদ্বর্ত্তনীয় বলা যায়। তাপের ন্যূনাধিক্য অনুসারেই পদার্থের এই গুণের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। উদ্বর্ত্তনীয় পদার্থের পরমাণু সমূহ বিভিন্ন হয় না, কেবল মাত্র আপনাপন নিরূপিত স্থান পরিত্যাগ করিয়া থাকে। পদার্থদর্শনবিৎ পণ্ডিতগণ নিম্নলিখিত ধাতুসকলকে উদ্বর্ত্তনীয় বলিয়া গণনা করেন;—

স্বর্ণ	দস্তা
রৌপ্য	টিন

প্লাটিনম্ সীসক
তাম্র লৌহ

ইহার মধ্যে স্বর্ণই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উদ্বর্ত্তনীয়, কারণ ২০০০০ সোনার পাত উপর্য্যুপরি স্থাপন করিলে এক ইঞ্চিমাত্র উচ্চতা হয়। লৌহ সর্ব্বাপেক্ষা অল্প উদ্বর্ত্তনীয়।

ইহার তৃতীয় গুণ তান্তবতা। যে সকল পদার্থকে টানিয়া অতি সূক্ষ্ম তার প্রস্তুত করা যায়, তাহাকেই তান্তব বলা যায়। কতকগুলি পদার্থ স্বভাবতই তান্তব; যথা, মোম। কতকগুলি রাসায়নিক প্রক্রিয়াদ্বারা তান্তব হইয়া থাকে; যথা, গালা। স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, প্লাটিনম্, টীন, সীসক, লৌহ, ইস্প্রাত, ইত্যাদি ধাতুর এই গুণ আছে। প্লাটিনমই সর্ব্বাপেক্ষা অত্যন্ত তান্তব। স্বর্ণ ও অল্প তান্তব নহে। এক বিন্দু স্বর্ণ হইতে ৫০০ ফুট লম্বা তার প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ইহার চতুর্থ গুণ সংঘাততা। যে পদার্থকে আঘাত করিলে ভাঙ্গিতে পারা যায় না, তাহাকে সংঘাত বলা যায়। সে পদার্থকে ভাঙ্গিবার যত চেষ্টা করা যাউক না কেন, তাহার পরমাণু সকল সেই আঘাতের প্রতিরোধ করিবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত পদার্থের প্রতিরোধ শক্তি বা বল ভাঙ্গিবার জন্য প্রযুক্ত বলের সমান থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত পদার্থ কোন ক্রমেই ভগ্ন হয় না; কিন্তু যখন প্রযুক্ত বল তদপেক্ষা অধিক হয়, তখন পদার্থ সহজেই ভগ্ন হইয়া থাকে। লৌহ একটী সংঘাত পদার্থ। স্বর্ণ ও সংঘাত। যদি অনেকদিন পর্য্যন্ত কোন পদার্থকে ভাঙ্গিবার চেষ্টা করা যায়, তাহা হইলে তাহার সংঘাততা শক্তি হ্রাস হইয়া আইসে।

ইহার পঞ্চম গুণ ভঙ্গপ্রবণতা। ইহা বিস্তারিত বলিবার আবশ্যকতা নাই। কতকগুলি পদার্থের পরমাণু এরূপ সন্নিবেশিত যে তদ্দারা পদার্থটী কঠিন হইয়াও অল্প আঘাতেই ভাঙ্গিয়া যায়। সেই সকল পদার্থকে ভঙ্গপ্রবণ বলে। কাঁচ একটী ভঙ্গপ্রবণ দ্রব্য। ইহা সংঘাততার বিপরীত ধর্ম্ম।

ইহার ষষ্ঠ গুণ কোমলতা। ইহা বুঝাইবার আবশ্যকতা নাই। ইহা কঠিনতার বিপরীত ধর্ম্ম।

ইহার সপ্তম গুণ ছেদপ্রবণতা। ইহা তান্তবতার বিপরীত ধর্ম্ম।

ইহার অষ্টম গুণ ভারসহত্ব। জড়ের এই গুণের বিষয় বিস্তারিত বলিবার আবশ্যকতা নাই।

ইহার নবম গুণ ঘনত্ব। যে সকল পদার্থের পরমাণু সমূহ ঘনসন্নিবিষ্ট তাহারাই ঘন। এক ঘনইঞ্চি পরিমিত সুবর্ণ যত ভারী সেই রূপ পরিমিত তাম্র সেরূপ ভারী নহে। এবং সেই প্রমাণ লৌহ তাম্র অপেক্ষা কম ভারী। তাহার কারণ

সুবর্ণের পরমাণুসমূহ তাম্রের পরমাণু সকল অপেক্ষা ঘনসন্নিবিষ্ট এবং লৌহের পরমাণুসমূহ অপেক্ষা তাম্রের পরমাণু সকলের রিনিবেশ অত্যন্ত নিবিড়।

ইহার দশম গুণ বিরলত্ব। ইহা ঘনত্বের বিপরীত গুণ।

উপরে যে দশটী গুণের বিষয় লিখিত হইল ইহাদিগকে সঞ্চারী গুণ বলে। এই সকল গুণ কেবল পরমাণু সমূহের ভিন্ন ভিন্ন রূপে সন্নিবেশ হওয়াতেই ঘটিয়া থাকে। কিন্তু এই সকল গুণ ব্যতীত কঠিন পদার্থের আর ও কতকগুলি গুণ আছে। সেই সকল গুণ ক্রমে বিবৃত করা যাইতেছে।

ইহার প্রথম গুণ মিশ্রতা। কতকগুলি দ্রব্য এমত যে তাহারা জলের সহিত অনায়াসে মিশ্রিত হইয়া যায়। চিনি সহজেই জলের সহিত মিশিয়া যায়; কিন্তু বালুকা জলের সহিত কোন প্রকারেই মিশ্রিত হয় না। অতএব চিনির মিশ্রতাগুণ আছে।

ইহার দ্বিতীয় গুণ উদ্বেয়তা। কতকগুলি দ্রব্য আছে, যাহাদিগকে বায়ুতে রাখিলেই বায়ুর সহিত মিশ্রিত হয়। কর্পূর একটী উদ্বেয় পদার্থ।

ইহার তৃতীয় গুণ দাহ্যতা। কতকগুলি এরূপ দ্রব্য আছে যাহারা সামা অগ্নি সংযোগেই জ্বলিয়া উঠে। তাহাদিগকে দাহ্য পদার্থ বলে।

ইহার চতুর্থ গুণ দীপ্যতা। কতকগুলি এরূপ দ্রব্য আছে যাহা অগ্নিসংযোগেই জ্বলিতে থাকে এবং তাহা হইতে আলোক নির্গত হইয়া থাকে। কর্পূর, দীপক, ইত্যাদি দীপ্য পদার্থ।

ইহার পঞ্চম গুণ স্বচ্ছতা। কতকগুলির পদার্থের মধ্য দিয়া আলোক আসিতে পারে সুতরাং সে সকল দ্রব্য দ্বারা চক্ষু আচ্ছাদিত হইলেও দৃষ্টির কোন ব্যাঘাত ঘটে না। কাঁচ একটি স্বচ্ছ পদার্থ।

ক্রমশঃ।

শ্রীবিঃ—

তত্ত্বসংগ্রহ।

ডাক্তার লণ্ডি (Dr. Lundy) নামক একজন ডাক্তার চক্ষু ভাল রাখিবার নিম্নলিখিত উপায় গুলি নির্দ্দেশ করিয়াছেন ;—

(১) হীন আলোকে কখন পুস্তকাদি পড়িবে না।

(২) দুই পাশ হইতে আলো আসা উচিত; সম্মুখ কিম্বা পিছন হইতে আলো ভাল নহে।

(৩) শরীর অত্যন্ত ক্লিষ্ট হইলে, কিম্বা ব্যারাম হইতে আরোগ্য হইবার সময়, পুস্তকাদি পাঠ করিবে না।

(৪) শুইয়া শুইয়া পড়িবে না।

(৫) একান্বয়ে অনেক ক্ষণ ধরিয়া নিকটের বস্তুর দিকে চাহিয়া থাকিতে হয় এরূপ কার্য্য করিবে না; মধ্যে মধ্যে চক্ষুর বিশ্রাম আবশ্যক।

(৬) পুস্তক পাঠাভ্যাস আদির নির্দ্দিষ্ট নিয়ম থাকা উচিত।

(৭) পড়িবার সময় ঘাড় হেঁট করিয়া কিম্বা যাহাতে মুখে ও মস্তকে বেশী রক্ত আইসে এরূপ ভাবে বসিয়া পড়া উচিত নহে।

(৮) বেশ পরিষ্কার ছাপা পুস্তক পড়িবে।

(৯) যদি চক্ষুর কোন দোষ থাকে, তবে উপযুক্ত চষমা ব্যবহার করিবে।

(১০) যাহাতে স্বাস্থ্য হানি হয় এরূপ অবস্থা সকল পরিহার করিবে; এবং মদ্য ও তামাক একেবারে পরিত্যাগ করিবে।

(১১) খোলা জায়গায় পরিষ্কার বায়ুতে প্রচুর পরিমাণে শরীর সঞ্চালনাদি করিবে।

(১২) মানসিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক উন্নতিও আবশ্যক, কেন না শরীর দুর্ব্বল হইলে দৃষ্টিও প্রায় দুর্ব্বল হইয়া থাকে।—Brahmo Public Opinion.

সুবিখ্যাত মার্কিন পণ্ডিত এডিসন্ (Edison) সাহেব কৃত তাড়িত রেলগাড়ীর (Electric Railway) এইরূপ বিবরণ বাহির হইয়াছে। এই রেলগাড়ীর রাস্তা দুই মাইল লম্বা, ইহাতে বিশেষ কিছু নূতন দেখিতে পাওয়া যায় না; তবে রেলগুলি পরস্পরে এক এক খণ্ড তাম্রের দ্বারা সংলগ্ন। ইহার ইঞ্জীনখানা ১৫ ফুট লম্বা, এবং ইহাতে তো কোন চিম্নী থাকিবেই না, কেন না ইহা তাড়িত দ্বারা চলে, ধুঁয়ার কোন সংশ্রব নাই। ঘণ্টায় ১৮ মাইল ইহার স্বাভাবিক গতি, তবে ঘণ্টায় ৪২ মাইল পর্য্যন্তও চালান যাইতে পারে। এডিসন সাহেব বলেন যে ইহা রীতিমত চলিলে বাষ্পীয় রেলগাড়ী অপেক্ষা শতকরা ৫০ টাকা খরচা কমিবে।—Graphic.

পাথুরিয়া কয়লার খনির ভিতর অন্ধকারময় বলিয়া আলোক ব্যবহার করিতে হয়। কিন্তু কয়লার খনিতে এক প্রকার দাহ্য গ্যাস উৎপন্ন হয় এবং সেই নিমিত্ত সামান্য লণ্ঠন ব্যবহার করিলে উক্ত গ্যাস জ্বলিয়া উঠিবার ও মহা অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। এইরূপ অনিষ্ট নিবারণের জন্য ডেবীর নিরাপদ লণ্ঠন (Davy's Safety Lamp) নামক এক প্রকার লণ্ঠন ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সম্প্রতি এক প্রকার

আলোকময় রং (Balmain's luminous paint) খনিতে ব্যবহার করিবার কথা হইতেছে; এই রং লাগাইয়া দিলে বেশ আলো হইবে অথচ কোনরূপ অগ্নিকাণ্ডের সম্ভাবনা থাকিবে না। আমেরিকার কোন কোন খনিতে এক প্রকার খনিজ পদার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, অন্ধকারে সেফ্‌টিম্যাচ্ নামক বিলাতী দেশলাই ঘষিলে যে একরূপ আলোক নির্গত হয়, উপরি কথিত খনিজ পদার্থও ঘর্ষিত হইলে ঐ রূপ আলোক প্রদান করে। এইরূপ আলোককে ফস্‌ফরস্ আলোক কহে, জোনাকী পোকার আলোক এইরূপ ফস্‌ফরস্ আলোক; দক্ষিণ আমেরিকার স্থানে স্থানে এক প্রকার তিন ইঞ্চি সাড়ে তিন ইঞ্চি লম্বা বড় বড় মক্ষিকা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদিগকে দীপ মক্ষিকা (Lantern Fly) বলে; ইহাদিগের মস্তক হইতে ফস্‌ফরস্ আলো এত অধিক পরিমাণে বাহির হয়, যে ইহারা এক একটীতে এক একটী বাতীর কায করে এবং রাত্রিকালে পথিকেরা তিন চারিটা দীপমক্ষিকা একটা কাটির ডগায় বাঁধিয়া মশাল তৈয়ারি করিয়া থাকে। শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্তের চারুপাঠ ১ম ভাগে ইহার একটী সুন্দর বিবরণ লিখিত আছে। কোন কোন বৎসর বর্ষা কালে গঙ্গায় যে একজাতীয় অতি ছোট ছোট কাঁকড়া আসিয়া থাকে, তাহার খোলা হইতেও রাত্রিতে একরূপক্ষীণ ফস্‌ফরস্ আলোক বাহির হইতে অনেকে দেখিয়া থাকিবেন। Graphic July 1882.

প্রতি বিঘায় কত পরিমাণে গোল আলু জন্মাইতে পারে? তাহাতে যে গোলআলুগুলি পোতা হয়, তাহার আকারের ও পুতিবার সময় যেরূপে গোল আলুগুলিকে কাটা হয় তাহার উপর নির্ভর করে। যদি আইল দিয়া আইলের উপরে আলুগুলিকে ঢিবি করিয়া পোঁতা হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক আলুটী আড়াই হাত তফাত করিয়া পুঁতিতে হইবে; আর যদি লম্বা লম্বা জুলির মধ্যে পোঁতা হয় তাহা হইলে ১ হাত আন্দাজ তফাতে তফাতে পুঁতিতে হইবে। পুঁতিবার জন্য এক একটী আলুতে একটী করিয়া চোখ থাকিলেই যথেষ্ট হইতে পারে। কেহ কেহ আলুগুলিকে গোটা পুঁতিয়া দেয় কেহ বা একটা আলুকে দুইখানা কেহ চারিখানা করিয়া কাটিয়া পুঁতে। সর্ব্বাপেক্ষা এক একটী চোখযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুকরাতেই বেশী পরিমাণে আলু উৎপন্ন হইয়া থাকে। আমাদিগের দেশে টুক্‌রা করিয়া আলু পুঁতিবার রীতি নাই; কিন্তু বেশ বড় বড় ভাল আলুকে কাটিয়া ৪, ৫ খণ্ডে বিভক্ত করিয়া এক একটী চোখযুক্ত খণ্ড পুঁতিয়া দেখা উচিত, ইউরোপ ও আমেরিকায় অনেক স্থলে এইরূপই করা হইয়া থাকে। Phrenological Journal of America April 1882.

---o---

সমালোচন।

অদ্ভুতদিগ্বিজয়—শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনবিহারি চক্রবর্ত্তী প্রণীত,
চোরবাগান চিকিৎসাতত্ত্ব যন্ত্রে মুদ্রিত—মূল্য ১॥ টাকা।

স্পেনদেশীয় মহাকবি সারেভণ্টিস কৃত ডনকুইক্সোট নামক গ্রন্থখানি ইউরোপীয় প্রায় সমস্ত ভাষাতেই অনুবাদিত হইয়াছে। ইংরাজি অনুবাদ পড়িয়া আমরা সারভেণ্টিসের ক্ষমতার পরিচয় পাইয়াছি। বাঙ্গালা ভাষায় ইহা এতদিন পর্য্যন্ত অনুবাদিত হয়নাই। আজি বিপিনবাবু সেই অভাব মোচন করিলেন। আমরা বিপিন বাবুর কৃত সারযুক্ত অনুবাদ পাঠ করিতে প্রস্তুত। বিপিন বাবুর লেখা সরল ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। আমরা আশা করি সকলে গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া তাঁহার উৎসাহবর্দ্ধন ও পরিশ্রম সফল করিবেন।

হৃদয়-প্রতিধ্বনি—শ্রীযুক্তবাবু পূলিনবিহারি দত্ত বিরচিত। মূল্য আট আনা।

একজন প্রসিদ্ধ সমালোচক সমালোচন করিতে ২ বলিয়াছিলেন বাঙ্গালা কাব্য-প্রধান দেশ। যদি যে কোন পদ্যময় গ্রন্থকে কাব্য বলা যায়, তাহাহইলে কথাটী যথার্থ বটে। বৎসরে ২ মাসে ২ দিনে দিনে কতশত পদ্যগ্রন্থ সূর্য্যালোকে দেখা দিতেছে। বঙ্গমাতা আজ কবিপ্রসবিনী! কি গৌরবের বিষয়! কবিত্বাধিষ্টাত্রী দেবী ইংলণ্ড প্রভৃতি উচ্চতম সভ্য দেশ পরিত্যাগ করিয়া আজি বঙ্গে বিরাজমানা। বাঙ্গালি তোমার দুঃখের বিভাবরী বুঝি এতদিনে পোহাইল। বঙ্গবাসি! আর ভয় নাই আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই কবিতা লিখিতে শিখিয়াছে, পদ্যে ভারতমাতার তরে কাঁদিতে আরম্ভ করিয়াছে। বাঙ্গালার উদীয়মান কবি সম্প্রদায়ের প্রধান গুণ এই যে তাঁহারা প্রকৃতি বর্ণনার তরে বৃথা শ্রম স্বীকার করিয়া আর প্রকৃতিকে অধ্যয়ন করেন না, লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবিদিগের কাব্য পাঠ করিয়াই প্রকৃতির ছবি হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া রাখেন এবং তাহাই লিথোগ্রাফ করিয়া বঙ্গ সাহিত্যসমাজে প্রকাশ করিয়া থাকেন। যিনিই Goldsmith's Traveller, Cowper's Poems, হেমবাবুর কবিতাবলি ও নবীনবাবুর অবকাশ রঞ্জিনী পাঠ করিয়াছেন, তিনিই অন্ততঃ ক্ষুদ্রাবয়বের একখানি কবিতাগ্রন্থ পাঠককরে উপহার দিবেনই দিবেন। ইহাদিগকে আমরা প্রথম শ্রেণীর কবি বলিব। আবার যাঁহারা Words worth's Excursion ও Shelley's Poetical works অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের পায় কে, তাঁহারা একেবারে হেমচন্দ্র, মাইকেল ও নবীনচন্দ্রকে পরাস্ত করিয়া বঙ্গের অদ্বিতীয় কবি হইতে চাহেন। ইঁহারা আমাদিগের দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি।

আমাদিগের সমালোচ্যগ্রন্থ প্রণেতা দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি নহেন একথা আমরা নিঃশঙ্কচিত্তে বলিতে পারি। আর যাহাই হউক ইনি কখন হেমবাবু ও নবীন বাবুকে সিংহাসনচ্যুত করিতে প্রয়াসী নহেন। তাহা বলিয়া আমরা বলিতে পারি না যে ইনি প্রথম শ্রেণীর কবি। তবে হেমবাবুর প্রতি লেখকের অনেকটা শ্রদ্ধা আছে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। গ্রন্থকারের "যৌবনে যোগিনী" অনেকটা যেন হেম বাবুর বিধবা রমণীর মত। নবীন বাবুর প্রতিও ইহার অনাস্থা নাই। পলাশির যুদ্ধ কাব্যের—৬৩—৬৪—পৃষ্ঠার জনৈক বৃটিশ তনয়ের গীত স্মরণে যেন ইহার মহারাষ্ট্রীয় রণ—গীত লিখিত বোধ হয়। আর Goldsmith's Travellerএর

"Vain, very vain, my weary search to find,"
"That bliss which only centres in the mind."

পংক্তিটীর সহিত যেন নিম্নোদ্ধৃত ভাগটী মিলিয়া যায়।

সুখের দুঃখের মনই জনক
মনই স্বরগ মনই নরক

আবার কেহ ২ বলিয়া থাকেন যে লেখকের এই ভাগটী

যেলোকে গিয়াছ তুমি আজি, পুন্যশীলে
সেলোকে কি মানবের অশ্রুধারা যায়?

কাউপারের নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিপাঠে লিখিত বলিয়া বোধহয়, সত্য মিথ্যা পাঠক মহাশয়েরা বিচার করিবেন।

"So thou, with sails how swift! hast reach'd the shore,"
"Where tempests, never beat, nor bellows roar;"

সংক্ষেপে বলিতে গেলে এই সমালোচ্য পদ্য গ্রন্থ মধ্যে যেখানে একটু প্রশংসা করিবার পদার্থ পাওয়া গিয়াছে সেই ভাগটীই কোন না কোন কবির কাব্য পাঠে লিখিত। কোথাও হেম বাবুর, কোথাও গোল্ডস্মিথের বাঙ্গালা অনুবাদ, অবশিষ্টাংশ অসার। দুঃখের বিষয় হৃদয় প্রতিধ্বনীতে কবিত্বের কিঞ্চিৎ আভাস ও পাওয়া গেল না। যে দরের কাব্যের জ্বালাতনে আজ বঙ্গভাষা জ্বালাতিত; এখানিও সেই দরের পুস্তক।

লেখকের পদ্য রচনায়—কাব্যরচনায় নহে—কিঞ্চিৎ পারদর্শিতা আছে দেখিতে পাওয়া গেল। এরূপ গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নিকট মুদ্রাযন্ত্র বিশেষ ঋণি।

———o———

শব্দশক্তি।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে জগতে কেবল পদার্থ শক্তি ও অস্মদীয় শক্তিই নিরন্তর প্রকাশ পাইতেছে। সেই শক্তি অনুসারেই আমরা দ্রব্য, গুণ, ক্রিয়া ও তাহাদিগের পরস্পর সম্বন্ধ অনুভব করিতেছি। সেই শক্তি অনুসারেই আমাদিগের নানা প্রকার অন্তর ও বহির্ভাব হইয়া থাকে। মুখ হইতে নির্গত শব্দ সমুদায়ও সেই শক্তির আবির্ভাব। অতএব এই সকল শব্দ যে ঐ শক্তির পরিচায়ক হইবে তদ্বিষয়ে আশ্চর্য্য কি? যাহাতে যে রূপ শক্তি তাহা হইতে ঠিক তদ্রূপই আবির্ভাব হইবে, কখনই তাহার তিলার্দ্ধও ব্যতিক্রম হইবার সম্ভাবনা নাই। প্রাণিভেদে, জাতিভেদে এই শক্তির বিভিন্নতা ও তদনুসারে শব্দের বিভিন্নতা হইলেও মূল প্রকৃতির সমতা হেতুক কতলগুলি ভাব সকল হইতেই সমানরূপে প্রকাশ পায়। স্নেহ, ক্রোধ, শোক, হর্ষ, ভয়, বিস্ময়াদিসূচক শব্দ সকল জাতিতেই সমান রূপ। বাহ্য প্রকৃতির বিভিন্নতা হেতুক স্বর ব্যঞ্জনাদির বিভিন্নতা হইলেও আকার ইঙ্গিত ভঙ্গি ও স্বুর বিষয়ে সকলেরই সমতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রিয় বস্তুর বিনাশে এক জন বাঙ্গালী যেরূপ করে. কাশ্মীরী, বোম্বাই, মান্দ্রাজি. তৈলঙ্গী; ইংরেজ ফেঞ্চ জর্ম্মন প্রুসীয়; আফ্রিকা আমেরিকেরাও সেইরূপ করে। গো মহিষ শৃগাল কুকুর কাক বক শুকপ্রভৃতি জন্তুরাও সেইরূপ করিয়া থাকে। আবার হর্ষাতিশয্য হইলেও ঐ রূপ সকলেই এক প্রকার আকার ইঙ্গিত ভঙ্গি ও স্বুর প্রকাশ করে।

(১) সহসা শরীরে আঘাত প্রাপ্ত হইলে সকলেই আঃ ইঃ উঃ ওঃ ইত্যাদি শব্দ, মুখাদির ভাবভঙ্গি ও স্বুরবিশেষ প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই রূপে মনের বিস্ময়াদি ভাবও আঃ ইঃ উঃ এঃ ঐঃ ওঃ; ইঅঃ ওআঃ বাঃ; আহা হীই উহু ওহে য়হো ইস্ উস্; আহাহা হীহীই উহুহু এহেহে ওহোহো; আঁ ইঁ উঁ ওঁ হাঁ হিঁ হুঁ. আহাঁ হীঁই এঁহে, চ্চ্, ছিছি ছ্যা ছ্যা বাহ্য না নো নাই, ইত্যাদি নানা প্রকার শব্দ স্বুর বিশেষ ও ভাব ভঙ্গি বিশেষ দ্বারা ব্যক্ত করিয়া থাকেন এবং স্নেহসূচক মাতৃ প্রভৃতি শব্দ ও প্রায় সকল জাতিতে এক প্রকার দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব মনুষ্যের এই ভাষাকে মৌলিক ভাষা বলা যাইতে পারে। এই সকল শব্দ কোন শব্দবিশেষের অনুকরণকৃত নহে। অতএব ইহাদিগকে অননুকৃত বিস্ময়াদি ভাববোধক শব্দ বলা যাইতে পারে।

(২) কতকগুলি বস্তুবাচক শব্দও এইরূপ বিস্ময়াদি ভাবসূচক অনমুকৃত শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যেমন সূর্য্যোদয় দেখিয়া কেহ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া অপরকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক পূঃ অর্থাৎ ঐ, বব অর্থাৎ কি সুন্দর, এই দুইটি শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক প্রদর্শন করিতে ঐ দিক্ পূর্ব্ব বলিয়া পরিচিত হইল। পরে ঐ দিকে প্রথমে সূর্য্যের উদয় হয় বা তদ্ধেতুক উহাই সকলের প্রথম লক্ষ্য হয় বলিয়া ঐ সাদৃশ্যে যে কোন প্রথমোদিত বা প্রথম লক্ষ্য স্থানকে পূর্ব্ব বলা যায়। পুনশ্চ ঐরূপ সাদৃশ্যে যে কোন প্রথম লক্ষ্য সময়কেও পূর্ব্ব বলা যায়। কিন্তু আমরা এই রূপে গ্রহণ করিয়াছি বলিয়া যে সকল জাতিতেই করিয়াছে এরূপ নয়। তবে বিস্ময়বাচক ইস্ ও ত বা তা যোগে East, Est, Oost, Ostan, Ost, Ost, Autstes, Auszta, Auszra, প্রভৃতি শব্দও ঐরূপে উৎপন্ন হইয়াছে এরূপ বোধ হয়।

(৩) অন্য প্রকারে উৎপন্ন শব্দের সহিত যোগেও অনমুকৃত শব্দ হইতে নাম বাচক শব্দ হয়, যথা আঃ চর্য্য আশ্চর্য্য, আ কার আকার, ওঁ কার ওঁকার, হাঁ কার হাঁকার ইত্যাদি।

(৪) শব্দ অনুসারে অনুকৃত শব্দও শব্দমাত্রের বোধক হইয়া থাকে, যেমন সন্ সন্, ঝন্ ঝন্, সাই সাই, মর্ম্মর, কলকল, ছলছল ইত্যাদি।

(৫) বস্তুর শব্দ অনুসারে কৃত শব্দ বস্তুবোধক বস্তুর ক্রিয়াবোধক ও গুণবোধক হইয়া থাকে। কিন্তু এই সকল শব্দের সহিত মুখোচ্চারিত শব্দের বা বর্ণের কেবল সাদৃশ্যমাত্রই থাকে। কারণ বস্তু হইতে যে শব্দ হয় তাহা বস্তুতঃ ক চ বা প এরূপ কোন ব্যঞ্জন বা অ ই উ এরূপ কোন স্বর বর্ণ নহে, অনুভাবকের গ্রহণ অনুসারেই তাহা নির্দ্দিষ্ট হয়; এজন্য ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে ও ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিতে তাহা ভিন্ন ভিন্ন প্রকারেও গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি তিনি যেরূপ গ্রহণ করিয়াছেন তাহাই অপরকে বুঝাইয়া দেন, তবে তিনি তাহাই বুঝিতে স্বীকার করেন; যেমন ঢেঁকি চালিত হইলে "ঢেঁ—কি" এইরূপ শব্দই করে, কিন্তু হেঁ—চি, অথবা 'ভেঁ—ই' এরূপ শব্দ করে না; ইহার কোন নিরূপণ নাই; কিন্তু যিনি প্রথমতঃ ঐ শব্দকে ঢেঁকি বলিয়া বুঝিয়া ঐ বস্তুকে ঢেঁকি বলিয়া বুঝাইয়া ছিলেন তখন তাহাতে কাহারও আপত্তি হয় নাই; এইরূপে চাউলে পূর্ণ ধুচনি উচ্চালিত হইলে তাহাতে যে শব্দ হয় সে যে ঠিক ধু-চ-নি এরূপ শব্দ করে এরূপ নয়; কিন্তু প্রথম অনুভাবক যেরূপে গ্রহণ করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে কেহই আপত্তি করেন নাই। এইরূপে ঝঁ ঝী, খাঁচা, মঞ্চ বা মাচা, মাজুর বা মাদুর,

ঝাউ, শাই, বট, অশ্বথ খর্জ্জুর, ঘট, পট কুম্ভ, যষ্টি বাষ্প; আমি তুমি তিনি ভস্ত্রা বা তাওয়া প্রভৃতি শব্দ প্রথম অনুভবকর্ত্তার গৃহীত শব্দানুসারেই প্রচলিত হইয়াছে। গো, মেষ, কাক, কুক্কুট, টিয়া তিত্তিরি চিল কোকিল বৌকথাক ঘোটক ভাষায় কি প্রকারে রূপান্তরিত হইয়াছে তাহাও একটি তালিকাতে প্রদর্শন করিতেছি।

গো মেষ ময়ূর কাক কুক্কুট তিত্তিরি টিয়া চিল কোকিল বৌকথাক প্রভৃতি শব্দ যে তাহাদের রবের অনুসারে রচিত হইয়াছে তাহা পাঠক মহাশয়েরা একটু অনুধাবন করিলেই দেখিতে পাইবেন এবং অন্যান্য ভাষায় ও তদনুরূপ শব্দ দর্শনে বুঝিতে পারিবেন। ঘোটক শব্দটি ঐ জন্তুর গমন সময়ে যে ঘোটক ঘোটক এই প্রকার শব্দ হয় তাহা হইতে উৎপন্ন। তুরগ শব্দটি ত্বরা বা তুর যেমন বাঙ্গালা প্রভৃতি এইরূপে স্ব২ শব্দানুসারে স্ব স্ব বাচক হইয়াছে। অট পত গম যা স্থপ স্থ, স্ব, শী যুত প্রভৃতি সংস্কৃত ও চট্ ভিজ্ ঠেক ঠক, মড় কড় প্রভৃতি বাঙ্গালা ধাতু ক্রিয়া ও গুণবোধক শব্দও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে শব্দানুসারে সৃষ্ট হইয়াছে। অতএব এই সমুদায় শব্দও ঐ শ্রেণীর অন্তর্গত। পাঠকগণের সুবিধার নিমিত্ত আমরা এখানে দুই চারিটি শব্দের বিশেষ বিবরণ দিতেছি ও সেই সকল শব্দ হইতে যে আবার কত কত বস্তুবাচক ক্রিয়াবাচক ও গুণবাচক শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে ও হইতে পারে তাহা পাঠকগণকে প্রদর্শন করিতেছি। এবং এই সকল শব্দ যে জগতের সমুদায় ভাষায় তুর তুর্ তুড় তুড় দুড়্ দুড়্ ইত্যাদি শব্দ বেগ গম অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সংস্কৃত ভাষায় তাদৃশ বেগবাচক তুর শব্দ ও গম্ শব্দ যাহা গমন ক্রিয়ার শব্দবিশেষ, যাহার অর্থ যাওয়া, এই দুই শব্দের যোগে উৎপন্ন হইয়াছে। এ শব্দটি যৌগিক। ঝাউ শাঁই প্রভৃতি সূক্ষ্ম পত্র থাকা প্রযুক্ত ঐ দুই বৃক্ষে বায়ুর আঘাত লাগিলে যেরূপ শব্দ হয় সেই শব্দ অনুসারে অনুকৃত হইয়াছে ঝাউ ও শাঁই গাছের বাচক হইয়াছে। সংস্কৃতে শাঁইকে শমী বলে; সেও ঐরূপ অনুকরণকৃত; বট ঐ বৃক্ষের ফল পতনের শব্দ; অশ্বথ বায়ুর আঘাতে পত্রের শব্দ বিশেষ। খর্জ্জুর ও ঐরূপ পত্রশব্দ। ঘট—একস্থলে লইলে অন্য স্থলে স্থাপিত হইলে ইহা 'ঘট্' এইরূপ শব্দ করে এইটিই কাহারও লক্ষ্য হওয়াতে সে ইহাকে ঘট বলিল। অতএব ঘট এই শব্দ মূলশব্দ বা ধাতু হইল। ভূমির সহিত সংযোগে ঘট্ এইরূপ শব্দ হইল এজন্য ঘট্ ধাতুর অর্থ সংযোগ হইল; তাহা হইতেই ঘটিত অর্থাৎ যোজিত, মিলিত বা উপস্থাপিত অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ঘটা অনেক মনুষ্যের মিলন বা বিবিধ দ্রব্যের আয়োজন। এদিকে গথ্ রোমক ইটালীয় প্রভৃতি জাতিরা ঐ শব্দকে পট্ বা পোটস্ মনে করিলেন ও তদনুসারে ঘটের নাম ঘট না রাখিয়া

পট্ রাখিলেন এবং পট্ জলের আধার বা উহাতে ধরিয়া জলপান করা যায় বলিয়া পোটস্ ধাতুর অর্থ পান করা স্থির করিলেন।

পট—বাতাসে দিলে বায়ুর তাড়নে পট্ পট্ শব্দ করাতে ইহার (বস্ত্রের) নাম কেহ পট রাখিলেন। ইহা হইতেই পট, চিত্রপট, পট্ট, পটল, পটক, পট্ট, পটী, কাপট, কাপড়, পটবাস ইত্যাদি শব্দ হইল। অন্যান্য জাতীয়েরা এই শব্দকে ক্লাথ্, ক্লাধ্ ক্লিদ্ ক্লিদ্ মনে করিলেন ও তদনুসারে ইহাকে তাহাই বলেন। কুম্ভ—ইহাও ঘটের ন্যায় স্থাপন কালে কুম্ভ্ এইরূপ একটী গম্ভীর শব্দ প্রকাশ করাতে কুম্ভ নাম প্রাপ্ত হইল। বায়ু পূরণে ঐরূপ শব্দ হয় অতএব কুম্ভক অর্থে বায়ু পূরক যোগের প্রক্রিয়া বিশেষকে বুঝাইল এইরূপে প্রাণবায়ু রোধকারী কুম্ভীর; শব্দ গুম্বজ প্রভৃতি শব্দও এই ধাতু হইতে উৎপন্ন। যষ্টি প্রক্ষেপ কালীন য+টি এইরূপ শব্দ করাতে উহার নাম যষ্টি। অন্যান্য ভাষায় লষ্টি, লাঠী ষ্টিকা, ষ্টিকি ষ্টিক্ ষ্টক্ ইত্যাদি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

বাষ্প পাত্রে আবৃত থাকিলে বেগে উদ্গমকালীন এইরূপ শব্দ হয়, এজন্য ইহার ঐ প্রকার নাম হইয়াছে, অন্যান্য ভাষায় ঐ শব্দকে বাষ্প, ভাব, ভাপ্ এবং গ্যাজ্ গ্যাস্ গ্যাষ্ট্ গিষ্ট্ গেষ্ট্ গোষ্ট্ এইরূপ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

অহম্—নিশ্বাস ও প্রশ্বাসের শব্দ অ+হম্ কোন বাক্যের উত্তরে স্বীয় কর্ত্তৃত্ব স্বীকারসূচক ও বটে। ইহা হইতেই অহ্ অস্ আস্, ভ ভূ ইত্যাদি ধাতুর উৎপত্তি হইতেছে এবং সংস্কৃত ও জেন্দ ভাষায় অস্মি ও অহ্সি এই ক্রিয়াদ্বয় অহং অর্থেও প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এই অহ্মি হইতে অথবা অহম্ হইতে অহ্মি যে প্রকারে হইয়াছে হামি আমি, হম্ হং হই হঞি মৈ মীমু ইত্যাদি আশীয়িক শব্দও সেই প্রকারে উৎপন্ন হইয়াছে। এই নিশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দকে অন্য জাতীয়েরা ই—গো ই—উ ইয়া ইয়ো ইক্ আই ইত্যাদি প্রকারে নির্দ্দেশ করিয়া তত্তৎ শব্দ কেই অহং অর্থ প্রতিপাদক জ্ঞান করিয়া লইয়াছেন।

ত্বং ওতৎ অহং শব্দের সাদৃশ্যে তু+অহং ত্বম্ তুবম্ অসি অহি তুম তুম্ তু তুমি তুই তু য়ো ইউ য়ুক্ জক জিজ্ প্রভৃতি এবং তিনি বাচক অহ্তি, অস্তি, অশ্তি, ঐ তি, ও, সঃ, সো, সে, তৎ তিনি তেঁহ, ই, হে, তি এই সকল শব্দ উদ্ভূত হইয়াছে। অট, পত, গম প্রভৃতি কেবল পতন বা গমনকালীন পদাদির শব্দকে লক্ষ্য করিতেছে। অধিকাংশ ভৌতিক ক্রিয়া কেবল নানা প্রকার গমন বা অপসরণ এজন্য ধাতু মধ্যে গমনার্থ ধাতু বহুসংখ্যক আছে। ঐ সমস্ত ধাতু পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে অনায়াসে ইহা প্রতীত হইবে যে উহারা যদিও এক্ষণে

একার্থে ব্যবহৃত হইতেছে, তথাপি উহারা ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের গমনকে লক্ষ্য করে এবং সেই সেই লক্ষ্যে যথোপযুক্তরূপে প্রযুক্ত হইলেই সমধিক হৃদয়ঙ্গম ও যথার্থ ভাব প্রকাশক হয়। এই সকল ধাতু হইতে যত শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে এরূপ প্রায় অন্য কোন ধাতু হইতে উৎপন্ন হইতে দেখা যায় না। আমরা এস্থলে বোধ সৌকর্য্যার্থে কয়েকটী উদাহরণ দিতেছি। যথা:—

অট অটন, পর্য্যটন, অটনী, অটাট্যা অপত্য, পত্নী সপত্নী পতি সম্পাত, অনুপাত পথ পথিক, পথ্য পাথেয় পন্থা পান্থ নিপাত উৎপাত পৎ বিপৎ সম্পৎ বিপত্তি সম্পত্তি আপত্তি উপপত্তি অভ্যুপপত্তি পদ পাদ প্রতিপাদন নিষ্পাদন সম্পাদন অপগম সঙ্গম সঙ্গতি সঙ্গত নিগম আগম আগমন প্রত্যাগমন নির্গমন নির্গত অবগত দুর্গতি গতি গমন দুর্গম দুর্গ দুর্গা অধিগত সুগম সুগত উদ্গত অভ্যুপগম, ইত্যাদি যান প্রয়াণ, উদ্যান. প্রগত, যাপন উদ্‌যাপন, প্রচার উপচার সঞ্চার বিচার আচার অপচার অনুচর দুশ্চর অভিচার চর্য্যা ব্রহ্মচর্য্যা আচার্য্য আশ্চর্য্য ব্রহ্মচারী চরণ, চর চরাচর চরিষ্ণু, গোচর খেচর ভূচর, অচল, নিশ্চল, চালিত, চলিত বিচলিত প্রচলিত উচ্চলিত—ইত্যাদি।

সৃপ সৃপ সৃপ্‌ বা সিড়্‌ সিড়্‌ বা সড়্‌ সড়্‌ করিয়া যাওয়া সরীসৃপ সর্প অপসর্পণ বিসর্প। অন্যান্য ভাষায়ও ইহা সার্পো, সার্পেস্ম সৃপো creep creepan creepa creep ইত্যাদি আকারে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

সৃ—সৃ সৃ বা ছিড়িক্‌ ছিড়িক বা সির সির বা ঝির ঝির করিয়া অল্পেং চলিত হওয়া নিঃসরণ, নিঃসৃত প্রসার বিসৃত বিসারিত, আসার, সংসার অভিসার অপসরণ, উপসৃতি সূর্য্য, সূরি।

শী—শয়নকালে নিশ্বাসের শব্দ, শয়ন, (ভূমিতে দেহবিস্তার) শয়ান, শয্যা, অতিশয় অতিবিস্তৃত আশয় (যাহা নিশ্বাস দ্বারা টের পাওয়া যায় অভিপ্রায়) সংশয় তৎসূচক নিশ্বাস দুই দিকেই সমান বিস্তার, অনুশয় অনুতাপসূচক নিশ্বাস, উপশয়, শীত অর্থাৎ শয়নকালীন গায়ের তাপের আবশ্যক, শীতল, শীতলা, শীকর ইত্যাদি।

যুজ্‌—দুই আর্দ্র মৃত্তিকাখণ্ড বা অদৃঢ় বিরল পরমাণুযুক্ত পদার্থদ্বয় যোগ করিতে যুজ এইরূপ শব্দ হয়। অতএব যুজ ধাতু. ইহার অর্থ সংযোগ বা মিলন। যোগ (মিলন, সঙ্কলন দুই রাশির সংলগ্ন হওয়া) যোগ (সমাধি জীবাত্মা পরমাত্মার যোগ) বিয়োগ অনুযোগ উপযোগ (আহার সংযোগ) অভিযোগ (বিরুদ্ধে যোগ) সংযোগ (মিলন) নিয়োগ (নিচে যোজন)।

গৃহ বা গ্রহ—আশ্রয় বা অবলম্বন স্বরূপ লওয়া-গৃহ (ঘর) গৃহ (স্ত্রী) গ্রহ যাহাকে অন্যেরা আশ্রয় করে যেমন সূর্য্য। যে অন্যকে আশ্রয় করে যেমন গলগ্রহ, গ্রহ যে গ্রহণ করে, গ্রহণ লওয়া ও আক্রমণে, যেমন সূর্য্য চন্দ্রাদিকে রাহুর আক্রমণ বা অপর নক্ষত্রাদির ছায়ার আচ্ছাদন। গ্রাহ কুম্ভীর, এই রূপ গ্রহীতা, গ্রাহক, গৃহীত গ্রাহ্য, বিগ্রহ নিগ্রহ, পরিগ্রহ, নিগ্রহ সংগ্রহ অবগ্রহ, অবগ্রাহ অনুগ্রহ প্রতিগ্রহ, উপগ্রহ্য আগ্রহ, গৃহ্য ইত্যাদি। এই শব্দ হইতেও ভূরি ভূরি শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। এই রূপ এক এক সংস্কৃত চট্ ভিজ্ ঠেক ঠক প্রভৃতি বাঙ্গালা ধাতুও ঐ প্রকারে উৎপন্ন। মৃত্তিকাদিনির্ম্মিত কোন পাত্রে তাপ দিলে সেই পাত্রস্থ কোন অংশ যে রূপ শব্দ করিয়া তাহা হইতে পৃথক্ হইয়া পাড় তাহাকে চট্ এই রূপ মনে করা হইয়াছিল। সুতরাং ঐ চট্ ধাতু (শব্দ মূল) হইতে আমরা চটিল চাটিয়াছে এরূপ প্রয়োগ করি এবং পাত্রবিশেষের কোনস্থ উহার সহিত সম্পূর্ণ মিলিত থাকিলেও তাপ পাওয়াতে ও সেই তাপ সহ্য করিতে না পারাতে উহা পৃথক্ হইয়া পড়িল এরূপ অদ্য মনে করি। ঐ সাদৃশ্যে আমাদের মনে কেহ তাপ দিলে অর্থাৎ কষ্ট প্রদান করিলে তাহার সহিত পূর্ব্বে অভিন্ন বা আত্মীয়ভাবে মিলিত থাকিলেও হঠাৎ যে তাহাহইতে পৃথক্ হইয়া পড়ে তাহাকেও চটা বলি, এই রূপ চটা (কাঁশের বা তালের) চ্যাটা চটাল (যাহা হইতে বন্ধুর বা গোল অংশ চাঁচিয়া পৃথক্ করিয়া লওয়া যায়) চট্ (শীঘ্র) চটক (বাহ্য শোভা অর্থাৎ যাহা দেখিলে মন সহসা সেই দিকেই বিক্ষিপ্ত হয়)ইত্যাদি।

ভিজ্—বস্ত্রাদি বস্তু জলে আর্দ্র হইলে ও চাপ পাইলে তাহা হইতে যে ভিজ্ ভিজ্ এই রূপ শব্দ উৎপন্ন হয় সেই শব্দ হইতেই ভিজ্ এই ধাতু উৎপন্ন হইয়াছে ও ইহার অর্থ আর্দ্র হওয়া হইয়াছে। ভিজে, ভিজ্ভিজে মন ভিজিল, ভিস্তি, ভিজন

ঠেক্ যখন কোন বস্তু কোন বস্তুর সহিত সংলগ্ন হয় তখন ঠেক এই রূপে একটি শব্দ হয় সেই হেতু ঠেক্ ধাতু। ইহা হইতে ঠেকিল অর্থাৎ সংলগ্ন হইল, ঠেকো অবলম্ব ঠেকাও আশ্রয় বা অবলম্ব দেও অর্থ হইয়াছে। এইরূপ কোন শক্ত বস্তুতে আহত হইলে অপেক্ষাকৃত কোমল বস্তু ঠক বা হঠ করিয়া একটি শব্দ করিয়া তাহা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হয়, এজন্য ঠকধাতু বা হঠ ধাতু পরাজয় ও প্রত্যাবর্ত্তন অর্থ যেমন ঠকিল হঠিল, ঠকাইল হঠাইল। ঠক প্রতারক ঠকঠকি কাঠিন্য ঠকামি প্রতারণ ত্যাদি।

মড়—কোন কঠিন বস্তুকে চাপিলে মড়্ মড়্ করিয়া ভাঙ্গিয়া যায় এজন্য মড়্ ধাতু ইহা হইতে মড়মড়িয়া, মাড়া) মর্দ্দন করা মড়া মাড় মাড়ি (দাঁতের) প্রভৃতি শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। এই রূপ কড় হইতে কড়া, কঠিন, কড়া (লৌহবলয়, যাহাতে

ঐরূপ কড় কড় শব্দ হয়, কড়া কটাহ, কড়াই (মটর প্রভৃতি) কড়্কড়, কড়কড়ি ইত্যাদি।

শব্দ হেতুভূত আঘাত বা প্রকম্পন জন্য শব্দসাদৃশ্যে গুণবাচক—শব্দ। কোন বস্তু প্রত্যক্ষ করিলে যে শরীরে সহসা এক প্রকার ভাবের উদয় হয় ও মুখাদিতে রুধিরের আগমনে মুখনেত্রাদি হঠাৎ লোহিত বর্ণ হয় তাহাতে শরীরের মধ্যে যেন রঞ্জ এই রূপ একটী শব্দ সূচক আঘাত বা প্রকম্পন হইল; সেই রঞ্জ্ সাদৃশ্যে ঐ ভাবকে রঞ্জ্ বলা যায় তাহা হইতেই রক্ত, রঞ্জন রঙ্গ, রাগ রঞ্জিত ইত্যাদি শব্দ হইয়াছে। এই রূপ সূর্য্যের প্রখর কিরণ গায়ে লাগিলে গায়ে যে ভাবের অনুভব হয় তাহা ঘৃ বা ঘর শব্দে ব্যক্ত হইয়াছিল তাহা হইতেই ঘৃণি কিরণ, চর্ম্ম স্বেদজল, ঘর্ম্ম গরম গ্রীষ্ম ঘৃত নিঃসৃত গলিত, ঘৃণা সহ্য না করা অর্থাৎ দ্বেষ বা নীচ মনে করিয়া কষ্ট সহ্য করা ও তন্নিবারণ প্রবৃত্তি অর্থাৎ দয়া। ঘৃত স্থূল অর্থাৎ যে সকল পশুতে অধিক চর্ব্বি আছে। সুতরাং ঘৃত লাবণ্যযুক্ত ও উজ্জ্বল। ঘর্ম্ম দ্রুত হয় অতএব ঘৃত দ্রুতগামী; সূর্য্য সম্বন্ধীয় কিরণ যাহা অতিশয় দ্রুত গামী তাহা দ্রুতগামীর সাদৃশ্যে অশ্ব শব্দে কথিত হইত; ঐ কিরণ অশ্বকে ও ঘৃত ঘরিত হরিত বা হরি বলা যায়। ঘৃত পূর্ব্বে সামান্য জলকেও বুঝাইত এখনও আঘার শব্দে সিক্ত জল বুঝায়।

ঘৃত শব্দে যেমন স্থূল ও উষ্ণ বুঝায় তেমনি কিরণ হইতে ইহার মূলউৎপন্ন হইলেও স্নিগ্ধ ও শীতলকে বুঝায়; যে হেতু ঘৃত স্নেহ পদার্থ অর্থাৎ নির্গত তৈলবৎ পদার্থ ও তাহা যাহাতে আছে সে স্নিগ্ধ। ক্রমে নয়নস্নিগ্ধকর সবুজ বর্ণকে ও ঘৃত ঘরিত হরিত্ বা হরিত শব্দ দ্বারা বুঝান হইয়াছে। সফেদ বর্ণ বিস্তার বিকার ও প্রকাশ ভাবকে সূচিত করে; এজন্য ঐ শব্দ শ্বেত শব্দে কথিত হয়। ইহাই ভিন্ন২ ভাষায় সফেদ শফদা শাত্দা শাদা, শ্বেতঃ হিবত্ হ্বেতিস্, হ্বিদ, হুইট্ হোয়াইট্ ইত্যাদি শব্দে কথিত হইয়াছে এবং এই রং শস্য বিশেষের প্রধান লক্ষণ বলিয়া তাহাকে হুইট্ (গম) বলিয়া সংস্কৃত ভাষীরাও শ্বেতবৎ দেখিয়া শ্বেতসর্পকে পারদকে ও বিবিধ পুষ্প বৃক্ষাদিকে শ্বেত নাম প্রদান করিয়াছিলেন।

এইরূপে যে শয়ন করে তাহার গাত্রের যে অপেক্ষা কৃত ঠাণ্ডা ভাব হয় তাহাকে শীত, শীতল বলা যায় আবার অগ্নির ও সূর্য্যের কিরণে যে উষ্ করিতে হয় সেই উষ্ণ ভাবকে তপ বা তাপ বলা যায়। ঐ উত্তাপ অতিশয় লাগিলে শরীরে বা চক্ষে যে ভাব হয়; তাহা জ্বল বা জ্বল২ শব্দে উক্ত হইয়াছিল। উহা হইতে জ্বলন্ জ্বালা প্রভৃতি শব্দের উৎপন্ন হইয়াছিল; কিন্তু এতদ্ভিন্ন বাঙ্গালা

ভাষাতে কতক গুলি অব্যক্ত দৈহিক ভাবসূচক নাম আছে; যথা পিট পিট, কট্, কট্, ঝন্, ঝন্, গর্, গর্ কর্, কর্, কশ্, কশ্, আট, চাই ইত্যাদি।

(৬) গতি, রুতি আর্দ্রতা তাপ শীতল রাগ মালিন্য ম্লানতা প্রভৃতি যেমন বস্তুর বা দেহের ভাব ব্যক্ত করে তেমনই তাদৃশ গুণ সাদৃশ্য মনোভাবেরও ব্যঞ্জক হইয়া থাকে যেমন প্রাণ শীতল হইল জুড়াইল, মন সন্তাপিত হইল; তাহাতে অনুরক্ত হইল। মালিন্য বা ম্লানতা প্রাপ্ত হইল ইত্যাদি। কিন্তু এ সকল ভিন্ন বাঙ্গালা ভাষায় খিট্ খিট্ গর্ গর্ উড়্ উড়্ প্রভৃতি কতকগুলি ভাববোধক শব্দ আছে। এই রূপে দেখা যাইতেছে ভাষা এক প্রকারে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

১। তীক্ষ্ণ মনোভাব সূচক অননুকৃত শব্দ, আঃ, ইঃ।

২। অননুকৃত শব্দ হইতে নামবাচক শব্দ, পূর্ব্ব।

৩। তাদৃশ শব্দমাত্র বোধক অনুকৃত শব্দ, কলকল।

৪। অনুকৃত শব্দ হইতে নাম বাচক শব্দ, ঘট, দীপ।

৫। শব্দ হেতুভুত অর্থাৎ সাদৃশ্যকৃত দৈহিক ভাব সূচক শব্দ, রঞ্জ্ জন।

৬। দৈহিক ভাব অনুসারে বস্তু নাম বা গুণবাচক শব্দ, রক্ত রঞ্জিত ক্রিয়া হরিত, গৃহ. গ্রহণ ইত্যাদি।

৭। দৈহিক ভাব সাদৃশ্য মনোভাব তাহার ক্রিয়া বা তাহার গুণবাচক শব্দ; অনুরক্ত, মন আকৃষ্ট সন্তাপিত, অনুরাগ সন্তাপ।

৮। বাহ্য ভাব সাদৃশ্যহেতুক শব্দের ভিন্ন ভাববোধনে গতি বা শব্দান্তর হইতে ভিন্ন ভাববোধক শব্দান্তর। যেমন গ্রহণ লওয়া; গ্রহণ সূর্য্য গ্রহণ; ঘর্ম্ম উষ্ণ ঘর্ম্ম স্বেদজল; গৃহ গ্রহ গৃহ্য। ঋচ্, ঋক্, অর্ক, অর্চ্চনা অর্চ্চি।

৯। অপভ্রংশ হেতু রূপান্তরিত শব্দ যেমন অস্মি হইতে অহম্ বা আত্মন্ আমি বা আপনি, মনঃ।

১০। যৌগিক অর্থাৎ দুই বা অধিক ধাতুর যোগে উৎপন্ন।

১। যৌগিক শব্দ আবার নানা প্রকারে উৎপন্ন হয়; অননকৃত শব্দদ্বয়ের যোগে যেমন পুঃ বঃ পূর্ব্বঃ, কিম্ উ কিমু; এক অনুকৃত এক অননুকৃত শব্দযোগে যথা, আ চর্য্য = আশ্চর্য্য; অনুকৃত শব্দদ্বয় যোগে যেমন তুর গম্ তুরগ, গম গম গঙ্গা; গম্ নগ, সু গম সুগম, সু তরাং সুতরাং, পশ্ চাৎ পশ্চাৎ, অব ধা অবধি, অব ধা ঈরিত অবধারিত। প্র উৎ হা ত প্রোজ্ঝিত অহম্ হইতে অহম্মন্ অথবা আশমন আশ্ মা আত্মন আত্মা আত্মীয় আত্মজ; ক্রমে ইহা হইতে আসম আদমি atom amatomes আপন আপনাআপনি; ক্রমে ইহা হইতে আধ্যাত্মিক অধ্যাত্ম;

এ দিগে মনস্ মন্ মেন্স্ মানস মনুষ্য মানুষ মন মানন মত মতি মন্তব্য মন্ত্র মন্ত্রণা মন্ত্রী মনীষা মনীষী মনু ইত্যাদি। এই সকল শব্দের এখন কোনটি উপসর্গ কোনটি প্রত্যয় বা বিভক্তি ও কোনটি ধাতু ইত্যাদি নামে বিভিন্ন করা হইয়াছে এবং কোন কোন শব্দ দুই তিন বা অধিক ধাতুর যোগে উৎপন্ন হইলেও তাহা এক ধাতু বলিয়া গণ্য হইতেছে, এতদ্ভিন্ন নাম বলিয়া প্রসিদ্ধ শব্দের যোগে ও সমান প্রক্রিয়াকৃত যোগেও বিবিধ শব্দ উৎপন্ন হইয়া থাকে; যেমন ভূচর, খেচর, পঙ্কজ, পীতাম্বর, ইন্দ্রধনু অলজ্জটা কলাপ দ্বিষাস্থির শোণিতভার পঙ্কিল ইত্যাদি।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্যারিমোহন সেনগুপ্ত।

—:—

সাবান।

সাবানের ন্যায় প্রয়োজনীয় বস্তু অতি অল্প দেখা যায়। ইহার আবিষ্কারে মনুষ্য জাতির যে কতদূর সচ্ছন্দের বৃদ্ধি করিয়াছে তাহা বলা যায় না। ইহা একটী প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য। আমাদের দেশে পুরাকালে সাবান প্রস্তুত করিবার নিয়ম কিম্বা তাহার ব্যবহার কেহই জ্ঞাত ছিল না; তাহার একটী বিশেষ প্রমাণ এই যে আমাদিগের ভাষায় সাবান শব্দের কোন প্রতিবাক্য নাই। আমাদের দেশের অল্প লোকেই সাবান ব্যবহার করিয়া থাকে। তাহার প্রধান কারণ এই যে সকলের মনে এই কুসংস্কার বদ্ধমূল আছে যে সাবান শূকরের ও গরুর চরবি হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে সুতরাং তাহা হিন্দুমতে অস্পর্শীয় দ্রব্য। তাহাদিগের এই দৃঢ় বিশ্বাস থাকাতে সাবান যে কেবল তৈল ও ক্ষার হইতে প্রস্তুত হয় তাহা তাহাদিগের প্রত্যয় হয় না। সাবানের পরিবর্ত্তে আমাদের দেশে ব্যাসম, তৈলের খইল ও সাজি-মাটী প্রভৃতি দ্রব্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই সকল দ্রব্য তৈল অপহরণ করিতে পারে কিন্তু কোন দ্রব্য উত্তমরূপে পরিষ্কার করিতে পারে না। ইহা ব্যতীত ইটা নামক এক প্রকার শুষ্ক ফল শাল রুমাল ও পশমি রেসমি কাপড় ধৌত করিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাতে এই সকল কাপড়

নষ্ট হয় না, সাবান এই সকল কাপড়ে ব্যবহার করিলে অনেক সময়ে উহার রঙ্গ নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু ইটার দ্বারা সকল দ্রব্য পরিষ্কার করা দুঃসাধ্য, তজ্জন্য সাবান অনেক কার্য্যে ব্যবহার হইতে পারে।

যে কাপড় সাবান দ্বারা ধৌত করা যায় তাহার ময়লা সাবানের সহিত মিশ্রিত হইয়া শিথিল হইয়া পড়ে এবং অনায়াসে জলে দ্রব হইয়া যায়। যে সকল ময়লা সুদ্ধ জল দ্বারা দূর করা যাইতে পারে না, সাবান দ্বারা তাহা অনায়াসে সিদ্ধ হয়। পরিধেয় বস্ত্র সকল ঘর্ম্মে শিক্ত হইলে তাহা জলে ধৌত করিলে তাহার ময়লা যায় না। মনুষ্য শরীর হইতে তৈলাক্ত এক প্রকার পদার্থ নির্গত হয় তাহা জলে ধৌত হয় না। তৈলাক্ত পদার্থ মাত্রেই সুদ্ধ জলে ধৌত করা যায় না। তজ্জন্য ক্ষারের আবশ্যক করে। ক্ষারের সহিত তৈলের একত্র মিলন হইলে মিলিয়া যায়, এবং সংলগ্ন দ্রব্য হইতে উঠিয়া আইসে। সুদ্ধ ক্ষার ব্যবহার করিলে এই কার্য্য সাধন করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহাতে যে দ্রব্য পরিষ্কার করা হয় তাহা ক্ষার সংলগ্নে নষ্ট হইতে পারে। তজ্জন্য ক্ষারের বল হ্রাস করিয়া তাহার সহিত তৈল মিশ্রিত করিয়া সাবান প্রস্তুত করা যাইতে পারে। তজ্জন্য যে সকল দ্রব্যে ক্ষার ব্যবহার করিলে বিশেষ হানি হইতে পারে সাবান ব্যবহার করিলে সে আশঙ্কা থাকে না। মনুষ্য শরীরে সাবান বিশেষ উপকার করে। কিন্তু তথায় সুদ্ধ ক্ষার কখনই ব্যবহার করা যায় না। কারণ, তাহা হইলে চর্ম্ম আক্রমণ করিয়া নষ্ট করে। এবং চর্ম্ম ক্ষয় হইয়া নানা প্রকার চর্ম্ম রোগ উৎপন্ন হইতে পারে। কিন্তু সাবান ব্যবহার করিলে শরীরের বিশেষ উপকার দর্শে। ইহার দ্বারা দেহ হইতে নির্গত তৈলাক্ত পদার্থ সকল অন্তর্হিত করা যাইতে পারে। এই পদার্থ ঘর্ম্মের সহিত নির্গত হয় এবং জলে ধৌত করিলে সম্পূর্ণরূপে যায় না, শরীরে থাকিয়া গেলে শীঘ্র পচিয়া উঠে, দুর্গন্ধযুক্ত হয়, এবং নানা প্রকার রোগ উৎপত্তির কারণ হইয়া উঠে; ইহা দ্বারা লোমকূপ আবদ্ধ হইয়া যায়, এবং বাহিরের ময়লা উড়িয়া গাত্রে লাগিলে উক্ত চট্‌চটে পদার্থের সহিত মিলিয়া লোমকূপ আরও বন্ধ করিয়া ফেলে। তাহাতে ভালরূপে স্বেদ নির্গমন হইতে পারে না। স্বেদ নির্গমন কালীন শরীরের দূষিত পদার্থ সকল বাষ্পাকারে নির্গত হইতে থাকে। ইহা দ্বারা রক্তের দূষিত পদার্থ সকল বহির্গত হইয়া যায়, তজ্জন্য উত্তমরূপে স্বেদ নির্গমন না হইলে সেই সকল বিষাক্ত পদার্থ শরীরাভ্যন্তরে থাকিয়া হানি উপস্থিত করে। কিন্তু লোমকূপ সকল আবদ্ধ থাকিলে সেই সকল দূষিত পদার্থ শরীরের মধ্যে থাকিয়া রোগের উৎপত্তি করে। সাবান ব্যবহার করিলে গাত্রের

সমস্ত ময়লা দূর করে। স্বেদ নির্গমন কালীন বাহির্গতি বিষাক্ত দ্রব্য সকল গাত্র হইতে হরণ করে ও লোমকূপ সকল পরিষ্কার রাখে, এবং তাহার সহিত ময়লা জমিয়া লোমকূপের মুখ আবদ্ধ করিতে পারে না। এইরূপে স্বেদ নির্গমন কার্য্য উত্তমরূপে সমাধা হইয়া থাকে, ও শরীরের অভ্যন্তরস্থ দূষিত পদার্থ সকল বাহির হইয়া যায় এবং তদ্দ্বারা শরীরের বিশেষ উপকার হয়। সাবান ব্যবহারে মনুষ্য শরীরের আর একটী বিশেষ উপকার হয়। সাপেরা যেরূপ খোলোষ ত্যাগ করে তদ্রূপ মনুষ্যের চর্ম্মের অতি সুক্ষ্মস্তর প্রায় সকল সময়ে অকর্ম্মণ্য হইয়া শরীর হইতে উঠিয়া যায়, সাবান ব্যবহারে এই চর্ম্মস্তর উত্তমরূপে শরীর হইতে উঠিয়া যায় নতুবা শরীরে জমিয়া থাকিলে লোমকূপ আবদ্ধ করিয়া রোগোৎপত্তি হইতে পারে। মনুষ্যের যেরূপ চর্ম্ম অকর্ম্মণ্য হইয়া উঠিয়া যায় বৃক্ষাদির ও সেই রূপ হয়। অনেকই জানেন যে পেয়ারা গাছের ছাল শুষ্ক হইয়া পড়িয়া যায়। এই চর্ম্ম উঠিবার কারণ এই যে মনুষ্য শরীরের অস্থি চর্ম্ম পেশী সকলই এক প্রকার অণ্ডাকার কোষ (cell) দ্বারা নির্ম্মিত। এই কোষ সকল মিলিত হইয়া শরীরের ভিন্ন২ স্থানে ভিন্ন২ পদার্থ উৎপন্ন করে। কোথাও পেশী, কোথাও চর্ম্ম, কোথাও চুল, নখ ইত্যাদি, ইহা যত দিন জীবিত থাকে ততদিন শীররের কার্য্য করে, মৃত হইলে অকর্ম্মণ্য হয় এবং শরীর হইতে পৃথক হওয়া আবশ্যক।

সুতরাং যে সকল কোষ দ্বারা চর্ম্ম নির্ম্মাণ হইয়াছে তাহারা সময়ে২ মৃত হইয়া শরীর হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে, আর একটী নূতন স্তর বহির্গত হইয়া পূর্ব্ববৎ কার্য্য করিতে থাকে। বৃক্ষগণের শরীরে প্রথম অবস্থায় যে স্তর উৎপন্ন হয় তাহা যদি চিরকাল স্থায়ী হইত, তাহা হইলে বৃক্ষের আয়তন কখনই বৃদ্ধি হইত না। তজ্জন্য মধ্যে ২ সর্ব্বোপরি ছাল শুষ্ক হইয়া পড়িয়া যায়। এবং নূতন চর্ম্ম বহির্গত হয়। মনুষ্য শরীরে সেই অকর্ম্মণ্য ও দূষিত চর্ম্ম থাকিলে পচিয়া লোমকূপ বন্ধ করে ও নানা প্রকার রোগ উৎপন্ন করে। সাবান দ্বারা সেই চর্ম্ম অন্তরিত হইয়া যায়। সাবান ব্যবহার করিলে স্বেদ নির্গমন অতি উত্তমরূপে হয়, শরীরের দুর্গন্ধ যায়, অথচ সাবানে যে তৈল থাকে তাহা শরীরে শোষিত হইয়া উপকার করে। যাহারা সময়ে২ সাবান ব্যবহার করেন তাহারা গ্রীষ্মকালে যে দিন সাবান ব্যবহার করেন সে দিন অনায়াসে জানিতে পারেন যে অধিক পরিমাণে স্বেদ নির্গমন হয়। আমাদিগের দেশে শরীরে তৈল মর্দ্দন প্রথা অতি উত্তম ও আবশ্যকীয়। কিন্তু অধিক তৈল গাত্রে লাগিয়া থাকিলে লোমকূপ বন্ধ হইয়া যায় এবং ময়লা জমে। তজ্জন্য তৈল মর্দ্দন করিয়া পরে সাবান দিয়া সে তৈল তুলিয়া ফেলিলে,

শরীরে তৈল প্রবেশ করিতে পারে এবং উপরিভাগের তৈল উঠিয়া যায়। তৈল না মর্দ্দন করিয়া অনাবৃত দেহে সূর্য্য কিরণে বাহির হইলে উত্তাপ দেহের মধ্যে অধিক পরিমাণে প্রবেশ করে এবং চর্ম্ম অত্যন্ত খারাপ হইয়া যায়। সেই হেতু আমাদের দেশের কৃষক ও অন্যান্য শ্রমজীবী লোকেরা যাহারা অধিক সময় রৌদ্রে অনাবৃত দেহে কার্য্য করে তাহারা অধিক পরিমাণে তৈল মর্দ্দন করে। তদ্দ্বারা সূর্য্য কিরণ তাহাদের দেহ মধ্যে অধিক পরিমাণে প্রবেশ করিতে পারে না।

গাত্র মার্জ্জনার্থ যে সাবান ব্যবহার করা যায় তাহা উত্তমরূপে দেখিয়া ব্যবহার করিতে হয়, নতুবা নানা প্রকার চর্ম্মরোগ উৎপন্ন হইতে পারে। উহাতে ক্ষার অধিক থাকিলে চর্ম্ম ক্ষয় হইয়া পারে, অপরিষ্কার তৈল ও মসলা দ্বারা প্রস্তুত হইলে শরীরের অনিষ্ট করিতে পারে। তজ্জন্য শরীর মার্জ্জনার্থ অতি উত্তম সাবান ব্যবহার করা উচিত। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে সে বিষয়ে অনেকের দৃষ্টি নাই। এক প্রকার সাবান হইলেই হইল। তজ্জন্য অনেকে সামান্য বার অর্থাৎ লম্বা সাবান গাত্রে ব্যবহার করেন। অল্পমূল্যে যে সাবান পাওয়া যায় তাহা ও খারাপ। অপরিষ্কার সাবান মুখে বা অন্যান্য কোমল স্থানে লাগিলে রোগ উপস্থিত হইতে পারে। যাহাদিগের চর্ম্মরোগ আছে তাহাদিগের সাবান ব্যবহার করা অত্যন্ত আবশ্যক; অনেক সময়ে অনেক চর্ম্মরোগ কেবল সাবান ব্যবহার করিয়া আরাম হইয়াছে; তদ্ব্যতীত কার্বলিক সাবানে অনেক চর্ম্মরোগ আরাম হয়। সামান্য চুলকনা ঘামাচি ও পাচড়া সাবান ব্যবহার করিলেই ভাল হইতে পারে।

সাবান দুই প্রকার পদার্থ সংযোগে প্রস্তুত হইয়া থাকে; যথা তৈল ও ক্ষার। প্রথমতঃ তৈলের বিষয় কিছু বলা যাইতেছে। সর্ব্ব প্রকার তৈলকে দুই শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে; যথা স্থায়ী (fatty) তৈল ও অস্থায়ী (volatile) তৈল অর্থাৎ যাহা বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়। স্থায়ী তৈল দুই প্রকার। যাহা শীঘ্র শুষ্ক হয়, যথা মসিনার তৈল; ইহা রঙ্গের সহিত দেওয়া হয়। অন্য প্রকার যাহা শুষ্ক হয় না, যথা, এরণ্ড তৈল। দ্বিতীয় শ্রেণীর তৈল দুই প্রকার যথা সুগন্ধযুক্ত (Essential) ও পার্থিব মেটে (Mineral.)

প্রথম প্রকার তৈল অর্থাৎ স্থায়ী তৈল সকল সময় আটাযুক্ত এবং বাষ্পাকারে পরিণত হয় না। এক খণ্ড কাগজে লাগাইয়া বাতাসে রাখিলে ক্রমশ ঘন হইয়া লাগিয়া থাকে। যথা, রেড়ি, নারিকেল এবং চরবি ইত্যাদি। অস্থায়ী তৈল সকল সময়ে বাষ্পাকারে পরিণত হইতে পারে, ইহা বায়ু সংস্পর্শে রাখিলে ক্রমশঃ শুষ্ক হইয়া যায়। এক খণ্ড কাগজে কিঞ্চিৎ Essential তৈল লাগাইয়া

বায়ুতে রাখিলে কিছুক্ষণ পরে সমস্ত তৈল উড়িয়া যায় । এই জাতির তৈল গন্ধযুক্ত হইয়া থাকে, এবং স্থায়ী তৈল অস্থায়ী তৈল মিশ্রিত হইয়া গন্ধযুক্ত হয় ।

Essential তৈল বৃক্ষের পত্র, ছাল, ফুল ফল ইত্যাদি হইতে চুয়াইয়া পাওয়া যায়,এবং এই তৈল থাকাতে অধিকাংশ বৃক্ষের ফলে ও ফুলে সুগন্ধি থাকে। অনেকেই দেখিয়াছেন যে লেবুর খোসা হস্তে মর্দ্দন করিলে এক প্রকার তৈল নির্গত হয় এবং তাহা সুগন্ধযুক্ত । এই তৈল Essential ।

আতর ও সুগন্ধ তৈল মাত্রেই Essential oil আছে । উত্তম আতর কাগজে লাগাইয়া দিয়া বায়ু সংস্পর্শে রাখিলে কিছুকাল মধ্যে উড়িয়া যায়,—কিন্তু মিশ্রিত থাকিলে হয় না। অঙ্গুলি দ্বারা ঘর্ষণ করিলে এই তৈল আটার ন্যায় চটচটে বোধ হয় না। এই তৈল বৃক্ষাদির যে অংশে থাকে তাহা চূর্ণ করিয়া জলের সহিত চুয়াইতে হয়। তাহা হইলে বাষ্পের সহিত তৈল আসিয়া একত্রীভূত হয়। এই তৈল পেষণ দ্বারাও নির্গত করা যায়। ইহা কিয়ৎ পরিমাণে জলে গুলিয়া যায়, ইহা আলকোহলে ও দ্রব হয়। ল্যাভেণ্ডার ওয়াটার, ফ্লরিডা ওয়াটারে এক প্রকার Essential oil আছে, তাহা জলে ভাসিয়া উঠে।

আর যে এক প্রকার অস্থায়ী তৈল আছে তাহা মৃত্তিকা হইতে অথবা পাথুরিয়া কয়লা টার ওপিট চুয়াইয়া পাওয়া যায়। ইহাকে পার্থিব তৈল বলা যায়।

সাবান প্রস্তুত করিবার জন্য স্থায়ী তৈল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আফ্রিকা হইতে এক প্রকার তাল জাতীয় তৈল অধিক পরিমাণে আমদানি হইয়া থাকে। ইহা স্বভাবতঃ রক্ত হরিদ্রা বর্ণ, মাখনের ন্যায় গাঢ়। সাবান প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে এই তৈল সলফিউরিক অ্যাসিড ও বাইক্রমেট অফ পোটাশ দ্বারা রঙ্গ বিহীন করিলে ইহা হইতে অতি উত্তম শ্বেত সাবান প্রস্তুত হয়। নারিকেল তৈল হইতে সাবান প্রস্তুত করা যাইতে পারে। এই সাবান অত্যন্ত শুভ্র বর্ণ হয়। কিন্তু ইহাতে অধিক পরিমাণে জল থাকে। ইহাতে ব্যবসায়ীদিগের বিশেষ লাভ হয় ; কারণ অল্প মসলাতে অধিক সাবান প্রস্তুত হয়।

চরবি হইতে ও সাবান প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা গরু ও ভেড়ার পেট হইতে পাওয়া যায়। উহাকে গলাইয়া ও পরিষ্কার করিলে সাবান প্রস্তুত হইয়া থাকে।

জলপাই তৈল (olive oil) হইতেও সাবান প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা উক্ত ফলকে পেষন করিলে নির্গত হইয়া থাকে। সমুদ্রবাসী নানা প্রকার মৎস্য ও জন্তু হইতে যে তৈল প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাতে ও সাবান প্রস্তুত হয়। মৎস্যের তৈল সাবান

প্রস্তুত ব্যতীত নানা প্রকার কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে যথা, চামড়া, পাট, এবং চর্ম্ম পরিষ্কার করা। গাঁজার বীজ হইতে তৈল বাহির করিয়া কোমল সাবান প্রস্তুত হইয়া থাকে। মসিনার তৈল হইতেও সাবান প্রস্তুত হইয়া থাকে। তৈল ব্যতীত সাবান প্রস্তুত করিবার অন্যান্য যে সকল দ্রব্যের প্রয়োজন হয় তাহার বিষয় বলা যাইতেছে।

কস্‌টিক্ পটাস এবং কস্‌টিক্ সোডা তৈলের সহিত মিশ্রিত হইয়া সাবান প্রস্তুত হয়। এই দুই দ্রব্য ব্যবহারে দুই প্রকার সাবান তৈয়ার হইয়া থাকে; যথা কঠিন ও কোমল সাবান। কসটিক্ পটাস বৃক্ষাদির পাতা ও ক্ষুদ্র২ ডাল পোড়াইয়া প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রথমতঃ পাতা ও ডাল পোড়াইতে হয়। তৎপরে ভস্ম গুলি একত্র করিয়া তাহাতে জল দিয়া কর্দ্দমের ন্যায় করিতে হয়। তৎপরে ইহা স্তূপাকার করিয়া মধ্য দেশে গর্ত্ত করিয়া চূণ দিয়া পুনরায় ভস্ম দিয়া চূণ আবরিত করিয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করিতে হয়। তৎপরে তাহাতে অধিক পরিমাণে জল দিয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া পরিষ্কার করিয়া লইলেই হয়। ইহা দ্বারা সাবানের গোলা (Ley) তৈয়ার হইল।

এই পদার্থের সহিত তৈল মিশ্রিত করিয়া জ্বাল দিলে সাবান তৈয়ার হয়। অধিক পরিমাণে সাবান তৈয়ার করিতে হইলে কসটিক্ সোডা অন্য উপায় দ্বারা তৈয়ার করিতে হয়। কসটিক পটাস হইতে তরল বা কোমল সাবান (soft soap) এবং কসটিক্ সোডা হইতে কঠিন সাবান (hard soap) প্রস্তুত হয়।

অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন যে, এ দেশের পল্লিগ্রামে গরিব লোকেরা কলা গাছের বাসনা (অর্থাৎ শুষ্ক পাতা) পোড়াইয়া এক প্রকার ভস্ম প্রস্তুত করিয়া তাহার সহিত চূণ দিয়া কাপড় সিদ্ধ করে পূর্ব্বে যে প্রকারে সাবানের গোলা প্রস্তুত করিবার প্রথা বলা গিয়াছে ইহাও সকল অংশে একই প্রকার। ইহা আমাদের দেশে বহুকাল হইতে জানা আছে। এই ভস্ম হইতে ক্ষার উৎপন্ন হইয়া থাকে।

কঠিন সাবান তৈয়ার করিতে হইলে কসটিক সোডা জলে দ্রব করিয়া গোলা প্রস্তুত করিয়া তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া একটা কড়ায় রাখিয়া অগ্নি সংযোগে সিদ্ধ করিতে হয়। এই কড়া লৌহনির্ম্মিত এবং ইহার ধার অধিক উচ্চ, কারণ গোলা না পড়িয়া যায়। ১০ হান্দর অর্থাৎ ৩০ মন তৈল বা চরবি সাবান প্রস্তুত জন্য ব্যবহার করিলে, প্রথমতঃ কড়ার উপর ৫০০ Liters উত্তম গোলা ঢালিয়া দিতে হয়, এবং তৎপরে উক্ত চরবি তাহাতে দিতে হয়। এবং কড়ার মুখ

কাষ্ঠের কিম্বা লৌহের ঢাকনি দ্বারা আবৃত করিয়া জ্বাল দিতে হয়। ফুটিতে আরম্ভ হইলে মধ্যে২ নাড়িয়া দিতে হয়। এইরূপে পাঁচ ঘণ্টা থাকিবে। এই সময়ে হাতা করিয়া তুলিয়া ফেলিলে ফোঁটা করিয়া না পড়িয়া চিটে গুড়ের মত পড়িবে, তবে উত্তম সিদ্ধ হইয়াছে জানা যাইবে। এই সময়ে ১০০ ভাগ চরবিতে ১৫ কি ১৩ ভাগ লবণ এই হিসাবে তাহাতে লবণ নিক্ষেপ করিতে হয়। তৎপরে অল্পক্ষণ অগ্নি সংস্পর্শ রাখিলেই, সাবান জল হইতে পৃথক হইয়া জমিয়া যায়। তৎপরে কড়ার তলার ছিদ্র দিয়া জল বাহির করিয়া দিতে হয়। এই সাবান উষ্ণ থাকিতে থাকিতে একটা কাষ্ঠের বাক্সের মধ্যে রাখা হয়, এই বাক্স এইরূপ কৌশলে প্রস্তুত যে তাহা অনায়াসে খণ্ডে২ ভাগ করা যাইতে পারে। তৎপরে সাবান শীতল হইলে বাক্স খণ্ড২ করিয়া খুলিয়া লওয়া হয় এবং সাবান লম্বা২ করিয়া কাটা হয়। ১০ হান্দর (cwt) চরবিতে ১৬ ¼ হান্দর সাবান পাওয়া যায়, এবং শীতল হইলে শতকরা ১০ ভাগ কমিয়া যায়। প্রস্তুতের প্রক্রিয়া অনুসারে কঠিন সাবান তিন প্রকার হইতে পারে। যথা——

১। বিশুদ্ধ সাবান (Nucleus soap) অর্থাৎ লবণ নিক্ষেপের পর যে সাবান জল হইতে পৃথক হয়; তাহা জাল দিয়া বুদ্বুদ হইতে পরিষ্কার করা হয় এবং শীতল হইলে তাহার মধ্যে ক্ষুদ্র২ দানা বাঁধিয়া যায়। লবণ দিবামাত্র যে সাবান পৃথক হইয়া গোল২ ডেলা হইয়া যায় তাহাতে সাবান বিশুদ্ধ হয়। ইহাতে গোলা মিশ্রিত থাকে না, জল কিম্বা গ্লিসিরিনও থাকে না। এই গ্লিসিরিন সাবান তৈয়ার করিবার সময় উৎপন্ন হয়।

২। মসৃণ সাবান (Smooth soap) ইহা কিছুক্ষণ জলের সহিত কিম্বা ক্ষারের সহিত সিদ্ধ করিলে জল গ্রহণ করিতে পারে এবং তাহাতে দানাদার আকার থাকে না। ইহা এইরূপে তৈয়ার করা যায়, ক্ষারের জল উত্তম রূপে সিদ্ধ হইলে তাহাতে লবণ নিক্ষেপ করিলেই সাবান ক্ষারের জল হইতে পৃথক হইয়া পড়ে, তৎপরে পুনরায় পাতলা গোলা দিয়া পুনরায় সিদ্ধ করা যায়। প্রথমোক্ত সাবান হইতে এই বিভিন্নতা যে ইহাতে বেশী জল থাকে।

৩। পূর্ণ সাবান (Filling soap) এই সাবান সর্ব্বাপেক্ষা অপকৃষ্ট, এবং গোলা সুসিদ্ধ হইলে অল্প পরিমাণে লবণ দিলে কড়ার সমস্ত গোলা জমিয়া যায়। লবণ দিয়া কিছু অধিককাল সিদ্ধ করিলেই সমস্ত কঠিন হয় তৎপরে তাহা হইতে অন্তরিত করিয়া লম্বা করিয়া কাটিয়া বিক্রয় করা হয়। নারিকেল তৈল হইতে যে সাবান তৈয়ার করা যায় তাহাতে অধিক পরিমাণে জল থাকতেও অত্যন্ত কঠিন

অবস্থা প্রাপ্ত হয় এই নিমিত্ত লোকে নারিকেল তৈলের সাবান তৈয়ার করিয়া থাকে, নারিকেল তৈলের সাবান অধিক পরিমাণে জল ধারণ করিতে পারে, এবং ইহা অন্য তৈলের সহিত ব্যবহার করিলে ও সেই তৈলকে নিজের গুণ দিতে পারে অর্থাৎ অন্য তৈলের সহিত নারিকেল তৈল মিশ্রিত করিয়া সাবান তৈয়ার করিলে তাহাতে অনেক জল গ্রহণ করিতে পারে, তাহাতে ব্যবসায়ীর অনেক লাভ হয়। এইরূপ সাবান, ১০০ ভাগ তৈল হইতে ৩০০ ভাগ তৈয়ার করা যাইতে পারে। ইহাতে জল ব্যতীত, এই সাবানে গ্লিসিরিন, ও অন্যান্য লবণ যাহা গোলাতে থাকে তাহাও জমিয়া যায়। অধিক জল ও অন্যান্য পদার্থ থাকাতে এই সাবান অল্প মূল্যে বিক্রীত হয়। পরিষ্কার নারিকেল তৈল ও কসটিক্ সোডা একত্রে সিদ্ধ করিয়া সাবান তৈয়ার করা যাইতে পারে। ইহার জন্য অত্যন্ত ঘন গোলা করিতে হয়। এই সাবান গোলা জল হইতে অতি কষ্টে পৃথক হয়। ইহা অতি শীঘ্র কঠিন হয়। ইহা অতি শুভ্র ও মসৃণ, কোমল এবং অল্পেই ফেনা উঠে। কিন্তু ইহার দুর্গন্ধ যায় না। অন্য সুগন্ধ মিশ্রিত করিলেও দুর্গন্ধ থাকে। নারিকেল তৈল শুদ্ধ সাবান তৈয়ারে ব্যবহার হয় না; চরবি তৈলের সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সাবান রঙ্গ করিতে হইলে কএকটী দ্রব্য লাগে যথা Oxide of Iron, Brown red, Frankfort Black। এই দ্রব্য অল্প সাবানের সহিত দ্রব করা হয় তৎপরে সমস্ত সাবানে ঢালিয়া দিয়া নাড়িত হয় তাহাতে মারবেল প্রস্তরের ন্যায় দেখায়।

কোমল সাবান। কসটিক্ পটাস তৈল কি চরবির সহিত সিদ্ধ করিলে এই সাবান প্রস্তুত হয়। ইহা বায়ু সংযোগে কঠিন হয় না, অধিক পরিমাণে জল শোষণ করিতে পারে। শীতল হইলেও জেলির (Jelly) ন্যায় থাকে। এই সাবান অত্যন্ত অপরিষ্কার, কারণ, ইহা গোলা হইতে পৃথক হয় না, তৈয়ারের সময় যে গ্লিসিরিন তৈয়ার হয় তাহার সহিত মিশ্রিত থাকে। এই সাবান কেবল কসটিক্ পটাস হইতেই তৈয়ার হয় কিন্তু কঠিন করিবার জন্য অল্প পরিমাণে কসটিক্ সোডা দেওয়া হইয়া থাকে। ইহা অতি শীঘ্র জলে দ্রব হয়, এবং সুতা ও পশমের বস্ত্রাদি ধৌত করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহাতে যে তৈল ব্যবহার হয় তাহা উদ্ভিজ্জ যথা মসিনার তৈল ও জান্তব তৈল যথা মৎস্য তৈল ইত্যাদি মিশ্রিত। গাঁজার তৈল হইতে অতি উত্তম কোমল সাবান তৈয়ার হয়, ইহার রঙ্গ কিছু সবুজ। কসটিক্ পটাস ও তৈল একত্রে সিদ্ধ করিয়া যখন পরিষ্কার ও কিছু গাঢ় হয় তখন তাহানামাইয়া শীতল করিয়া পিপা ভরিয়া রাখে। ইহাতে লবণ লাগে না।

অঙ্গ সৌষ্ঠব করিবার জন্য যে সাবান প্রস্তুত হয়, তাহা প্রায় সামান্য সাবান উত্তাপে দ্রব করিয়া তাহাতে সুগন্ধি দিয়া প্রস্তুত করা হয়। ইহা তিন প্রকারে প্রস্তুত হইয়া থাকে যথা—

১। পুনরায় দ্রব করিয়া।

২। শীতল অবস্থায় সুগন্ধিযুক্ত করা।

৩। একেবারে প্রস্তুত করা।

প্রথম প্রকারের সাবান প্রস্তুত করিতে হইলে সাবানকে খণ্ড২ করিয়া কাটিয়া দ্রব করা হয় এবং তাহাতে সুগন্ধি দেওয়া হয়। তৎপরে ছাঁচে ঢালিয়া উত্তাপ দেওয়া হয়।

দ্বিতীয় প্রকার। সামান্য সাবান সূক্ষ্ম২ করিয়া কাটিয়া তাহাতে সুগন্ধি দেওয়া হয় তৎপরে রোলারের মধ্য দিয়া প্রবেশ করাইলে পাতের মত হয়, তাহা হইতে কাটিয়া চৌক করিয়া সাবান প্রস্তুত হয়।

তৃতীয় প্রকার। ইহা প্রথম অবস্থা হইতে প্রস্তুত করা হয়। শীতল না করিয়া দ্রব থাকিবার সময় রঙ্গ ও সুগন্ধি দিতে হয়।

সাবান রঙ্গ করিবার জন্য এই সকল রঙ্গ ব্যবহার করা হয় যথা। লাল Cinnaber, Coralline and fuschine; ভায়লেট violettar color; নিল Ultramarine পাটকিলে solution of raw sugar or Caramel (for scent oil of Bergamot, oil Itryme, oil of Lavender Amni oil.

স্বচ্ছ সাবান——সামান্য চরবি বা তৈলের সাবান ক্ষুদ্র করিয়া কাটিয়া সমান ভাগ আলকোহলের সহিত মিশ্রিত করিয়া সিদ্ধ করিলে, সাবান তাহাতে দ্রব হইয়া যায়। তৎপরে ইহা শীতল করা হয়। এই সময় সমস্ত ময়লা নিম্নে নিক্ষিপ্ত হয় এবং এই পরিষ্কার তরল পদার্থ ছাঁচে করিয়া রাখা হয় এইরূপে তিন সপ্তাহ হইতে চারি সপ্তাহ রাখিলে কঠিন হয়। ইহার রঙ্গের জন্য tincture of cochineal and aniline red and also Martin's yellow সুগন্ধের জন্য oil of cinnamon, oil of Itryme oil of marjoran and sassafras oil.

গ্লিসিরিন সাবান প্রস্তুত করিতে হইলে সামান্য সাবান আলকোহলে দ্রব করিয়া তাহাতে গ্লিসিরিন দিতে হয়। সাবানে যত অল্প জল থাকে, তত কঠিন হয় এবং অনেক ঘর্ষণের জল ফেন উঠে। আবার অধিক জল থাকিলে সাবান নরম হয় অল্পে ক্ষয় হইয়া যায়।

শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

মনোযোগ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

নিউটন এই পর্য্যন্ত বলিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যদি আর একটু বলিতেন তাহা হইলে আর আমাদিগকে এই প্রস্তাব লইয়া এত কষ্ট পাইতে হইত না। তিনি যেন বলিলেন না যে "কেবল দর্শন সম্বাদ নহে, সাংসারিক কোন কিছুর সম্বাদ। আমি যদি কোন দোষ বা গুণ করিয়া থাকি, তবে তাহা আমার মনোযোগের জনিত, অন্য কোন কারণ জনিত নহে" তাহা হইলেই আমরা পরিতৃপ্ত হইতাম। ছোট মুখে বড় কথা বলা উচিত হয় না, কিন্তু আমরা না বলিয়া পারি না যে মনোবিৎ পণ্ডিতেরা মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রকে 'বৃত্তি ও প্রবৃত্তি' এই দুই ভাগে বিভক্ত না করিয়া যদি 'মন ও মনোযোগ' এই দুই ভাগে বিভক্ত করিতেন তাহা হইলে তাঁহাদের কথার অর্থ সহজেই বোধগম্য হইত। ফলতঃ আমাদের মতে মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রের "প্রবৃত্তি পরিচ্ছেদ" তুলিয়া দিলেই গোল মিটিয়া যায়। 'জিজীবিষা,' 'নিগ্মিমিৎসা', 'লিপ্সা,' 'জুগুপ্সা,' 'চিকীর্ষা, আসঙ্গ লিপ্সা,' 'সম্বুভুক্ষা' ইত্যাদি বহুসংখ্যক প্রবৃত্তির ধারণা দূরে থাকুক্ নাম উচ্চারণ করিতেও অনেক সময় আবশ্যক করে। আর্য্যেরা অবশ্য ইহার অপেক্ষা অনেক সংক্ষেপ করিয়াছেন। তাঁহারা প্রবৃত্তি সমুদায়কে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য এই ছয় ভাগে বিভক্ত করিয়াই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। আমরা তাহাতেও সন্তুষ্ট নহি। আমরা এক কথায় শেষ করিতে চাহি। আমরা সমস্ত প্রবৃত্তিকেই মনোযোগের বিকার বলিয়া উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি।

ফলতঃ, পাঠক, আমরা আপনাকে নিঃসন্দেহে বলিতেছি যে প্রবৃত্তি মাত্রেরই জীবন মনোযোগ। মনোযোগকে বিষয়ান্তরে চালিত করুন, তৎক্ষণাৎ প্রবৃত্তি মরিয়া যাইবে। কিছু দিন হইল রাণী রাসমণির বাড়িতে এক জন পরম হংস আসিয়াছিলেন, আমাদের এক জন বন্ধু তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন, তিনি ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন যে পরম হংসের এমন আশ্চর্য্য নিস্পৃহস্বভাব যে তাঁহার গাত্রে মুদ্রা স্পর্শ করিবামাত্র সহসা জড়ভাব উপস্থিত হয়, সহসা দেহ যেন কাষ্ঠবৎ ও নির্জীবপ্রায় বোধ হয়। এখন পাঠক লোভ যাহাকে বলিবেন

বলুন ; টাকা দেখিলে যে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা হয়, তাহার নাম তো আপনার মতে লোভ? কিন্তু পরম হংসের তো টাকা স্পর্শে বিপরীত ভাব উপস্থিত হয়। তবে বলুন যে লোভ একটা সামগ্রী নাই, যদি থাকিত, তবে তাহা আপনারও যে স্থলে উপস্থিত হইত পরম হংসেরও সে স্থলে উপস্থিত হইত। যদি আমরা উহাকে লোভ না বলি এবং যদি এরূপ বলি যে টাকা দেখিলে কাহারও মনোযোগে সরসতা উপস্থিত হয়, আবার কাহারও বা মনোযোগে বিরসতা উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে বোধ হয় অনেকটা পরিষ্কার বোঝা যাইত। এক্ষণে আমরা নিম্নে একে একে সকল প্রবৃত্তির ব্যাখ্যা করিতেছি যথা প্রথমতঃ—

কাম।

আপাততঃ মনে করা যাউক যে যেন কামশব্দের অর্থ সৌন্দর্য্য গ্রহণ শক্তি। কিন্তু জগতে সৌন্দর্য্য শব্দে আহ্বান-যোগ্য কোন বস্তু নাই, সুতরাং সৌন্দর্য্য গ্রহণ শক্তিও কিছু নাই। সৌন্দর্য্য কিছু নাই, একথা আপাততঃ বলিলে পাঠক হয়তো বিরক্ত হইবেন। কিন্তু একথা আমরা একাকী বলিতেছি না, সকল শাস্ত্রে এবং সকল ইতিহাসেই এই কথা বলিতেছে। যে সকল পণ্ডিত চক্ষুর বিষয়ে পুস্তক লিখিয়াছেন তাঁহারা বলেন যে তুমি যাহা আপাততঃ সোজা দেখিতেছ তাহা বাস্তবিক বাঁকা এবং তুমি যাহা বাঁকা দেখিতেছ তাহা হয়তো সোজা। তাঁহাদের মতে সূর্য্য কিরণ বর্ত্তমানে যে ভাবে পৃথিবীতে পড়িতেছে এবং আমাদের চক্ষুর যেরূপ গঠন তাহাতে যে কোন্ বস্তু সোজা, কোন বস্তু বাঁকা, তাহা আপাততঃ নির্ণয় করাই কঠিন। সুতরাং চক্ষুর প্রতি আমাদের তো প্রথমতঃ এক প্রকার বিশ্বাসই নাই। দ্বিতীয়তঃ চিত্রকর পণ্ডিতেরা কহেন যে যে বস্তুতে গোল ও কোণ অধিক তাহাই অধিক সুন্দর। তাঁহাদের মতে গোল ও কোণ সৌন্দর্য্যের উপকরণ। এইতো সৌন্দর্য্যের অসারতা। অথবা সারবত্তা কিম্বা অসারতা আমাদের বর্ত্তমানে পরিষ্কার বিষয় নহে। সকল জাতির মতে গোল ও কোণ সৌন্দর্য্যের উপকরণ কি না সে পক্ষে বিশেষ সন্দেহ আছে, কারণ আমরা যে চিত্রকর পণ্ডিতদিগের উল্লেখ করিয়াছি তাঁহারা ইংরাজ জাতীয় অথবা তাঁহারা ককেসীয় বংশীয় সুতরাং তাঁহারা যে সৌন্দর্য্যের উপকরণ মীমাংসা করিয়াছেন তাহা অবশ্য ককেসীয় প্রকারের সৌন্দর্য্য। অতএব তাঁহারা যাহাকে সৌন্দর্য্য শব্দে উল্লেখ করিতেছেন তাহা এক জন কাফ্রীর মতে সৌন্দর্য্য কি না তাহা জানা যায় না। অথবা ককেসীয় জাতির মতে সূক্ষ্মাগ্র নাসিকা সুন্দর হইলেও এক জন কাফ্রির মতে

স্থূল নাসিকাই যে সুন্দর সে পক্ষে তো আর সন্দেহ নাই। ফলতঃ ককেসীয় জাতি কখন এরূপ অভিমান করিতে পারেন না যে সৌন্দর্য্য তাঁহাদের একচেটে সামগ্রী। রূপসম্বন্ধে গর্ব্ব করিবার অধিকার সকল জাতিরই আছে। বিলাসিনী ফরাসীর মধ্যেও আছে, আবার চীনেদের মধ্যেও আছে। কিন্তু চীন বালার রূপ হয়তো আমাদের চক্ষে রূপ বলিয়া বোধ হইতে না পারে। হয়তো কাফ্রি সুন্দরীর রূপ সন্দর্শন করিলে আমরা আপাততঃ মোহিত না হইয়া ভীত হইয়া পড়ি। তবে কি সৌন্দর্য্য লালসা অর্থাৎ কাম ব্যক্তি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন। যে স্ত্রীকে দেখিলে এক জন কাফ্রির সৌন্দর্য্য লালসা জাগরিত হয়, তাহাকে দেখিলে এক জন বাঙ্গালীর সৌন্দর্য্যলালসা শুষ্ক হইয়া যাইবে। পাঠক হয় তো বলিবেন যে জাতিভেদে সৌন্দর্য্য লালসা ভিন্ন২। আমরা বলি যে ব্যক্তি ভেদে ভিন্ন২। দেখুন এক জাতির মধ্যেই দেখুন। যাঁহাকে দেখিলে স্বামীর সৌন্দর্য্য লালসা পরিতৃপ্ত হয়, তাঁহাকে দেখিলে পুত্রের তাপিত প্রাণ শীতল হয়, তাঁহাকে দেখিলে অপরাধী দাস ভয়ে কম্পান্বিত কলেবর হয়, তাঁহাকে দেখিলে ভ্রাতার মন অনুকম্পা রসে আপ্লাবিত হয়, এবং তাঁহাকে দেখিলে পিতার শরীর প্রেম ভরে পুলকিত হয়। অতএব দেখুন্ সকলই কেবল মনোযোগের কর্ম্ম। মনোযোগ দেহীকে যে ভাবে চালনা করে দেহী সেই ভাবেই যায়। মনোযোগ যতক্ষণ বশ থাকে, মানুষ ততক্ষণ প্রকৃতিস্থ থাকে। কিন্তু একবার বলবান্ হইয়া উঠিলে মানুষকে ভূতের ন্যায় চালনা করে। আপনি মনোযোগকে যে পথে বার বার চালনা করিবেন, মনোযোগ শেষে স্বয়ং আপনাকে সেই পথে লইয়া যাইবে। আমরা মনোযোগকে প্রথম প্রথম ইচ্ছাপূর্ব্বক দিক্ বিশেষে চালনা করি, শেষে মনোযোগ আমাদিগকে সেই দিকে চালনা করে। পৃথিবীতে সৌন্দর্য্য নামক পদার্থ কিছু নাই। বার বার যাহাতে মনোযোগ দিবে, পরিণামে তাহাই সুন্দর হইবে। গণিত শাস্ত্র যদি প্রথম আপনার পড়িতে ভাল না লাগে, বারবার পড়িলে শেষে অবশ্যই ভাল লাগিবে। যে বস্তু চক্ষে প্রথম খারাপ লাগিবে, বারবার দেখিলে তাহাই শেষে ভাল বোধ হইবে। ইহার উদাহরণ দিতে হইলে আমাদিগকে অধিক দূর যাইতে হইবে না। পাঠক মনে করিয়া দেখিবেন যে যাহাকে কখন দেখি নাই, প্রথম দিন তাহাকে দেখিবা মাত্র তাহার গঠনের সমস্ত অসুন্দর ভাগ কেমন পরিষ্কাররূপে আমাদের অনুভূত হয়। দুই চারি দিন দেখিতে দেখিতে শেষে আর সেরূপ বিশেষ কিছু বোধ হয় না অর্থাৎ বিশেষ কিছু কুৎসিত মনে হয় না। ক্রমে পরিচয় হইতে হইতে তাহাকেই আবার শেষে অভেদ্য বলিয়া বোধ হয়। পুত্রের মুখ এত মধুর বোধ হয় কেন?

সর্ব্বদা ঘাঁটা যায় বলিয়া মধুর বোধ হয়। সচরাচর প্রাকৃত কথায় বলে যে "দাদার মত ভর্ত্তাটী কোথায় পাওয়া যায়।" দাদা হইলেই যে সুন্দর হইবে আর ভর্ত্তা হইলেই অসুন্দর হইবে ইহার অর্থ কি? ইহার অর্থ এই যে দাদা পরিচিত লোক. কিন্তু ভর্ত্তা নূতন লোক।

ইহাতে অবশ্য স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে "মাতৃবৎ পরদারেষু যস্তিষ্ঠতি স পণ্ডিতঃ" এই কথাই পরস্ত্রী সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা যুক্তিযুক্ত। কারণ ইচ্ছাপূর্ব্বক অকারণে নিজের মনোযোগকে অপবিত্র করা বুদ্ধিমত্তার কার্য্য নহে। মনোযোগকে যে ভাবে চালাইবে মনোযোগ সেই ভাবে চলিতেই ভাল বাসিবে, যখন এত সুবিধা রহিয়াছে তখন কেন অকারণে মনকে কলুষিত করা হয়। এই স্থলে আমাদের একটী বন্ধুর একটী কথা মনে হইতেছে তাহা এই; তিনি কহেন যে আমি বেশ্যা দেখিলেই নমস্কার করিয়া থাকি। কাহাকে নমস্কার করা হয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহেন যে আমি ঈশ্বরকে নমস্কার করিয়া থাকি। এ কথার অর্থ কি তাহা আর আমরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি নাই। কিন্তু ইহা অবশ্য স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে যে বেশ্যা তাঁহার মনোযোগকে ঈশ্বর লইয়া যায়।

ব্যাসদেব কহিয়াছেন যে "ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন সাম্যতি।" ইহার অর্থও স্পষ্ট। কেন না মনোযোগ যে পথে অভ্যস্ত সেই পথেই বারবার যাইবে। শেষে রক্ত মাংসের গতিও সেই পথে হইবে, তখন রক্ত মাংস আর মনোযোগকেও অপেক্ষা করিবে না। আমাদের কোন বন্ধু স্পিরিচুয়ালিষ্ট অর্থাৎ ভূতোপাসক ছিলেন। শেষে ভূত তাহাকে এরূপ পাওয়া পাইয়াছিল, যে ভূতকে আর ডাকিতে হইত না। ভূত আপনা হইতেই আসিত। আমাদের বন্ধুটী নড়াইলের পোষ্ট আপীসে চাকরী করিতেন। এক দিন এক খানি রেজিষ্টরী পত্র হাতে করিয়াছেন, এমন সময় ভূত আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন, তাঁহার মুখে ফেণোদ্গম হইতে লাগিল। তিনি রেজিষ্টরী পত্র খানি ছিড়িয়া ফেলিলেন। একজন পিউন্ কাছে ছিল, সে পত্র খানি তাঁহার হাত হইতে কাড়িয়া লইল। পত্রের মধ্যে নোট্ ছিল। সুতরাং ব্যাপার গুরুতর হইয়া উঠিল। শোচনীয় দীনবন্ধু মিত্র মহোদয় সে সময়ে ঐ অঞ্চলের ইনস্পেক্টর ছিলেন। তিনি এ রূপ কোপান্বিত হইয়াছিলেন যে পত্র পাঠ আসিয়া আমাদের সেই ভূতাবিষ্ট বন্ধুকে ফৌজদারীতে সোপরর্দ্দ করিলেন। সকলে দীনবন্ধু বাবুর নিন্দা করিতে লাগিল, সকলেই বলিল যে নিজের রক্ত মাংসের উপর যাহার অধিকার নাই, তাহাকে ফৌজদারীতে দেওয়া অন্যায় হইয়াছে। কিন্তু দুই চারি দিন

ফৌজদারীতে যাতায়াত করিয়া আমাদের বন্ধুটীর জন্মের মত রোগ সারিয়া গেল। ইহার অবশ্য কারণ আর ব্যাখ্যা করিবার আবশ্যকতা করে না। ফলতঃ বিষয় বিশেষে মনোযোগ বার বার চালিত হইলে শেষে আর মনোযোগ আবশ্যক করে না। শেষে রক্তমাংস মনোযোগকে আকর্ষণ করে। ফলতঃ "জানামি ধর্ম্মংনচমে প্রবৃত্তি র্জানাম্যধর্ম্মং নচমে নিবৃত্তিঃ। ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা প্রবৃত্তোস্মি তথা করোমি॥" এই কবিতায় যে হৃষীকেশ শব্দ আছে, তাহার অর্থ আমাদের মতে মনোযোগ। হয়তো হৃষীকেশ শব্দের আভিধানিক অর্থই মনোযোগ হইতে পারে। কারণ আমাদের স্মরণ হইতেছে যে ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের প্রণীত শিক্ষা দর্পণ নামক কাগজে "হৃষীকেশ" শব্দের অর্থ 'বিবেক' বলিয়া উল্লিখিত আছে। তিনি অবশ্য সবিশেষ জানিয়া শুনিয়াই ও রূপ অর্থ করিয়াছেন।

ইংরাজীতে একটি চলিত বাক্য আছে যে নিজের স্ত্রী সুন্দরী হয় না। বাস্তবিক কথাও তাই। নিজের স্ত্রী হাজার সুন্দরী হইলেও সুন্দরী বোধ হয় না। কিন্তু অপর একজন স্ত্রীলোক তাঁহার অপেক্ষা কম সুন্দরী হইলেও তাহাকে আপাততঃ অধিক সুন্দরী বলিয়া বোধ হয়। ইহার অর্থ এই যে যখন নিজের স্ত্রীকে দেখাযায় তখন মনোযোগ কেবল তাঁহার সৌন্দর্য্যের প্রতিই ধাবিত হয় না, পরন্তু তাঁহার অন্যান্য ইষ্টানিষ্টের প্রতিই সমধিক ধাবিত হয়। কিন্তু যখন অপরের প্রতি দৃষ্টিপাত হয়, তখন সে মরুক্ আর বাঁচুক সে দিকে আর মনোযোগ হয় না, কেবল তাঁহার সৌন্দর্য্যের প্রতিই সমধিক মনোযোগ হয়। এই স্থলে মহাত্মা ভূদেব বাবুর শিক্ষা-দর্পন আর একবার স্মরণস্থ হইতেছে। তাহার এক স্থলে এইরূপ লেখা আছে যে রাবণ যখন সীতাকে হরণ করিয়াছিল, তখন সীতা অবশ্য কাতরতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। রাবণ অবশ্য অহৃদয় লোক ছিল না বরং সীতার সতীত্বের প্রতি বল পূর্ব্বক আক্রমণ না করাতে পূর্ব্বাপর তাঁহার ধীরতাই প্রকাশ আছে। এরূপ বোধ শোধ সত্ত্বেও সে যে সীতার করুণতায় আর্দ্র হইল না তাহার কারণ এই যে তাঁহার মনোযোগ সীতার সৌন্দর্য্যের প্রতি এরূপ আকৃষ্ট হইয়াছিল, যে সে তাঁহার কাতরতা অনুভবই করিতে পারে নাই, বরং তাঁহার কাতরতাবশত তৎকালে তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হওয়াতে তাঁহার রূপ মাধুরী রাবনের একতান নয়নে বিবর্দ্ধমান হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। ইতিবাস লেখক শ্রীযুত তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় দিল্লীতে কেরা ও কেকোবাদের সাক্ষাৎকার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে লম্পটেরা অন্য পক্ষে সহস্র দোষী হইলেও সহৃদয়তা পক্ষে কখন হীন হয় না। বাস্তবিক আমরা এ কথা স্বীকার করি। তবে বিলাসী যে সতীত্বের অব-

মাননা করে তাহার কারণ এই যে তাহার মনোযোগ সে অবমাননা অনুভব করে না। কেবল কালিদাসের হংসের ন্যায় জল মিশ্রিত দুগ্ধ হইতে দুগ্ধের ভাগ বাহির করিয়া জল ভাগ পরিত্যাগ করিয়া থাকে। এমন শুনা গিয়াছে যে বিলাসিনী কটু সম্ভাষণ করিতেছে, বিলাসী তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিতেছে না। বিলাসীদের মুখে এরূপও শুনা গিয়াছে কটুবাদে বিলাসিনীর সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়। অতএব এই ইতর বিষয় লইয়া আমরা আর অধিক আন্দোলন করিব না। এক্ষণে কেবল ইতিহাস হইতে একটী গল্প উদ্ধার করিয়া ক্ষান্ত হইব। ঐ গল্প পাঠ করিলে সংক্ষেপে জানিতে পায়া যায় যে মনোযোগ মধ্যে মধ্যে ভয়ানক প্রতারিত হয় অর্থাৎ

"ভাল বাসিনে যায়,
ভাল সে কেন আমায় ভাল বাসা জানায়।"

এইরূপ হয়। গল্পটী এই; ইংলণ্ডের রাজা প্রথম চার্লস্ নববধূ মেরিয়াকে ফ্রান্স হইতে আনিবার নিমিত্ত বকিংহামের ডিউককে তথায় প্রেরণ করেন। বকিংহাম বাবুগিরির জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। ফ্রান্সদেশে উপস্থিত হইয়া তিনি বাবুগিরির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। এমন কি তিনি মণিমুক্তা প্রবালাদি পরিতৃপ্ত পরিচ্ছদে বিভূষিত হইয়া যৎকালে ফ্রান্সের রাজপথে ভ্রমণ করিতেন, তখন মহামূল্য মণি সকল তাঁহার বসনস্খলিত হইতে থাকিত। কেহ কুড়াইয়া দিলে তিনি তাহা উচ্ছিষ্ট বলিয়া গ্রহণ করিতেন না। ফরাসীরা তাঁহাকে এরূপ আদরে গ্রহণ করিয়াছিল যে তিনি ফরাসী কি ইংরাজ তাহা সহজে বুঝিতে পারা যাইত না। ফ্রান্স দেশের রাজসভায় তাঁহার সর্ব্বোপরি গণনীয়তা ছিল। সম্রাট ও মহারাণী তাঁহাকে লইয়া সর্ব্বদাই আমোদ আহ্লাদ করিতেন। ক্রমে তাঁহার অন্তঃকরণ এরূপ স্পর্দ্ধিত হইয়াছিল, যে মহারাণী ভিন্ন আর কোন রমণীকে তিনি মনোযোগের পাত্র বলিয়াই মনে করিতেন না। মহারাণী রসিকতা ও আমোদপ্রিয়তার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। একজন ফরাসী গ্রন্থকার কহেন যে সচরাচর প্রসক্তি যাহাকে বলে তাহা কার্য্যে না হইয়া মুখে ও ব্যবহারে যতদূর হইতে পারে মহারাণী স্বকীয় পুরুষ বন্ধুদিগকে তাহা অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রদর্শন করা দোষের বিষয় মনে করিতেন না। ক্রমে বকিংহাম মনে করিতে লাগিলেন যে আমি মহারাণীর প্রতি যে পরিমাণে মনোযোগ করি, মহারাণীও আমার প্রতি তৎপরিমাণে মনোযোগ করিয়া থাকেন। এক দিন সন্ধ্যানীল-সেবন বাসনায় আকৃষ্ট হইয়া মহারাণী সহচরীগণ ও বকিংহামের সমভিব্যাহারে প্রাসাদের সন্নিকৃষ্ট উপবনে ভ্রমণ করিতেছেন এমন সময়ে বকিংহাম মহারাণীর সৌন্দর্য্য ধ্যান করিতে এরূপ আসক্ত-মনোযোগ হইয়া উঠিলেন যে

তাঁহার পক্ষে সকলই সম্ভব বোধ হইতে লাগিল। তিনি মহারাণীকে সাতিশয় সরলভাবে সম্ভাষণ, পরে অনুনয় বিনয় এবং তৎপরে নিতান্ত পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন। ক্রমে অন্ধকার হওয়াতে নিকটে নিকটেই একটু ঘোর ঘোর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। দৈবাৎ ঐ সময়ে সহচরীগণ কেহ কিছু অগ্রে কেহ কিছু পশ্চাৎ এইরূপ ভাবে ভ্রমণ করিতেছেন এমন সময়ে বকিংহাম মহারাণীর নিকটবর্ত্তী হইয়া হঠাৎ মনোযোগের গুপ্ত কপাট খুলিয়া দিলেন। তিনি মহারাণীর চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন। মহারাণী আপনার বিপৎ-পাত সম্ভাবনা করিয়া ভয় ব্যাকুল চিত্তে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। মহারাণীর ঘোটক রক্ষক পিউটেঞ্জ নামক ফরাসী যুবক নিকটে ভ্রমণ করিতেছিল। সে দৌড়িয়া আসিল এবং বকিংহামের হস্ত ধারণ করিল। ক্রমে সমস্ত দলবল উপস্থিত হইলে বকিংহাম ভিড়ের মধ্যে সুবিধা পাইয়া গেলেন।

সে দিন তো এইরূপ গেল। প্রথমে গোলমাল, শেষে ঘুষঘাষ ফুসফাস, ক্রমে কথা নির্ব্বাণ হইয়া গেল। "রাজা রুজীরের ঘরে এ রূপ গোলমাল মধ্যে মধ্যে ঘটিয়াই থাকে" সুতরাং মহারাণী বড় একটা মনে করিলেন না। বিদায়ের দিন বকিংহাম অশ্রুবর্ষণ সহকারে মহারাণীকে নমস্কার করিলেন, মহারাণীও তাঁহার করুণভাবে আর্দ্র হইয়াছিলেন। বকিংহাম ইংলণ্ড যাত্রা অনুরোধে সমুদ্র তীরে উপনীত হইলেন। কিন্তু তাঁহার মনোযোগ প্রত্যাকৃষ্ট হইল। তিনি ছলপূর্ব্বক পুনর্ব্বার সম্রাট-ভবনে উপস্থিত হইলেন। মহারাণীর শরীর অসুস্থ ছিল, তিনি শয়ানা ছিলেন। বকিংহামের আগমন-বার্ত্তা শুনিয়া হঠাৎ তিনি সখীকে কহিলেন "আবার এল, মনে করিয়াছিলাম যে বালাই গিয়াছে।" বলিতে বলিতে বকিংহাম তাঁহার শয়নাগারের সমীপবর্ত্তী হইলেন এবং নিদারুণ মনোবেগবশে অন্ধ হইয়া শয্যাগারে প্রবেশপূর্ব্বক তাহার চরণে নিপতিত হইলেন এবং বিহ্বলের ন্যায় শয্যার আস্তরণ ধারণ ও আলিঙ্গন পূর্ব্বক উচ্চৈস্বরে মনোবেগ বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। সহচরী রাজকুমারীগণ তাহাতে লজ্জিত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে কাউণ্টপত্নী লানোয়া বকিংহামকে উত্থিত করিবার জন্য কর্কশ বাক্যে কহিলেন যে "তোমার ব্যবহাব ফরাসী রীতির অনুমত নহে।" বকিংহাম করুণস্বরে কহিলেন যে "আমি ফরাসী নহি।" ইত্যাদি।

পাঠক দেখুন কেমন বিপদ উপস্থিত। তুমি যাহা ভাবিতেছ, অন্যেও ঠিক তাহাই ভাবিতেছে, এইরূপ হইলে গোলমাল হইয়া যায়। স্ত্রীলোক ও পুরুষের মধ্যে এইরূপ গোলমাল সর্ব্বদা ঘটিবার সম্ভাবনা। ইউরোপীয়দিগের মধ্যে এইরূপ বিপদ অধিক ঘটিয়া থাকে। কারণ তাহাদের সমাজে স্ত্রীলোক ও পুরুষের পরস্পর

খাত্তায়াত্তিতা অধিক। এ দিকে স্ত্রীলোকেরা স্বভাবতই নম্রশীল ও হাস্য মুখ হয়, তাঁহাতে পুরুষের মনোযোগ সহসা অযথা স্থলে প্রেরিত হওয়াই সম্ভব। তবে ইউরোপীয় সমাজে রক্ষা এই যে স্ত্রীলোকের হাস্যমুখতা প্রভৃতি শিষ্টাচার অনুমোদনীয়। আমাদের দেশে ঘোমটা দেওয়াই রীতি। সুতরাং যদি কোন পরস্ত্রী শিষ্ট স্বভাববশতঃ হাস্যমুখতা প্রকাশ করে, তাহা হইলে অবিবেচক লোকের ভ্রম হওয়া সম্ভব। অধিক কথা কি আমাদের দেশে অনেক লোকে বিবীদিগের কলঙ্ক করিয়া থাকেন। বোধ হয় বিবীদের গাঢ়ালাপ ও হাস্যমুখ তাঁহাদিগকে ঐ রূপ ভ্রমাক্রান্ত করিয়াছে। বিবীরা বাঙ্গালী বন্ধুদের সঙ্গেও সরলভাবে হাস্য পরিহাস করিয়া থাকেন, কিন্তু তজ্জন্য তাঁহাদিগকে মন্দ ভাবিতে হইবে না। সতীত্ব বিষয়ে বিবীরা পৃথিবীর অন্য কোন জাতীয় স্ত্রীলোকের অপেক্ষা হীন নহেন। অথবা যদি স্বামীর প্রতি মনোযোগকে সতীত্ব বলা যায়, তবে ইতিহাসে অন্যান্য জাতির অপেক্ষা বিবীদিগের সতীত্ব সংখ্যা ও পরিমাণে যে অধিক প্রকাশিত আছে এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। মনোযোগ যত প্রকার আছে তন্মধ্যে কাম নামক মনোযোগ ভারতীয় জাতির অধিক, ইংরাজী সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধি সহকারে এই মনোযোগ কিয়ৎ পরিমাণে দূরীভূত হইয়াছে কি না সে বিষয় আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারিতেছি না। প্রথমতঃ এই মনোযোগ আমাদের যে স্বভাবতই অধিক সে পক্ষে আর সন্দেহ নাই। আমাদের কবিরা এই মন্ত্রে দীক্ষিত, আমাদের ব্যবস্থাপকেরা এই মন্ত্রে দীক্ষিত, আমাদের দার্শনিকেরা এই মন্ত্রে দীক্ষিত, আমাদের আলঙ্কারিকেরা এই মন্ত্রে দীক্ষিত। ভাস্করাচার্য্য অঙ্কশাস্ত্র লিখিতেছেন সে স্থলে লীলাবতীর রসালাপ। যে স্থলে সাদাকথায় বলিলেই হইত যে "একটা দশহাত পদ্ম মৃণাল জলোপরি দুই হাত জাগিয়া আছে.......ইত্যাদি..........অতএব তাহার পরিমাণ কত ইত্যাদি;" সে স্থলে বলা হইতেছে যে 'যুবতী হৃদয়ের ন্যায় এক সরোবর আছে, তদুপরি এক পদ্ম কলি ভাসমান আছে ইত্যাদি অতএব তাহার পরিমাণ কত ইত্যাদি।" ছাত্র অঙ্ক শিক্ষা করিবে না স্ত্রীসৌন্দর্য্যে মনোযোগ করিবে। জ্যোতিঃশাস্ত্রেও এই কথা, কাব্য শাস্ত্রেও এই কথা, ধর্ম্মশাস্ত্রেও এই কথা। অতএব ছাত্র দাঁড়াইবে কোথা। তান্ত্রিকেরা তাহাতেও পরিতৃপ্ত না হইয়া জগৎপিতা জগদীশ্বরের শিব-দেহেও ঐ মনোযোগ প্রেরণ করিয়াছেন। হায়! হায়! হায়! কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! লোকে অনায়াসে প্রণাম করিতেছে!!! পাঠক! আমাদিগকে গালি দেন আর যাহা খুসি করুন যে দিন হইতে কালী ও শিব দর্শন করিয়াছি, যে দিন হইতে কৃষ্ণের বামে রাধিকাকে দেখিয়াছি এবং যে

দিন হইতে ভদ্বৎ অন্যান্য মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়াছি, সেই দিন হইতে দেবদেবীকে ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করা পরিত্যাগ করিয়াছি। হয়তো তান্ত্রিকেরা কহিবেন যে শিব মূর্ত্তির পারমার্থিক অর্থ আছে হয়তো ভাবুকেরা কহিবেন যে শঙ্খ শব্দের অর্থ-আকাশ, গদা শব্দের অর্থ শাসন, চক্রশব্দের অর্থ জ্যোতিশ্চক্র, পদ্ম শব্দের অর্থ শোভা, সুতরাং কৃষ্ণ শব্দের অর্থ ঈশ্বর ইত্যাদি। কিন্তু সে কথায় মন আর প্রবোধ মানে না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীযশোদানন্দন সরকার।

উদ্ভিদ ও

উদ্ভিদের প্রয়োজনীয়তা।

ভূমণ্ডলস্থ যাবতীয় পদার্থপুঞ্জের বিষয় যতই পর্য্যালোচনা করা যায়, ততই মন মঙ্গলময় ঈশ্বরের অসীম ক্ষমতা, বিচিত্র কৌশল ও অপার করুণার বিকাশদর্শনে বিমোহিত, এবং হৃদয় ভক্তিরসে অভিষিক্ত হয়। প্রাণী ও বৃক্ষলতাদিগকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু যতই বিজ্ঞানের উন্নতি সাধিত হইতেছে, ততই উহাদের মধ্যে নব নব অজ্ঞাতপূর্ব্ব সৌসাদৃশ্য অবলোকনে বৈজ্ঞানিকের হৃদয় পুলকিত হইতেছে; এমন কি প্রাণী ও উদ্ভিদের সীমারেখা এখন পর্য্যন্তও অবিসংবাদিত রূপে নিরূপিত হয় নাই; কতকগুলি এরূপ অবস্থাপন্ন পদার্থ আছে, যে পণ্ডিতেরা তাহা প্রাণী কি উদ্ভিদ, এ বিষয় সুন্দর রূপ মীমাংসা করিতে পারেন নাই। উদ্ভিদের পান, আহার ও সন্তানোৎপাদন,প্রাণীর ন্যায়; প্রাণীর ন্যায় উদ্ভিদও বায়ু ও আলোক ব্যতিরেকে জীবনধারণ করিতে পারে না। পূর্ব্বে হরিদ্বর্ণ পদার্থ বিশেষের (Chlorophyl) সত্তা, উদ্ভিদের এক প্রধান লক্ষণ বলিয়া গণ্য হইত, কিন্তু এক্ষণে কোন কোন প্রাণিদেহেও উক্ত পদার্থের অবস্থান লক্ষিত হইয়াছে। পূর্ব্বে, গতি, প্রাণিদিগের এক প্রধান লক্ষণ ছিল, এক্ষণে লজ্জাবতীলতা ও মাংসাশী বৃক্ষবিশেষের গতি দৃষ্ট হইয়াছে। অম্লজান, উদজান, যবক্ষারজান, অঙ্গার, ফস্‌ফোরস্ প্রভৃতি উপাদানে প্রাণী ও উদ্ভিদ উভয়েরই দেহ গঠিত। যাহা হউক এ বিষয়ের সম্যক আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে; উদ্ভিদ্ হইতে পৃথিবীর কি কি সুমহৎ উপকার হইতেছে, এক্ষণে তাহার সংক্ষেপ বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

প্রাণীগণ নিশ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা নিরন্তর অঙ্গারক বাষ্পত্যাগ এবং অম্লজান বাষ্প দেহ মধ্যে গ্রহণ করিতেছে; সুতরাং অসারকবাষ্প কোন প্রকারে ব্যয়িত বা নষ্ট না হইলে অঙ্গারক বাষ্পের আধিক্য এবং অম্লজান বাষ্পের অল্পতা প্রযুক্ত বায়ু দূষিত হইয়া প্রাণীগণের প্রাণ ধারণের সম্পূর্ণ অনুপযোগী হইয়া যাইত। কিন্তু ঈশ্বরের কি বিচিত্র নিয়ম! উদ্ভিদ ঐ অঙ্গারকবাষ্প গ্রাস করিয়া প্রাণীদিগের মহৎ উপকার সাধন করিতেছে। বৃক্ষলতাদি বায়ু হইতে অঙ্গারক বাষ্প গ্রহণ পূর্ব্বক অম্লজান বাষ্প ত্যাগ করে; সুতরাং বায়ু যেমন প্রাণীদিগের নিশ্বাস প্রশ্বাসে ক্রমাগত দূষিত হইতেছে, তেমনই উদ্‌ভিদ-নিশ্বাস প্রশ্বাসে পরিস্কৃতও হইতেছে। অঙ্গারক বাষ্প উদ্‌ভিদের অনিষ্টকারী না হইয়া, তাহাকে পুষ্ট ও বর্দ্ধিত করে। অঙ্গারকবাষ্প বৃক্ষলতাদিতে রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া পত্র, পুষ্প ফলাদি রূপে পরিণত হয়। বৃক্ষলতাদির ফল পত্রাদি কোমলাংশ প্রাণীগণ কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়া তাহাদের শরীরের তাপোদ্‌ভাবন কার্য্যে ব্যয়িত হয়। উদ্‌ভিদের কঠিনাংশ কাষ্ঠ বা অঙ্গাররূপে পরিণত হয়; কাষ্ঠ, গৃহাদি নির্ম্মাণে; বিবিধ গৃহসজ্জা প্রস্তুত করণে ও তাপোদ্‌ভাবন কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। অঙ্গার অথবা পাথুরিয়া কয়লার দ্বারা পৃথিবীর কত উপকার সাধিত হইতেছে, তাহা বর্ণনাতীত; পাথুরিয়া কয়লা না থাকিলে প্রভিহক্ত তমোবৃত্তি গ্যাসালোকের সৃষ্টি হইত না; শুদ্ধ গ্যাসালোক কেন, বাষ্পীয় যন্ত্র সাধারণ কার্য্যে এতদূর ব্যবহৃত হইত না, সুতরাং মনুষ্য সমাজও এতদিনে সভ্যতার এত উচ্চ সোপানে আরোহণ করিতে সক্ষম হইত না।

উদ্ভিদ্ প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে সকল জীবের আহারদাতা। অনেক প্রাণীই শস্যভোজী; গ্রীষ্ম প্রধান দেশে শস্যই মনুষ্যের প্রধান আহার। মাংসাহারী প্রাণিরাও আহারের নিমিত্ত অপ্রত্যক্ষভাবে উদ্ভিদের নিকট ঋণী। যে চিনি পৃথিবীতে এত ব্যবহৃত, তাহাও বৃক্ষবিশেষের রস হইতে উৎপন্ন হয়। শুদ্ধ খাদ্য নহে, পানীয় দ্রব্যও উদ্ভিদ হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়; ডাবের জল ও খেজুর রস সময়ে সময়ে অত্যন্ত তৃপ্তিপ্রদ হয়; ইহা ব্যতীত নানা প্রকার উদ্ভিজ্জাত দ্রব্যই মদ্যের প্রধান উপাদান।

এতদ্ব্যতীত মানবের পরিধেয় বস্ত্রও উদ্ভিজ্জজাত পদার্থ হইতে নির্ম্মিত হয়; বিশেষতঃ আমাদের নগর গ্রীষ্মপ্রধান দেশে কার্পাস নির্ম্মিত বস্ত্রই সচরাচর ব্যবহৃত হয়। পৌষের দারুণ শীতে কাষ্ঠাদি সংগ্রহ করিয়া অগ্নি সেবন করাই দরিদ্রদিগের শীত নিবারণের এক প্রধান উপায়। উদ্ভিদ না থাকিলে রন্ধনাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হইত না। গ্রীষ্মকালে তপনের প্রচণ্ড উত্তাপে পৃথ্বীমণ্ডল তাপিত হইলে; শীতল

বৃক্ষতলই পথিকের একমাত্র আশ্রয়স্থল। স্থানে২ বনসংরক্ষণ দ্বারা দেশের মহৎ উপকার সাধিত হইয়া থাকে। উদ্ভিদ্ হইতে বিবিধ প্রকার তৈল ও প্রস্তুত হয়। অনেক উত্তম উত্তম ঔষধও বৃক্ষের ফল মূল ও ত্বক্ হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

পরমকারুণিক পরমেশ্বর শুদ্ধ আমাদের অভাব নিবারণের নিমিত্ত উদ্ভিদ সৃষ্টি করেন নাই; আমাদের মনে সন্তোষ প্রদান করাও তাঁহার এক উদ্দেশ্য; সুন্দর কুসুম তাঁহার মহানন্দের পরিচায়ক। উদ্ভিদ্ না থাকিলে মনোহর উদ্যান, হরিৎ তৃণক্ষেত্র, ফল ফুল সুশোভিত সুন্দর তরুরাজি প্রভৃতি স্বাভাবিক শোভা নয়ন মন চরিতার্থ করিত না, সমস্ত জগৎ সাহারা মরুভূমির ন্যায় ভয়ঙ্কর ও শ্রীহীন অবস্থা প্রাপ্ত হইত। উদ্ভিদ্ যেরূপ শোভার আধার, সেইরূপ সদ্গন্ধেরও এক প্রধান উৎস; সকল প্রকার সদ্গন্ধই প্রায় পুষ্প হইতে সংগৃহীত। বাস্তবিক পুষ্প, সকল প্রকার সগন্ধ ও সৌন্দর্য্যের আদর্শ স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। সর্ব্ব দেশীয় কবিগণ মনোহর রূপ বর্ণনা স্থলে কোন না কোন কুসুমের উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। আমাদের মহাকবি কালিদাস এ বিষয়ে এক প্রধান উদাহরণ স্থল। ইংলণ্ডীয় আধুনিক মহাকবি টেনিসন লিখিয়াছেন,

Flower in the crannied wall,
I pluck you out of the crannies;
Hold you here in my hand,
Little flower, root and all;
And if I could understand
What you are, roots and all and all in all,
I should know what God and man is"

হে প্রাচীরছিদ্রস্থ পুষ্প! আমি তোমাকে তুলিয়া লইয়া শিকড়ের সহিত হস্তে ধারণ করিলাম। হে ক্ষুদ্র কুসুম! যদি আমি তোমাকে শিকড়ের সহিত সম্পূর্ণ রূপে বুঝিতে পারি, তাহা হইলে আমি ঈশ্বর ও মনুষ্য কি ইহা জ্ঞাত হইব।" আমাদের কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারও বলেন,

"সাধে কিগো কবিদের সফল নয়ন,
তুচ্ছ ভাবে অট্টালিকা স্তম্ভ সুশোভন?
সামান্য তরুর পাতা করি দরশন,
মুহুর্মুহু পুলকাশ্রু করে বরষণ?"

বাস্তবিক সামান্য একটি বৃক্ষের পত্রে বা ক্ষুদ্র কুসুমে ঈশ্বরের বুদ্ধি কৌশল, ক্ষমতা ও দয়ার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। বিজ্ঞানালোচনা, ঈশ্বরালোচনা ব্যতীত কিছুই নহে। বিজ্ঞানবিৎ নাস্তিকের ন্যায় মহান্ধ, হতভাগ্য ও ঘৃণাপাত্র আর কেহই নাই।

শ্রী কালীকৃষ্ণ বসাক।

তত্ত্বসংগ্রহ।

উত্তাপ পাইলে সকল জিনিসের পরমাণুই শিথিল হইয়া লঘু হয়, একথা বিজ্ঞান পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। সূর্য্যোত্তাপে ধূলিপটল বায়ুভরে উত্থিত হয়। বৃক্ষাদি শূন্য মরুপ্রদেশে এইরূপ অধিক পরিমাণে ধূলি উত্থিত হয়। আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে এই জন্যই নাবিকেরা কখন কখনও দশ বার দিন বহুক্রোশ ধরিয়া ধূলিবৃষ্টি দেখিতে পান, মেঘের জলে ভিজিয়া এই ধূলিজাল বৃষ্টির আকারে পতিত হয়। ধূলির বর্ণ যেরূপ, বৃষ্টির বর্ণও সেইরূপ হয়। অনেক সময়েই এরূপ বৃষ্টির ধূলির বর্ণ হরিদ্রা বর্ণ। পুষ্পাদির কেশরধূলিও কখন কখন এই সঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায়। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের সঙ্গেও ধূলি উত্থিত হইয়া আকাশ মার্গে গমন করে। বড় বড় শিল্পপ্রধান নগরের চুল্লী ধূমের সঙ্গেও বড় অল্পপরিমাণ ধূলি উত্থিত হয় না! বায়ুমার্গস্থ এই ধূলির গুণে সূর্য্যরশ্মির আলোক ও তেজ কমিয়া যায়। এই ধূলির সহিত জলীয় বাষ্প মিশ্রিত হয় বলিয়াই বায়ু শীতল থাকে। এক জন ইংরাজ বৈজ্ঞানিক বলেন, বায়ুমার্গে যদি ধূলি না থাকিত, তাহা হইলে মেঘ সংঘটিত হইতে পারিত না, বৃষ্টিও হইত না। এ কথার প্রামাণিকতার উপর আমরা এখনও নির্ভর করিতে পারি না। কিন্তু পৃথিবীর বৃক্ষলতা ফল পুষ্প জীব জন্তুর শরীর হইতে সূর্য্যরশ্মি ধূলির সঙ্গে সঙ্গে রোগ তুলিয়া লইয়া যায় ইহা প্রায় সকল বৈজ্ঞানিকের মত। সংক্রামক রোগ মাত্রেরই এক প্রকার কীটাণু কারণ, সূর্য্যরশ্মি ধূলির সহিত এই সকল কীটাণুও উড়াইয়া লইয়া যায়। তাই অনেক রক্ষা, নতুবা পৃথিবীর দশা আরও শোচনীয় হইত।

আমেরিকার অন্তর্গত বেলেভিল নগরে মাটীর ভিতর নল বসাইয়া, সেই নলের

মধ্যে উত্তাপ দিয়া স্রোত চালাইয়া চারিদিকের কল কারখানা চালান হইতেছে। বয়লরগুলি এক জায়গায় রাখিয়া, চারিদিকে উত্তাপ স্রোত প্রবাহিত করা হইয়া থাকে। ইহাতে কারখানা ওয়ালাদের খরচ কম পড়ে, কাজেও সুবিধা হয়। আমাদের এখানেও একজন রেলওয়ের ইঞ্জিনীয়র রানীগঞ্জে কয়লা পোড়াইয়া চারিদিকে এইরূপে উত্তাপস্রোত চালাইতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার আবিষ্ক্রিয়া নূতন নহে।

মশো ব্রংনিয়ার্ট মাটীর ভিতর হইতে একপ্রকার প্রস্তরীভূত পতঙ্গ বাহির করিয়াছেন, ইহা দৈর্ঘ্য প্রায় এক ফুট। এ পতঙ্গ বোধ হয় ত্রেতাযুগের মশা।

আমেরিকানেরা কাগজে রেলওয়ে গাড়ির চাকা প্রস্তুত করিয়াছেন। ঐ চাকা লৌহের ন্যায় ভারসহ ও বহুকাল স্থায়ী। অল্প দিন হইল, অষ্ট্রেলিয়ার প্রদর্শণী মেলাতে যে সকল অত্যাশ্চার্য্য পদার্থ প্রদর্শিত হয়, তম্মধ্যে একখানি কাগজের অট্টালিকা ছিল। ঐ অট্টালিকার মধ্যে ভোজনপাত্র, জলপাত্র, বিছানার চাদর, মসারি, খাট পালঙ্ক প্রভৃতি সমস্তই কাগজে প্রস্তুত হইয়াছিল। জর্ম্মনিতে কাগজের এমন সুন্দর বাসন হয়, যে কাষ্ঠ বা ধাতুদ্রব্যে অমন হইতে পারেনা। কোরিয়ার একটী মানমন্দিরের চূড়া কাগজে নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহাতে অনেকে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে কাগজে ছাদের কড়ি ও বরগা হইলে অপেক্ষাকৃত অনেক ব্যয় লাঘব হইতে পারে। অল্পদিন হইল, একজন আমেরিকান কাগজের এমন আশ্চর্য্য নৌকা প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা যেমন বেগগামী, তেমনি দেখিতে সুন্দর। ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সের এক জন ভদ্রলোক কাগজের ঐরূপ একখানি নৌকায় চড়িয়া ২০০০ মাইল জলপথ ভ্রমণ করিয়াছেন। ঐ নৌকাখানির ভার ৫৮ পাউণ্ড মাত্র, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, উহা জলে ভিজিয়া নষ্ট হয় নাই। বস্তুতঃ উহা এমন সুন্দর বার্ণিস করা যে জলে উহার কিছুই করিতে পারে না। আজ কালি আনারসের সূক্ষ্ম আঁস হইতে উত্তম রেশম প্রস্তুত হইতেছে।

সেন্টপীটার্স বর্গের অধ্যাপক বেরনৌস্কী এক প্রকার কলের বৃহৎ পক্ষী প্রস্তুত করিয়াছেন। পক্ষীটী লোক লইয়া উড়িতে পারে। এই ব্যোমযানের চিত্র ১০ই ফেব্রুয়ারীর সায়েন্টিফিক আমেরিকান নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। একটী বৃহৎ ফাঁপা লৌহের পুলীর দুই পার্শ্বে দুইটি ডানা বসান, পুলীর এক অগ্রভাগে আর একটী ডানা বসান আছে। এটী হালের মত কাজ করে। পুলীর ভিতর কল আছে, সেই কলের জোরে ডানা দুখানি এবং লেজটী চলে, পুলির অপর মুখটীতে ছিদ্র আছে, বাষ্পাদি তাহা হইতে বাহির হয়, যখন বাষ্প বহির্গত হয় তখন দেখিতে ঠিক যেন একটী পেন্টুলুম ঝোলান আছে। পুলীর ভিতর নাব-

কেরা থাকে, মুখের ছিদ্র দিয়া বায়ু প্রবেশ করে, নাবিক দিগের কোন ক্লেশ হয় না; কলচালনের পক্ষে ও কোন বিঘ্ন হয় না। কলের পাখীটী যদি যেখানে সেখানে মানুষ লইয়া যাইতে পারে তাহা হইলে সংসারের ভাব একেবারেই পরিবর্ত্তন হইবে। গমনাগমন আকাশ মার্গেই চলিবে, আকাশ বাহিনী রণতরীর যুদ্ধের উপরই সকলে নির্ভর করিবে. বিলাতী ডাক জলপথে না আসিয়া আকাশপথেই আসিবে। বিষ্ণুর একটী গরুড় ছিল, রুষীয় অধ্যাপকের কল্যাণে ঘরে ঘরে গরুড়ের আবির্ভাব হইবে।

সার আইজাক নিউটন ও তাঁহার শিষ্যেরা বিশ্বাস করিতেন, আলোকের পরমাণু আছে. সেই পরমাণু আসিয়া নেত্রমধ্যে প্রবেশ করে। এখন সে মত রহিত হইয়া গিয়াছে। এখন স্থির হইয়াছে, উত্তাপ ও আলোক দুই কম্পনের পরিমাণ। কম্পন ও এক প্রকার গতি ভিন্ন কিছুই নহে। পূর্ব্বে বিশ্বাস ছিল আলকের গুরুতা আছে; পূর্ব্বে যেমন আলোক ও উত্তাপের পরমাণু ও গুরুতার উপর বৈজ্ঞানিক দিগের বিশ্বাস ছিল, এখন গন্ধের সেইরূপ পরমাণু সুতরাং গুরুতার উপর বৈজ্ঞানিকেরা বিশ্বাস করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, দ্রব্যের পরমাণু বায়ুসংযোগে নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করে, তাহাতেই আমরা গন্ধ অনুভব করিতে পারি। এই জন্যই বায়ুর নামান্তর গন্ধবহ। কিন্তু আজ কাল কোন কোন বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন, আলোকও উত্তাপের ন্যায় গন্ধ ও কম্পনের পরিণাম, দ্রব্যের পরমাণু নাসারন্ধ্রে আসিয়া গন্ধের অনুভূতি জন্মাইয়া দেয় না। যদি দিত তাহা হইলে আঘ্রাত দ্রব্যের পরিমাণ ও গুরুতা কমিত। কারণ যে পরিমাণে পরমাণু সমষ্টি পরিচালিত হইবে, দ্রব্যের পরিমাণ ও ওজন সেই পরিমাণে কমিয়া যাইবে। কিন্তু পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে, মৃগনাভি প্রভৃতি তীব্রগন্ধ দ্রব্যের শতবর্ষে ও কিছুমাত্র পরিমাণ বা ওজনের কমতি হয় না, কার্ব্বলিক এসিডের যে পরিমাণে গন্ধ বাহির হয়, ওজন ও পরিমাণ সে পরিমাণে কমা দূরে থাকুক, তাহার শতাংশের একাংশ ও কমে কি না সন্দেহ। গন্ধ যদি পরমাণুময় হইত, তাহা হইলে এরূপ হইত না। তাই অনেকে বলেন, গন্ধও আলোক উত্তাপের ন্যায় কম্পনের পরিণাম।

পারিসের প্যালে রয়াল নামক রাজোদ্যানে একটী কামান আছে, আতস কাচের মণির সাহায্যে বেলা দুই প্রহরের সময় সূর্য্যরশ্মি সেই কামানের রঞ্জুতঘরে গিয়া প্রবেশ করে, আর বারুদ ভরা কামানে গুড়ুম করিয়া আপনা আপনি তোপ পড়িয়া যায়। এ কামানটী আজকার নহে, ইহার বয়স দেড়শত বৎসরের কম নহে।

আমেরিকায় বিগারষ্টাফ ও হিলপাট দুই জনে জুটিয়া একটী ধোপা-কল করি-

য়াছেন। ইহা হাতে চলে, খরচ অল্প। কলটীর কোন গোলযোগ নাই। একটী টবের ভিতর আর একটী চোঙ্গের মত টব বসাও, এটীর তলায় ঝাঁজরা থাকা চাই। টবের গায়ে একটী খুঁটি লাগাইয়া তাহার মাথায় একটী ঢেঁকি কল লাগাও, সেই ঢেঁকিকলের সঙ্গে একটী বাঁটওয়ালা স্নানের ঝারার মত ঝারা লাগাইতে হইবে। টবের ভিতর উপযুক্ত পরিমাণে সাবান জল রাখ, সচ্ছিদ্র চোঙটীতে ময়লা কাপড় রাখ, আর সেই যে ঢেঁকি কলটী বসাইয়াছ, টবের পাশে দাঁড়াইয়া তাহা নাড়িতে থাক, তাহা হইলেই ঝারাটী একবার করিয়া চোঙ্গের ভিতর প্রবেশ করিবে, এই রূপে সাবান জলে অতি সুন্দররূপে সহজে এবং শীঘ্র কাপড় কাচা হইবে। সহচর

প্রোফেসর ইয়ঙ্গ গননা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে যদি কোন রেলওয়ে শকট ঘণ্টায় ৪০ মাইল বেগে গমন করে, তাহাহইলে তাহার পৃথিবী হইতে সূর্য্যমণ্ডলে গমন করিতে ২৬৫ বৎসর লাগিবে এবং ঐ সুদীর্ঘ ভ্রমণের ভাড়া ২,৫০০০০ পাউণ্ড বা ২৫ লক্ষ টাকা হইবে।

মনুষ্যের মস্তিষ্কের পরিমাণ দেখিয়া তাহার বিদ্যাবুদ্ধির পরিমাণ নির্দ্দেশ করা সর্ব্ব সময়ে সুপ্রশস্ত নহে; ফরাসী মানবতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত ডাক্তর ব্রোকা বলেন, যে যদি কেহ কোন পরিচয় না দিয়া গ্যাম্বেটার মস্তিষ্ক তাঁহার নিকট উপস্থিত করিত তাহা হইলে তিনি কখন তাহাকে গ্যাম্বেটার মস্তিষ্ক বলিয়া বিবেচনা করিতেন না; ঐ মস্তিষ্ক কোন সুশিক্ষিতা স্ত্রীলোকের মস্তিষ্ক বলিয়া বোধ হইত, কারণ গ্যাম্বেটার মস্তিষ্ক ওজনে ৩৯ আউন্সের অপেক্ষাও ন্যূন; এবং পুরুষের মস্তিষ্ক ওজনে সচরাচর ৪৮ আউন্স হইয়া থাকে।

মানব দেহ অসংখ্য কীটের নিবাস ভূমি; মানবের রক্তাশয় সমুহে সময়ে সময়ে ৩০০০০ কীটানু বাস করিয়া থাকে। Bangalee

পৃথিবী ১৫০ ফুট ঘন বরফরাশি দ্বারা আচ্ছাদিত হয়, তাহা গলাইয়া জল করিতে দ্বাদশ মাস লাগিতে পারে। পৃথিবীতে উত্তাপ পড়িবার পূর্ব্বে বায়ু সৌরোত্তাপ কতক পরিমাণে আটকাইয়া রাখে। বায়ুর এই ক্ষমতা থাকাতেই পৃথিবী জীবলোকের বসতি স্থান হইয়াছে। আবার বায়ুর উত্তাপসংরক্ষণ ক্ষমতা না থাকিলে সূর্য্যের সোণার বর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া নীলবর্ণ দেখাইত। সহচর

চন্দ্র।

"Now glowed the firmament
With living saphires : Hesperus, that led
The stary host, rode brightest, till the moon !
Rising in clouded majesty, atlength
Apparent queen, unveiled her peerless light,
And o'er the dark, her silver mouth threw."

Milton.

ইংলণ্ডের মহাকবি মিল্টন উপরোদ্ধৃত মনোহর সন্ধ্যাবর্ণনার রচয়িতা; তিনি কি সুন্দরভাবেই চন্দ্রকে রজনীর রাজ্ঞীরূপে বর্ণনা করিয়াছেন! কবিকুলচূড়ামণি কালিদাসও সুন্দরীর রূপবর্ণনাস্থলে চন্দ্রের মনোহর রূপের উল্লেখ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারেন নাই। তবে ইংলণ্ডীয় কবির চক্ষে চন্দ্র সৌন্দর্য্যের আধারভূতা গগনবাসিনী রমণী; সংস্কৃত কবি চন্দ্রকে শশধর, রজনীরনায়ক, সুন্দরপুরুষরূপে দর্শন করেন। যাহা হউক, চন্দ্রের সৌন্দর্য্য ও মনোহারিণীশক্তি সম্বন্ধে সর্ব্বদেশীয় কবিগণের একমত। যখন চন্দ্র পূর্ণিমাতিথিতে নীলগগনে উদিত হইয়া সুধাকরজালবিস্তার পূর্ব্বক জগন্মণ্ডল ধবলিত করে, তখন তদ্দর্শনে কাহার মন না প্রীত হয়? বিভিন্ন কবির বিভিন্ন কল্পনা চন্দ্রে বিভিন্ন প্রাণির ও পদার্থের অধিষ্ঠান নির্দ্দেশ করিয়াছে। কবির চক্ষে চন্দ্র একরূপে প্রতীয়মান হয়; বৈজ্ঞানিকের চক্ষে অন্যরূপ ধারণ করে। কবি ও বৈজ্ঞানিক পরস্পর বিরোধী; কবির মন

কল্পনাপ্রবণ; বৈজ্ঞানিক, কল্পনার স্বৈরগতি নিবারণ করিয়া ন্যায়েরই অনুবর্ত্তন করেন। বৈজ্ঞানিকেরমতে চন্দ্র নিবৃত্ত-ধাতুনিঃস্রব আগ্নেয়গিরিপূর্ণ, তেজ ও আলোকরহিত গোলাকার জড়পদার্থ বিশেষ। এইশতাব্দীতে চন্দ্রসম্বন্ধে বিবিধ-বিষয় আবিষ্কৃত হইয়াছে। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে বিয়ার ও ম্যাড্‌লার নামক প্রসিয়ান জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতদ্বয় চন্দ্রের মানচিত্র প্রকাশ করেন।

গ্রহ, উপগ্রহ ও নক্ষত্রের মধ্যে চন্দ্র আমাদিগের সর্ব্বাপেক্ষা সমীপস্থ। চন্দ্র-গ্রহ নহে, উহা পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ। চন্দ্র পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতে করিতে পৃথিবীর সহিত সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। দেখিতে সর্ব্ব গ্রহ নক্ষত্রাদি অপেক্ষা বৃহৎ হইলেও চন্দ্র পৃথিবী অপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্র। চন্দ্রের ব্যাস পৃথিবীর ব্যাসের প্রায় $\frac{২}{৭}$ অংশ হইবে; উহার বর্গফল ইউরোপ ও আফ্রিকার বর্গফলের সহিত সমান। চন্দ্রের দৃশ্যমান ব্যাস (Apparent diameter) প্রায় অৰ্দ্ধ অংশ পরিমিত হইবে। চন্দ্রের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির $\frac{৪}{২৫}$ অংশ। চন্দ্র ২৭ দিন ৮ ঘণ্টায় একনক্ষত্র * ছাড়িয়াগগনমণ্ডল পরিভ্রমণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার

* চন্দ্র আপন গতিক্রমে ভ্রমণ করিতেছে। চন্দ্র সূর্য্যের অধঃকক্ষা হইতে নিসৃত হইয়া যত ক্ষণে সূর্য্যহইতে বার অংশ দূরে গমন করে ততক্ষণেই এক তিথি হয়। প্রথম দ্বাদশ অংশ-গমনে শুক্ল প্রতিপদ, দ্বিতীয় দ্বাদশ অংশ অর্থাৎ ২৪ অংশ দূরে চন্দ্র গমন করিলে দ্বিতীয়া এইরূপ সূর্য্য হইতে রাশিচক্রের অর্দ্ধেক অর্থাৎ ১৮০ অংশ গমনে ১৫তিথি হয়। এই পঞ্চদশ তিথিকে শুক্লপক্ষ বলে। পরে ১৮০ ডিক্রির পর দ্বাদশ অংশ ক্রমে ১৫ তিথিতে চন্দ্র ক্রমশঃ সূর্য্যের নিকটগামী হইয়া সমসূত্রপাত ন্যায় পুনরায় সূর্য্যের অধোবর্ত্তী হয়। তাহাকে কৃষ্ণপক্ষ কহে। সূর্য্য হইতে চন্দ্র যত ১২ অংশ দূরে গমন করে, চন্দ্রের তত কলা দৃষ্ট হয়। এবং যত ১২ অংশ ক্রমে নিকটগামী হয় তাহাতে অদৃশ্য হয়। সূর্য্যের উভয় পার্শ্বস্থ ১২ অংশের ব্যবধানে চন্দ্র দর্শন হয় না, চন্দ্র আপন গতিক্রমে সূর্য্য হইতে ১২ অংশ দূরে যাইবার মধ্যে সূর্য্য আপন গতিক্রমে প্রায় ১ অংশ চন্দ্রের নিকটস্থ হয়। ঐ কালকে চন্দ্রের ১২ অংশ গমনের কালের সহ ঐক্য করিলে ৫৯ দণ্ড হয়। ইহাতে চন্দ্রের গতি প্রায় ১৩ অংশ ১০।৷০ কলা হয়। চন্দ্র ও সূর্য্যের কদাচিত শীঘ্র গতি ও মন্দগতি প্রযুক্ত তিথি মানের হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ১ তিথিতে ১ চান্দ্র দিন, ৩০ তিথিতে ১ চান্দ্র মাস, ১২ চান্দ্র মাসে ১ চান্দ্র বৎসর। চান্দ্র মাস তিন প্রকার; শুক্ল প্রতিপদ অবধি অমাবস্যা পর্য্যন্ত যে ৩০ তিথি তাহাকে মুখ্য চান্দ্র এবং কৃষ্ণ প্রতিপদ অবধি পূর্ণিমা পর্য্যন্ত যে ৩০ তিথি তাহাকে গৌণচান্দ্র এবং শুক্লপক্ষীয় বা কৃষ্ণপক্ষীয় যে কোন তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার পূর্ব্বের তিথি পর্য্যন্ত যে ৩০ তিথি করিয়া গণনা করা হয় তাহাকে চান্দ্র সাবন মাস কহে।

সেই নক্ষত্রে উপস্থিত হয়। এক অমাবস্যা হইতে পরবর্ত্তী অমাবস্যা বা এক পূর্ণিমা হইতে অপর পূর্ণিমা পর্য্যন্ত সময়কে একচান্দ্রমাস কহে; চান্দ্রমাসের পরিমাণ, ২৯ দিন ১২ ঘণ্টা। ঠিক ঐ সময়ের মধ্যে চন্দ্র আপন মেরুদণ্ডের উপর একবার আবর্ত্তন করে; এইজন্য চন্দ্রের একার্দ্ধই কেবল আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয়। কিন্তু চন্দ্রের ত্রিবিধতুলামান (Libration) নিবন্ধন চন্দ্রের অপরার্দ্ধেরও কিয়দংশ সময়ে সময়ে দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রথমতঃ চন্দ্রের মেরুদণ্ড চান্দ্রকক্ষের লম্বস্বরূপ নহে; এই নিমিত্ত কোন কোন সময়ে অদৃশ্যার্দ্ধের উত্তরভাগের কিয়দংশ এবং অপর সময়ে দক্ষিণভাগের কিয়দংশ দৃষ্ট হইবে; নিম্নলিখিত চিত্রে পৃ পৃথিবী. $ক_১$ $চ_১$ $খ_১$ গ ও $ক_২$ $চ_২$ $খ_২$ গস্বীয় কক্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থিত চন্দ্র; চন্দ্রের মেরুদণ্ড; $ক_১$ $চ_১$ $খ_১$ ও $ক_১$ $খ_১$ গ, পৃথিবী হইতে দৃশ্যভাগ চন্দ্রের মেরুদণ্ড চান্দ্রকক্ষে লম্বভাবে স্থিত হইলে পৃথিবী হইতে ক, গ চ১ (অপর স্থানের গ $খ_২$ $চ_২$) অংশই কেবল দৃষ্ট হইত; কিন্তু চন্দ্রের মেরুদণ্ড বিভিন্নভাবে স্থিত বলিয়া চন্দ্র যখন ক২ চ১ $খ_২$ গ স্থলে স্থিত হইবে, তখন তাহার $ক_১$ $চ_১$ খ১ অংশ দৃষ্ট হইবে; সুতরাং এ অবস্থা চন্দ্রের উত্তর মেরুমণ্ডলের কিয়দংশ অদৃশ্য এবং অদৃশ্যার্দ্ধের দক্ষিণ মেরুমণ্ডলের কিয়দংশ দৃষ্ট হইবে; এইরূপ অপরাংশে চন্দ্রের অদৃশ্যার্দ্ধের উত্তর মেরুমণ্ডলের কিয়দংশ দৃষ্ট হইবে। ইহাকে চন্দ্রের অক্ষতুলামান (Libration in Latitude) কহে। দ্বিতীয়তঃ অন্যান্য গ্রহোপগ্রহের ন্যায় চন্দ্রের কক্ষ বৃত্তাকার নহে, বরঞ্চ কতকাংশে অণ্ডাকৃতি (elliptic) হইবে; অতএব চন্দ্র সর্ব্ব সময়ে পৃথিবী হইতে সমদূরে অবস্থান করে না; সুতরাং নিউটনের গণনানুসারে তাহার গতির বেগ সর্ব্বসময়ে সমান হইবে না। চন্দ্র যতই পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে ততই তাহার বেগ বৃদ্ধি হয়, এবং যতই দূরবর্ত্তী হয়, ততই তাহার বেগ হ্রাস প্রাপ্ত হয়; সুতরাং চন্দ্র যখন পৃথিবীর নিকটতম হয়, তখন তাহার বেগ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয়; এই হেতু চন্দ্র যখন পৃথিবীর নিকটতম হয়, তখন অত্যধিক বেগনিবন্ধন তাহার অদৃশ্যার্দ্ধের পশ্চিমভাগের কিঞ্চিদংশ দৃষ্ট হয়; এবং চন্দ্র যখন দূরতম হয় তখন তাহার বেগ, বেগের গড় পরিমাণ হইতেও ন্যূন হইবে; সুতরাং তখন চন্দ্রের অদৃশ্যার্দ্ধের পূর্ব্বাংশের কিয়দংশ দৃষ্ট হইবে; এই তুলামানকে দ্রাঘিমা তুলামান (Libration in Longitude) কহে। পুনশ্চ চন্দ্রোদয় কালে চন্দ্রের অদৃশ্যাংশের উপরার্দ্ধের কিয়দংশ এবং চন্দ্র গগন মধ্যস্থল আরোহণ করিলে নিম্নার্দ্ধের কিয়দংশ দৃষ্ট হইবে; ইহাকে চন্দ্রের আহ্নিকতুলামান (Diurnal Libration) কহে।
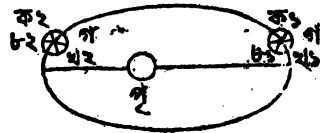
উপরোক্ত ত্রিবিধতুলামান দ্বারা চন্দ্রের অদৃশ্যার্দ্ধের $\frac{১}{১১}$ অংশ মাত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে; সুতরাং চন্দ্রের $\frac{৯}{২২}$ অংশ এপর্য্যন্ত দৃষ্ট হয় নাই। জ্যোতির্ব্বিদেরা স্থির করিয়াছেন, যে চন্দ্রের কক্ষ ক্রমশঃ বৃত্তাকার হইয়া আসিতেছে, সুতরাং ভবিষ্যৎ কালে চন্দ্রের অপরার্দ্ধ দৃষ্ট হইতে পারিবে।

চন্দ্র অস্বচ্ছ গোলাকার জড়পদার্থ; চন্দ্রের নিজের জ্যোতি নাই। চন্দ্র সূর্য্য হইতে আলোক প্রাপ্ত হয়, এবং সেই আলোক প্রতিফলিত করিয়া দৃষ্ট হয়। এক আলোক দ্বারা কোন গোলাকার পদার্থ সর্ব্বাংশে আলোকিত হইতে পারে না অর্দ্ধাংশ অবশ্যই নিরালোক থাকিবে; কেবল যে অর্দ্ধাংশ আলোকের সম্মুখে থাকিবে সেই অর্দ্ধাংশই আলোক প্রাপ্ত হইবে। অতএব চন্দ্র একরকালে কেবল অর্দ্ধ আলোকিত হইবে; সেই আলোকিত ভাগই যে সর্ব্ব সময়ে পৃথিবীর সম্মুখীন থাকিবে, তাহার কোন কারণ নাই; সুতরাং চন্দ্রের আকৃতি কদাচিৎ সম্পূর্ণ গোল কার দৃষ্ট হইবে। নিম্নঅঙ্কিতচিত্রে সূ, সূর্য্য, পৃ, পৃথিবী, এবং চ১ চ২ চ৩ চ৮ চিহ্নিত অন্তরতরবৃত্ত চন্দ্রের কক্ষ।
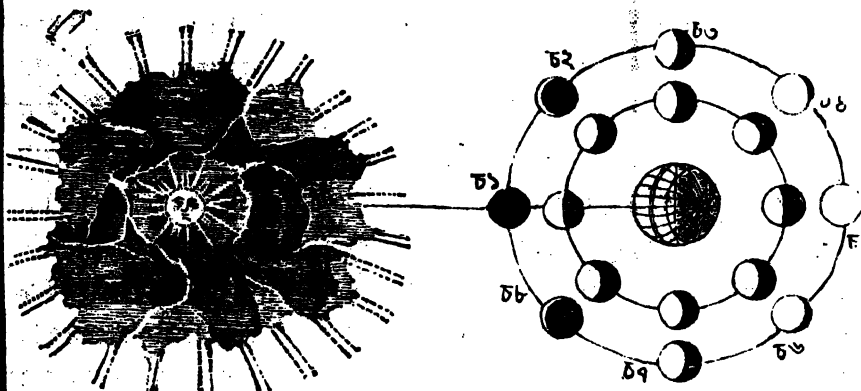
অমাবস্যাতিথিতে চন্দ্র চ১ স্থানে অবস্থিতি করে, তখন তাহার নিরালোক ভাগ সম্পূর্ণরূপে পৃথিবীর সম্মুখীন হয়; সুতরাং অমাবস্যা তিথিতে চন্দ্রকে দেখিতে পাওয়া যায় না। তদনন্তর চন্দ্র যখন কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া চতুর্থী অথবা পঞ্চমী তিথিতে চ২ স্থানে উপনীত হয়, তখন চন্দ্রের আলোকিতাংশের কিয়দংশ মাত্র পৃথিবীর সম্মুখে থাকে; সুতরাং চন্দ্র অর্দ্ধচন্দ্রাপেক্ষাও ক্ষুদ্রতর দৃষ্ট হইবে। যখন চন্দ্র কক্ষের চতুর্থাংশ গমন করিয়া চ৩ স্থানে উপস্থিত হইবে, তখন
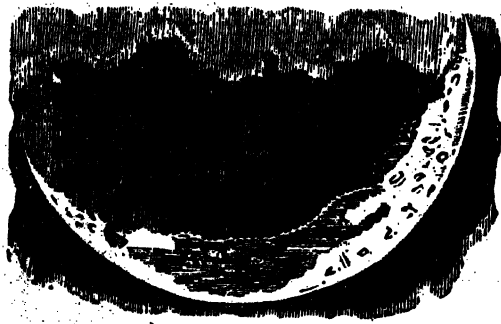
চন্দ্রের আলোকিতাংশের অর্দ্ধভাগ পৃথিবীর সম্মুখে থাকিবে; তখন চন্দ্র অর্দ্ধবৃত্তাকার দৃষ্ট হইবে। এইরূপ চন্দ্র দিন দিন উপচিত হইয়া কক্ষার্দ্ধ গমন পূর্ব্বক চ৫ স্থানে উপস্থিত হইবে, তখন চন্দ্রের আলোকিত অর্দ্ধভাগ সম্পূর্ণরূপে পৃথিবীর সম্মুখীন হইবে; সুতরাং চন্দ্র গোলথালার ন্যায় দৃষ্ট হইবে। তদনন্তর চন্দ্র ক্রমশঃ ক্ষীণ-কান্তি হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় বিভিন্ন আকার ধারণ করিতে করিতে অবশেষে অমাবস্যা তিথিতে একাবারে বিলুপ্ত হইবে। তবে তাহাদের পূর্ব্বভাগ পশ্চিমে ও পশ্চিম ভাগ পূর্ব্বে দৃষ্ট হইবে, এই মাত্র প্রভেদ। চ২, চ৩, চ৪, চ৮ স্থানে চন্দ্র ক্রমান্বয়ে পূর্ব্বপৃষ্ঠবর্ত্তী বৃত্তে চিহ্নিত আকার প্রাপ্ত হইবে।

পূর্ণিমারজনী অতীব রমণীয়; বিশেষতঃ শরদের পূর্ণচন্দ্রের মনোহারিত্ব সর্ব্বত্র সুপ্রসিদ্ধ। এই সময়ে চন্দ্র কতিপয় দিবস সূর্য্যাস্তকালে পূর্ণাবয়বে প্রকাশিত হয়; ইংলণ্ড প্রভৃতি উত্তরাক্ষ বিশিষ্ট দেশে ঐ কয় দিবস সূর্য্যাস্তকালের পূর্ব্বেই চন্দ্রোদয় হইয়া থাকে। সুন্দর চন্দ্রালোকে কৃষকদিগের শস্যচ্ছেদনের সুবিধা হয় বলিয়া ইংরাজেরা ঐ শারদীয় পূর্ণচন্দ্রকে "শস্যসংগ্রহ চন্দ্র" (harvest moon) বলিয়া থাকেন। কেহ কেহ এই চন্দ্রকে 'মৃগয়াচন্দ্র' (hunter's moon) এই আখ্যা প্রদান করেন।

চন্দ্রগ্রহণ সূর্য্যগ্রহণের ন্যায় কৌতুহলোৎপাদক না হইলেও একেবারে কৌতূহল-বিষয় বহির্ভূত নহে। যখন পৃথিবী সূর্য্য ও চন্দ্রের মধ্যবর্ত্তীস্থানে এরূপভাবে স্থিত হয়, যে তদ্দারা চন্দ্রের আলোক সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে নিরাকৃত হয়, তখনই চন্দ্রগ্রহণ হইয়া থাকে। কোনগৃহে একটী আলোক জ্বলিতেছে; উক্তদীপের সম্মুখের ভিত্তিতে একখানি আলেখ্য সংলগ্ন রহিয়াছে; সুতরাং ঐ আলেখ্যের উপর দীপের আলোক সম্পূর্ণভাবে পতিত হইয়াছে; এক্ষণে যদি কোনবস্তু ঐ দীপ ও আলেখ্যের মধ্যবর্ত্তীস্থানে স্থাপন করা-যায়, তাহা হইলে ঐ আলেখ্যের আলোক সম্পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে তিরোহিত হইবে; চন্দ্রগ্রহণও ঠিক এই প্রকারেই হইয়া থাকে; পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে

চন্দ্রের নিজের জ্যোতি নাই, সূর্য্যালোক প্রতিফলিত করিয়াই আলোকময় হইয়া থাকে; সুতরাং পৃথিবী যদি ব্যবধানস্বরূপ উহাদের মধ্যে উপস্থিত হয়, তাহা হইলে চন্দ্র সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে সূর্য্যকিরণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে। পার্শ্ববর্ত্তী চিত্রদৃষ্টে স্পষ্ট বুঝা যাইবে, যে কেবল পূর্ণিমা তিথিতেই পৃথিবী চন্দ্র ও সূর্য্যের নিম্নবর্ত্তী
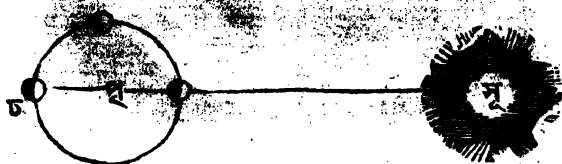
স্থানে অবস্থান করে; সুতরাং কেবল পূর্ণিমা তিথিতেই চন্দ্রগ্রহণ হইতে পারে। যদি সূর্য্যের দৃশ্যমান কক্ষ ও চান্দ্রকক্ষ একই হইত, তাহা হইলে প্রতি পূর্ণিমাতেই চন্দ্র-গ্রহণ হইত; কিন্তু চান্দ্রকক্ষ ও দৃশ্যমান সৌর্য্যকক্ষ একই নহে; উহাদের উভয়ের পরস্পরচ্ছেদোৎপন্ন কোন্ পাঁচ অংশ পরিমিত হইবে। সুতরাং চন্দ্র পূর্ণিমার সময় কক্ষচ্ছেদবিন্দুর (nodes) অনতিদূরে না থাকিলে গ্রহণ হইবার সম্ভাবনা নাই। নিম্নাঙ্কিতচিত্রে ক ঘ দৃশ্যমান সৌর্য্যকক্ষের কিয়দংশ গ খ চান্দ্রকক্ষের কিয়-

দংশ; পৃ, পৃথিবীর ছায়া এবং চ১, চ২, চ৩, স্বীয়কক্ষে বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত চন্দ্র। স্পষ্টদেখা যাইতেছে যে চ১ স্থানে কোন গ্রহণ হইবে না; চ২ স্থানে অংশ গ্রহণ এবং কক্ষচ্ছেদবিন্দুতে পূর্ণগ্রহণ হইবে। গননাদ্বারা স্থির হইয়াছে যে চন্দ্রের দূরত্ব সমীপবর্ত্তী কক্ষচ্ছেদ বিন্দু হইতে ১২ $\frac{১}{২}$ অংশের ন্যূন না হইলে চন্দ্রগ্রহণ হইবে না। সূর্য্যের ন্যায় চন্দ্রের মধ্যগ্রাস গ্রহণ (annular eclipse) হইতে পারে না, কারণ পৃথিবীরছায়া চন্দ্রের আকৃতি অপেক্ষা অনেক বড়। পৃথিবী ও চন্দ্রের আহ্নিক-গতি নিবন্ধন চন্দ্র ও পৃথিবীর ছায়া পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে গমন করিতেছে;
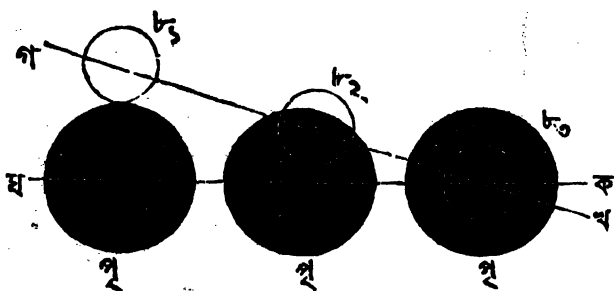
কিন্তু চন্দ্রের গতি পৃথিবীরগতি অপেক্ষা অনেক দ্রুততর; সুতরাং চন্দ্র পশ্চিম দিক হইতে ছায়া মধ্যে প্রবেশ করে; সুতরাং চন্দ্রের পূর্ব্বভাগ প্রথম নিরালোক হয়।

পূর্ণচন্দ্রগ্রহণকালে চন্দ্র কখন কখন অদৃশ্য এবং কখন কখন তাম্রবর্ণ থালার ন্যায় প্রতীয়মান হয়। পূর্ণগ্রহণকালে চন্দ্র ১ ঘন্টা ৫০ মিনিটকাল নিরালোক থাকিতে পারে। গণনাদ্বারাস্থির হইয়াছে যে বৎসরে তিনটির অধিক চন্দ্রগ্রহণ হইতে পারে না, এবং বৎসরে একটীও চন্দ্রগ্রহণ না হইতে পারে।

অনাবৃত চক্ষে দেখিলেও চন্দ্রের সর্ব্বাংশ সমভাবে আলোকিত দেখিতে পাওয়া যায় না; বস্তুতঃ চন্দ্রে অনেক কৃষ্ণবর্ণ দাগ দৃষ্ট হয়; এইচন্দ্রকলঙ্ক সম্বন্ধে হিন্দু কবিগণ বিবিধ প্রকার কল্পনা করিয়া গিয়াছেন। চন্দ্রের ভূমি সমতল নহে; উহা অত্যন্ত বন্ধুর এবং পর্য্যায়ক্রমে পর্ব্বত ও উপত্যকায় শোভিত; যখন সূর্য্যকিরণ বক্রভাবে পর্ব্বতোপরি পতিত হয়, তখন তাহার অপরপার্শ্বের নিম্নদেশে অবশ্যই ছায়া হইয়া থাকে; এবং ঐ অপরিস্ফুট সূর্য্যালোকে আলোকিত স্থানগুলিই কলঙ্করূপে প্রতীয়মান হয়। আমেরিকার প্রেয়ারির ন্যায় চন্দ্রে বৃহৎ বৃহৎ বিস্তীর্ণক্ষেত্র দৃষ্ট হয়; পূর্ব্বতন জ্যোতির্ব্বিদগণ ঐ গুলিকে চান্দ্র মহাসাগর জ্ঞান করিয়া উহাদিগকে সাগর নামে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকদিগের মতে চন্দ্রে জলবিন্দু মাত্র নাই। চন্দ্র, আগ্নেয় গিরিতে পরিপূর্ণ; অধিকাংশেরই ধাতুনিস্রব শেষ হইয়া গিয়াছে, কেবল কতকগুলি অদ্যাপিও গলিত ধাতু উদ্গীরণ করিতেছে। এক্ষণে পৃথিবীর ন্যায় চন্দ্রের ও মানচিত্র অঙ্কিত হইয়াছে; চন্দ্রের স্থিত প্রধান প্রধান পর্ব্বত, উপত্যকা ও ক্ষেত্রের, প্রধান প্রধান জ্যোতির্ব্বিদদিগের নামানুসারে নামকরণ হইয়াছে; এমন কি কতকগুলি চান্দ্র পর্ব্বতের উচ্চতাও নির্ণীত হইয়াছে; কতকগুলি পর্ব্বতের উচ্চতা ২০০০০ ফুটের অপেক্ষা ন্যূন হইবে না।

চন্দ্রের নিজের উত্তাপ নাই; তাহাও সূর্য্য হইতে প্রাপ্ত। পূর্ণচন্দ্রের আলোক সূর্য্যালোকের $\frac{১}{৬১৮০০০}$ অংশ; যদি সমস্ত গগনমণ্ডল অসংখ্যপূর্ণচন্দ্রের দ্বারা আবৃত হয়, তাহা হইলেও তাহাদের সমস্ত আলোক একত্রে সূর্য্যালোকের তুল্য দীপ্তি বিশিষ্টহইবে না। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক দিগের মতে চন্দ্রে বায়ু নাই, যদিও থাকে তাহা অত্যন্ত বিরল। তাঁহারা নিম্নলিখিত কয়েকটী যুক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন;—প্রথমতঃ চন্দ্র কর্ত্তৃক কোন নক্ষত্রের আবরণ (occultation) কালে, চান্দ্র বায়ু কর্ত্তৃক আলোক বক্রীকরণ (Refraction) হেতু, নক্ষত্র আবৃতাবস্থায়ও কিয়ৎকাল দৃষ্ট হইবে; কিন্তু এরূপ ফল কখন দৃষ্ট হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ চন্দ্রেবায়ু থাকিলে নক্ষত্র চন্দ্র কর্ত্তৃক আবৃত হইবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ও পরে

অত্যন্ত নিষ্প্রভ দৃষ্ট হইবে ; কিন্তু ও রূপ অবস্থায় কোন নক্ষত্রকে নিষ্প্রভ হইতে দেখা
যায় নাই। তৃতীয়তঃ বায়ু থাকিলে চান্দ্র প্রদোষকালে চন্দ্রের অৰ্দ্ধাংশেরও অধিক সূর্য্য
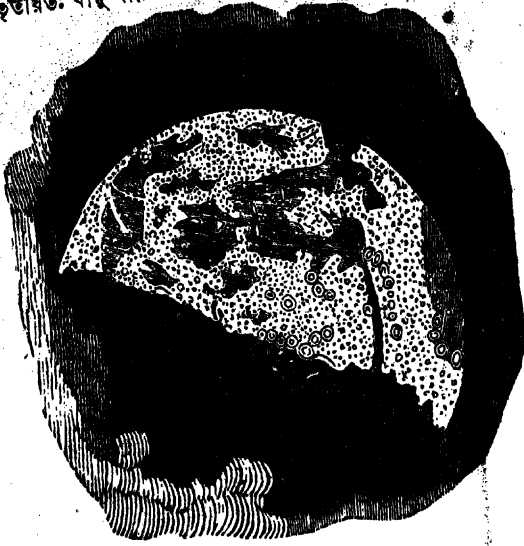
কিরণে আলোকিত হইবে ; সুতরাং দ্বিতীয়া, তৃতীয়া তিথিতে চন্দ্রের আলোকিতা
শের পার্শ্বভাগ অর্দ্ধবৃত্তাপেক্ষাও বৃহদাকার হইবে ; কিন্তু ইহা অতিঅল্প পরিমাণে
দৃষ্ট হইয়াছে। চতুর্থতঃ চন্দ্রে পৃথিবীর ন্যায় বায়ু থাকিলে সূর্য্যগ্রহণ কালে সূর্য্য
কখন অদৃশ্য হইত না ; ইহাই সৰ্ব্বাপেক্ষা বলবৎ প্রমাণ। অতএব চন্দ্রে বায়ু নাই,
যদি থাকে তাহা পার্থিববায়ু অপেক্ষা সহস্রগুণে বিরল।

আমাদিগের ২৭·৩২২ দিনে একচান্দ্র দিন হইয়া থাকে ; আমাদিগের ৩৪৬·৬০৭
দিনে একচান্দ্র বৎসর হয় ; একচান্দ্র বৎসরে ১১·৭৩৭ চান্দ্রদিন হইয়া থাকে ;
সুতরাং ৩ চান্দ্রদিনে এক এক চান্দ্র ঋতু হইবে দিবারাত্রের অত্যন্ত দৈর্ঘ্য ও চন্দ্রে
জলীয় বাষ্পের অভাব নিবন্ধন চান্দ্রদিন অত্যন্ত উষ্ণ এবং চান্দ্ররাত্রি অত্যন্ত শীতল
হইয়া থাকে। পূর্ণচন্দ্রের সময় চন্দ্রের উত্তাপ সৰ্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে ;
তাহার পরিমাণ ফ্যারেন হিটের ৫০০ অংশ পরিমিত হইবে। চন্দ্রের প্রাকৃতিক
অবস্থা সন্দর্শনদ্বারা চন্দ্রে ঋতু পরিবর্ত্তনের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

প্রায় একমাস কালে চন্দ্র আপন মেরুদণ্ডের উপর একবার আবর্ত্তন করে,
সুতরাং চন্দ্র হইতে সমক্ষত্র গগনমণ্ডলকে ঐ সময়ে একবার আবর্ত্তন করিতে দেখা
যাইবে। পৃথিবী, চন্দ্রের অৰ্দ্ধাংশ হইতে এক নির্দ্দিষ্টস্থানে দৃষ্ট হইবে ; চন্দ্রের

অপরার্দ্ধের দর্শকেরা পৃথিবীকে দেখিতে পাইবে না; কেবল তুলামান নিবন্ধন অপরার্দ্ধের প্রান্ত হইতে পৃথিবী সময়ে সময়ে দৃষ্ট হইবে। পৃথিবীর দৃশ্যমান ব্যাস ২ অংশ পরিমিত, এবং তাহার দৃশ্যমান আকৃতি চন্দ্রের দৃশ্যমান আকৃতির দ্বাদশগুণের অধিক হইবে। পৃথিবীর আকাশে চন্দ্রের ন্যায়, চান্দ্রগগণে পৃথিবীরও কলাক্রমে উপচয়ও ক্ষয় হইবে। কিন্তু আমাদের পূর্ণিমার সময়, চন্দ্রের অমাবস্যা এবং চন্দ্রের পূর্ণিমার সময় আমাদের অমাবস্যা এইরূপে চন্দ্রে তিথি সকল বিভিন্নকালে উপস্থিত হইবে। তুলামান নিবন্ধন সময়ে পৃথিবীর অল্পঅল্প গতি লক্ষিত হইবে, কিন্তু তাহা অতি সামান্য।

চন্দ্র হইতে আমরা রজনীতে আলোকপ্রাপ্ত হইয়া থাকি এবং চন্দ্রের আকর্ষণ পৃথিবীর জলোচ্ছাসের প্রধান কারণ। চন্দ্র না থাকিলে কোনগ্রহণের উৎপত্তি হইত না। চন্দ্র না থাকিলে, অনেক জ্যোতির্ব্বিদদিগের মতে মহামাধ্যাকর্ষণ শক্তিরও আবিষ্কার হইত না। বর্ত্তমান অবস্থায় চন্দ্র পৃথিবীস্থ কোনজীব বা উদ্ভিদের বসতি যোগ্য নহে; কিন্তু জ্যোতির্ব্বিদদিগের মতে চন্দ্রের ঐ অবস্থা চিরন্তন নহে; এমন সময় গত হইয়াছে যখন চন্দ্রে জলও বায়ুর অভাব ছিল না; বোধ হয় সে সময়ে চন্দ্র বৃক্ষলতাপরিশোভিত, বিবিধপ্রাণীপূর্ণ, সাগরেবেষ্টিত পৃথিবীর ন্যায় অবস্থাপন্ন ছিল। অনেকে অনুমান করেন, যে চান্দ্রদিনের অতীব দৈর্ঘ্যত্বাৎ সূর্য্যের প্রচণ্ড উত্তাপে ও অসংখ্য ভয়ঙ্কর আগ্নেয়গিরির উৎপাতে চন্দ্র এরূপ জল বায়ু জীব বৃক্ষ রহিত শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। চন্দ্রের ভবিষ্যৎ অবস্থা কি হইবে, কে বলিতে পারে; যাহা হউক সকলই জগতের নিয়ন্তা সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন। চন্দ্র কোন না কোন উদ্দেশ্য সাধনার্থ সৃষ্ট হইয়াছে তাহার কোন সন্দেহ নাই। আমরা সে উদ্দেশ্যানুসন্ধানে বিরত হইয়া, তাঁহাকে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক ভক্তিভাবে তাঁহার নিকট প্রণত হই।

শ্রীকালীকৃষ্ণ বসাক।

উদ্ভিদ জীবন প্রক্রিয়া।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

প্রাগুক্ত প্রকারে সজীব পদার্থের অবির্ভাব হইলে, তাহাদিগের রক্ষার জন্য এবং সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য পূর্ব্বোক্ত তিন প্রক্রিয়া যে প্রকারে নির্ব্বাহ হইয়া থাকে তদ্বিষয় অনালোচ্য হইলেও কিঞ্চিৎ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

প্রথমতঃ। বাহ্য বস্তু সংযোগে দেহ বৃদ্ধি জন্য তাহাদিগকে উদরস্থ করা আবশ্যক হয়। প্রাণীগণ যাহা আহার করে তাহা প্রথমাবস্থায় জীবিত থাকে, পরে তাহার জীবন নষ্ট করিয়া জড় রূপে পরিণত করিয়া উদরস্থ করে। কিন্তু জীবন প্রক্রিয়ার আশ্চর্য্য কৌশলে সেই জড় আর বার জীবন প্রাপ্ত হয় এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই জীবন, কি পদার্থ তাহা আমরা জানিনা। কেবল অঙ্গ সঞ্চালনাদি দ্বারা ইহার স্থায়িত্ব অনুভূত হয়। দেহে কিরূপে জীবন সঞ্চার হয় এবং মরিলেই সেই জীবন কোথায় গমন করে তাহাও আমরা জানিনা। জীবিত পদার্থের ভক্ষ্য দ্রব্য এক রূপ নহে, যে যেমন দেহ ধারণ করে, তাহার ভক্ষ্য ও সেই রূপ অর্থাৎ কেহ সর্ব্ব ভোজী, কেহ মাংস ভোজী, কেহ বা তৃণ ভোজী; যে জন্তু যেরূপ বস্তু ভক্ষণ করিয়া থাকে, ভগবান্ তাহাকে সেইরূপ যন্ত্র সকল প্রদান করিয়াছেন। মনুষ্য সর্ব্ব ভোজী, এজন্য ঈশ্বর তাহাদিগকে তিনপ্রকার দন্ত প্রদান করিয়াছেন যথা কর্ত্তন, বেঁদন ও চিবান; মাংস ভোজীকে বেঁদন ও পেশন তৃণ ভোজীকে পেশন ও কর্ত্তন দন্ত দিয়াছেন। কেবল তরল পদার্থ ভোজী বৃক্ষ ও কৃমি দিগকে দন্ত দেন নাই। কৃমিমল পরীক্ষা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীতি হইবে যে তাহাতে মৃত্তিকার উপাদান ভিন্ন অন্য কিছুই নাই। শরীর রক্ষা এবং আহার পরীক্ষা জন্য ঈশ্বর আমাদিগকে ইন্দ্রিয় দিয়াছেন। চক্ষু দ্বারা অবস্থা দর্শন, নাসিকা দ্বারা গন্ধ গ্রহণ এবং জিহ্বা দ্বারা স্বাদ গ্রহণ কার্য্য নির্ব্বাহ হয়। এই তিন ইন্দ্রিয়, ভক্ষ্য বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করে। অর্থাৎ সুভক্ষ্য (দুগ্ধাদি) হইলে সহজে খাইতে প্রস্তুত হয়, আর কুভক্ষ্য (মদ্যাদি) হইলে কতই আপত্তি করে, সহজে কখনই খাইতে চায়না। তবে বল পূর্ব্বক অভ্যাস করা স্বতন্ত্র কথা।

প্রাণীগণের পাকযন্ত্রের ক্রিয়া এবং সন্তানোৎপত্তির কার্য্য সকল যেরূপে সম্পন্ন হয়, উদ্ভিদদিগেরও সেইরূপে নির্ব্বাহ হয়। যে স্থানে বিষাক্ত দ্রব্য আছে, বৃক্ষ সকল প্রাকৃতিক নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া সে দিকে কদাচ রস গ্রহণ করেনা। যদি জন্তুগণের বিহার এবং নিদ্রার সহিত বৃক্ষ সকলের তুলনা করা যায় তবে উক্ত দুই গুণ সমভাবে আছে ইহাও স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। উদ্ভিদ সকল জন্তুগণের ন্যায় ইন্দ্রিয় প্রতিক্রিয়ার দ্বারা ভক্ষ্য বস্তু গ্রহণ করিয়া বৃদ্ধি পাইতেছে এবং জীবগণের ন্যায় গর্ভ ধারণ করিয়া বীজোৎপাদন করিতেছে। ইহারা শিকড় দ্বারা মৃত্তিকা হইতে রস গ্রহণ করে। (রস বলিলে এ স্থলে যেন জল বোধ না হয় কারণ ইহারা যদি জল খাইয়া জীবন ধারণ করিত, তবে ইহাদের ভিতর কেবল জলের উপাদান থাকিত। অন্য প্রকার উপাদান কখন থাকিত না)। যে স্থলে বৃক্ষেরা প্রোথিত থাকে, সে স্থানের কোন অংশ কমিয়া যায় না। জন্তুগণ মলমূত্র

ত্যাগ করিয়া ভক্ষণের পরিচয় দেয়, উদ্ভিদেরা মলমূত্রও ত্যাগ করে না। এজন্য ইহাদিগের ভক্ষ্যদ্রব্য পরীক্ষা করিতে হইলে রসায়নবিদ্যার সাহায্য ভিন্ন অন্য উপায় নাই। বৃক্ষগণের কোন অংশ পোড়াইলে তাহার অধিকাংশ উড়িয়া যায় এবং অবশিষ্ট কিঞ্চিৎ ভস্মমাত্র পড়িয়া থাকে। যে বস্তু উড়িয়া যায় তাহা কি? নিরূপণ করিতে হইলে ঐ দাহ্যমান পদার্থের শিখার উপর কোন বস্তু ধরিলে তাহাতে ভুষা পড়িয়া থাকে, ঐ ভুষাই যে বৃক্ষের উপাদান তাহার আর সন্দেহ নাই। ঐ ভুষার যে যে পরমাণু আছে, বৃক্ষেরা তাহাই শরীরে ধারণ করিয়াছিল। আর বার যদি ভস্ম লইয়া পরীক্ষা করা যায় তবে অন্যান্য প্রকার উপাদান বাহির হইয়া পড়ে। যেমন আঠালমৃত্তিকায় বালি চূন লবণ গন্ধক ইত্যাদি বাহির হয় ঐ সকল ভস্মেও সেই সকল পদার্থ অল্প বা অধিক পরিমাণে পাওয়া যায় ইহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে বৃক্ষেরা আবশ্যকমত সকল বস্তুই ভক্ষণ করিয়া থাকে, কদলী ও নারিকেল বৃক্ষে ঐ সকল উপাদান অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। উলুখড়ে বালুকার পরিমাণ অধিক আছে। উদ্ভিদদিগের ভিতরে কোন্ উপাদান অধিক কোন উপাদান্ অল্প আছে ইহা দেখিয়া অনুমান করাযায় যে, যে বৃক্ষে যে উপাদান অধিক তাহাই তাহার ভক্ষ্যদ্রব্য; অন্যগুলি আনুষঙ্গিক উপাদান মাত্র। উদ্ভিদ সকল মৃত্তিকার উপাদান (রস) ভোগকরে সত্য বটে কিন্তু এমন অনেক বৃক্ষ আছে, তাহাদিগের মৃত্তিকার সহিত কোন সম্পর্ক নাই। কেবল বৃক্ষের উপর থাকিয়া বৃদ্ধিশীল হইয়া থাকে। ইহারা ভক্ষ্যদ্রব্যের অধিক ভাগ বায়ু হইতে গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহাদিগের যে সকল শিকড় বৃক্ষত্বকে সংযুক্ত থাকে তদ্দ্বারা বৃক্ষত্বকের দূষিত অংশ সকল ভক্ষণ করে, তাহার রস কখন পান করে না। বৃক্ষের কার্‍্বণিক ভাগ ভক্ষণ করিয়া অক্‌সিজন ভাগ ত্যাগ করে, ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত, কিন্তু ত্বকস্থ দূষিত পদার্থ ভক্ষণ করে ইহা অনেকেই স্বীকার করিবেন না। কিন্তু যদি ইহারা কেবল কার্‍্বন খাইয়া জীবিত থাকিত. তাহা হইলে ইহাদিগকে পোড়াইলে কার্‍্বন উড়িয়া যাইত ভস্মাদি থাকিত না। যখন ভস্মাদি থাকে তখন ঐ পদার্থ দূষিত স্থান হইতে ভিন্ন অন্য কোথা হইতে পাইল?

অন্য কয়েক প্রকার বৃক্ষ আছে তাহারা বৃক্ষ শাখায় বাস করে। ইহাদিগের শিকড় আলম্ব্যশাখা ভেদ করিয়া ভিতরে প্রবেশপূর্ব্বক রসপান করে। এজন্য মূলবৃক্ষরসে যে সকল উপাদান আছে, তাহাই ইহাদিগের ভক্ষ্য; কোন স্থানে কোন বৃক্ষ অধিক কাল থাকিলে, ক্রমে তাহার ভক্ষ্যবস্তু নিঃশেষিত হইয়া যায়, পরে আহার অভাবে সেই বৃক্ষ মরিলে তৎস্থানে যদি তজ্জাতীয় কোন বৃক্ষ রোপণ করা যায় তবে তাহা বৃদ্ধি পায় না বা জীবিত থাকে না। কিন্তু যদি অন্য জাতীয়

কোন উদ্ভিদ রোপণ করা যায় তবে তাহা অবশ্য জীবিত থাকিয়া বাড়িতে থাকে, কারণ তাহার ভক্ষ্যদ্রব্য তথায় নিঃশেষ হয় নাই। কোন উদ্যানে বৃক্ষ রোপণ করিতে হইলে ঘণ রোপণ করা উচিত নহে কারণ অল্প ব্যবধান মধ্যে যে ভক্ষ্যদ্রব্য থাকে তাহা কখন দুইটী বৃক্ষের পর্য্যাপ্ত হয় না; কাজেই ক্রমে শীর্ণ হইয়া মরিয়া যায়। এজন্য বৃক্ষের ভাবী আকার অনুমান করিয়া তদুপযুক্ত অন্তরে রোপণ করাই কর্ত্তব্য। মৃত্তিকার প্রধান উপাদান বালুকা এবং আঠাল মৃত্তিকা; এই দুই বস্তু যেখানে সমপরিমাণে থাকে তথায় সর্ব্বপ্রকার বৃক্ষ জন্মিবার নিতান্ত সম্ভাবনা। ইহার তারতম্যানুসারে কাহারও উপযোগী কাহারও অনুপযোগী হয়। যেস্থলে বালির ভাগ অধিক তথায় কোমল শিকড় বিশিষ্ট; যথা তরমুজ, ফুটী, লাল-আলু ইত্যাদি উত্তম জন্মাইতে পারে। এবং আঠালমাটীতে শুষ্ক ও কঠিন শিকড় বিশিষ্ট যথা আম্র, কাঁঠাল ইত্যাদি হইতে পারে। যথায় কেবল বালি কিম্বা আঠাল-মাটী তথায় প্রায় কোন বৃক্ষ হয় না। বালি এবং আঠাল মৃত্তিকাযুক্ত মৃত্তিকা উদ্ভিদের পক্ষে গুণকারক; কোন বীজ রোপণ কিম্বা শাখা ও গুটী কলম করিতে হইলে, পাতাপচাসার মিশ্রিত বালির উপর পুঁতিলে, বীজ শীঘ্র অঙ্কুরিত হয়। আর শাখা ও গুটী কলমের শিকড় ত্বরায় নির্গত হয় কারণ বালির উত্তাপ ধারণ ক্ষমতা থাকায় বীজ এবং শাখা শীঘ্র উত্তেজিত হইয়া অঙ্কুর ও শিকড় নির্গত করে। উদ্যানে চারা জন্মাইবারকালে বালি এবং সার দ্বারা গাম্‌লা পরিপূর্ণ করিয়া ব্যবহার করা যায়। আঠাল মৃত্তিকার উত্তাপ ধারণ ক্ষমতা নাই। এইরূপে গাম্‌লার চারা উৎপন্ন হইলে আর তাহাদিগকে তথায় রাখা কর্ত্তব্য নহে। যেহেতু তথায় ভক্ষ্যদ্রব্যের অভাব হইলে উদ্ভিদ সকল মরিয়া যাইতে পারে। এজন্য তাহারা যথায় খাদ্য পাইতে পারে তথায় রোপণ করা কর্ত্তব্য। উদ্ভিদদিগের ভক্ষ্যদ্রব্য নিরূপণ করিয়া ইহারা যে প্রকার দ্রব্য আহার করে, তদ্বিষয় লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। জন্তুদিগের ন্যায় ভক্ষ্যদ্রব্য নির্ব্বাচন করিবার জন্য ইহাদিগের চক্ষু, নাসিকা, দন্ত প্রভৃতি যন্ত্র নাই। ইহারা খাদ্যদ্রব্য দন্ত দ্বারা পেশন ও লালার সহিত মিশ্রিত করিয়া ভক্ষণ করিতে জানে না। স্বাভাবিক কৌশলে ঐ কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। অনেক প্রকার জন্তু আছে, তাহাদের দন্ত নাই এবং চর্ব্বিত বস্তু লালার সহিত মিশ্রিত করিয়া জিহ্বা দ্বারা স্বাদ গ্রহণ করিতে এমন রসনা নাই। কেবল চক্ষুদ্বারা ভক্ষ্য নির্ব্বাচন করিয়া ভক্ষণ করিয়া থাকে। যেমন সর্পজাতি, ইহাদের যে জিহ্বা আছে; কোমল অস্থির ন্যায় বস্তু তদ্দ্বারা স্বাদ গ্রহণ করে না। ইহাদিগের খাদ্য ভেক কিম্বা মৎস্য; চক্ষে দেখিলেই ধরিয়া গ্রাস করে; কেঁচো, মশা এবং মধুমক্ষিকা এই শ্রেণীভুক্ত;

স্বাভাবিক যে সকল কারণে বস্তুসকলের যোগভঙ্গ হয় তাহার মধ্যে কার্বনিক য়্যাসিড প্রধান ; ইহাবৃষ্টির জলে ও বায়ুতে আছে। বায়ু মৃত্তিকার উপর সঞ্চালিত হইয়াই তাহার যোগ ভঙ্গ হইয়া ধুলা হইয়া পড়ে। পরে বায়ু সহকারে ঐ ধুলা উড্ডীয়মান হইয়া তথায় পড়ে। তথায় উদ্ভিদ থাকিলে ঐ ভক্ষ্য ভক্ষণ করিয়া পুষ্ট হইতে থাকে। এবং সেইস্থলে বীজ পড়িলে আর জল হইলে শীঘ্র সেই বীজ অঙ্কুরিত হয়। জল মৃত্তিকার উপর পড়িলে জলস্থল কার্ষণ দ্বারা মৃত্তিকার যোগভঙ্গ হইয়া জলের সহিত মিশ্রিত হয়। এই কারণে জল ঘোলা হইয়া পড়ে। কদনন্তর ঐজল যেখানে আসিয়া পড়ে তথায় উদ্ভিদ দিগের খাদ্য দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত হয়। এই রূপে পর্ব্বতশৃঙ্গ ও গাত্র ধৌত করিয়া নদীর জল সমল হয়। এবং সেইজল যথায় যথায় গমনকরে তথায় পলি পড়িয়া ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধিকরে। যে দেশের ভূমি নদীজলে প্লাবিত হয় তথাকার ভূমিতে সারদিবার আবশ্যক হয়না। এইরূপে গ্রাম ধৌত হইয়া ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা বৃদ্ধিকরে। মৃতজন্তু ও বৃক্ষপত্রাদি পচিয়া কার্বনিক য়্যাসিড এবং সার উৎপন্ন করে, তদ্দারা বৃক্ষগণ প্রচুর খাদ্যদ্রব্য প্রাপ্তহয়।

বৃক্ষ মূলে জলদিলে ইহারা জীবিতহয়, ইহাদেখিয়া অনেকে মনে করিতে পারেন, পাদপগণ শুদ্ধ বারি ভক্ষণ করিয়া ঐরূপ হয় বস্তুত তাহানহে। জলসংযোগে, মৃর্ত্তিকার অভ্যন্তরে বৃক্ষদিগের ভক্ষ্যদ্রব্য প্রবেশ করে, তাহাই বৃক্ষগণ ভক্ষণ করিয়া পুষ্ট হয়।

ক্রমশঃ—

শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায়

জ্যোতিষশাস্ত্র।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

বিশেষরূপে খগোল বিবরণে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে নক্ষত্র পরিদর্শনের একটি সামান্য ও সহজ ব্যবস্থা সাধারণের নিকট প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। ইহা আমাদিগের কোন প্রিয় বন্ধুর অভিপ্রেত হওয়াতে আমরা আহ্লাদ সহকারে তাহা অনুমোদন করিলাম এবং এ স্থলেই ঐ ব্যবস্থা সঙ্কলন করিলাম।

কোন প্রশস্ত ক্ষেত্র বা কোন উচ্চ ভূমিতে দণ্ডায়মান হইলে যখন আমাদিগের দৃষ্টি অব্যাহতরূপে আমাদিগের চতুর্দ্দিকেই প্রসারিত হয় তখন আমরা দেখিতে

পাই যে আমরা আকাশের এক মণ্ডলার্দ্ধের মধ্যস্থলে অবস্থিত আছি, আমাদিগের চতুর্দ্দিকে গোলাকার এক রেখা আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, এবং মস্তকের উপরে অনন্ত হীরকখণ্ড সদৃশ নক্ষত্র মণ্ডল নীলকান্তমণি নির্ম্মিত চন্দ্রাতপ সদৃশ নীল নভস্থল ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে। এইরূপে দণ্ডায়মান হইয়া কিয়ৎকাল পূর্ব্ব অভিমুখে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া থাকিলে আমরা অনায়াসেই উপলব্ধি করিতে পারি যে সমুদায় নক্ষত্র চক্র পূর্ব্বদিকে উদিত হইয়া ক্রমে আমাদের মস্তকোপরিস্থ আকাশখণ্ডে উপস্থিত হয়, আবার কিয়ৎক্ষণ পরেই পশ্চিমদিকে গিয়া নীচেরদিকে অবতরণ করিয়া অস্তগমন করে। আবার যদি উত্তরদিকে মুখ ফিরাইয়া দেখি তবে দেখিতে পাই যে কতকগুলি নক্ষত্রের উদয় ও অস্ত নাই। তাহারা কেবল পূর্ব্বদিক্ হইতে পশ্চিমে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত গমন করিয়া পুনরায় সেই পথে প্রত্যাবৃত্ত হয়। দক্ষিণদিকে দৃষ্টি করিলেও ঐরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকে মনে করিতে পারেন যে উহারা পূর্ব্বদিকে অস্ত যায়, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। প্রাতঃকালের আলোকের প্রাদুর্ভাবে আমরা উহাদিগকে আর দেখিতে পাই না। যদি ঐ সময়ে প্রাতঃকাল না হইত, বা গ্রহণে সূর্য্যের সর্ব্বগ্রাস হইত তাহা হইলে আমরা অবশ্যই উহাদিগকে কিয়দ্দূর গমনকরার পর পুনরায় ফিরিতে দেখিতে পাইতাম। যাহা হউক এই সকল নক্ষত্র মস্তকের উপর পর্য্যন্ত উঠিয়া পশ্চাৎ উভয় দিকে নামিয়া পড়াতে ইহাই বোধ হয় যে এই সকল নক্ষত্র কোন বৃত্তক্ষেত্রের অর্দ্ধাংশ পর্য্যন্ত ১২ ঘণ্টায় গমন করিয়া পুনর্ব্বার প্রতিনিবৃত্ত হইয়া আবার ১২ ঘণ্টায় সেই পথেই আসে। বস্তুতঃ উহারা বৃত্তক্ষেত্রের অর্দ্ধাংশ পর্য্যন্ত গিয়া ফেরে না। উহারা এক নির্দ্দিষ্ট বৃত্তক্ষেত্র সম্পূর্ণরূপে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রায় ২৪ ঘণ্টায় পুনরায় সেই স্থলে উপনীত হয়। তবে এই বৃত্তক্ষেত্র পূর্ব্বপশ্চিমাভিমুখ হওয়াতেও পৃথিবীর মধ্যভাগ আমাদের দৃষ্টির আবরক না হওয়াতে—আমরা ঐরূপ দেখিয়া থাকি। পৃথিবী দৃষ্টি আচ্ছাদন না করিলে অথবা চন্দ্র সূর্য্য কেন্দ্রস্থ হইলে আমরা চন্দ্র সূর্য্যকেও ঐরূপ দেখিতে পাইতাম। কারণ আকাশমণ্ডলের সমান্তরালে পরিভ্রমণ না করিলে আমরা দূরস্থ বস্তুর ভ্রমণ উপলব্ধি করিতে পারি না। ফলতঃ পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ কেন্দ্রের উপর যদি বস্তুতই দুইটী গোঁজ পোতা থাকিত ও তাহার উপর তারা থাকিত তবে আমরা যেমন তাহার বেষ্টন অনুভব করিতে পারিতাম না ও তাহার নিকটস্থ গুলিকে কেবল এদিকে ও ওদিকে যাইতে দেখিতাম ইহাও ঠিক সেইরূপ। উক্ত নক্ষত্রগণ যে একই বৃত্তপথে পরিভ্রমণ করে এমন নয়, কোনটি বা বৃহৎ কোনটি বা ক্ষুদ্র মণ্ডল পরিভ্রমণ করে। কিন্তু এই একটি আশ্চর্য্য দেখা যায় যে সকল গুলির মণ্ডলপথের কেন্দ্র একই স্থান এবং সকলগুলিই ঠিক

সমান সময়ের মধ্যেই স্ব স্ব ভ্রমণ কার্য্য সম্পন্ন করে। আমারা যদি কয়েক রাত্রি মনোযোগপূর্ব্বক উহাদের উদয়াস্ত প্রভৃতি অবলোকন করি তবে আমরা আপনা হইতেই উহাদের প্রত্যেকের স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট স্থল ও আকৃতির পরিচয় পাইতে পারি। ইহারই নাম আকাশস্থ নক্ষত্রমালার পরিচয়। যেমন বর্ণমালার বর্ণপরিচয় ব্যতিরেকে কেবল শব্দাদি শিক্ষা নীরস ও অকিঞ্চিৎকর সেইরূপ নক্ষত্র পরিচয় ব্যতিরেকে জ্যোতিষ শাস্ত্র পাঠও নীরস ও অকিঞ্চিৎকর।

কয়েক দিন পরিদর্শনের পর হঠাৎ আমাদের এরূপ বোধ হয় যে ঐ নক্ষত্রগণের উপরিউক্ত গতি উহাদের স্বসম্বন্ধীয় স্বতন্ত্র গতি নহে। উহা যেন কেবল পরিদৃশ্যমান আকাশেরই গতি, আর উহারা যেন আকাশেই স্থির হইয়া আছে।* আকাশের এই গতি ২৪ ঘণ্টায় একবার পূর্ণ হইয়া পুনরারম্ভ হয়, আর যেন এই ঘূর্ণাগতি কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যাস বা কীলকের উপর থাকিয়া হইতেছে। ভপঞ্জর সমেত এই আকাশ যে কীলকের উপর ঘুরিতেছে বলিয়া বোধ হয় সেই কীলক যেন হোরাচক্রের (Meridian) উত্তর চতুর্থাংশের কোন নির্দ্দিষ্ট বিন্দুকে লক্ষ্য করিয়া আছে। দৃষ্টস্তমণ্ডলের পরিধি হইতে ইহার উচ্চতা ও দর্শকের অধিষ্ঠান স্থান হইতে পরিধির সেই স্থানের দূরতায় যে অংশ হয় এ উভয়ই ঠিক সমান। অর্থাৎ দৃষ্টিমণ্ডলের পরিধির কোন স্থান হইতে দ্রষ্টা যদি ২৫ অংশ দূরে থাকেন তবে তথা হইতে তাঁহার দৃষ্টি তারাও ২৫ অংশ দূরে থাকিবে।

নক্ষত্র সহ আকাশের গতিপ্রকৃক্রিয়ার অনুধাবন হইলে তত্রত্য অপরাপর বিবিধ বিষয়ও অনায়াসেই বুঝা যাইতে পারিবে। পূর্ব্বোক্ত এই গতি ক্রিয়া হেতুক ইহা অনায়াসেই বুঝা যাইতেছে যে, সমুদায় জ্যোতিষচক্রই স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট কীলকের চতুর্দ্দিকে পরস্পর সমান্তরালে মণ্ডলাকারে পরিভ্রমণ করিতেছে এবং যে নক্ষত্র কেন্দ্রের যত নিকটবর্ত্তী তাহার ভ্রমণমণ্ডল তত ছোট। যখন কোন ব্যক্তি দক্ষিণদিকে দৃষ্টিপাত করেন তখন তিনি দেখিতে পান যে, তত্রত্য নক্ষত্রমণ্ডল দৃষ্টিমণ্ডলের কিয়দ্দূর নীচে ও কিয়দ্দূর উচ্চে যাতায়াত করে এই জন্যই তাহাদের পর্য্যায়ক্রমে উদয় ও অস্ত পরিদৃশ্যমান হয় কিন্তু যখন তিনি উত্তরদিকে নিরীক্ষণ করেন তখন দেখবেন যে তত্রত্য নক্ষত্রগণ কীলকের অগ্রভাগের অধিক নিকটবর্ত্তী হওয়াতে ক্ষুদ্রতর চক্রপথে পরিভ্রমণ করে, আর দৃষ্টিমণ্ডলের ঠিক উপর হওয়াতে তাহাদের উদয় অস্ত হয় না। এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, মেরুদণ্ডের

* এইজন্যই আর্য্যভট্ট কহিয়াছেন। ভপঞ্জরঃ স্থিরোধ্রুবেবাবৃত্যাবৃত্ত প্রতি দৈবসিকাবুদয়াস্তময়ৌ সম্পাদয়তি।

ঠিক উপরে গোলকের যে কীলক থাকে তাহাকে স্থির দেখা যাইবে। তাদৃশ স্থলের নক্ষত্র ভিন্ন আর কাহাকেও স্থির দেখা যাইবে না। কিন্তু বস্তুত ঠিক ঐ স্থানে কোন নক্ষত্র নাই উহার অতি নিকটে একটিমাত্র উজ্জ্বল তারা আছে। ঐ তারাটি যদিও তদনুসারে এই কীলকের চতুর্দ্দিকে পূর্ণচন্দ্রের ছয় গুণ মণ্ডলাকার একটি মণ্ডলপথে পরিভ্রমণ করে তথাপি তাহা জ্যোতিষিক যন্ত্র সাহার্য্য ব্যতিরেকে সামান্য দৃষ্টির অনুভবনীয় নহে। সেই জন্যই উহাকে ধ্রুবনক্ষত্র অর্থাৎ স্থির তারা কহে! এই তারকাদ্বারাই আকাশমণ্ডলের উত্তরকেন্দ্র নির্ণীত হইয়া থাকে। উত্তরকেন্দ্র নির্ণীত হইলে ইহার ঠিক বিপরীতদিকে অদৃশ্য দক্ষিণ কেন্দ্রেরও নির্ণয় হয়।

ভাস্করাচার্য্য উত্তর ও দক্ষিণ ধ্রুবতারা সম্বন্ধে কহিয়াছেন, যে নিরক্ষদেশে (*Equator*) থাকিয়া দেখিলে মনুষ্য উত্তর ও দক্ষিণ ধ্রুব তারাকে পৃথিবীর উভয় প্রান্তে অর্থাৎ উত্তর দক্ষিণদিকের দর্শনান্তমণ্ডলের রেখাতে দর্শন করেন। আর সনক্ষত্র আকাশমণ্ডল যেমন উত্তর দক্ষিণকেন্দ্রে আবদ্ধ থাকিয়া পূর্ব্বে পশ্চিমে তাঁহাদের মণ্ডলোপরি জলযন্ত্রের ন্যায় ঘুরিতেছে। কিন্তু যখন তাঁহারা নিরক্ষ প্রদেশ হইতে ক্রমশঃ উত্তরদিকে প্রসৃত হন তখন তাঁহারা দেখেন যে যে তারকা গুলিকে তাঁহারা নিরক্ষদেশ হইতে মস্তকের উপর দিয়া ঘুরিয়া অস্ত যাইতে দেখিয়াছিলেন সে গুলি নীচেরদিকে নত হইয়া এবং উত্তর ধ্রুব ক্রমশ অস্তমণ্ডল হইতে উচ্চদিকে উঠিয়া ঘুরিতেছে। এতদ্বারা প্রতীয়মান হয় যে কেন্দ্র ও অস্ত-মণ্ডলের মধ্যস্থ অংশের পরিমাণই অক্ষাংশের পরিমাণ। অতএব দর্শকের স্থান ও নিরক্ষদেশের দূরতা হেতু যে অংশ হয়, এই অংশ তাহার দ্বারা কৃত ও তাঁহার সমান হয়। *

উপরে যে নক্ষত্র পুঞ্জের সহিত আকাশ মণ্ডল প্রতিদিন পৃথিবীকে বেষ্টন করিতেছে বলিয়াছি তাহা কেবল আমাদের দর্শন সম্বন্ধে জানিতে হইবে। বস্তুতঃ আকাশ বা নক্ষত্রগণ পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে না। পৃথিবী নিয়ত কীলকে ঘুরি-তেছে বলিয়া আমাদের এরূপ দৃষ্টিভ্রম হইয়া থাকে। কেবল আমাদের বর্ত্তমান প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত ওরূপ বলিয়াছি। ফলতঃউহাতে বুঝিবার সুবিধা ভিন্ন প্রকৃতপক্ষে আর কোন দোষ ঘটিবে না।

আকাশ মণ্ডলস্থ ভিন্ন ভিন্ন নক্ষত্র পুঞ্জ ও পৃথক্ পৃথক্ আকৃতি ও উজ্জ্বল অনু-সারে জ্যোতির্ব্বিদেরা ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী বিভক্ত করিয়াছেন।

* নিরক্ষ দেশে ইত্যাদি ২৬২ পৃঃ দেখুন।

রাশি চক্র ও নক্ষত্র।

অনেকেই অবগত আছেন যে সূর্য্য বৎসরের মধ্যে আকাশস্থ যে ক্রান্তিবৃত্তি অতিক্রম করে এবং চন্দ্র যাহা ২৭। ২৮ দিনে অতিক্রম করে, সেই পথে কতক গুলি নক্ষত্র পুঞ্জ আছে ঐ নক্ষত্র পুঞ্জগুলির নামই রাশি ও সেই রাশিগণ সমেত এই চক্রপথের নামই রাশিচক্র। রাশিগণ ক্রান্তিপথের উভয়-দিকে ১০। ১২ অংশের মধ্যে অবস্থিতি করে। এক এক রাশিগত স্থান প্রায় ৩০ ত্রিশ অংশের তুল্য। এক এক রাশি অতিক্রম করিতে সূর্য্যের প্রায় ৩০ দিন ও চন্দ্রের প্রায় ২।০ দিন লাগে। এজন্য সৌর মাস প্রায় ৩০ দিনের ও চান্দ্র মাস প্রায় ২৭ দিনের তুল্য।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে পূর্ব্বে যে যে মাসে যে যে রাশিতে সূর্য্য থাকিত এখন তাহার ব্যতিক্রম হইয়া একরাশি অন্তরে থাকিতেছে। অর্থাৎ পূর্ব্বে সূর্য্য বৈশাখ মাসে মেষ রাশিতে, জ্যৈষ্ঠে বৃষরাশিতে, আষাঢ়ে মিথুন রাশিতে ইত্যাদিক্রমে চৈত্রে মীন রাশিতে থাকিত, কিন্তু এক্ষণে বৈশাখ মাসে বৃষ রাশিতে, জ্যৈষ্ঠে মিথুন রাশিতে, আষাঢ়ে কর্ক্কট রাশিতে ইত্যাদি ক্রমে অব-স্থিতি করিতেছে। এইরূপে চৈত্রে সূর্য্য মীন গত না হইয়া এক্ষণে কুম্ভ গত আছে। কিন্তু এই প্রকার ব্যতিক্রম হইলেও পঞ্জিকাতে পূর্ব্ববৎই গণনা ও হিসাব হইয়া থাকে। পঞ্জিকার সবিশেষ বিবরণ আমরা অন্যত্র প্রকাশ করিব, এক্ষণে তাহার প্রবেশিকা স্বরূপ রাশি ও নক্ষত্রগত অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সাধারণের নিকট গোচর করিতেছি।

বর্ত্তমান চৈত্রমাসের অদ্য ১৫ পঞ্চদশ দিবসে সূর্য্য কুম্ভরাশির মধ্য স্থলে আছে। অতএব সূর্য্য অস্ত যাওয়ার পর এক ঘণ্টা পর্য্যন্ত কুম্ভরাশি, ৩ ঘণ্টা পর্য্যন্ত মীন রাশি ও পাঁচ ঘণ্টা পর্য্যন্ত অর্থাৎ রাত্রি ১১ টা পর্য্যন্ত মেষ রাশির অবস্থান আকাশের পশ্চিমে ৩০ ও ৬০ অংশের মধ্যে দৃষ্ট হয়। সম্প্রতি এই রাশিতে শনি অবস্থিতি করিতেছে। যদি বৃষের দক্ষিণদিকের চক্ষু ও প্লায়েডিস্‌ পর্য্যন্ত এক রেখা কল্পনা করা যায় ও তাহা আরও তত্তদীর্ঘ করিয়া বর্দ্ধিত করা যায় তবে উহা আকাশের কথিত স্থলে মেষরাশিকে স্পর্শ করে। এই রাশিতে দুইটী নক্ষত্রপুঞ্জ আছে। একটী পুঞ্জের নাম অশ্বিনী ও অপরটীর নাম ভরণী। অশ্বিনী পুঞ্জে ৩টী নক্ষত্র উহাদের অবস্থানের ভাব অশ্বের মস্তকের মত ও ভরণী পুঞ্জে ত্রিকোণাকার

৩ টী নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায়। পশ্চিমাংশেরটীকে অশ্বিনী ও পূর্ব্বাংশেরটীকে ভরণী বলা যায়। এই দুই পুঞ্জে যে দুইটী অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র আছে তাহাদের একটীর নাম অশ্বী ও অপরটীর নাম যম। ইহাদিগকে ক্রমান্বয়ে ঐ দুই পুঞ্জের অধিপতি বলা যায়। আমাদের বর্দ্ধিত রেখাটী প্রথমতঃ যমকেই স্পর্শ করে, উহা হইতে আর এক হাত পশ্চিমে অশ্বী; যে নক্ষত্রপুঞ্জদ্বয় প্লায়েডিস্ ও হায়েডিস্ বলিয়া কথিত হইয়াছে তাহারা ক্রমান্বয়ে কৃত্তিকা ও রোহিণী নক্ষত্র। কৃত্তিকাতে ৬ টী ও রোহিণীতে ৫ টী নক্ষত্র আছে কৃত্তিকার আকার খুরের ন্যায় এবং রোহিণীর আকার শকটের ন্যায়। এই দুই পুঞ্জের যে দুই অধিপতি তাহাদিগের নাম অগ্নি ও ব্রহ্মা। ইহারা বৃষরাশির অন্তর্গত। বৃষের চক্ষুর্দ্বয় হইতে ক্যাষ্টর ও পলক্স পর্য্যন্তস্থল মিথুন। ইহার অন্তর্গত পশ্চিমদিকের তিনটী ক্ষুদ্র অথচ উজ্জ্বল নক্ষত্র সম্বলিত পুঞ্জ মৃগশিরা, দেখিতে হরিণের মস্তকেরন্যায়। উহার পর রত্ন সদৃশ একটীমাত্র উজ্জ্বল তারকা আর্দ্রা ও মধ্যস্থলের এবং মিথুনের সহিত স্থিত ৪টী নক্ষত্র লইয়া চতুষ্কোণাকৃতি নক্ষত্রপুঞ্জ পুনর্ব্বসু নামে কথিত। কর্কটরাশিতে কোন উজ্জ্বল নক্ষত্র নাই। ইহাতে ২টী চতুর্থ শ্রেণীর নক্ষত্র ও দুই অংশ দূরে স্বর্ণবালুকার সদৃশ বা ধূমবৎ পরিদৃশ্যমান কতকগুলি নক্ষত্র বিদ্যমান আছে।

ইহা মিথুন রাশির পূর্ব্ব দক্ষিণে। ঐ চতুর্থ শ্রেণীর নক্ষত্রদ্বয়ের নাম পশ্চিমাদিক্রমে পুষ্যা ও অশ্লেষা। গ্রীকদিগের নামানুসারে ইংরাজেরা উহাদিগকে (Presepe) প্রিসিপ্ ও আশেলি (Aselli) কহেন। অঙ্গিরা ও মরীচির মধ্যে একটী রেখা কল্পনা করিয়া বাড়াইয়া দিলে সিংহরাশির অন্তর্গত পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্রপুঞ্জকে স্পর্শ করে। পূর্ব্বফল্গুনীর প্রথমটীকে রেগুলস্ (Ragulus) ও দ্বিতীয়টীকে (Denebola) কহে। এই রেগুলস্টী প্রথম শ্রেণীর নক্ষত্র। ইহা সিংহের বক্ষঃদেশে অবস্থিত। বর্দ্ধিত রেখা ইহাকেই স্পর্শ করে। ডেনেবোলাটী লেজের দিকে। এটী দ্বিতীয় শ্রেণীর নক্ষত্র। রেগুলস্ সংযুক্ত আর চারিটী নক্ষত্র আছে। ঐ পাঁচটী দ্বারা যে পুঞ্জ হয় তাহার নাম মঘা. ইহাও একটী গৃহাকৃতি চতুষ্কোণ। মরীচি এবং অত্রিকে একটী রেখা দ্বারা যোগ করিয়া বর্দ্ধিত করিলে উহা কন্যারাশির পূর্ব্বফল্গুনীও উত্তর ফল্গুনীকে স্পর্শ করে। পূর্ব্বফল্গুনীতে ২টী নক্ষত্র আছে উহা দেখিতে খট্টার ন্যায়, উত্তরফল্গুনীতেও দুইটী নক্ষত্র আছে। ইহার মধ্যে প্রধান নক্ষত্রটী প্রথম শ্রেণীর গ্রীক্‌ভাষায় Spika Virginis কহে। ইহাকেই উক্তরেখা স্পর্শ করে। পূর্ব্বোক্ত ডেনেবোলা, পশ্চাদুক্ত স্বাতী বা Arcturus ও এই Spika এই তিনটীতে মিলিত রেখাত্রয় একটী সমবাহু ত্রিভুজ উৎপন্ন করে। স্পাইকার নিকটে

হস্তা নক্ষত্র। ইহা হস্তাকৃতি এই জন্য ইহার নাম হস্ত বা হস্তা, ইংরাজিতে ইহাকে Wheat ear of the Virgin কহে। বার্জিন স্পাইকার দক্ষিণ পূর্ব্বে যে মুক্তাসদৃশ তারাটী আছে তাহারই নাম চিত্রা। বশিষ্ঠ ও ক্রতু সংলগ্ন রেখা বর্দ্ধিত করিলে তুলারাশির অন্তর্গত স্বাতী নক্ষত্রকে স্পর্শ করা যায়, ইহাকে Arcturus কহা যায়। Arcturus গ্রীকদের বুটিস Bootes নামক নক্ষত্র পুঞ্জের অন্তর্গত প্রধান নক্ষত্র। ইহার নিকটে চারিটী ক্ষুদ্রতর উজ্জ্বল তারকায় একটী তোরণাকার পুঞ্জ আছে। তাহারই নাম বিশাখা নক্ষত্র। বোধ হয় (Draco) ড্রেকোর পশ্চিমাংশে রাষ্ট্রবান নামক পুঞ্জই বিশাখা নক্ষত্র হইবে। চিত্রা, স্বাতী ও বিশাখা লইয়া তুলারাশিকৃত হইয়াছে। তুলা রাশির পূর্ব্ব দক্ষিণে বৃশ্চিক রাশি। ইহাতে অনুরাধা ও জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র আছে, ষষ্ঠ শ্রেণীর চারিটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারকাদ্বারা নৈবিদ্যাকৃতি যে একটী পুঞ্জ হইয়াছে তাহার নাম অনুরাধা; ইহা লীরা ও রাষ্টাবানের মধ্যে আর তিনটী ক্ষুদ্র তারকাদ্বারা যে কুণ্ডলাকৃতি আর একটী পুঞ্জ আছে তাহার নাম জ্যেষ্ঠা। এই ক্ষুদ্র তারাগুলির মধ্যে জ্যেষ্ঠা তারাটীর নামেই এই পুঞ্জের নাম হইয়াছে। প্রথম শ্রেণীর ঐ জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রকে অন্তর নক্ষত্র ইংরাজিতে (Antares) কহে। জ্যেষ্ঠা বৃশ্চিকের মধ্যস্থলে অবস্থিত, ইহা লোহিত বর্ণ। তাহারও দক্ষিণ পূর্ব্ব অথবা আকাশ মণ্ডলে আমাদিগের উত্তর পশ্চিমে ধনুরাশি, ইহাতে ধনু বা সিংহপুচ্ছাকৃতি মূলা ও পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্র আছে। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পাঁচটী ও ষষ্ঠ সপ্তম শ্রেণীর ৬টী এই ১১ টী নক্ষত্র লইয়া মূলাপুঞ্জ হইয়াছে। পূর্ব্বাষাঢ়ায় চারিটী নক্ষত্র আছে তন্মধ্যে বড়টী পূর্ব্বদিকে। ইহার নাম গ্রীক্‌ভাষা অনুসারে Saggitari বলা যায়। ইহা সিগ্‌নসের উ পূ অংশে। বোধ হয় ডেল্‌ফাইনস্ পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্র হইবে। ধনুরাশির পর ৩০ অংশ মকর। ইহাতে চারিটী নক্ষত্র আছে। একটী উত্তরাষাঢ়া, ইহাতে তৃতীয় শ্রেণীর দুটী নক্ষত্র আছে, তাহার প্রধানটীকে Capricornus কহে। দ্বিতীয় অভিজিৎ ইহাতে চতুর্থ শ্রেণীর তিনটী আছে। শ্রবণাতে ত্রিপদী অর্থাৎ তেপায়ার আকৃতি তিনটা বড় উজ্জ্বল নক্ষত্র আছে এই তিনটীকে Altair, Cygni or adrided & Lyra or Vega কহে। অঙ্গিরা ও পুলস্ত্য পর্য্যন্ত রেখা বাড়াইয়া দিলে ইহা ড্রেকোর অন্তর্গত রাষ্ট্রেবন পুঞ্জের একটী বড় তারা অতিক্রম করিয়া লীরা নক্ষত্রে যায়। এই কয়টী পরস্পর রেখা যোগ করিলে একটী ত্রিভুজ হয়। আর (আকটরস) স্বাতী কৈন্দ্রধ্রুব ও ঐ লীরা দ্বারা একটী প্রকাণ্ড ত্রিভুজ অঙ্কিত করা যায়। লীরার উপর রেখা পড়িয়া যে কোণ হয় তাহা সমকোণ। লীরার(Lyra)

নিকটে দুইটী তৃতীয় শ্রেণীর ও চারিটী চতুর্থশ্রেণীর তারা আছে। পূর্ব্বোক্ত দুইটী ও শেষোক্তের আদ্যঅন্তটী এই চারিটীতে একটী সমচতুকোণ হয়। তাহার পর ধনিষ্ঠা। ইহাতে ৪টী তারা আছে। ইহার অধিপতি বসু ডেলফাইনসের প্রায় ৪০ অংশ দক্ষিণে ও আল্‌টেরায়ের ৩৫ অংশ দক্ষিণ পশ্চিমে ইহা অবস্থিত। আল্‌টেরায়ের পশ্চিমোত্তরে পঞ্চতারকা সম্বর্দ্ধিত ডেলফাইনস (Delphinus) ধনিষ্ঠার ৪টী তারা এরূপ ভাবে স্থাপিত যে উহাদিগকে একটী বালতীর (জলপাত্রবিশেষের) ন্যায় দেখায়। ধনিষ্ঠার উত্তর পূর্ব্বাংশে শতাভিষা। ইহাতে বৃত্তাকারে একশত নক্ষত্র আছে। তাহার উত্তর পূর্ব্বে পূর্ব্বভাদ্রপদ ইহাতে দুইটী মঞ্চাকৃতি নক্ষত্র আছে। তাহার উত্তরে উত্তরভাদ্রপদ (পালঙ্কাকার) দুইটী নক্ষত্র স্থাপিত আছে। উত্তর ভাদ্রপদের উত্তরপূর্ব্বে রেবতী নক্ষত্র আছে। ইহাতেও প্রায় পূর্ব্ববৎ একটী জলপাত্র বা মর্দ্দল বা মাদল আকারে ৩২ টী নক্ষত্র বিদ্যমান আছে।

সুবিধায় বুঝাইবার নিমিত্ত আমরা পরে প্রসিদ্ধ ২৮ টী নক্ষত্রের সহিত বারটী রাশির একটী তালিকা প্রদান করিব।

মধ্যাকাশের নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে ১৮টী বা ২০টী প্রথম শ্রেণীর, তাহার প্রায় তিনগুণ দ্বিতীয় শ্রেণীর, দ্বিতীয় শ্রেণীর তিনগুণ তৃতীয় শ্রেণীর, তৃতীয় শ্রেণীর তিনগুণ চতুর্থ শ্রেণীর, চতুর্থ শ্রেণীর তিন গুণ পঞ্চম ও পুনরায় পঞ্চম শ্রেণীর তিনগুণ ষষ্ঠশ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত। এইরূপে প্রায় নয় দশ হাজার তারকা জ্যোতির্ব্বিদগণের পরিচিত আছে। আমরা তন্মধ্যে এস্থলে কতক গুলির সংক্ষেপে পরিচয় দিব।

সপ্তর্ষিমণ্ডল, সাতভাইচম্পা বা সাতভেয়ে নামে প্রসিদ্ধ যে তারকা পুঞ্জ, যাহাকে গ্রীকভাষায় উর্সা মেজরিস্ (Ursa Majoris) ও তদনুসারে ইংরাজিতে উর্সা মেজর বা গ্রেট্ বেয়ার কহে ও এক্ষণে আমরা আবার যাহাকে বৃহৎ ভল্লুক কহিতেছি তাহার পরিচয় আমরা পূর্ব্বেই দিয়াছি। এক্ষণে তাহার আর একটী পরিচয় দিয়া আমরা ক্রমশ অপরাপর তারার পরিচয় দিব।

সাতভেয়ে তারা সাতটীকে উত্তর দিকে দেখিলেই চিনিতে পারা যাইবে। এই উজ্জ্বল তারাকয়টী এরূপ পর্য্যায়ে আছে যে ঐ কয়টীকে যদি একটী রেখা দিয়া যোগ করা যায় তবে ঐ যুক্তভারাবলীকে খড়্গাকৃতি বা রাঢ়দেশীয় তাঁতীর কলকাধার অথবা একটী প্রশ্ন চিহ্নের মত দেখায়। কেবল প্রশ্নচিহ্নের নিম্নদেশটুকু একটু বাঁকা বলিয়া বোধ হয়। যে তারাটী প্রশ্নচিহ্নের অগ্রভাগ হয় সেইটী ভল্লুকের লাঙ্গুলের ও অগ্রভাগ হয়। এইটীকেই সপ্তম ও অপর দিকের সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল তারাটীকে প্রথম তারা কহা গিয়া থাকে। এই

সাতটী নক্ষত্রের পৃথক্ পৃথক্ নাম সাতজন ঋষির নামানুসারে হইয়াছে। প্রশ্ন চিহ্নের আরম্ভ স্থানের উজ্জ্বল তারাটীকে প্রথম গণনা করিলে, ১ম অঙ্গিরা, ২অত্রি, ৩মরীচি, ৪পুলস্ত্য, ৫পুলহ ৬বশিষ্ঠ ও ৭ক্রতু। বশিষ্ঠের নিকট অরুন্ধতী নামে একটী ক্ষুদ্র তারা দৃষ্ট হয়। বশিষ্ঠপত্নী অরুন্ধতীর নামে ইহার নামকরণ হইয়াছে। এরূপ শাস্ত্রীয় কথাও কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে মৃত্যুর ছয়মাস পূর্ব্বে এই অরুন্ধতী নক্ষত্র দেখা যায় নাই। ফলতঃ অরুন্ধতী দর্শন দ্বারা যে চক্ষুর তেজস্বিতা প্রতিপন্ন হয় তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয় হইতে প্রথম তারা পর্য্যন্ত একটী সরল রেখা টানিলে, ও দ্বিতীয় ও প্রথম নক্ষত্র যত দূর, আর চারিগুণ ততদূর ঐ রেখা বর্দ্ধিত করিলে ঐ রেখা যে একটী নক্ষত্রের নিকট উপনীত হয় তাহারই নাম ধ্রুব বা উত্তর ধ্রুব। এই ধ্রুবই ক্ষুদ্র ভল্লুকের লাঙ্গুলস্থ শেষ তারা। ক্ষুদ্র ভল্লুকের লাঙ্গুলে তিনটী তারা ও দেহে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ২ তিনটী ও ধ্রুবের সদৃশ একটী তারা দেখিতে পাওয়া যায়। এই তারা চারিটীকে রেখা দ্বারা যোগ করিলে একটী চতুষ্কোণ আকৃতি হয়।

ক্ষুদ্র ভল্লুকের লাঙ্গুলটী যেন কেন্দ্রের খোঁটায় বাঁধা আছে ও তদবস্থায় থাকিয়া পলাইবার জন্য যেন সে তাহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে। বৃহৎ ভল্লুকের গলার দড়ী যেন কেন্দ্রের খোঁটায় বাঁধা আছে। সে ও যেন কেন্দ্রের দিকে মুখ করিয়া পশ্চাৎ দিকে হাঁটিয়া যাইবার নিমিত্ত টানা টানি করিতেছে ও তাহার চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

সপ্তর্ষি মণ্ডলের চতুর্থ ক্ষুদ্রতম নক্ষত্রটী হইতে অর্থাৎ পুলস্ত্য হইতে ঐ ধ্রুবতারা পর্য্যন্ত এক রেখা টানিয়া যদি ঐ রেখা আরও ততদূর পর্য্যন্ত টানা যায় তবে ঐ রেখা আরএকটী নক্ষত্র পুঞ্জের নিকট উপস্থিত হয়। সেই পুঞ্জের নাম কশ্যপ পুঞ্জ। গ্রীক্ ভাষায় ইহাকে (Cassiopeas) কহে। ইহার দেহেও সপ্তর্ষি মণ্ডল ও ধ্রুবপুঞ্জের দেহের ন্যায় চারিদিকে চারিটী নক্ষত্র আছে কেবল লাঙ্গুল স্থানে তিনটীর পরিবর্ত্তে দুইটী নক্ষত্র দেখা যায়। এ পুঞ্জটীও উপরিউক্ত দুই পুঞ্জের ন্যায় কেন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করে। কেন্দ্রের যে দিকে সপ্তর্ষি মণ্ডল থাকে, এই পুঞ্জটী ঠিক তাহার বিপরীত দিকে থাকে। সপ্তর্ষি মণ্ডল যদি ধ্রুব নক্ষত্রের পূর্ব্বাংশে থাকে তবে কশ্যপ তাহার পশ্চিমাংশে থাকিবে। সপ্তর্ষি মণ্ডল যদি মস্তকের উপরের দিকে থাকে, কশ্যপ অধোদিকে দৃষ্টিমণ্ডলের নিকটে অবস্থিতি করিবে।

[অত্রি ও অঙ্গিরাকে মিলিতকরিয়া যে রেখা টানা যায় তাহা উরগনামক পুঞ্জের অন্তর্গত কপিলকে স্পর্শ করে। কপিলটী প্রথম শ্রেণীর উজ্জ্বল নক্ষত্র। ইহার নিকট আর একটি ক্ষুদ্র নক্ষত্র আছে।]

অঙ্গিরা, অত্রি ও ধ্রুব যে রেখায় থাকে তাহা বর্দ্ধিত করিলে বকাস্য নামক আর একটী বৃহৎ পুঞ্জে উপনীত হয়। এই পুঞ্জেরও চারিদিকে চারিটী ও লাঙ্গূলবৎ অংশে তিনটী নক্ষত্র আছে। লাঙ্গূলবৎ অংশের শেষ নক্ষত্রটী কপিল অভিমুখে আছে। কপিলের অতিনিকটে উত্তরাংশে যে তিনটী ক্ষুদ্র নক্ষত্র আছে তাহার অনতিদূরে দক্ষিণাংশে আলগল নামে একটী অপেক্ষাকৃত বড় তারা আছে। ক্রতু ও ধ্রুবকে সংযুক্ত করিলে যে রেখা হয় তাহা বর্দ্ধিত করিলে আলগল নামক নক্ষত্রের নিকট দিয়া যায়। আলগল সমেত পূর্ব্বোক্ত তিনটী ও আরো কয়েকটী ক্ষুদ্র তারা লইয়া যে একটী পুঞ্জাংশ হয় তাহা পুরুষ নামে খ্যাত। পুরুষ পুঞ্জের দক্ষিন পশ্চিমাংশে একটু ত্রিকোণাকারে যে তিনটী উজ্জ্বল নক্ষত্র দেখা যায় ঐ তিনটী নক্ষত্র কৃত পুঞ্জাংশের নাম ইন্দ্রমেঢ্র। এই তিনটীর মধ্যে যেটী আলগলের অধিক নিকটবর্ত্তী তাহার নাম আলমাক্ তাহার পরবর্ত্তীটীর নাম মিরাক ও তৃতীয়টীর নাম আলফিরাজ আলফিরাজের বিপরীত দিকে যে নক্ষত্রটী আছে তাহার নাম মাঢ়ব; পূর্ব্ব দিক্ স্থিতটীর নাম স্কীল্ ও পশ্চিমস্থের নাম আল্‌জেনির। এই সাতটী অর্থাৎ আলগল আলমাক্, মিরাক, আলফিরাজ, মাঢ়ব, স্কীল ও আল্‌জেনিব এই কয়টী বৃহৎ নক্ষত্র ও তৎসমীপস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্র লইয়া যে একটী বৃহৎপুঞ্জ হয় তাহা দেখিতে ঠিক বকপক্ষীর আস্য অর্থাৎ মুখের সদৃশ। সেই জন্য সেই বৃহৎপুঞ্জ—বকাস্য নামে খ্যাত হইয়াছে। ইংরাজেরা ইহাকে বা ইহার অংশ বিশেষকে গ্রীক নামানুসারে পেগাসস্ (Pogasus) কহিয়া থাকেন।

কপিলের দক্ষিণে, ও পশ্চিমাস্য হইয়া দাঁড়াইলে আমাদের বাম হস্তের দিকে যে একটী সুদৃশ্য সুন্দর চতুষ্কোণ পুঞ্জ দেখিতে পাওয়াযায় তাহার নাম কালপুরুষ। গ্রীক্ ও ইংরাজী ভাষায় ইহাকে Orionis ওরায়ন্ কহে। কালপুরুষের আকৃতি পরে নক্ষত্রচক্রে প্রদর্শিত হইবে। ইহার উত্তর পূর্ব্বের দুইটী তারা যাহা সামান্য দর্শনে প্রায় পরস্পর এক গজদূরে অবস্থিত বলিয়া বোধ হয় সেই দুইটীর সমান্তরালে প্রায় চারি গজ দূরে দক্ষিণ পশ্চিমের আর দুইটী তারা আছে। এই চারিটীর ঠিক মধ্যস্থলে উত্তর দক্ষিণে সারি সারি তিনটী নক্ষত্র আছে। এই তিনটীর নীচে বা দক্ষিণাংশে আর একটী ক্ষুদ্র নক্ষত্র বালুকাকণার ন্যায় আর কতকগুলি ক্ষুদ্রতর নক্ষত্রের সহিত অবস্থান করিতেছে।

এই চতুরস্র প্রতিকৃতির উত্তর দিকে যে দুইটী তারা আছে তাহা কাল পুরুষের দুইটা হাত, দক্ষিণে যে দুইটী তারা তাহা দুই পা, দুইহাতের উপর মস্তক স্থানে যে তিনটী ক্ষুদ্র তারা আছে, তাহা তাহার মস্তক। মধ্যে যে তিনটী তারা আছে তাহা কোমারবন্ধ ও তাহার নিম্নদেশস্থ ক্ষুদ্র তারা পুঞ্জ

তাহার ঢাল বা ঝাঁটা। চতুঃকোণের নক্ষত্র কয়টীর নাম প্রতিকৃতিতে দেওয়া যাইবে। তাহার মস্তকের উপরে অর্থাৎ উহার উত্তর দিকে সারি সারি দুইটী নক্ষত্র আছে উহা মিথুন রাশির পশ্চিম সীমা। এই দুইটী বৃষের চক্ষু ও বলা যাইতে পারে। এই দুই নক্ষত্রের ঠিক মধ্য স্থলে ১০ ই।১২ ই চৈত্রে বৃহস্পতি গ্রহ উদিত হইতেন। এক্ষণে সেখান হইতে ক্রমশঃ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎপূর্ব্ববর্ত্তী হইতেছেন। এই দুই তারার উত্তরেই পূর্ব্বোক্ত কপিল অবস্থিতি করিতেছে। মিথুন রাশির পূর্ব্ব সীমায় ও দুইটী তারা আছে, ইহারা নক্ষত্র মিথুন বলিয়া কথিত হয়। ইংরাজেরা এই দুইটীকে ক্যাষ্টর ও পলক্স কহে। পুলহ ও পুলস্ত্যকে একটী রেখা দ্বারা যোজিত করিয়া ঐ রেখা বর্দ্ধিত করিয়া দিলে উহা পলক্সকে (pollux) স্পর্শ করে। কাল পুরুষের দক্ষিণ পূর্ব্বদিকের পা ও তাহার কোমর বন্ধের মধ্য তারাটী একটী রেখা দ্বারা যোজনা করিয়া ঐ রেখা বর্দ্ধিত করিয়া দিলে উহা পলক্সের সমীপবর্ত্তী ক্যাষ্টরকে স্পর্শ করে।

কাল পুরুষের উত্তর পশ্চিমাংশে দুই হাত দূরে যে দুইটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্র পুঞ্জ দেখা যায় উহা বৃষরাশির মধ্যস্থল। যে পুঞ্জটী দক্ষিণে অর্থাৎ কালপুরুষের অধিক নিকটবর্ত্তী, তাহাতে যে একটী উজ্জ্বল রক্তবর্ণ নক্ষত্র দেখা যায় তাহার নাম ব্রহ্মা। এইটী এই পুঞ্জের অধিপতি অর্থাৎ সর্ব্ব প্রধান তারা। ইংরাজিতে আরবদিগের নামানুসারে ইহাকে আলডিবারণ (Aldebaran) কহে। প্রধান তারাটী রোহিণী অর্থাৎ রক্তবর্ণা বলিয়া প্রাচীন পণ্ডিতেরা তদধিষ্ঠিত এই পুঞ্জকে ও কখন কখন সেই তারামাত্রকে রোহিণী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রোহিণীর উত্তর পশ্চিমে কৃত্তিকা। প্রাচীন গ্রীস দেশীয়েরা ইহাদিগকে যথাক্রমে হায়েডিস্ ও প্লিয়েডিস্ (Hyades and ploidos) কহিতেন। গ্রীস দেশীয়দের মধ্যে এরূপ প্রবাদ আছে যে আটলাস্ নামক পুরুষের ঔরসে ও প্লীয়নের গর্ভে হায়েডিস্ ও প্লায়েডিস্ নামে দুইটী কন্যা জন্মিয়াছিল। ইহাদের সহোদর হায়াস্ কোন বৃষ কর্ত্তৃক শৃঙ্গাহত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলে ইহারা শোকসাগরে মগ্ন হইয়া বৃষের সম্মুখে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল। দেবতারা তাহাদিগের প্রতি অনুকম্পা করিয়া স্বর্গে লইয়া গেলেন তথাপি তাহারা ক্রন্দন পরিত্যাগ করিল না। পরিশেষে ঐ বৃষকেও তাহাদের সম্মুখে আনিয়া দিলেন। এরূপ প্রবাদও আছে যে সূর্য্য ইহাদের সম্মুখীন হইলেই ইহারা অশ্রুবর্ষণ করিতে থাকে তাহাতেই বৃষ্টি হয়। ফলতঃ হায়েডিস্ যে শব্দ হইতে উৎপন্ন তাহার অর্থ বর্ষণকারী।

ক্রমশঃ—

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত।

মরুত তত্ত্ব।

যে সকল কারণে বায়ুর অবস্থান্তর উপস্থিত হয় তাহাদিগের অনুসন্ধানই এই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য।

বায়ুর ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাতে ভিন্ন ভিন্ন ঘটনা উপস্থিত হয়, ইহা হইতে ঝড়, জল, মেঘ কুজ্ঝটীকা, উত্তাপ, শৈত্য সকলই হইয়া থাকে। বায়ু উত্তপ্ত হইয়া—লঘু হইলে উপরে উঠিয়া যায় এবং তৎস্থান পূরণ করিবার জন্য তাহার চতুষ্পার্শ্ব হইতে বায়ু আগমন করে তাহাতে বায়ুর গতি অনুভব হয়। ইহা মৃদু ভাবে বহিলে অনেক সময় সুরম্য বোধ হয়! এবং প্রবল বেগে বহিলেই তাহা ঝটিকা এবং বাত্যা প্রভৃতি রূপে পরিণত হয়।

বায়ুর এক অতি আশ্চর্য্য গুণ আছে, যে ইহা সকল সময়েই বাষ্প গ্রহণ করিতে পারে। এই বাষ্পকে নানা রূপ ধারণ করিতে দেখা দেয়। যথা শিশির, কুজ্ঝটীকা. মেঘ, শীলা, বৃষ্টি ইত্যাদি ইহাদের দ্বারা এবং অন্যান্য কারণ বশতঃ বায়ুর যে অবস্থান্তর সাধিত হয় তাহার অনুসন্ধানই এই বিজ্ঞানের প্রধান উদ্দেশ্য। বায়ু কদাপি স্থির নহে সকল সময়েই চলিতেছে। যে সময়ে বৃক্ষের পত্র নিস্তব্ধ ভাবে আছে, তখনও বায়ু চলিতেছে। এতদ্ব্যতীত অনেক উপরিস্থ বায়ু পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন অভিমুখে গমন করিতেছে! এক বায়ু-স্রোত এক দিকে চলিতেছে, অপরটী—তাহার ঠিক বিপরিত দিকে বহিতেছে। কুয়াসা, বৃষ্টি, ঝড় প্রভৃতি স্বাভাবিক ঘটনা দ্বারা আবহের যে পরিবর্ত্তন হয় তাহার পর্য্যালোচনা আবহ বিজ্ঞানের অন্তর্ভূত।

বায়ু তত্ত্ব লিখিতে হইলে তৎসম্বন্ধীয় একটী আবশ্যকীয় বিষয় বর্ণনা করা অতি প্রয়োজনীয়। তদ্বিষয় একে একে নিম্নে বলা যাইতেছে।

বায়ুর বিস্তার বা বায়ুর সীমা—প্রায় ৫০ মাইল পর্য্যন্ত, বায়ু পৃথীবিকে সম্পূর্ণ রূপে বেষ্টন করিয়া আছে। বায়ুর ভার আছে. এবং ইহা স্থিতিস্থাপক গুণ বিশিষ্ট। সুতরাং যত উর্দ্ধে উঠা যায় বায়ু তত লঘু ও পাতলা Less dense বোধ হয়; অধিকাংশ বায়ু প্রায় তিন চারি মাইল মধ্যে আছে। এবং বায়ু সম্বন্ধীয় ঘটনা সকলই এই সীমার মধ্যেই হইয়া থাকে যথা মেঘ, বৃষ্টি, তুষার, ঝড় ইত্যাদি। অধিক উর্দ্ধে উঠিলে বায়ু এরূপ পাতলা ও লঘু বোধ হয় যে

শব্দের জোর হ্রাস হয়, নিশ্বাস, প্রশ্বাস কষ্ট কর হয়। এ বিষয়ে যাহারা ব্যোমযান ও উচ্চ পর্ব্বত শিখরে উঠিয়াছেন তাঁহারা অনেক প্রমাণ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

উচ্চতানুসারে বায়ুর গুরুত্ব হ্রাস হওয়া প্রযুক্ত পর্ব্বত সকলের উচ্চতা অনায়াসে নির্ণয় করা যায়। বায়ুমান যন্ত্রের Barometer অল্পভারে (Pressure) জল অল্প উত্তাপে ফুটিতে থাকে। ইহার দ্বারা উচ্চতা নির্ণয় করা যায়।

পৃথিবী হইতেই বায়ু উত্তাপ গ্রহণ করে। সূর্য্য কিরণ ইহার মধ্য দিয়া পৃথিবীর উপর আসার জন্য বায়ু অতি অল্পই উত্তপ্ত হয়। সূর্য্য কিরণে পৃথিবী উত্তপ্ত হইয়া উত্তাপ বিকীরণ করে, সেই উত্তপ্ত ভূমিসংস্পর্শে বায়ু উত্তপ্ত হয় এজন্য ভূমি হইতে কিছু উর্দ্ধে উঠিলেই বায়ুর তাপ অতিশয় হ্রাসযুক্ত বোধ হয়। এই হেতু উচ্চ পর্ব্বত সকলের চূড়া হইতে নিম্নদেশ পর্য্যন্ত চিরতুষারাবৃত থাকে। বায়ু যত উর্দ্ধে উঠে তত বিস্তৃত হয় (Expand) তজ্জন্য তাহার উত্তাপ গ্রহণ ক্ষমতা (Capacity of heat) বৃদ্ধিপায় ও উত্তাপ শোষণ করে (Absorbs) এবং (Sensible heat) বাহ্যিক উত্তাপ হ্রাস হয়। নিম্ন হইতে উর্দ্ধে উঠিলে প্রত্যেক ৩৫০ ফিটেতে ১ ডিগ্রি ফারণহিট করিয়া উত্তাপ হ্রাস হয়। সেই হেতু কিয়দ্দূর উর্দ্ধে উঠিলেই বিশেষ রূপে শৈত্য অনুভব হয়। তজ্জন্য উচ্চ পর্ব্বতের তুষারাবরণ কোন কালেই দ্রবীভূত হয় না।

বিশ্লেষণ দ্বারা জানা যায় যে বায়ু প্রধানতঃ দুইটী গ্যাস সংযোগে সম্ভূত। ইহারা রাসায়নিক ভাবে মিলিত নহে, কেবল অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন মিশ্রিত মাত্র আছে; এই দুইটী গ্যাস পরস্পর বিপরীত গুণ বিশিষ্ট; একটী দহনকার্য্য সাহায্য করে এবং প্রাণীগণের জীবন রক্ষা করে। কিন্তু নাইট্রোজেন অগ্নি নির্ব্বাণ করে এবং প্রাণীর প্রাণ নাশ করে। বায়ুতে নাইট্রোজেনের এই প্রয়োজনে দেখা যায় যে ইহা অকৃসিজেন পাতলা করিবার জন্য আছে।

ইহা ব্যতীত বায়ুতে অঙ্গারকবাষ্প উপস্থিত আছে। অনেকে দেখিয়াছেন যে কলি চূণ একটা গামলায় দ্রব করিয়া কিছুক্ষণ রাখিলে তাহা স্থির হইয়া জল পুনর্ব্বার স্বচ্ছ ও পরিষ্কার হয়, এবং এইরূপে উক্ত জল কিছুকাল বায়ু সংস্পর্শে থাকিলে জলের উপর কঠিন সরের ন্যায় জমিয়া যায়। ইহা কালসিয়ম কার্বনেট, অর্থাৎ কালসিয়ম অকৃসাইড সহ অঙ্গারকাম্ল বাষ্প মিশিয়া ইহা প্রস্তুত হয়। একশত ভাগ বায়ুতে নিম্নলিখিত পরিমাণে নাইট্রোজেন ও অকৃসিজেন থাকে।

যবক্ষারজান (Nitrogen) ৭৯
অম্লজান (Oxygen) ২১

ইহা ব্যতীত বায়ুতে এমোনিয়া মিশ্রিত আছে এবং জলীয় বাষ্প ন্যূনাধিক পরিমাণে সকল সময়েই বর্ত্তমান আছে। এই বাষ্প পরিমাণ অনায়াসে নির্ণয় করা যায়। এবং ইহারই তারতম্য হেতু আবহের নানা প্রকার ব্যতিক্রম উপস্থিত হয়; সে বিষয় পরে বিশেষরূপে প্রতীয়মান হইবে।

অন্যান্য জড়পদার্থের ন্যায় বায়ুর ও ভার আছে। একটা কাচপাত্র যাহার মুখে ষ্টপকক্ (Stopcock) আছে তাহা (Airpump) বায়ুনিষ্কাশন যন্ত্রদ্বারা নির্ব্বাত করিয়া ষ্টপকক বন্ধ করিয়া ওজন করিতে হয়। তৎপরে পুনরায় বায়ুপূর্ণ করিয়া ওজন করিলে দেখা যায় যে পূর্ব্বাপেক্ষা ভার অধিক হইয়াছে। বায়ুমাণ যন্ত্রে ৩০ ইঞ্চে ৬০ ফারন হিট, ১০০ ঘন ইঞ্চ বায়ু ওজন করিয়া দেখা গিয়াছে যে তাহা ৩০.৮২৯ ২৬গ্রেন ভারি হয়। প্রত্যেক বর্গ ইঞ্চতে বায়ুভার ১৫ পাউণ্ড এবং ইহা বায়ুমান যন্ত্রের ৩০ ইঞ্চ পারদ স্তম্ভের সহিত সমান।

বায়ু স্থিতিস্থাপকগুণ বিশিষ্ট অর্থাৎ কিয়ৎ পরিমাণে বায়ু একত্র করিয়া পেশন দিলে তাহা সঙ্কুচিত হয়, এবং চাপ অন্তরিত করিলে পুনরায় পূর্ব্বায়তন প্রাপ্ত হয়।

বায়বীয় বন্দুক এই উপায়দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে; অধিক পরিমাণে বায়ু অল্প স্থানে সঙ্কুচিত করিয়া রাখিয়া মুক্ত করিবামাত্র তাহার পূর্ব্ব আয়তন প্রাপ্ত হইতে চেষ্টা পায়, অমনি গুলি প্রবলবেগে দূরে নিক্ষিপ্ত হয়।

বায়ুর অবস্থান্তর উৎপন্ন করাইবার নিমিত্ত উত্তাপ একটী প্রধান কারণ। ইহার ন্যূনাধিক্য হেতু বায়ুর বাষ্প ভার গ্রহণের ক্ষমতা হ্রাস ও বৃদ্ধি হয়, তদ্দারা আবহের নানা প্রকার ব্যতিক্রম উপস্থিত হয়। পৃথিবীর দ্বারা যে উত্তাপ শোষিত ও বিকীর্ণ হয় তদ্বারা নানা প্রকার বায়ব্য ঘটনা উপস্থিত হয়।

উত্তাপদ্বারা প্রায় বস্তুমাত্রেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে কঠিন দ্রব্য যথা 'লৌহ, উত্তাপ দ্বারা বৃদ্ধি এবং তরল পদার্থও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এবং গ্যাস ও উত্তাপে স্ফীত হয়। বায়ু ও একটী গ্যাস সমষ্টি, সুতরাং উত্তাপে বায়ু স্ফীত হয় এবং শৈত্যে সঙ্কুচিত হয়।

উত্তাপের যে যে শক্তি দ্বারা বায়ুর অবস্থান্তর উৎপাদন করে তাহার বিষয় সংক্ষেপে কিছু বলা যাইতেছে—

১। পরিচালন (Conduction)। পরিচালকতা গুণে বস্তুর তাপ হ্রাস ও বৃদ্ধি হয়। উত্তাপ উৎপত্তি স্থান নিকটস্থ বস্তুর পরমাণু প্রথমতঃ উত্তপ্ত হয়, তৎসন্নিকটস্থ কণা উত্তাপ গ্রহণ করিয়া উত্তপ্ত হয়, তাহার পর, এইরূপে ক্রমশঃ উত্তাপ পরিচালিত হইতে থাকে যে পর্য্যন্ত না সমস্ত বায়ু

সংস্পৃষ্ট বস্তুর উত্তাপ প্রাপ্ত হয়। উত্তপ্ত বায়ু সংস্পর্শে পদার্থ সকল এইরূপে উত্তপ্ত হয়। সকল বস্তু সমান পরিচালক নহে, এবং বায়ু ও উত্তম পরিচালক নহে। একখণ্ড কাষ্ঠ এক সীমায় ধরিয়া অপর সীমা জ্বলিতে থাকিলেও হস্তে কোন প্রকার উত্তাপ লাগে না। তদ্রূপ একটী কাচের নল একটী স্পীরিট ল্যাম্পের উপর রাখিয়া দ্রব করা যাইতে পারে এবং শিখার এক ইঞ্চ অন্তরে নল ধরিয়া থাকা যায়। সুতরাং ইহা অপরিচালক। কিন্তু একটী লৌহদণ্ড এক সীমায় উত্তপ্ত হইলে অপর সীমায় হস্ত রাখা যায় না; ইহা পরিচালক। পৃথিবীর উপরিভাগস্থ স্তর অপরিচালক, তজ্জন্য অভ্যন্তরস্থ উত্তাপ উপরিভাগে আসিতে পারে না। উপরের তাপ কেবল সূর্য্য হইতে প্রাপ্ত হয়। পুনরায় গ্রীষ্মকালে বাহিরের উত্তাপ অধিক হইলেও কিছু ফিট নিম্নে কুপের বা খনির মধ্যস্থ তাপ কখন বিচলিত হয় না। অর্থাৎ পৃথিবীর বহিস্থস্তর অপরিচালক হওয়া প্রযুক্ত বাহিরের উত্তাপ ভূগর্ভে প্রবেশ করিতে পারে না। বায়ু ও তরল পদার্থের পরিচালকতা শক্তি অতি অল্প আছে—

২। Convection উত্তাপের এই শক্তির দ্বারা তরল বস্তু ও গ্যাস উত্তপ্ত হয়। কিয়ৎপরিমাণে তরল পদার্থ একটী পাত্রে রাখিয়া উত্তপ্ত করিলে, তাহার অধঃস্থলস্থ কণা সকল উত্তপ্ত হইয়া স্ফীত হয় এবং তাহার আপেক্ষিক গুরুত্বের হ্রাস হইয়া উর্দ্ধে উঠিতে থাকে এবং তৎস্থান পুরণ করিবার জন্য উপর হইতে গুরু ও শীতল কণা সকল নিম্নে আইসে এইরূপে তরল পদার্থ যতক্ষণ উত্তপ্ত হইতে থাকে কণা সকল উর্দ্ধ ও অধঃ গমন করিতে থাকে। তদ্বারা উত্তাপ বিস্তৃত হইয়া তরল পদার্থের সকল স্থানে যায়। বায়ুও এই নিয়ম দ্বারা উত্তপ্ত হয়। এই নিয়ম দ্বারা উষ্ণকটিবন্ধস্থ সমুদ্র জল উত্তপ্ত হইয়া লঘু হয়। এবং উপরে উঠে তজ্জন্য কেন্দ্র দ্বয় হইতে জলবিষুবরেখাভিমুখে স্রোত দ্বারা আইসে এবং উপরিভাগের উত্তপ্ত জল কেন্দ্রাভিমুখে গমন করে। শীত প্রধান দেশের বায়ু এই স্রোত সংস্পর্শে উষ্ণ হইয়া শৈত্যের আধিক্যতা হ্রাস করে। Gulf of stream দ্বারা এইরূপে বহুদূর পর্য্যন্ত উষ্ণতা বিস্তৃত হয়।

বিকীরণ (Radiation) উত্তাপের এই নিয়ম দ্বারাও বায়ুর অবস্থান্তর উৎপাদিত হইয়া থাকে। কোন পদার্থ পার্শ্ববর্ত্তী পদার্থ অপেক্ষা অধিক উত্তপ্ত হইলে ইহা হইতে উত্তাপ বহির্গত হইয়া নিকটস্থ পদার্থ সকলে যায় ইহাকে বিকীরণ কহে (Radiation) সূর্য্য কিরণে পৃথিবী এই নিয়ম দ্বারা উত্তপ্ত হয়। বায়ু একবারে সূর্য্য কিরণে উত্তপ্ত হয় না। সূর্য্য কিরণে পৃথিবী উত্তপ্ত হইয়া সেই উত্তাপ বিকীর্ণ হইতে থাকে, তাহাতে আমরা উত্তাপ অনুভব করিতে পারি, এবং

বায়ু ও উত্তপ্ত হয়। একটা লৌহদণ্ড উত্তম রূপে উত্তপ্ত করিয়া কিছুকাল রাখিলে তাহার উত্তাপ হ্রাস হইয়া আইসে অর্থাৎ উত্তাপ বিকীর্ণ হয়। এই নিয়ম হইতে রাত্রিকালীন বায়ু শীতল হইয়া তাহা হইতে শিশির উৎপন্ন হয়। ইহার বিষয় পুনর্ব্বার স্থানান্তরে ভাল রূপে বলা যাইবে। উত্তাপ শোষণ। পদার্থের নিজ শরীর (Omass) মধ্যে উত্তাপ গ্রহণ করিবার ক্ষমতাকে শোষণ ক্ষমতা বলা যায়।—যে পদার্থ যে পরিমাণে উত্তাপ শোষণ করিতে পারে সেই পরিমাণে উত্তাপ বিকীরণ করিতে পারে। উত্তাপ প্রতি নিক্ষেপ (Reflection of heat) কোন কোন পদার্থে উত্তাপ প্রদান করিলে সেই উত্তাপ সমস্ত তাহার অন্তরে প্রবিষ্ট না হইয়া তাহা হইতে প্রতি নিক্ষিপ্ত হয়। আলোক যেরূপ নিয়মে দ্রব্য বিশেষ হইতে প্রতি ফলিত হয় উত্তাপও সেই নিয়মের বশীভূত। আলোক যেরূপ উজ্জ্বল ধাতু প্রতিফলক (Reflector) হইতেপ্রতিনিক্ষিপ্ত হয়, উত্তাপও তদ্রূপ হইয়া থাকে। কোন কোন দীপশিখার পশ্চাদ্ভাগে উজ্জ্বল প্রতিফলক দেওয়া থাকে, তদ্দ্বারা আলোক শোষিত না হইয়া বরং প্রতি নিক্ষিপ্ত হয় এবং তজ্জন্য অধিক বলিয়া বোধ হয়।

আলোক কিরণ যেরূপ গোলাকৃতি খোন্দল বিশিষ্ট (Concave mirror, reflector) হইতে প্রতি নিক্ষিপ্ত হয়, উত্তাপ কিরণ ও তদ্রূপ হয়। যথা দুই খানি (Concave reflector) পরস্পর কিছু দূরে রাখিয়া যদি তাহার একটীর ফোকসে (Focus) উত্তাপ ও আরক্ত বর্ণ একটা লৌহ বর্ত্তুল রাখা যায় এবং অপর Reflector ও ফোকসে যদি কিছু বারুদ বা গানকটন (Guncotton) রাখা যায়, তাহা হইলে উত্তাপ প্রতি নিক্ষিপ্ত হইয়া বারুদ বা গানকটন প্রজ্জ্বলিত করে।

এই উদাহরণে বারুদ বা গনকটন পরিবর্ত্তে যদি একটী তাপমান যন্ত্র রাখা হইত তাহা হইলে তাহার তাপ বৃদ্ধি হইত এবং পারদ স্ফীত হইয়া ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকিত। পথে চলিবার সময় কোন দেওয়ালে রৌদ্র পড়িলে, তাহার নিকট দিয়া যাইতে হইলে, তৎসাময়িক উত্তাপ অপেক্ষা অধিক উত্তাপ অনুভব করা যায়। তজ্জন্য পরে বলা হইবে যে তাপমান যন্ত্র সন্নিবেশ কালে, কোন দেওয়ালের নিকট বা উপর যেন না রাখা হয়। কারণ তদ্দ্বারা প্রকৃত উত্তাপ পরিমাণ পাওয়া যায় না। অল্প উত্তাপ শোষক বস্তু মাত্রেই অধিক উত্তাপ প্রতি নিক্ষেপ করে। এবং যে সকল অধিক উত্তাপ প্রতিনিক্ষেপ করে তাহারা অল্প উত্তাপ শোষণ করে। এবং অল্প প্রতিনিক্ষেপ ক্ষমতা থাকিলে অধিক উত্তাপ শোষণ ক্ষমতা থাকে। সকল পদার্থে সমান রূপে উত্তাপ শোষণ বা প্রতিনিক্ষেপ সমান রূপে হইতে পারে না। ভিন্ন ভিন্ন বস্তুতে ভিন্ন ভিন্ন রূপে হইয়া থাকে। ভূষা (Lamp black) ও হোয়াইট

লেড রঙ (White lead) সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে উত্তাপ শোষণ করে এবং এই দুই পদার্থ সর্ব্বপেক্ষা অধিক বিকীরণ করিতে পারে। পরিষ্কৃত পিত্তল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে উত্তাপ কিরণ প্রতি নিক্ষেপ করে। এবং ভুষা সকল অপেক্ষা অল্প। যে পদার্থের উপরিভাগ যত মসৃণ ও পরিষ্কার করা (Polished) তাহা অধিক পরিমাণে উত্তাপ প্রতিনিক্ষেপ করে। এবং তজ্জন্য শোষণ ও বিকিরণ ক্ষমতা হ্রাস হয়। উত্তাপের গতি অনুসারে শোষণের তারতম্য হইয়া থাকে। কিরণ যদি লম্বভাবে পতিত হয় তবে অধিক উত্তাপ শোষিত হয়। কিন্তু বক্রভাবে পতিত হইলে অধিক উত্তাপ শোষিত হয় না এই হেতু গ্রীষ্ম কালে উত্তাপ অধিক প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং শীতকালে উত্তাপ অনেক অল্প বোধ হয়। সূর্য্যের গতি অনুসারে এইরূপ হয়।

আপেক্ষিক—উত্তাপ। সমান ওজনের দুইটীভিন্ন ভিন্ন পদার্থ সমান তাপ যুক্ত দুইটী একপ্রকার পাত্র মধ্যে রাখিয়া যদি এক সময়ে সমান ভাবে উত্তপ্ত করা হয় অর্থাৎ একটী শিখার উপর রাখা হয় অথবা অগ্নি সংস্পর্শে রাখা হয় তবে অল্প সময় মধ্যে দেখা যায় যে তাহাদের তাপ পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন হয়। পারদ জল অপেক্ষা অধিক উষ্ণ হইবে। এই পরীক্ষাতে দেখা যায় যে উভয় পদার্থ সমান উত্তাপ প্রাপ্ত হইল, কিন্তু যে উত্তাপে পারদ কোন নির্দ্দিষ্ট ডিগ্রি উত্তপ্ত হইবে, তাহাতে জল তদপেক্ষা অনেক অল্প ডিগ্রি উত্তপ্ত হইবে। পারদকে এক ডিগ্রি পরিমাণে উত্তপ্ত করিতে হইলে যে উত্তাপের আবশ্যক, জলকে তৎপরিমাণে উত্তপ্ত করিতে হইলে তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে উত্তাপের আবশ্যক। পরন্তু, পারদ ও জল উভয়কেই ১০০ ডিগ্রি পরিমাণে উত্তপ্ত করিয়া শীতল হইতে দিলে, জল পারদ অপেক্ষা অধিক সময়ে শীতল হইবে। এবং শীতল হইবার সময় পারদ সমান তাপ প্রাপ্ত জল পারদ অপেক্ষা অধিক উত্তাপ ত্যাগ করে। ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর আপেক্ষিক উত্তাপ ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ বিশিষ্ট, অর্থাৎ আপেক্ষিক-উত্তাপ গ্রহণ শক্তি পদার্থ বিশেষে পৃথক পৃথক হইয়া থাকে। পারদের এই শক্তি অতি অল্প এই জন্য ইহা তাপমান যন্ত্র নির্ম্মাণে ব্যবহৃত হয়। ইহা অল্প উত্তাপেই বিচলিত হয়।

এই উত্তাপ গ্রহণ শক্তির নির্ণয় করিতে হইলে জলের আপেক্ষিক উত্তাপের সহিত অন্য বস্তুর উত্তাপের তুলনা করিতে হয়। যথা শিশের (Lead) আপেক্ষিক উত্তাপ 0.0৩১৪ অর্থাৎ যে উত্তাপে নির্দ্দিষ্ট পরিমিত এক খণ্ড শিশধাতু ১ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড উত্তপ্ত হইবে, সেই উত্তাপে জল 0.0৩১৪ উত্তপ্ত হইবে।

পদার্থ	আপেক্ষিক উত্তাপ
জল	১. 00000
টারপিন তৈল	0. ৪২৫৯০
অঙ্গার	0. ২৪১১১
গন্ধক	0. ২০২৫৯
হীরক	0. ১৪৬৮৭
লৌহ	0. ১১৩৭৯
রৌপ্য	0. ০৫৭০১
স্বর্ণ	0. ০৩২৪৪

লুপ্ত উত্তাপ (Latent Heat) একটা পাত্রে এক খণ্ড বরফ রাখিয়া যদি উত্তাপ দেওয়া যায় (এই বরফের তাপ পরিমাণ ৩২° ফারণহিট) তাহা হইলে তৎক্ষণাৎই বরফ দ্রব হইয়া জল হয় না, কিন্তু সময়ের আবশ্যক হয়। অর্থাৎ বহুল পরিমাণে উত্তাপ বরফ মধ্যে প্রবেশ করিলে পর ৩২° তাহা দ্রব হইয়া জল হয়, এবং জলেরও উত্তাপ ৩২° ডিগ্রি পরিমাণ) এইরূপে অধিক উত্তাপ প্রাপ্ত হইলেও ইহার তাপ পরিমাণ বৃদ্ধি হয় না, কেবল মাত্র কঠিন অবস্থা হইতে দ্রব হয়। এই উত্তাপকে লুপ্ত উত্তাপ বলা যায়, কারণ ইহার দ্বারা পদার্থের উত্তাপ বৃদ্ধি হয় না, এবং এই তাপ তাপমান যন্ত্র দ্বারা পরিমাণ করা যায় না, উদাহরণ দ্বারা কহা যায়। তাহা এই সঙ্কেতে লেখা হয় ৩২° জল = ৩২° বরফ + লুপ্ত উত্তাপ পদার্থ মাত্রেই কঠিন অবস্থা হইতে তরলতা প্রাপ্ত হওন কালে এইরূপে অর্থাৎ লুপ্তভাবে উত্তাপ গ্রহণ করিয়া থাকে। পুনরায় এই সকল পদার্থ কঠিন হইলে উত্তাপ ত্যাগ করিয়া থাকে। ইহাকে দ্রব হওনের লুপ্ত উত্তাপ কহে। কঠিন পদার্থ তরল অবস্থায় থাকিবার জন্য এই উত্তাপের আবশ্যক।

ক্রমশঃ—

শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

——o——

তত্ত্ব সংগ্রহ।

লেবুর রস বহুকাল রাখিবার উপায়—লেবুর রস বহুকাল উত্তমাবস্থায় রাখিবার ইচ্ছা করিলে প্রথমতঃ ঐ রস ফেরেনহিটের ১৫০ অংশ পরিমিত তাপে তাপিত করিতে হইবে; তদনন্তর ঐ অবস্থায় রস বোতলে পুরিয়া বোতল হইতে সম্পূর্ণ রূপে বায়ু বহিষ্করণ পূর্ব্বক বোতল উত্তমরূপে আঁটিয়া ফেলিবে; শীতকালই ইহার উত্তম সময়।—ফারমেকিউটিকাল্ জরন্যাল।

১৮৮২ সালের মহাধূমকেতু—ওয়াসিঙ্গটনের বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্ প্রোফেসর ফ্রিসবী (Frisby) গণনা দ্বারা স্থির করিয়াছেন, যে উক্ত ধূমকেতু এক সুদীর্ঘ বৃত্তাভাসকক্ষে (Elliptical orlit) সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে; সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করিতে উহার ৭৯৩ বৎসর লাগিয়া থাকে; সূর্য্যের সমীপতম হইলে উহা সূর্য্য হইতে ৭ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থান করে, এবং যখন দূরতম স্থানে গমন করে, তখন তাহার সূর্য্য হইতে দূরত্ব, সূর্য্য হইতে পৃথিবীর দূরত্বের ৯০ গুণ হইয়া থাকে। থোলন্ (Thollon) ও গাউ (Gouy) নামক পণ্ডিতদ্বয় আলোকবিশ্লেষণ যন্ত্র (Spectroscope) দ্বারা উক্ত প্রকাণ্ড ধূমকেতুর আলোকের পরীক্ষা করিয়াছেন; তাঁহারা ধূমকেতু সম্বন্ধে প্রাচীন তাড়িত সম্বন্ধীয় মতেরই (Electric theory) পোষকতা করেন।

ডাক্তার টাউন সেণ্ড বলেন যে দুগ্ধ স্তন্যপায়ী জীবদিগের স্বাভাবিক আহার; শুদ্ধ দুগ্ধ পান করিয়া যে আমরা জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হই, এরূপ নহে। দুগ্ধ পান করিলে শরীরের সর্ব্বাংশ সম্যক্ বর্দ্ধিতও হয়। স্বভাবের ক্ষমতার দ্বারা রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে; যিনি যে পরিমাণে স্বভাবকে সাহায্য করিতে পারেন, তিনি সেই পরিমাণে সুচিকিৎসক। আমাশয় রোগে নূতন তক্রই উত্তম ঔষধ; রোগী, গোবৈদ্যের বিষময় ঔষধ সেবন ত্যাগ করিয়া শান্তভাবে অবস্থান করিলেই রোগ আরোগ্য হইবে। বসন্তরোগে ও রক্তজ্বরে (Scarlet fever) শরীরে পুনঃ পুনঃ অলিভ্‌তৈল (Olive) মর্দ্দন করিলে মহৎ উপকার হইয়া থাকে। শরীরে তৈলমর্দ্দনে উপকার ব্যতীত অনিষ্ট নাই। সাহেবীভূত পরিত্যক্ত-তৈল-

মর্দ্দনকারী বাবুরা সাহেবকে তৈলমর্দ্দনের গুণ ব্যাখ্যা করিতে দেখিয়া না জানি কি বলিবেন।

বিজ্ঞানের উন্নতি সহকারে যতই উত্তম উত্তম যন্ত্রের ব্যবহার প্রচলিত হইতেছে ততই অল্প মনুষ্যের দ্বারা অধিক কার্য্য অল্প সময়ে সম্পন্ন হইতেছে। এ্যাটকিন্‌সন্ সাহেব বলেন যে সমস্ত ইউনাইটেড্-ষ্টেটে যত বস্ত্র ব্যবহৃত হয়, তাহা প্রস্তুত করিতে একলক্ষ বাইট্‌হাজার—পুরুষ, স্ত্রীলোক ও বালক নিযুক্ত আছে। ঐ কার্য্য পূর্ব্বব্যবহৃত মাকু দ্বারা সম্পন্ন হইতে হইলে ১৬ কোটী লোককে দিন দশ ঘণ্টা করিয়া পরিশ্রম করিতে হইত।

সমুদ্র তরঙ্গের উচ্চতা —উত্তর আটলাণ্টিক মহাসাগরের তরঙ্গমালা সচরাচর ২৪ হইতে ৩০ ফিট উচ্চ হইয়া থাকে; উত্তর মহাসাগরে কখন কখন ৪৩ ফিট উচ্চ ঢেউও দেখা গিয়াছে। প্রশান্ত মহাসাগরের তরঙ্গ ৩২ ফিট উচ্চ হয়। দক্ষিণ আটলাণ্টিকের তরঙ্গের উচ্চতা ২২ফিট; তরঙ্গের উচ্চতা ভূমধ্যসাগরে ১৪ $\frac{১}{২}$ ফিট, অর্ম্মণসাগরে ১৩$\frac{১}{২}$ এবং বিস্কে উপসাগরে ৩৬ ফিট পর্য্যন্ত তরঙ্গ হইয়া থাকে।

ভিওে ও স্ক্যামবেক্ নামক দুইজন বিজ্ঞানবিৎ কাষ্ঠে মাখাইবার একপ্রকার রঙ্গ প্রস্তুত করিয়াছেন; ঐ রঙ্গ মাখাইলে কাষ্ঠ অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইবে না। ঐ রঙ্ গৃহের কড়ি, বরগায়, গবাক্ষ ও কবাটে মাখাইলে গৃহে অগ্নি লাগিবার অতি কম্ সম্ভাবনা। ঐ রঙ নিম্নলিখিত উপায়ে প্রস্তুত করিতে হয়; ২০ ভাগ উত্তমচূর্ণ কাচ, ২০ ভাগ চূর্ণ চিনামাটি (Porcelain) ২০ ভাগ চূর্ণপ্রস্তর (যে কোন প্রস্তর হইলেই হইবে) এবং ১০ ভাগ চূর্ণ চূণ (Calcined-lime) জলে ভিজাইয়া অতি উত্তমরূপে ৩০ ভাগ Selicate of soda সহিতমিশ্রিত কর; এই মিশ্রিত পদার্থ কাষ্ঠে লাগাইলে কাষ্ঠ অগ্নির হস্ত হইতে নিস্তার পাইবে। গুঁড়া অতি উত্তমরূপ হওয়া চাই এবং চালুনীর দ্বারা ছাঁকিয়া লইলে আরো ভাল হইবে। উক্ত পদার্থ রঙের সহিত মিশ্রিত করিয়া মাখাইলে ক্ষতি নাই। এই রঙ্ বুরুশের দ্বারা অতি পরিষ্কাররূপে কাষ্ঠের গায়ে লাগাইতে হইবে, প্রথমবার লাগাইবামাত্রই শুষ্ক হইবে; ৬ ঘণ্টার পরে দ্বিতীয় বার লাগাইবে; তাহা হইলেই যথেষ্ট হইবে। উক্ত মসলার কোনটীর পরিমাণ বদলাইলে অথবা একটির পরিবর্ত্তে অন্য একটী দ্বিগুণ পরিমাণ ব্যবহার করিলেও চলিতে পারে; কিন্তু Selicate of sodaর পরিমাণ ঠিক রাখিতে হইবে এবং চূণের পরিবর্ত্তে অন্য কিছু ব্যবহার করিলে চলিবে না। Sci entific American

সূর্য্য।

"Thou sun of this great world both eye and soul,
Acknowledge him thy greater ; sound his praise
In thy eternal course................................"

Milton.

" কে করিল, দিবাকর ! রচনা তোমার,
স্থাপিল কে তোমায় সৌর জগৎ-কেন্দ্রে ?
কি আশ্চর্য্য তব জ্যোতি ! নাশিছে ভব-তিমিরে ;
অহ ! এই জ্যোতি কোন্ জ্যোতির জ্যোতি ?
গ্রহ উপগ্রহ কত, নিয়ত দুর্লক্ষ্য বেগে,
তোমার প্রকাণ্ড মূর্ত্তি করিতেছে প্রদিক্ষণ।
কে করিল এ বিধান ? বল কোথা সে বিধাতা ?
অচিন্ত্য তাঁর শকতি, সীমা কে জানে ? "

কৃষ্ণ চন্দ্র মজুমদার।

জ্যোতিস অতি প্রাচীন শাস্ত্র ; ইহার চর্চ্চা অতি প্রাচীনকাল হইতে মানবজাতির মধ্যে আরম্ভ হইয়াছে ; বেদের প্রাচীনতম অংশেও আর্য্যঋষিদিগের জ্যোতিষ বিজ্ঞান পর্য্যালোচনার বহুল প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। মনোবিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতেরা বলেন, যে কৌতূহল মানবের মনে স্বতঃই উদিত হয় ; এই স্বভাবজা জ্ঞানলিপ্সা অজ্ঞানপ্রসূতা হইলেও জ্ঞানের একমাত্র জনয়িত্রী। সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্রাদির উদয়াস্ত গমন মাতৃক্রোড়স্থ শিশুরও মনে কৌতূহল উৎপাদন করিয়া থাকে ; অতএব গগনপরিভ্রমণশীল জ্যোতিষ্কগণ যে মানবের নবোদিত চিন্তাশক্তির বিষয়ীভূত হইয়াছিল, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। সূর্য্য উক্ত জ্যোতিষ্কদিগের মধ্যে দেখিতে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং উহার তেজঃ ও আলোক এই পৃথিবীর উত্তাপ ও আলোকের একমাত্র প্রধান কারণ ; অতএব আদিমমানব অবশ্যই সূর্য্যের উপকারিতা অনেকাংশে অনুভব করিয়াছিল ; তাহার কল্পনা প্রবল মন আদিত্যের প্রচণ্ড উত্তাপ ও নেত্রপ্রতিঘাতিনী প্রভা সন্দর্শন করিয়া তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া নির্দ্দেশ করিল। কালসহকারে প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বেত্তাগণ উক্ত কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধীয় বিবিধতত্ত্ব আবিষ্কৃত করিলেন।

কিন্তু দূরবীক্ষণ যন্ত্র সৃষ্টির পূর্ব্বে সূর্য্যচন্দ্রাদির উপরিভাগ, প্রাকৃতিক অবস্থা প্রভৃতি বিষয় অতি অল্পই আবিষ্কৃত হইয়াছিল। সূর্য্য চন্দ্র সম্বন্ধীয় অদ্ভুত দৃশ্যাবলী ও উহাদের প্রাকৃতিক অবস্থা সম্বন্ধীয় তত্ত্ব সকল গত শতাব্দী হইতে আবিষ্কৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এই সকল লোমহর্ষণ ব্যাপারের বিষয় পাঠ করিলে প্রীত ও চমৎকৃত হইতে হয়; আমাদের এই পৃথিবীকে অসীম গগনসাগরে একমাত্র জলবুদ্বুদ অপেক্ষাও ক্ষুদ্র বলিয়া প্রতীয়মান হয়; মন সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের অননুভবনীয় ক্ষমতার বিকাশ দর্শনে বিমোহিত এবং হৃদয় ভক্তিরসে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। প্রাচীন ও ইদানীন্তন বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণের দ্বারা আবিষ্কৃত সূর্য্য সম্বন্ধীয় প্রধান প্রধান তত্ত্বসমূহের সংক্ষেপ বর্ণনা করিতে এক্ষণে আমরা প্রবৃত্ত হইলাম।

সূর্য্য নক্ষত্র হইতে বিভিন্ন পদার্থ নহে; পরন্তু সূর্য্য আমাদিগের সর্ব্বাপেক্ষা সমীপস্থ নক্ষত্র বিশেষ। অন্যান্য নক্ষত্রাপেক্ষা অনেক নিকটে অবস্থিত বলিয়া সূর্য্যকে অত বৃহৎ দেখায়; বস্তুতঃ সূর্য্য সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ নক্ষত্র নহে; সূর্য্যাপেক্ষা বৃহদাকার অনেক নক্ষত্র দৃষ্ট হইয়াছে। সূর্য্য অন্যান্য নক্ষত্রের অপেক্ষা অনেক নিকটে থাকিলেও উহা পৃথিবী হইতে ৯ কোটি ২০ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত। সূর্য্য অতি প্রকাণ্ড,গোলাকার জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ; উহার ব্যাস প্রায় ৮ লক্ষ ৫০ হাজার মাইল দীর্ঘ। সূর্য্যের মাধ্যাকর্ষণশক্তি পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণশক্তির সপ্তবিংশতি গুণেরও অধিক। যদি কোন বস্তু সূর্য্যমণ্ডল হইতে এরূপ বেগে নিক্ষেপ করা যায় যে, তাহা প্রতি সেকেণ্ডে ৩৭৮ বা ততোধিক মাইল গমন করিতে পারে, তাহা হইলে উক্ত বস্তু সূর্য্যের আকর্ষণশক্তি অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিবে। ইহা অপেক্ষা উহার বেগ ন্যূন হইলে উক্ত পদার্থ সূর্য্যমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিতে থাকিবে; এবং যদি কোন বস্তু সূর্য্যমণ্ডল হইতে এরূপ বেগে উৎক্ষিপ্ত করা যায়, যে তাহা প্রতি সেকেণ্ডে ২৬৮ মাইলের অধিক যাইতে পারে না, তাহা হইলে ঐ বস্তু সূর্য্যের আকর্ষণে উহার উপরিভাগে পতিত হইবে। সূর্য্যের উপরিভাগ সমতল নহে; উহা অত্যন্ত বন্ধুর এবং ক্রমান্বয়ে উন্নতাবনত। সূর্য্যমণ্ডলে ধাতু সকল অত্যন্ত তাপপ্রভাবে বাষ্পীয় ও তরল আকার এবং বাষ্প সকল তরল ও কঠিন আকার ধারণ করিয়াছে। স্পেকট্রস্কোপ (Spectroscope) যন্ত্রদ্বারা আলোক পরীক্ষা করিয়া ইউরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদগণ স্থির করিয়াছেন যে, পৃথিবী যে যে পদার্থে নির্ম্মিত, সূর্য্য ও অন্যান্য নক্ষত্রে প্রায় সেই সেই পদার্থ বাষ্পীয় আকারে বিদ্যমান আছে। লৌহ, সোডিয়ম্, উদজান্, ম্যাগ্নিসিয়াম্, তাম্র দস্তা প্রভৃতি পদার্থ সূর্য্যে প্রচুর পরিমাণে আছে। উক্ত যন্ত্রদ্বারা সূর্য্যে, স্বর্ণ, রৌপ্য

প্রভৃতি মহামূল্য ও গুরুধাতু সকলের সত্বার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না; কিন্তু এতদ্বারা ইহা সপ্রমাণ হইতেছে না যে সূর্য্যে ঐ সকল ধাতু নাই; বোধ হয় ঐ সকল ধাতু অত্যধিক আপেক্ষিক গুরুত্ব নিবন্ধন, অন্যান্য বায়বীয়ধাতুর নিম্নে সূর্য্যের ঠিক উপরিভাগে বিদ্যমান আছে, সেই নিমিত্ত আলোকে তাহাদের সত্বার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। সূর্য্য হইতে বর্ষে বর্ষে যে তাপ অসীম স্থানে বিকীর্ণ হয়, তাহার কেবল $\frac{১}{২১৩৮০০০০০০}$ অংশপৃথিবী কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হয়; ইহা হইতে সূর্য্যের তাপপরিমাণ অনুমান করা যাইতে পারে। সূর্য্যের উপরিভাগ অত্যন্ত দীপ্তিবিশিষ্ট; মনুষ্যকৃত কোনও আলোকের সহিত তাহার কিঞ্চিন্মাত্রর তুলনা হয় না। সূর্য্যের জ্যোতি একরূপ দীপ্তিবিশিষ্ট নহে; কোন কোন নক্ষত্রে জ্যোতির ন্যায় উহার জ্যোতিরতারতম্য হইয়া থাকে।

চন্দ্রে কলঙ্ক আছে, ইহা আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই অবগত আছেন; কিন্তু সূর্য্যে কলঙ্ক আছে, ইহা বোধ হয়, অনেকেই বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহেন। গ্যালেলীও হইতে বর্ত্তমান কালের জ্যোতির্ব্বিদ্ পর্য্যন্ত সকলেই একবাক্যে বলেন যে সূর্য্যে অনেক কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ দৃষ্ট হয়; দূরবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা দৃষ্টি করিলে অতিবেগে সঞ্চরমান মেঘমালার ন্যায় অনেক কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ স্থানে স্থানে সূর্য্যের উপরিভাগে দৃষ্ট হইয়া থাকে। সার জনহর্শেল বলেন যে এই কলঙ্ক গুলিকে প্রায়ই দুইটী নির্দ্দিষ্ট মণ্ডলের মধ্যে নিবদ্ধ দেখা যায়; ঐ দুই মণ্ডল সূর্য্যের বিষুবরেখার উভয় পার্শ্বে ৩৫ অংশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত; কিন্তু সূর্য্যের বিষুব রেখার উভয়পার্শ্বে ৮ অংশ পর্য্যন্ত স্থানে কোন কলঙ্ক দেখা যায় না। একনির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই কলঙ্ক সকলের ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে; এই নির্দ্দিষ্ট সময় ১১ $\frac{১}{১০}$ বৎসর; এই সময়ের মধ্যে সৌরকলঙ্ক ন্যূনতম হইতে অধিকতম হইয়া থাকে। এই পরিমিত সময়ের মধ্যে পৃথিবীর চৌম্বুকাকর্ষণের ও নির্দ্দিষ্ট পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে; বোধ হয় ইহাদের মধ্যে কোন কার্য্যকারণ সম্বন্ধ আছে। এই কৃষ্ণবর্ণ দাগ সকল অতিশয় বৃহৎ; ক্ষুদ্রতমগুলির বর্গফল ৫০০০০ মাইলের কম নহে; এই সকল বৃহদাকার কলঙ্কের আবির্ভাব আকার পরিবর্ত্তন ও তিরোভাব অতি অল্প সময়ের মধ্যে হইয়া থাকে; বলিলে আশ্চর্য্য বোধ হইবে যে ৫০০০০ মাইল ক্ষেত্রফলযুক্ত কলঙ্ক নিমেষ মধ্যে উদিত বা তিরোহিত হইতে দেখা গিয়াছে। যাহা হউক এই কলঙ্কগুলি কি, ইহাদের উৎপত্তির বা কারণ কি এ বিষয়ে জ্যোতির্ব্বিদগণ একমত নহেন।

কেহ বলেন এগুলিন সূর্য্য মণ্ডলস্থ মেঘমালা; কাহারমতে এগুলি গুহাদ্বারব্যতীত আর কিছুই নহে, অন্য একজনের মতে ওগুলি সূর্য্যের কঠিন উপরিভাগ, ভয়ঙ্কর সৌর্য্যবাত্যার প্রভাবে সৌর্য্য বায়ু স্থানান্তরিত হইলে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

সূর্য্যে উপরিউক্ত কৃষ্ণবর্ণ স্থান গুলির ন্যায়, কতকগুলি অতি উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ রেখা দৃষ্টহয়; এবিষয়েও জ্যোতির্ব্বিদ দিগের মতের ঐক্যতা নাই; কেহ কেহ বলেন যে এই শ্বেতবর্ণ রেখাগুলি উন্নত প্রদেশ বা পর্ব্বত শৃঙ্গ। সার্ জনহর্ষেল এই সকল মার্গগুলিকে একাকৃতি দেখিয়া অনুমান করেন, যে এ সকল সূর্য্য মণ্ডলবাসী বিরাট মূর্ত্তি প্রাণিবিশেষ এবং ইহাদের হইতেই সূর্য্যের আলোক ও তেজনিঃসৃত হয়। ঐ শ্বেত রেখাগুলি দৈর্ঘ্যে সহস্র মাইলের নূ্যন নহে; উহাদের বিস্তার এক শত হইতে দুই শত মাইল পর্য্যন্ত হইয়া থাকে; এরূপ বৃহদাকার এবং সূর্য্যের তাপ ও প্রভার মূলকারণ, প্রাণী যে কিরূপ, তাহাদের কার্য্য কলাপ ও বুদ্ধিবৃত্তিই বা কিরূপ, এসকল আমাদের কল্পনার বহির্ভূত। কিন্তু ইহাও বলা আবশ্যক যে ঐ শ্বেতরেখাগুলি প্রাণিবিশেষ, তাহার কোন বলবৎ প্রমাণ নাই, এবং তাহা অনুমান অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান বলিয়া বোধ হয় না। কোন কোন স্থলে ঐ শ্বেত রেখাগুলি এরূপভাবে অবস্থিত, যে তাহাদিগকে বৃক্ষবিশেষের পত্রের ন্যায় দেখায়; এরূপ অবস্থাপন্ন শ্বেতরেখাগুলিকে ন্যাস্ মিথ্ ' উইলোপত্র (Willow leaves) এই আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। সার্ উইলিয়ম্ জোন্সের মতে সূর্য্যের বায়ু দ্বিবিধ; একটী উজ্জ্বল, অন্যটি স্বচ্ছ; সূর্য্যের বায়ু নানাবিধ তরল ও বাষ্পীয় পদার্থে গঠিত। সূর্য্য হইতে ১৮৪৩ মাইল উর্দ্ধে এবং ২৭৬৫ মাইলের—নিম্নে নিবিড় মেঘমালাদৃষ্ট হয়। সূর্য্যের অভ্যন্তর ভাগ কঠিন বা তরল পদার্থ নির্ম্মিত। সচরাচর সূর্য্যে যে যে স্থানে কলঙ্ক দৃষ্ট হইয়া থাকে, সেই সেই স্থানেই প্রায় ভয়ঙ্কর বাত্যা ও ঘূর্ণবায়ুদ্বারা নিরন্তর আলোড়িত হইয়া থাকে; উহাদিগের বেগ অতিশয় ভয়ঙ্কর ও অলৌকিক; সচরাচর, সেকেণ্ডে ৪০ হইতে ৫০ মাইল বেগে প্রবাহিত হয় এবং সময়ে সময়ে সেকেণ্ডে ১২০ মাইল পর্য্যন্ত বেগও দৃষ্ট হইয়াছে!

সূর্য্য ও চন্দ্রের গ্রহণ সকলেই সন্দর্শন করিয়াছেন; গ্রহণ স্বভাবের নিয়মাধীন; করালরাহুর কঠোর আসুর জঠরজ্বালা নিবারণের নিমিত্ত যে গ্রহণের উৎপত্তি হয় না তাহা বিদ্যালয়ের বালকবৃন্দেরও অবিদিত নাই; বাস্তবিক গ্রহণ কোন অমঙ্গলসূচক ঘটনা নহে এবং মৃৎপাত্রের সহিত তাহার কোন সংস্রব নাই। চন্দ্র ও পৃথিবী জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ নহে, সূর্য্যের আলোক হইতেই ইহারা আলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যখন চন্দ্র, পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতে-করিতে সূর্য্যও পৃথিবীর অন্তর্বর্ত্তীস্থানে এক রেখাবর্ত্তী হয়, অর্থাৎ যখন চন্দ্র

ও সূর্য্য গগণমণ্ডলে একস্থানে দৃষ্ট হয় তখন সূর্য্যগ্রহণ হইয়া থাকে। অতএব
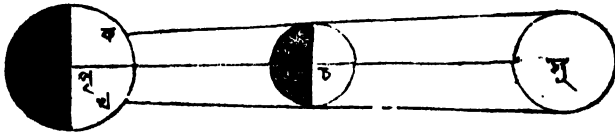
সূর্য্যগ্রহণ কেবল অমাবস্যা তিথিতেই হইতে পারে। উপরি লিখিত চিত্রে সূর্য্য চন্দ্র ও পৃথিবীর সূর্য্যগ্রহণকালীন অবস্থা প্রদর্শিত হইল। পৃ, পৃথিবী, চ চন্দ্র, সূ, সূর্য্য। অমাবস্যা তিথিতে চন্দ্র ও সূর্য্য দৃশ্যতঃ একস্থানে অবস্থান করিবে, অতএব চন্দ্র, নিজের ঠিক নিম্নবর্ত্তী পৃথিবীর লোকদিগের চক্ষু হইতে সূর্য্যের জ্যোতি সম্পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে দূরীকৃত করিবে। উপরি-উক্ত চিত্র দৃষ্টে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে, যে ক ও খএর মধ্যবর্ত্তী স্থানেই কেবল পূর্ণ গ্রহণ হইবার সম্ভাবনা। যখন চন্দ্রের দৃশ্যমান (Apparent) আকৃতি, সূর্য্যের দৃশ্যমান আকৃতি অপেক্ষা বৃহত্তর হয়, তখনই কেবল ক ও খএর মধ্যবর্ত্তী স্থানে পূর্ণ গ্রহণ দৃষ্ট হইবে ; অন্যথা মধ্যগ্রাস গ্রহণ দেখা যাইবে ; মধ্যগ্রাস হইলে সূর্য্যের মধ্যভাগ সম্পূর্ণরূপে আবৃত্ত হয়, কেবল চন্দ্রের চতুঃস্পার্শ্বে অঙ্গুরীয়কের ন্যায় একখণ্ড আলোক দৃষ্ট হয়। ক ও খএর সমীপবর্ত্তী স্থানে কেবলমাত্র অংশ গ্রাস হইবে ; নিম্নলিখিত চিত্রে গ নামক স্থান হইতে অংশ গ্রাস দৃষ্ট হইবে। ক ও খ হইতে কিঞ্চিদধিক দূরবর্ত্তী স্থানে কোন গ্রহণ হইবে না।
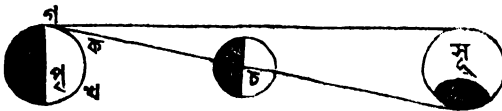
নিম্নলিখিত চিত্রে ঘ চিহ্নিত স্থান হইতে কোন গ্রহণ দেখা যাইবে না। সূর্য্যের
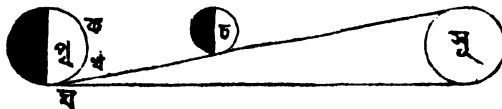
দৃশ্যমানগতি অপেক্ষা চন্দ্রের গতিক্রততর বলিয়া চন্দ্র ক্রমে সমীপবর্ত্তী হইয়া স্বীয় পূর্ব্বাংশের দ্বারা সূর্য্যের পশ্চিমাংশ আবৃত করিতে আরম্ভ করে, সুতরাং সূর্য্য গ্রহণ

সূর্য্যের পশ্চিমাংশ হইতেই আরম্ভ হইয়া থাকে। গণনাদ্বারা স্থির হইয়াছে যে পূর্ণসূর্য্যগ্রহণ ৪ মিনিটের অধিককাল থাকিতে পারে না।

যদি সূর্য্যের দৃশ্যমান কক্ষ ও চান্দ্র কক্ষ একই হইত, তাহাহইলে প্রতি অমাবস্যায় অবশ্যই সূর্য্যগ্রহণ হইত। সূর্য্যের দৃশ্যমানকক্ষ ও চন্দ্রের কক্ষ বিভিন্ন; তাহারা পরস্পর পরস্পরকে দুই বিন্দুতে চ্ছেদ করিয়াছে; ঐ দুই বিন্দুকে কক্ষচ্ছেদ বিন্দু বলা যাইতে পারে; উভয়ের কক্ষের মধ্যবর্ত্তীকোণের পরিমাণে ৫ অংশ হইবে। যখন সূর্য্য ও চন্দ্র কক্ষচ্ছেদ বিন্দু হইতে অনতিদূরে অবস্থান করে, তখনই কেবল গ্রহণ হইবার সম্ভাবনা; নতুবা অমাবস্যা হইলেও গ্রহণ হইবে না; নিম্ন লিখিত চিত্র দৃষ্টে ইহা স্পষ্ট বোধগম্য হইবে; গ্রহণ হইতে হইলেই সূর্য্য ও চন্দ্র পরস্পরকে স্পর্শ করা আবশ্যক। গণনাদ্বারাস্থির হইয়াছে, যে আমাবস্যার সময় সূর্য্য সমীপবর্ত্তী কক্ষচ্ছেদ বিন্দু হইতে ১৮$\frac{১}{২}$ অংশাপেক্ষা দূরে থাকিলে
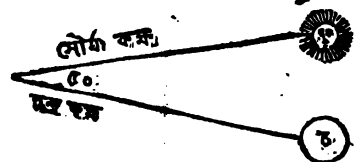
গ্রহণ হইবে না; যদি সূর্য্যের দূরত্ব ১৩$\frac{২}{৩}$ অংশ অপেক্ষা ন্যুন হয়, তবে অবশ্য গ্রহণ হইবে; এবং আমাবস্যা কালে যদি সূর্য্যের দূরত্ব ১৩$\frac{২}{৩}$ অংশাপেক্ষা অধিক অথবা ১৮$\frac{২}{১}$ অংশাপেক্ষা ন্যুন হয়, তাহা হইলে গ্রহণ হইবার সম্ভাবনা থাকে। প্রতিবৎসরে ২টী সূর্য্য গ্রহণ অবশ্যই হইবে এবং ৫টী পর্য্যন্ত হইলেও হইতে পারে।

পূর্ণসূর্য্য গ্রহণে এক অদ্ভুত নৈসর্গিকদৃশ্য দৃষ্ট হয়; সমস্ত গগণমণ্ডল ক্রমে ক্ষীণপ্রভ হইয়া আইসে; পৃথিবীর উপর একপাটলবর্ণ আভা পতিত হয়; পক্ষীগণ অকালসন্ধ্যা আগত দেখিয়া ভয়ে কলরব করিয়া কুলায়াভিমুখে ধাবিত হয়; পশুগণ প্রলয় ভাবিয়া নিস্পন্দভাবে অবস্থান করে। সূর্য্যচন্দ্রাবৃত হইয়া একখানি গোলাকার কৃষ্ণবর্ণ থালের ন্যায় লক্ষিত হয়; সূর্য্যের অসময় দেখিয়া গ্রহগণ সগর্ব্বে প্রকাশিত হয়; পাটলগগণ বিরল নক্ষত্রমালায় শোভিত হয়; সমস্ত পৃথিবী স্তব্ধভাব ধারণ করে। সূর্য্যমণ্ডল সমীপে সর্ব্বাপেক্ষা এক অত্যাশ্চর্য্য দৃশ্য দৃষ্ট হয়। সূর্য্যমণ্ডলের চতুঃপার্শ্বে উজ্জ্বল রক্তবর্ণ বাস্পীয়পদার্থ ভাসমান দেখিতে পাওয়া যায়; কতকগুলি কৃষ্ণবর্ণ সূর্য্য ভূমিতলের সহিত সংযুক্ত; কোন কোনটী মেঘমালার ন্যায় সূর্য্যমণ্ডল হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন; এতদ্ব্যতীত ঐ রক্তবর্ণ পদার্থকে সূর্য্যমণ্ডল বেষ্টন করিয়া থাকিতেও দেখা যায়; শেষোক্তটীকে ইংরাজেরা (Chromosphere) বলেন, আমি

তাহাকে রক্তাম্বর আখ্যাপ্রদান করিলাম; প্রথমোক্তটীকে ইংরাজেরা (Solar prominences)বলিয়া থাকেন আমি রক্ত-শিখাব দিলাম। উক্ত রক্তশিখাগুলি অতিশয় উচ্চ; উচ্চতমগুলির উন্নতি প্রায় ১,৩০০০০০ মাইল হইবে। রক্তশিখা ও রক্তাম্বরে দহ্যমান
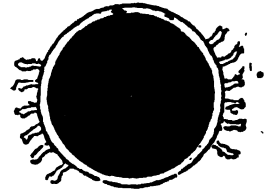
উজ্জ্বল উদজান সোডিয়াম ও ম্যেগনেসিয়ামের বাষ্প দৃষ্ট হয়। কাহারও কাহারও মতে উক্ত রক্তাম্বর ও রক্তশিখা গুলি সৌরধাতুনিঃস্রব; কতকগুলি ক্ষুদ্র এবং সান্দ্র-ভাবে অবস্থিত বলিয়া দূর হইতে একরক্তবেষ্টনের ন্যায় দেখায়; আর কতক-গুলি, অতিউচ্চ ও বিরল বলিয়া স্থানে স্থানে রক্তশিখার ন্যায় প্রতীয়মান হয়। কিন্তু অনেকে এইমত গ্রাহ্য করেন না, তাঁহারা বলেন যে রক্তাম্বর ও রক্ত-শিখা সূর্য্যের বায়ুব্যতীত আর কিছুই নহে; তাঁহাদের মতে পার্থিব বায়ুতে যেরূপ উদজান বাষ্প জলীয় বাষ্পাকারে অবস্থিতি করে সেইরূপ সৌর বায়ুতে উদজান বাষ্প দহ্যমান বাষ্পাবস্থায় আছে; যে যে স্থানে পূর্ব্বোক্ত উজ্জ্বল শ্বেত-বর্ণ গুলি দৃষ্ট হয় সেই সেই স্থলেই রক্তশিখা অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে, এবং সূর্য্যকলঙ্কের উপরিভাগে সূর্য্যের উভয় মেরুমণ্ডল ও বিষুব রেখার নিকট রক্তশিখা অতি অল্পই দেখা গিয়া থাকে। পূর্ণ সূর্য্যগ্রহণকালে এই গুলি প্রথমদৃষ্ট হইয়াছিল; এক্ষণে গ্রহণ ব্যতিরিক্ত অন্যসময়েও ঐগুলি দেখিবার যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে।

এ সকলব্যতীত সূর্য্যমণ্ডল হইতে একপ্রকার অত্যুজ্জ্বল শ্বেতালোক নিঃসৃত হইতে দেখাযায়; পৃথিবীতে ঐ প্রকার এক আলোক উত্তর মেরুমণ্ডলে দৃষ্ট হইয়া থাকে, উহাকে 'অরোরাবরিয়ালিস্' বা উত্তরালোক বলে। কেহ কেহ বলেন যে, সূর্য্যমণ্ডলস্থ উজ্জ্বলালোক 'উত্তরালোকের' ন্যায় উজ্জ্বল আলোক বিশেষ। কেহ কেহ বলেন যে সূর্য্যের অনতিদূরে সূর্য্যপরিভ্রমণকারী অসংখ্য উল্কাপিণ্ড বা নক্ষত্রকের উপর অত্যুজ্জ্বল সূর্য্যরশ্মি প্রতিফলিত হইয়া উক্ত অদ্ভুত দৃশ্যের উৎপত্তি হয়। একথা অযুক্তিসিদ্ধ বোধ হয় না; একবৎসর মধ্যে ২৭০০ কোটি উল্কাপিণ্ড, যন্ত্রসাহায্য ব্যতীত শুদ্ধচক্ষে পৃথিবীতে পতিত হইতে দেখাগিয়াছে; উল্কাপিণ্ড গ্রহ অথবা ধূমকেতুর কক্ষে পরিভ্রমণ করে; সূর্য্যমণ্ডলের সমীপে যে লক্ষ লক্ষ কোটি উল্কা মেঘাকারে দৃষ্ট হইবে তাহার কোন সংশয় নাই; এবং সূর্য্যের সমীপস্থ বলিয়া তাহাদের উপর সূর্য্যরশ্মি অবশ্যই অতি তীব্রভাবে প্রতি-ফলিত হইবে; সূর্য্যতেজে যদি উক্ত উল্কামেঘমালা ধূমেও পরিণত না হয়, তাহারা

নিশ্চয়ই দহ্যমান অবস্থা প্রাপ্ত হইবে; সুতরাং তাহাদের মধ্য হইতে বিদ্যুৎ নিঃসরণ সহজেই হইতে পারে। এইরূপে সূর্য্যমণ্ডলে বহুবিধ অত্যাশ্চর্য্য অলৌকিক দৃশ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইংলণ্ডীয় কবি ইয়ঙ্গ বলিয়াছেন, মানব ক্ষুদ্র তথাপি মহৎ, কীটাধম তথাপি দেবসদৃশ; ইহা কে অস্বীকার করিবে? যে মানব পৃথিবী হইতে পঞ্চ অথবা ষষ্ঠ মাইল উর্দ্ধে উঠিলে প্রাণধারণ করিতে অক্ষম হয়, যাহার ইন্দ্রিয়গণ অতি সঙ্কীর্ণ স্থানে নিবদ্ধ, এক ক্ষুদ্র সূচিকাঘাতে যাহার ক্ষুদ্র প্রাণ নষ্ট হইতে পারে, সেই মানব ৯কোটি ২০ লক্ষ মাইল দূরস্থ সূর্য্যেরগতি, তেজ-আকার ও আলোকের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিতেছেন! ইহা অতীব আশ্চর্য্যের বিষয়!

সূর্য্য নিজে স্থির নহে; যেমন পৃথিবী, চন্দ্র, বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহ ও উপগ্রহগণের আহ্নিকগতি আছে, সেইরূপ সূর্য্যেরও আহ্নিকগতি লক্ষিত হইয়াছে; পৃথিবীর আপন মেরুদণ্ডের উপর একবার ঘুরিতে চব্বিশ ঘণ্টা লাগে; সূর্য্যের আপন মেরুদণ্ডের উপর একবার ঘুরিতে পঁচিশ দিন লাগিয়া থাকে। শুদ্ধ ইহা নহে, সূর্য্যও পৃথিবীর ন্যায় আপন কক্ষে ভ্রমণ করিতেছে; সূর্য্যের কক্ষ অতিদূরস্থ এবং অতিদীর্ঘ বলিয়া একটী সরলরেখার মতন দৃষ্ট হয়। সূর্য্য আপন কক্ষে ভ্রমণ করিতে করিতে দক্ষিণ দিকের নক্ষত্রপূর্ণস্থান হইতে উত্তরদিকের নক্ষত্রপূর্ণ আকাশের সমীপস্থ হইতেছে। সূর্য্যের ন্যায় অন্যান্য নক্ষত্রেরও গতি লক্ষিত হইয়াছে। অতএব বোধ হয় যেমন পৃথিবীর সহিত বুধ শুক্রাদিগ্রহ সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, সেইরূপ সূর্য্যের মহাগতিতেও অনেক সহচর আছে। এইপ্রকারে সূর্য্য বৎসরে ১৫ কোটি মাইল অগ্রসর হইতেছে।

সূর্য্য হইতে গ্রহ উপগ্রহাদির কত উপকার হয়, তাহা নির্ণয় করা যায় না। সূর্য্যের মহাকর্ষণে গ্রহ ও উপগ্রহগণ এক এক নির্দ্দিষ্ট কক্ষে পরিভ্রমণ করিতেছে। দুই একটী গ্রহ ব্যতীত গ্রহ উপগ্রহের নিজের তাপ বা আলোক নাই। সূর্য্যই তাহাদের তাপ ও আলোকের প্রধাণ কারণ। তাপ ও আলোক ব্যতিরেকে কোন জীবজন্তু জীবিত থাকিতে পারে না অতএব সূর্য্যই জীবজন্তুদিগের জীবনের এক প্রধাণ কারণ। সূর্য্যরশ্মি পার্থিব সকল প্রকার গতির প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ্য কারণ। সূর্য্য কিরণ ব্যতিরেকে বায়ুরগতি হইতে পারে না। পৃথিবী সূর্য্যকিরণ হইতে আলোকও তাপব্যতীত রসায়নিকশক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই রাসায়নিক শক্তি দ্বারা মহৎ উপকার হইয়া থাকে। রাসায়নিকশক্তি অম্লজান বাষ্প হইতে অঙ্গারক বাষ্পকে পৃথক্ করিয়া উদ্ভিদ শরীরে পরিণত করে। রাসায়নিক শক্তিদ্বারা অঙ্গারক বাষ্প এইরূপে ব্যয়িত না হইলে পৃথিবী ও কোন জীব

ভিষ্টিতে পারিত না। বৃক্ষলতাদি হইতে পাথুরিয়া কয়লা উৎপন্ন হয়; অতএব কয়লা পৃথিবীর সূর্য্য হইতে পূর্ব্বপ্রাপ্ত সঞ্চিত তাপরাশি। যন্ত্রাদি পৃথিবীর পূর্ব্বসঞ্চিত তাপরাশি ব্যয় করে; ইহা সহজে পুনঃ পূর্ণ হইবার নহে। মনুষ্যাদি জীবিত প্রাণী সূর্য্যবিকীর্ণ সাময়িকতাপ ক্ষয় করে; এই তাপ পৃথিবী প্রতিদিন সূর্য্য হইতে প্রাপ্ত হইয়া থাকে; অতএব সূর্য্য হইতে পৃথিবী দূরীকৃত না হইলে পৃথিবী অবশ্য এই তাপ প্রাপ্ত হইবে। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে কালক্রমে এরূপ সময় আসিবে, যখন পৃথিবীর সমস্ত সঞ্চিত তাপরাশি ব্যয়িত হইয়া যাইবে; তখন প্রত্যক্ষ সূর্য্য রশ্মি হইতে তাপসংগ্রহ করিয়া যন্ত্রাদি চালিত করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত পৃথিবী, সূর্য্য হইতে চৌম্বুকাকর্ষণশক্তি ও প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সূর্য্যের গতি সময় নিরূপণের একমাত্র প্রধান উপায়।

সূর্য্য বর্ষে বর্ষে এত তাপ বিকীর্ণকরিয়া ও নিজে কিঞ্চিৎ মাত্র ও তাপ হীন হয় নাই; তাহার ব্যয়িত তাপ কোন না কোন প্রকারে পুনঃ-সংস্থাপিত হইতেছে; এরূপে পুনঃসংস্থাপিত না হইলে সূর্য্যের তাপ পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে অনেক হ্রাস হইয়া যাইত, কিন্তু তাহা হয় নাই। অগ্নিদাহ প্রভৃতি রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা সূর্য্যের দিগন্তবিকীর্ণ প্রচণ্ড তাপ উৎপন্ন হইতে পারে না। প্রোফেসর টিনডাল্ ও সার উইলিইয়াম টম্সন্ স্পষ্টাক্ষরে প্রমাণ করিয়াছেন যে রাসায়নিক ক্রিয়া সূর্য্য তাপের কারণ নহে। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকেরা এ সম্বন্ধে ঔল্কিক-মতের (Meteoric theory) সমর্থন করিয়া থাকেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যে সূর্য্য মণ্ডলে ক্রমাগত কোটি কোটি উল্কাপিণ্ডের পতন হইতেছে; তাহাদের সহিত সংঘর্ষণে তাপ উৎপন্ন হয়, তাহার দ্বারাই সূর্য্যের তাপ পুনঃ সংস্থাপিত হইতেছে। এইমত গ্রাহ্য করিয়াও কেহ কেহ সূর্য্যাবয়বের ক্রমিক আকুঞ্চনকে উহার তাপের অন্যতর কারণ নির্দ্দেশ করেন।

সূর্য্য হইতে কতদূর উপকার পাওয়া যায় তাহা এক প্রকার বর্ণিত হইয়াছে। প্রচীন আর্য্যগণ সূর্য্যের উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা উত্তমরূপ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সংস্কৃত, গ্রীক, ল্যাটিন প্রভৃতি আর্য্যভাষায় আর্য্যদিগের সূর্য্যোপসনার অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়; সূর্য্য, সবিতৃ, মিত্র, বিষ্ণু, হিলিয়স্, ফিবস্, এপলো প্রভৃতি নামে সূর্য্য আর্য্যদিগের উপাস্য হইয়াছিল। কিন্তু সূর্য্য জ্যোতির্ম্ময় জড় পদার্থ; অতএব সূর্য্য হইতে যে সকল উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়, তন্নিমিত্ত সূর্য্যস্রষ্টা অসীম ক্ষমতাবান ঈশ্বরের উপাসনা করাই কর্ত্তব্য। জ্যোতিষ শাস্ত্রের ন্যায় কোন শাস্ত্র ঈশ্বরের

অসীম ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করেনা। অসীম আকাশে তাঁহার অনন্ত সৃষ্টি। মনুষ্য সৃষ্ট দুরবীক্ষণ যন্ত্র এপর্য্যন্ত অনন্ত নক্ষত্রাকাশ অতিক্রম করিয়া যায় নাই। কোন কোন অল্পবুদ্ধি লোকের মতে বিজ্ঞানচর্চ্চাক্রমে মনুষ্যের মন হইতে ঈশ্বর বিশ্বাস লোপ করিবে। কিন্তু আমি বলি, মনুষ্য যতই বিজ্ঞানচর্চ্চা করিবে ততই তাহার মন ঈশ্বরের অসীম ক্ষমতা, জ্ঞান বুদ্ধি ও প্রেমের বিকাশদর্শনে বিমোহিত হইয়া বিশ্বাসপূর্ণ হইবে। তবে বিজ্ঞান, অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কারের মূলে অবশ্যই কুঠারাঘাত করিবে। ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্দিগ্ধচিত্ত লোকের সন্দেহ নিবারণার্থে এবং আস্তীকের, তাঁহার বিচিত্র কার্য্য কলাপদর্শনে স্বীয় বিশ্বাস দৃঢ়ীকরণার্থে বিজ্ঞানালোচনা করা কর্ত্তব্য।

শ্রীকালীকৃষ্ণ বসাক।

ভারতবর্ষীয় বার্ত্তাশাস্ত্র।

(নবম সংখ্যক বিজ্ঞান দর্পণের অনুবৃত্তি)

নবম সংখ্যক বিজ্ঞান-দর্পণে আমরা বার্ত্তাশাস্ত্র বা জীবিকাতত্ব নামধেয় একটী দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়া ক্রমিক দুই সংখ্যায় তাহার দুই অংশ প্রকাশ করিয়াছি। এবার তাহার তৃতীয়াংশ প্রকাশ করিলাম, অবশিষ্ট অগ্রিম মাসে প্রকাশ করা যাইবে।

পূর্ব্বে কি পর্য্যন্ত লেখা হইয়াছে তাহা পাঠকবর্গের স্মরণ না থাকিতেও পারে। এজন্য তাহার আংশিক পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। দ্বাদশ প্রকার জীবিকার মধ্যে প্রথম বিদ্যা ও দ্বিতীয় শিল্প। এই দুইটী মাত্র জীবিকার উল্লেখ, ব্যাখ্যা ও সবিবরণ মুলতত্বগুলি বলা হইয়াছে। পূর্ব্বকালে এদেশে কত প্রকার বিদ্যা ও কত প্রকার শিল্প অনুষ্ঠিত হইত তাহাও বলা হইয়াছে। শিল্প প্রসঙ্গে ৬৪ চতুঃষষ্টি কলাবিদ্যার পরিচয় বিবরণ ব্যক্ত করাও হইয়াছে। সম্প্রতি তদতিরিক্ত কতিপয় কলা বা শিল্পের কথা বলিব, পশ্চাৎ অন্যান্য জীবিকার সূত্র সংগ্রহ করিয়া দেখাইব।

বৃহৎসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে নিম্নলিখিত কলা বা শিল্পের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যথা—

উদ্যান রচনা। বাপী কূপ ও তড়াগাদি খনন। ঐ সকলের সংস্কার। জল জ্ঞান। পরিকর্ম্ম।

পূর্ব্বকালের লোকেরা এই সকল শিল্পের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত; এক্ষণেও এ সকল শিল্পের সমধিক উৎকর্ষ দৃষ্ট হয়। বার্ত্তাবিৎ পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন যে,—

"পৃথক পৃথক ক্রিয়াভির্হি কলা ভেদস্তু জায়তে।"

ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজন উদ্ভাবন দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া অর্থাৎ শিল্পি-ব্যাপার হইতে ভিন্ন ভিন্ন কলা অর্থাৎ শিল্প প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। ফলতঃ শিল্পের সংখ্যা নাই। চিরকালই ইহার নূতন নূতন প্রয়োগ প্রাদুর্ভূত হইতে পারে। সেই জন্যই বার্ত্তাবিৎ পণ্ডিতেরা উপরোক্ত শ্লোক দ্বারা শিল্পের অসীমতা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

শুক্রনীতি গ্রন্থে পূর্ব্বোক্ত চতুঃষষ্টি ও উপরোক্ত কতিপয় কলা ব্যতীত আর কএকটী কলা বা শিল্পের বর্ণনা আছে। যথা—

শস্ত্র কর্ম্ম। প্রস্তর ক্রিয়াদি। ইক্ষু বিকার-বিজ্ঞান। ধাতু ও ঔষধির বিকার-বিজ্ঞান। সাঙ্কর্য্য-বিজ্ঞান। ধাতু সংযোগ। ক্ষার নিষ্কাশন। অস্ত্র পরিচালন। ভূত সংযোগ-বিয়োগ-নিরোধ-বিজ্ঞান। যান ক্রিয়া। ধাতুকরণ। অলঙ্কার নির্ম্মাণ।

এই সকল শিল্প পূর্ব্বকালেও ছিল, এখনও আছে। উহাদের ব্যাখ্যা এইরূপ—

শস্ত্র কর্ম্ম অর্থাৎ বৈদ্য দিগের অস্ত্র চিকিৎসা। প্রস্তর ক্রিয়াদি অর্থাৎ প্রস্তর, ধাতু, পশুশৃঙ্গ, ও পশুচর্ম্মের ভস্ম ও দ্রবীকরণ-প্রক্রিয়া।

ইক্ষু বিকার-বিজ্ঞান অর্থাৎ গুড়, চিনি, মিছরী প্রভৃতি প্রস্তুত-করণ।

ধাতু ও ঔষধি বিকার-বিজ্ঞান অর্থাৎ উদ্ভিজ্জ পদার্থের সংযোগ বিয়োগ জনিত গুণ দোষ ও শক্তি বিষয়ক বিজ্ঞান।

সাঙ্কর্য্য বিজ্ঞান অর্থাৎ এক ধাতুর সহিত অন্য ধাতুর মিশ্রভাব থাকিবে তাহা অবগত হওয়ার প্রণালী।

ধাতু সংযোগ অর্থাৎ এক ধাতুর সহিত অন্য ধাতু সংযুক্ত করিবার প্রণালী।

ক্ষার নিষ্কাশন অর্থ ৎ বনজ ঔষধি ও মৃত্তিকা বিশেষ হইতে ক্ষার বহিষ্করণ।

অস্ত্র পরিচালন অর্থাৎ যুদ্ধাস্ত্র শিক্ষা।

ভূত সংযোগ-বিয়োগ-নিরোধ-বিজ্ঞান অর্থাৎ জল, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি পরস্পর সংযুক্ত বিযুক্ত ও নিরুদ্ধ হইয়া কি কি কার্য্য উৎপাদন করে তাহা অবগত হওয়া।

যানক্রিয়া অর্থাৎ নৌকাদি জলযান এবং রথাদি স্থলযান নির্ম্মাণ করা।

ধাতুকরণ অর্থাৎ কৃত্রিম স্বর্ণ রৌপ্যাদি প্রস্তুত করণ।

অলঙ্কার নির্ম্মাণ অর্থাৎ দেহের, গেহের, বাহনের নানাপ্রকার ব্যবহার্য্য বস্তুর শোভাজনক আভরণ প্রস্তুত করণ।

পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশ বিধ জীবিকার মধ্যে এই শিল্প নামক জীবিকাটী বহু বিস্তৃত ও বহু শাখ। বিদ্যা ও শিল্পনামক জীবিকার ব্যাখ্যা করিতে করিতে আমরা বহুদূরে আসিয়াছি, এক্ষণে এইস্থান হইতেই প্রত্যাবর্ত্তন করা যাউক।

শিল্প যেমন বহুবিস্তৃত ও বহু শাখ, কৃষি ও বাণিজ্য প্রভৃতি অন্যান্য জীবিকাও সেইরূপ বহুবিস্তৃত ও বহু শাখ। তত্তাবতের প্রত্যেকটীকে ভালরূপে বুঝাইতে হইলে একখানি বহুবিস্তৃত পুস্তক রচনা করিতে হয়। সে প্রয়াস বা সে আয়াস নিষ্ফল বিবেচনায় আমরা সংক্ষেপে অন্যান্য জীবিকার বর্ণনা করিব।

"বিদ্যা শিল্পং ভৃতিঃ সেবা গোরক্ষা বিপণিঃ কৃষিঃ।
গিরির্ভৈক্ষ্যং কুসীদঞ্চ দশ জীবন হেতবঃ॥"

এই শ্লোকে, বিদ্যা ও শিল্পের পরে যে ভৃতিরূপ বৃত্তির উল্লেখ আছে তাহার বিবরণ সকলেই জ্ঞাত আছেন। বিশেষতঃ বঙ্গবাসীমাত্রেই এই জীবিকার আস্বাদ ভালরূপ জানেন। সুতরাং এতৎসম্বন্ধে অধিক বাক্যব্যয় করিবার প্রয়োজন দেখি না।

৪ সেবা। সেবা-বৃত্তিটী শ্লোকের চতুর্থ স্থানে আছে ইহার অর্থ পরচিত্তানুবর্ত্তন অর্থাৎ মোসাহেবী করা। বেতন লইয়া পরকার্য্য করার নাম ভৃতি এবং পরচিত্ত অনুবর্ত্তন দ্বারা অর্থ গ্রহণ করায় নাম সেবা। এই বৃত্তিই পূর্ব্বে অতি ঘৃণ্য ছিল। মহর্ষি মনু এই বৃত্তিকে "শ্ব-বৃত্তি" অর্থাৎ কুক্কুরের বৃত্তি বলিয়া ঘৃণা করিতেন। তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াছেন।

"ঋতামৃতাভ্যাং জীবেত ন শ্ব-বৃত্ত্যা কথঞ্চন।"

ব্রাহ্মণ যদি উঞ্ছবৃত্তির দ্বারা জীবন ধারণ করেন তাহাও ভাল তথাপি শ্ব-বৃত্তি অর্থাৎ সেবা বা ভৃত্যত্ব করিবেন না। পূর্ব্বকালের আর্য্যেরা সেবা ও ভৃত্য ভাবকে ঘৃণা করিতেন, কিন্তু বর্ত্তমান আর্য্যবংশধরেরা তদ্দ্বয়কে বড় ভাল বাসেন। পূর্ব্বকালের শূদ্রেরাই ঐ বৃত্তিদ্বয় গ্রহণ করিত—কিন্তু এক্ষণকার ব্রাহ্মণেরাই উহা গ্রহণ করিয়া থাকেন। কালের কি আশ্চার্য্য পরিবর্ত্তন !!

৫ গোরক্ষা। শ্লোকের পঞ্চমস্থানোক্ত "গোরক্ষা" নামক জীবিকাই পূর্ব্বে বৈশ্যজাতির অধীন ছিল। গোরক্ষা অর্থাৎ পশুপালন। গো, অশ্ব, মেষ, মহিষ প্রভৃতি পশু প্রতিপালনাদির দ্বারা যে অর্থাগম হয় তাহা সকলেই জানেন।

৬ বিপণি। বিপণি অর্থাৎ বণিক্ ব্যবহার বা বাণিজ্য। ইহারতুল্য স্বাধীন ও উৎকৃষ্ট জীবিকা আর নাই। এই বাণিজ্য-বৃত্তি সম্বন্ধে আমাদের অনেক বক্তব্য আছে, সে সকল পশ্চাৎ বলা যাইবে।

৭ কৃষি। কৃষি অতি উৎকৃষ্ট জীবিকা। কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষের পক্ষে এই জীবিকাই উত্তম। পরন্তু ইহা অতি কষ্টসাধ্য। এই কৃষি-সম্বন্ধেও আমাদের অনেক বক্তব্য আছে; পরন্তু তাহা স্বতন্ত্র প্রবন্ধে ব্যক্ত করিবার ইচ্ছা আছে।

৮ গিরি। গিরি অর্থাৎ পর্ব্বত। প্রায় সমুদায় পর্ব্বতই মনুষ্যের উপজীব্য অর্থাৎ জীবিকা-স্থান। তত্রোৎপন্ন তৃণ, ধাতু, ঔষধি, বৃক্ষ ও অন্যান্য বহুবিধ দ্রব্য তথাহইতে আহরণ করিয়া তদ্বিনিময়ে গ্রাম্য ও নাগরিক লোকের নিকট হইতে বিপুল অর্থ সংগ্রহ হইতে পারে।

৯ ভৈক্ষ্য। ভিক্ষাও একপ্রকার জীবিকা বটে; পরন্তু তাহা অতি হীনাবস্থ লোকের অবলম্বনীয়। পূর্ব্বকালের গৃহত্যাগী ব্রাহ্মণেরা এই বৃত্তির পূজা করিতেন; কিন্তু এখন আর "ভিক্ষয়া নৈব নৈবচ" ভিক্ষাতে কিছু নাই।

১০ কুসীদ। কুসীদ অর্থাৎ বৃদ্ধি (সুদ গ্রহণ)। লোকের অভাব কালে দ্রব্য কি ধন দান করিয়া পশ্চাৎ সময়ে তাহার বৃদ্ধি গ্রহণ করার নাম কুসীদ। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে "তেজারাতি" ও "মাহাজনী" বলে। এই জীবিকাটী স্বাধীন বটে; উক্ত ব্যবসায়ের দ্বারা যথেষ্ট ধনাগমও হয়; পরন্তু উহা মূলধন সাধ্য। ধন না থাকিলে ও দ্রব্য না থাকিলে এই বৃত্তি অবলম্বন করা যায় না।

এই দশ প্রকার জীবিকা ছাড়া আরও দুইটী অতিরিক্ত জীবিকা আছে। সে দুইটী এই—"শাকট" ও 'আনুপ"। শাকট কিনা শকট ব্যবহার; গাড়ীর ব্যবসা। গাড়ীর ব্যবসাটী পূর্ব্বে অধম ছিল, এক্ষণে উত্তম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যদি ভালরূপে গাড়ীর ব্যবসা চালান যায় তাহা হইলে বিলক্ষণ দশ টাকা লাভ হইতে পারে। প্রচুর তৃণাদি পরিপূর্ণ ও জলবাহন স্থানের নাম "অনুপ"। এই অনুপ স্থান যদি জীবিকার্থ অবলম্বিত হয় তাহা হইলে তাহাকে আনুপবৃত্তি বলাযায়। বহুতর শ্রমজীবী মনুষ্য এই আনুপবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবন ধারণ করিয়া থাকে। নল, খাগড়া, খড়, খড়ী, মৎস্য, কূর্ম্ম প্রভৃতি অনুপজাত দ্রব্য আহরণ করিয়া তদ্বিনিময়ে বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকে। জলা-স্থানে "পাতি" নামক এক প্রকার তৃণ হয়, তদ্দ্বারা উত্তম "মাদুর" প্রস্তুত হয়। ইত্যাদি অনেক প্রকার ব্যবহারোপযোগী বা প্রয়োজনীয় বস্তু অনুপস্থান হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং তদ্দ্বারা বিলক্ষণ দশটাকা লাভ হয়।

প্রস্তাবের প্রারম্ভ হইতে এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু বলা হইল, সমুদয়ই সংক্ষিপ্ত ফল,

দ্বাদশ প্রকার জীবিকার মূলতত্ত্ব,—যাহা অতি পূর্ব্বকাল হইতে লোকের বিদিত আছে, তন্মাত্র ব্যক্ত করাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। বিস্তার করিয়া বলিতে গেলে প্রবন্ধটী পুস্তকাকার প্রাপ্ত হইবে, এবং খণ্ডশঃ প্রকাশের অযোগ্য হইবে ভাবিয়া স্বল্পাকারেই ব্যক্ত করা গেল।

কথিত প্রকারের দ্বাদশ জীবিকা সর্ব্বসাধারণের সুসাধ্য। তদ্ভিন্ন আরও কএকটী বৃত্তি বা ধনাগমের উপায় আছে; পরন্তু তাহা সাধারণের সুসাধ্য নহে। সে সকল ধনাগম দ্বার কেবল রাজা বা রাজপুরুষদিগের জন্যই নির্দ্দিষ্ট আছে। রাজা বা রাজার সাহায্য ব্যতীত সে সকল পথ পরিষ্কৃত বা অধিকৃত হইতে পারে না। তজ্জন্য, বার্ত্তাবিৎ প্রাচীন পণ্ডিতেরা সে গুলিকে বার্ত্তাশাস্ত্রভুক্ত না করিয়া, রাজশাস্ত্রভুক্ত করিয়া উপদেশ করিয়াছেন। যথা—

"কৃষির্বণিক্ পথো দুর্গং সেতুঃ কুঞ্জর বন্ধনম্।
খন্যাকরকরাদানং শূন্যানাথ্য নিবেশনম্॥
এতানি সন্ধি কর্ম্মানি যথাযোগ্যং প্রয়োজয়েৎ॥"

কৃষি ও বাণিজ্য সর্ব্বসাধারণের সুসাধ্য বটে; কিন্তু পথ, দুর্গ, সেতু, খনি, আকর, করসংগ্রহ, গ্রাম নগরাদি স্থাপন,—এ সকল কার্য্য সাধারণের সুসাধ্য নহে। পথ ও সেতু প্রস্তুত করিয়া দিয়া তাহার শুল্ক গ্রহণ করা, ধাতুর খনি ও রত্নের আকর আবিষ্কার করিয়া বা অধিকার করিয়া তদ্দ্বারা আয় বৃদ্ধি করা, প্রজা ও বণিক্‌দিগের নিকট হইতে কর ও শুল্ক আদায় করা, শূন্যস্থানে মনুষ্যাবাস অর্থাৎ গ্রাম নগরাদি স্থাপন করা, হাট, বাজার ও বন্দর স্থাপন করা,—এ সকল কেবল রাজারাই পারেন, অন্যে নহে। রাজত্ব বা অধিকার, স্বামিত্ব বা প্রভুশক্তি না থাকিলে উক্ত উপায় অবলম্বন করা যায় না। করিতে গেলে অনেক বিঘ্ন বিপত্তি ঘটে। এজন্য সাধারণের নিকট বাণিজ্যই ধনাগমের উৎকৃষ্ট উপায়। বাণিজ্যের দ্বারা প্রভূত ধন সঞ্চয় হইতে পারে বলিয়া বার্ত্তাবিৎ পণ্ডিতেরা "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী" বলিয়া থাকেন। বাণিজ্যের অপর এক গুণ আছে যে, "বাণিজ্যোনাতিরস্কৃতোঽর্থলাভঃস্যাৎ" বিনা তিরস্কারে অর্থ লাভ হয়। যদ্দ্বারা বিনা তিরস্কারে, ও পূর্ণ-স্বাধীনভাবে অর্থাগম হয় তদপেক্ষা উত্তম জীবনোপায় আর কি আছে? বার্ত্তাশাস্ত্রে আরও লিখিত আছে যে,—

'উপায়ানাঞ্চ সর্ব্বেষাং উপায়ঃ পণ্য সংগ্রহঃ।
ধনার্থং শস্যতে হোক-স্তদন্যঃ সংশয়াত্মকঃ॥"

যত প্রকার ধনার্জ্জনের পথ আছে, সমুদায়ের মধ্যে পণ্যসংগ্রহ অর্থাৎ বাণিজ্যই প্রধান। বাণিজ্যই ধনার্জ্জনের একমাত্র সুপ্রশস্ত পথ। অন্যান্য পথ সকল

সঙ্কীর্ণ ও সংশয়িত। অর্থাৎ বাণিজ্য ভিন্ন সকল উপায়েই বিঘ্ন সঙ্কুলিত, পরাধীন এবং তদ্দ্বারা নিষ্কণ্টকে ধনার্জ্জন হইবে কি না এরূপ সংশয় বিশিষ্ট।

এই বণিকবৃত্তি পূর্ব্বে এ দেশের বৈশ্যজাতির অধীন ছিল। স্ব স্ব কর্ম্মে অপারগ বা অক্ষম ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও শূদ্রেরাও ইহা অবলম্বন করিত। এই জীবিকার উৎকর্ষে দেশ ধনশালী, সৌন্দর্য্যপূর্ণ ও নানাপ্রকারে উন্নত হয়। এই বৃত্তির প্রসাদেই ইয়ুরোপ আজ্‌কাল পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ভারতবর্ষও এক সময়ে এই বৃত্তির প্রসাদে গৌরবান্বিত ছিল। এই বৃত্তির শাখা প্রশাখা এত অধিক যে, গণিয়া শেষ করা যায় না। ভারতবাসী পুরাতন আর্য্যেরা (অর্থাৎ বৈশ্য) এই বৃত্তির অনেক উৎকর্ষ করিয়াছিলেন। প্রাচীন আর্য্যেরা লিখিয়া গিয়াছেন যে, বণিক্ বৃত্তি সপ্তগ্রন্থিযুক্ত। অর্থাৎ ইহার প্রধান সাতটী গাঁইট আছে। বার্ত্তাবিৎ আর্য্যেরাও তৎসিদ্ধান্তের অনুগামী ছিলেন। কেননা তাঁহারাও বাণিজ্যকে সপ্তাঙ্গ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বাণিজ্যের সাত অঙ্গ প্রধান। তদ্ভিন্ন তাহার অনেক উপাঙ্গ বা ক্ষুদ্রাঙ্গ আছে।

বাণিজ্যের সাতটী অঙ্গ। কি কি? তাহা বলিতেছি। প্রথম গান্ধিক-ব্যবহার। ২য় নিক্ষেপ প্রবেশ। ৩য় গোটীকর্ম্ম। ৪র্থ পরিচিত-গ্রাহকাগমন। ৫ম মিথ্যাক্রয় কথন। ৬ষ্ঠ কূটকরণ। ৭ম ভাণ্ডানয়ন।

এই সপ্তাঙ্গের মধ্যে ভাণ্ডানয়নই শ্রেষ্ঠ, নিষ্কলঙ্ক ও প্রচুর ধনাগমের দ্বারা। অন্যান্য অঙ্গ গুলি নিন্দিত, সকলঙ্ক, ও স্বল্পার্জ্জনের হেতু।

উল্লিখিত অঙ্গগুলির ব্যাখ্যা অতি কৌতুকাবহ। বার্ত্তাবিৎ বণিকেরা গান্ধিক-ব্যবহার প্রভৃতি বাণিজ্যাঙ্গ গুলির যেরূপ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা অগ্রিম মাসের দর্পণে বিবৃত হইবে।

ক্রম প্রকাশ্য।

শ্রীকালীবর শর্ম্মা।

জল।

বায়ুর ন্যায় জল রূঢ় পদার্থ নহে। অম্লজান (অক্সিজন) ও উদজান (হাইড্রজেন) এই দুই বায়বীয় মৌলিক পদার্থের পরমাণু সংহতি দ্বারা সমুৎপন্ন; সুতরাং ইহা প্রকৃতপক্ষে যৌগিক পদার্থ; কিন্তু পূর্ব্বে এবিষয়ের প্রসিদ্ধি ছিল না বলিয়াই আমাদের প্রাচীন গ্রন্থাদিতে ইহা রূঢ় পদার্থ নামে অভিহিত হইয়াছে। দুই বা

ততোধিক মূলপদার্থের সমবায়ে উৎপন্ন পদার্থ যৌগিক নামে অভিহিত হয়; সুতরাং জল যে যৌগিক পদার্থ এবিষয়ে ইদানীং আর অনুমাত্র সংশয় নাই। অম্লজান এবং উদ্‌জান এতদুভয়ের বিমিশ্রনে কি প্রকারে জল উৎপন্ন হয়, তাহা এখানে বলিবার আবশ্যক নাই। রসায়নশাস্ত্র পাঠে তাহা সম্যক অবগত হওয়া যায়।

দহন করাই অম্লজানের প্রধান ধর্ম্ম; কিন্তু উদ্‌জানের ধর্ম্ম ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত, অর্থাৎ ইহা দ্বারা নির্ব্বাপনকার্য্য সাধিত হয়: কিন্তু উদ্‌জানে অম্লজান সংস্পৃষ্ট হইলেই প্রজ্জ্বলিত হইতে থাকে। এই উদ্‌জান এবং অম্লজান জীব সমূহের সর্ব্বদাই আবশ্যক, এই হেতুই বোধ হয় কি উদ্ভিদজাত, কি জীবজাত, সকল প্রকার পদার্থেই ইহার বিদ্যমানতা পরিলক্ষিত হয়।

পদার্থবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা পৃথিবীস্থ যাবতীয় পদার্থকে প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা তরল, দৃঢ় এবং বাষ্পীয়। যে কোন পদার্থই হউক না, তাহা নিশ্চয়ই এই তিন শ্রেণীর একশ্রেণীভুক্ত হইবে। সুতরাং আমাদিগের প্রস্তাবিত বিষয়টী প্রথমশ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট। জল তরলপদার্থ, স্রোত বহিয়া যায়, এবং একপাত্র হইতে পাত্রান্তরে অনায়াসে ঢালা যায়! নিম্নদিকে গমন করা জলের একটী প্রধান ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মের অনুরোধে, বিশেষ মাধ্যাকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া নদীসমূহ প্রধাবিত হইতেছে, উৎস-বারি প্রবলবেগে চলিতেছে, নির্ঝরনিচয় গম্ভীর নির্ঘোষে জলপাত করিতেছে। সকলেরই উদ্দেশ্য এক। সকলেই সাগর সঙ্গম লাভ লালাসায়ব্যস্ত; কিন্তু সকলের অদৃষ্টে কি তাহা ঘটিতেছে? কোনটী যৎসামান্য গমন করিয়াই লুপ্ত প্রায় হইতেছে; কোনটী বা অপেক্ষাকৃত বৃহৎ একটীর কলেবর পরিপোষণ করিতেছে, আবার কোনটী বা মৃতবৎ প্রবাহিত হইতেছে; সুতরাং সমুদায়ের সহিত তুলনা করিলে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে স্বীয় প্রবাহ প্রভাবে সাগর স্পর্শ সুখ অনুভব করিতেছে, এপ্রকার নদীর সংখ্যা অনেক ন্যূন। কিন্তু প্রকারান্তরে সকলগুলিই যে বারীধিতে নিপতিত হইতেছে তাহার আর সন্দেহ নাই।

এই যে অনন্ত ভূমণ্ডলে আমরা বাস করিতেছি ইহার অধিকাংশই জলরাশি পরিবেষ্টিত। এই বিস্তীর্ণ জলরাশি মহাসাগর নামে অভিহিত। এই এক মহাসাগরই সমুদায় পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, তবে স্থানভেদে যে পৃথক্ পৃথক্ নামে অভিহিত হয় সে কেবল ভৌগলিক জ্ঞানের সৌকার্য্যার্থ। এই মহাসাগরই বারি ধারণের নিদান স্বরূপ, এই জন্যই ইহার নামান্তর বারিধি হইয়াছে।

এইবারি মনুষ্যাদি জীব জন্তর পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় ও নিত্য প্রয়োজনীয়। বায়ু সেবন যেমন জীবন ধারণের একমাত্র উপায়, জলও প্রায় তদ্রূপ। এইহেতুই পণ্ডিতবৃন্দ জলকে জীবন নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। তবে উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, বায়ু ব্যতিরেকে আমরা ২।৪ সেকেণ্ড মধ্যে মরিয়া যাই; কিন্তু জলাভাবে অতি-কষ্টে কয়েক দিন জীবিত থাকিতে পারি। বিশ্বপাতা জগদীশ্বরের কি আশ্চর্য্য কৌশল! কি অপার মহিমা? পৃথিবীতে স্থলাপেক্ষা জলের ভাগই অধিকদৃষ্ট হয়।

পৃথিবী যেমন মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, উদ্ভিদ, এবং পর্ব্বত ইত্যাদির দ্বারা পরিপূর্ণ, মহাসাগর গর্ভ ও তদ্রূপ শত শত অসংখ্য জীবের নিবাস ভূমি। যখন স্থলাপেক্ষা জলের ভাগ অনেক অধিক, তখন ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, সেই অনন্ত জলরাশি, স্থলাপেক্ষা সহস্রাংশে অধিক জীবের আবাস গৃহ। এমন কত শত জীবজন্ত জলে স্বচ্ছন্দে দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে, যাহা-দিগের বিষয় আমরা বিন্দুমাত্র ও অবগত নহি। কেহ বা আমাদের চর্ম্মচক্ষের নিতান্ত অদৃশ্য; কাহার ও বা নামপর্য্যন্ত অদ্যাপি আমাদের শ্রুতিগোচর হয় নাই। অগাধ বারিধি বক্ষে কত উচ্চ উচ্চ শৈলরাজি, কত বৃহৎ মগ্নগিরি নিমগ্ন রহিয়াছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিতে সমর্থ হয়? অনুবীক্ষণ যন্ত্র সহকারে দৃষ্টি করিলে বড়ই চমৎকৃত ও বিস্মিত হইতে হয়। দেখিতে পাওয়া যায় যে, সামান্য একবিন্দু জলে কত শত জীবই বিদ্যমান রহিয়াছে: তাহাদের মধ্যে আবার কোন কোনটী এত ক্ষুদ্র যে ঈদৃশ বিন্দুদ্বয় পরিমিত জলমধ্যে শতকোটি জীব অক্লেশে দেহ যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। ইহা একপ্রকার নির্ণীত হইয়াছে যে, এই বর্ত্তমান সময়ে সমুদয় পৃথিবীতে শতকোটী লোকের বাস; কিন্তু এই স্বল্পপরিমিত জলমধ্যে তাহা অপেক্ষা অনেকাংশে অধিক জীব অনায়াসে অবস্থান করিতেছে; সুতরাং ইহা অপেক্ষা আশ্চার্য্য ও বিস্ময়কর ব্যাপার আর কি হইতে পারে! করুণাময় জগদীশ্বরের কি অচিন্ত মহিমা! কি বিচিত্র সৃষ্টিকৌশল! সামান্যবুদ্ধি মনুষ্যের ইহা সম্পূর্ণই দুর্ণেয় ও দুজ্জের্য়।

চক্ষুর অগোচর এই ক্ষুদ্র কীটাণু সমূহ যে কেবল পূতিগন্ধযুক্ত জলাশয়েই দেখিতে পাওয়া যায় এমন নহে। কি বিস্তৃত সাগর বারিতে, কি স্রোতস্বতীর স্বচ্ছসলিলে, কি কূপের স্থির জলে, সকল স্থানেই ইহারা পরিদৃশ্যমান হয়। ইহারা জলে অবস্থান পূর্ব্বক যে কেবল আমাদের পানীয় জল দূষিত করে, কোনপ্রকার উপকারই ইহাদের দ্বারা সংসাধিত হয় না এমন নহে। আমাদিগের জীবনের অনিষ্টোৎপাদক জলস্থিত পচা গলিত পদার্থ সমূহ স্থানান্তরিত করা ইহাদের

একটী প্রধান ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া ইহারা প্রতিনিয়ত কার্য্য করি- [illegible] অপেক্ষা [illegible] বৃহৎ জন্তু কর্ত্তৃক ভক্ষ্যস্বরূপে পরি- [illegible] ইহদ্বারা [illegible] প্রতিপন্ন হইতেছে যে অতিক্ষুদ্রতম কীটাণু [illegible] পর্য্যন্ত সমুদয় সৃষ্ট পদার্থ কর্ত্তৃকই মনুষ্যের অবশ্যই [illegible] ন উপকার সাধিত হইতেছে তাহাতে আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই। [illegible]তঃ এমন কত শত সৃষ্ট পদার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে, যাহাদের কার্য্য কৌশল আমাদের বুদ্ধির নিতান্ত অগম্য; সুতরাং তাহাদিগের সংসাধিত উপকারও আমা- দিগের অননুভূত। যেহেতু কার্য্য অভাবে কারণ নির্ণয় অসম্ভব।

জলের স্বাভাবিক কোন বর্ণ কি ঘ্রাণ কিছুই নাই। তবে কোনস্থানের জল পীত, কোন স্থানের জল লোহিত, আবার কোন স্থানের জল নীলবর্ণ দেখায় কেন? বিবেচনা করিয়া দেখিলে অতি সহজেই ইহার কারণ অনুমেয় হইবে। জলসংশ্লিষ্ট পদার্থ সমূহই এতাদৃশ বিভিন্ন প্রকার বর্ণোৎপাদনের মূল কারণ। লোহিত সাগরের জলে উজ্জ্বল লালবর্ণের অসংখ্য কীট দেখিতে পাওয়া যায়, বোধ হয় ইহাদেরই বিমিশ্রণে লোহিত সাগরের জল লাল দেখায়। আবার আরব সাগরের উপকূলবর্ত্তী জল হরিৎবর্ণ বিশিষ্ট। সমুদ্রের কিঞ্চিৎ জল লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলে তাহার কোনই বর্ণ দেখা যায় না, অথচ সমুদ্রের বিস্তৃত জল রাশি গাঢ় নীলবর্ণ দেখায়। ইহার কারণ অদ্যাপিও নির্ণীত হয় নাই। দূরস্থিত পর্ব্বতাদি নীলবর্ণ বিশিষ্ট দেখায় বলিয়া ইংরাজেরা বায়ুর নীলবর্ণ রূপ স্বীকার করেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বায়ুর কোনপ্রকার বর্ণ নাই; উহা বায়ুস্থিত জলকণা সমূহের বর্ণ। সুতরাং সমুদ্র বারি যে গাঢ় নীলবর্ণ দেখাযায় তাহা একপ্রকার স্বভাবতই বলিতে হইবে।

রাসায়নিক পণ্ডিতেরা জীবদেহ বিশ্লেষণ দ্বারা নির্ণয় করিয়াছেন যে কীটশরীর যে যে উপকরণে সংগঠিত জল (উদ্জান) তাহার অন্যতম। জীব দেহস্থ এই জল পরি- মাণ সমুদ্র জলের উচ্ছ্বাসিত অনুচ্ছ্বাস সদৃশ, কখন হ্রাস কখন বা বর্দ্ধিত হইতেছে। ইহার কারণ অতি সহজেই প্রতিপন্ন হইতে পারে। এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক পরমাণুর সহিত যে প্রত্যেক পরমাণুর কোন বিশেষ সম্বন্ধ আছে, ইহা স্থির নিশ্চয়। এই নৈসর্গিক নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া চন্দ্র নিয়তই সমুদ্র বারি আকর্ষণ করিতেছে, এই হেতুই সমুদ্র জল সময়ে উচ্ছ্বসিত হইতেছে। চন্দ্রের সহিত সমুদ্রের যে সম্বন্ধ, জীব গণের দেহের সহিতও ঠিক সেই মত সম্বন্ধ, তবে বৃহৎ আর ক্ষুদ্র এই মাত্র প্রভেদ, সুতরাং জীবগণের দেহ মধ্যেও যে ঐমত জল বৃদ্ধি হইবে তাহার আর বিচিত্র কি! যাঁহারা বিশেষ অনুসন্ধিৎসু এবং যাঁহারা বাত ইত্যাদি রোগগ্রস্থ; তাঁহারা

অনায়াসেই ইহার যথার্থ নিরাকরণে সমর্থ হয়েন। যাহাতে জীব শরীরে এই জল পরিমাণ বর্দ্ধিত না হয়, এই আশয়ে প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা অমাবস্যা ও পূর্ণিমার প্রাক্কালাবধি সরস দ্রব্যাদি ভোজনের নিষেধ বিধি সমূহ ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় যে আধুনিক সভ্যমহোদয়গণ মধ্যে অনেকে ঈদৃশ বিধির গূঢ় তাৎপর্য্য অবগত না হইয়াই হউক বা অসমর্থ হইয়াই হউক ইহা প্রলাপবাক্য বোধে-উপেক্ষা করিয়া থাকেন।

জীবদেহস্থ এই উদ্‌জানাংশ বিবিধ প্রকারে প্রতিনিয়ত ক্ষয় এবং ধ্বংস হইতেছে। এই ক্ষয় ধ্বংস পরিপূরণার্থ উদজানজ পদার্থের আবশ্যক; এই হেতুই পিপাসা উপস্থিত হইলে আমরা জলপান করিয়া থাকি; এই হেতুই সরস দ্রব্য ভোজনে পিপাসা শান্তি হয়। যেমন আহারীয় দ্রব্যাদি উদরসাৎ হইবামাত্র ক্ষুধাশান্তি হয় না, তেমনি জলপান করিবামাত্র পিপাসা নিবৃত্তি হয় না। যে পর্য্যন্ত পানীয় জলের কিয়দংশ আভ্যন্তরিক যন্ত্রাদির দ্বারা আশোষিত হইয়া আবশ্যকীয় স্থানে নীত না হয়, অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত ক্ষয় অংশ পরিপূরিত না হয়, সে পর্য্যন্ত পানেচ্ছা বলবতী থাকে। সুতরাং পানেচ্ছার পরিমাণ অনুসারে জলপান করা উচিত; নচেৎ এককালে অধিক জল উদরসাৎ হওয়ায় বিবিধ প্রকার অসুখ হইবার সম্ভব। হানিমান, রসেল্ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ চিকিৎসকেরা বলেন যে প্রত্যহ দুই কি আড়াই সের জল পান করিলেই চলিতে পারে। আহারীয় দ্রব্যের বিভিন্নতা অনুসারে পানেচ্ছার ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে। যে সমুদয় দ্রব্যে জলীয়ভাগ অল্প বা এককালে নাই তাহা উদরসাৎ করিলে অধিক পরিমাণে জলপানের প্রয়োজন হয়। আবার সরস দ্রব্য ভোজনে পিপাসা অতি অল্পই হইয়া থাকে, এমন কি পান না করিলেও চলিতে পারে। এক্ষণে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, উদজানজ জীবদিগের শরীর ধারণার্থ নিতান্ত প্রয়োজনীয়। উদজানজ ব্যতিরেকে কদাপি জীবগণ জীবিত থাকিতে পারে না। হয়ত অনেকে এ প্রকার বলিতে পারেন যে, উদজানজের আবার আবশ্যক কি? শুদ্ধ উদজান্ খাইলেইত চলিতে পারে। বাস্তবিক তাহা খাইতে পারে না। উদ্‌জানে জীবের অভাব মোচন হয় না; কারণ ইহা মৌলিক পদার্থ। জীবগণের অভাব মোচনার্থ যৌগিক পদার্থের প্রয়োজন; এই হেতুই উদজানজের আবশ্যক।

নদী ও অন্যান্য স্রোতের জল সুস্বাদ; কিন্তু সমুদ্রবারি ত... লবণময়। সকল স্থানে সমুদ্রবারি সমান লবণময় নহে। উত্তর স... দক্ষিণ সমুদ্রের জল অধিক বিস্বাদ। সমুদ্রের উপরিভাগের জলাপেক্ষা নিম্ন... জল অধিক লোণা। সমুদ্রের যে অংশে স্রোতস্বতীর প্রভূত বারি নিপতিত

হইতেছে; সেই সঙ্গমস্থানে, স্বচ্ছ, সুস্বাদ বারির বিমিশ্রণে লবণাংশ অনেক পরিমাণে হ্রাস হইতেছে। বারিবর্ষণেও ইহা অনেকাংশে সংসাধিত হয়। আবার যে সাগর, যে পরিমাণে নদ্যাদি হইতে জল প্রাপ্ত হয়, যদি তাহার বাষ্পোত্থান পরিমাণ তাহা অপেক্ষা অধিক হয়, তাহা হইলে সে সাগরবারি নিশ্চয়ই অধিক লবণাক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু বাষ্পোত্থান পরিমাণ ন্যূন হইলে অবশ্যই তাহা অনেকাংশে লবণ পরিশূন্য বলিতে হইবে। এই হেতুই কাস্পিয়ান সাগর, বৃহৎ বৃহৎ নদ্যাদির সঙ্গম স্বত্বেও, লোহিত সাগরাপেক্ষা অধিক লবণাম্বু। সমুদ্রবারি যে কেন লবণময় হইল? এ প্রশ্নের উত্তর করা বড় সহজ নহে। আর অদ্যাপি এ বিষয়ের কোন স্থির সিদ্ধান্তও হয় নাই। তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, সমুদ্রবারির ঈদৃশ গুণ স্বভাবজ। সমুদ্রজলে লবণ আছে সত্য, কিন্তু তাহা আমরা দেখিতে পাই না; কারণ লবণের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অণু সকল জলের সহিত এমন ভাবে মিলিত থাকে যে তাহা আমাদের চক্ষের সম্পূর্ণ অগোচর। কিন্তু অল্প পরিমাণে সমুদ্রবারি কোন পাত্রে স্থাপন করিয়া, তাহার নিম্নে উত্তাপ প্রদান কর, পাত্রস্থ জল উষ্ণ হইয়া, তাহার জলীয়ভাগ ক্রমশঃ বাষ্পাকারে উত্থিত হইতে থাকিবে, এবং পরিশেষে দেখিবে যে, কেবল লবণাংশ পাত্রে সংলগ্ন রহিয়াছে। সুতরাং সমুদ্রবারি আপাততঃ নির্ম্মল বোধ হইলেও, এমন লবণাক্ত এবং বিস্বাদ যে তাহা কেহ পান করিতে পারে না। পক্ষান্তরে প্রবাল দ্বীপ সমূহ এই লবণময় বারিধি হইতেই সমুৎপন্ন, এবং চতুর্দ্দিকেই এই লবণাম্বু দ্বারা পরিবেষ্টিত; অথচ উহার মধ্যে ৪।৫ ফিট খনন করিলে লবণ পরিশূন্য সুস্বাদ সলিল প্রাপ্ত হওয়া যায়; ইহা কি আশ্চর্য্যের বিষয়! দ্বীপ সমূহের বেলোর্দ্ধসীমার কিঞ্চিৎ নিম্নেই ঈদৃশ নির্ম্মল বিশুদ্ধ বারি নিঃসৃত হয়। পদার্থবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে প্রবালের কোন অসাধারণ শক্তিদ্বারা তাহাদের আবাসগৃহের লবণময় নীর পরিশোধিত হইয়া থাকে।

জগদীশ্বরের কি আশ্চর্য্য সৃষ্টি কৌশল! তাঁহার বিশ্বনৈপুণ্যের কি অনির্ব্বচনীয় মহীয়সীশক্তি। দেখ, পৃথিবীস্থ যাবতীয় বৃহৎ বৃহৎ নদীই সমুদ্রে নিপতিত হইতেছে; অথচ সমুদ্র শরীর পরিপুষ্ট না হইয়া পূর্ব্ববৎ সমভাবেই রহিয়াছে। নদ্যাদির সঙ্গমদ্বারা যে পরিমাণে সাগরবারি বৃদ্ধি হয়; বাষ্পোত্থান ইত্যাদির দ্বারা তাহা প্রতিনিয়ত হ্রাস হইতেছে। সময়ে সেই বাষ্পরাশি আকাশমার্গে উড্ডীন হইয়া মেঘরূপে পরিণত হইতেছে; সেই মেঘসমূহই যথাকালে বৃষ্টিরূপে ভূতলে পতিত হইয়া পৃথিবীকে শস্যশালিনী করিতেছে। নদ্যাদির কলেবর পরিপুষ্ট করিতেছে; সুতরাং এক সমুদ্রই সমুদয় জলের নিদান স্বরূপ। বায়ুস্থ সমস্ত জীবগণের নিশ্বাস

দ্বারা প্রতিনিয়ত গৃহীত হইলেও, ইহা এককালে ক্ষয় বা ধ্বংস না হইয়া বায়ুমধ্যে সমানভাবেই বর্ত্তমান রহিয়াছে, উদ্ভিদাদির বিশ্লেষণই ইহার প্রধান কারণ। সেই মত নদ্যাদির কলেবর পরিপোষণের একমাত্র উপায়, সমুদ্র। সমুদ্র স্বয়ংই সমুদয় আদান করিতেছে, আবার প্রকারান্তরে প্রদানও করিতেছে, সুতরাং বলা বাহুল্য যে নদ্যাদি সম্বন্ধেও এই নৈসর্গিক নিয়ম সৃষ্টির প্রারম্ভাবধি অপ্রতিহতরূপে চলিয়া আসিতেছে। কদাপি ইহার ব্যত্যয় সম্ভবে না। এই বিশাল বিশ্বরাজ্যের যে দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ কর, সর্ব্বত্রই সামঞ্জস্য বিরাজমান দেখিতে পাইবে। অতি ক্ষুদ্র হইতে অতি বৃহৎ পর্য্যন্ত, সকলেই সেই বিধাতৃ বিহিত নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট সীমায় অবস্থানান্তর কালযাপন করিতেছে। সাধ্য কি যে তাহা কেহ অতিক্রম করে! কারণ, জগদীশ্বরের নিয়মের অন্যায়াচরণ করা কাহারই সাধ্যায়ত্ত নহে। কি অনলে, কি সলিলে, কি অনিলে, কি নভোস্থলে, সর্ব্বত্রেই তাঁহার অচিন্ত্য অনির্ব্বচনীয় কীর্ত্তি দেদীপ্যমান রহিয়াছে, সর্ব্বত্রেই তাঁহার অভাবনীয় ঐশীশক্তি বিশদরূপে পরিপুষ্ট হইতেছে। সামান্য বুদ্ধি মনুষ্যর সাধ্য কি যে তাহা অবগত হয়।

নদ্যাদির জলাপেক্ষা সমুদ্রবারি যে এত বিস্বাদ তাহার কারণ, লবণ, চূণ, ম্যাগনেসিয়া প্রভৃতি বিবিধ পদার্থ সমুদ্রবারিতে নিত্য সংশ্লিষ্ট থাকিয়া ইহার জল কলুষিত করিতেছে। নদ্যাদির স্বাদু সলিলেও ইহাদের কোন কোনটীর বিদ্যমানতা প্রতীয়মান হয় বটে কিন্তু তাহার অংশ নিতান্ত অল্প। আবার কোন কোন জলভাগে লবণ, গন্ধক এবং গন্ধকধর্ম্মী বিবিধ খনিজ পদার্থ এত অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান রহিয়াছে যে, তাহাদের জল পানকরা দূরে থাকুক, তাহাদের গর্ভে কোন প্রকার জীব জন্তু বাস করিতে সমর্থ হয় না। মরু, আরল প্রভৃতি ইহার প্রকৃত দৃষ্টান্ত স্থল। আধুনিক ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে এবম্বিধ জলভাগের নিম্নদেশে অবশ্যই কোন উৎসের বা আগ্নেয়গিরি গহ্বরের অবস্থান সম্ভব। যাহাহইতে গন্ধক এবং গন্ধকধর্ম্মী খনিজ পদার্থ সমূহ সময়ে সময়ে প্রভূত পরিমাণে নির্গত হইয়া থাকে। সমুদ্রের কোন কোন স্থানের জল যে সময়ে সময়ে সজোরে উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া থাকে; সমুদ্র গর্ভস্থ উৎস বা আগ্নেয়গিরি গহ্বর সংস্থাপনই তাহার মূল কারণ। অপিচ অস্মদেশীয় শাস্ত্রকারেরা গ্রন্থ বিশেষে যে "বাড়বাগ্নির" উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাও বোধ হয় সমুদ্রস্থ কোন আগ্নেয়গিরির অগ্নি দৃষ্টে কল্পিত হইয়া থাকিবে।

ইতিপূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে সমুদয় জলেরই আদি কারণ সমুদ্র। এই সমুদ্রে কত জল আছে তাহা পরিমাণ করা বড়ই দুরূহ; তবে এ সম্বন্ধে

পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, সমুদয় সমুদ্রবারি যদ্যপি শুষ্ক হইয়া যায়, তাহা হইলে যে সমুদয় স্রোতস্বতীর জল এক্ষণে প্রবলবেগে ইহাতে নিপতিত হইতেছে, সেই সমুদয় প্রবল প্রবাহ একাদিক্রমে ২০ হাজার বৎসর নিপতিত না হইলে ইহা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই; সুতরাং সমুদ্রবারি একপ্রকার অমেয় বলিলেও বলা যায়।

তেজঃ প্রভাবে সকল বস্তুরই আয়তন বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত। পৃথিবীস্থ যাবতীয় জড়পদার্থ পরমাণু সমষ্টি; এবং যখন দেখা যাইতেছে যে, সেই পরমাণুসমূহ শীতল হইলেই ঘনীভূত ও সঙ্কুচিত হয় এবং উত্তপ্ত হইলেই পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া বিস্তৃত হইয়া পড়ে, তখন জড়পদার্থ মাত্রেই যে তেজদ্বারা বর্দ্ধিতায়তন হইবে তাহার আর সন্দেহ কি? এই হেতুই উত্তাপ দ্বারা জলের আয়তন বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, এই হেতুই অগ্নি সংযুক্ত বারুদ, গুলি গোলা সমূহকে অতি দূরে নিক্ষেপ করে। এবং এতাদৃশ বর্দ্ধনের পরিমাণই বা কি তাহাও পণ্ডিতগণ পরীক্ষা দ্বারা নির্ণয় করিয়াছেন। "দৈর্ঘ্য প্রস্থে ও উচ্চতায় একবুরুল প্রমাণ স্থানে যত জল ধরে, তাহাতে তদ্রূপ ১৭২৮ বুরুল প্রমাণ বাষ্প প্রস্তুত হইতে পারে। অতএব অগ্নির উত্তাপে জলের আয়তন ১৭২৮ গুণ বৃদ্ধি হইয়া থাকে।" জল অধিক উষ্ণ হইলে বাষ্প হইয়া উড়িয়া যাইতে থাকে, এবং অধিক শীতল হইলে জমিয়া বরফ হয় আবার বরফ উষ্ণ হইলেই জল হয়; সুতরাং জল, বরফ এবং বাষ্প এ তিনই এক পদার্থ।

. কি হিমশিলা, কি শিলাবর্ষণ, কি নীহার বৃন্দ, কি কুজ্ঝটিকা, কি-উড্ডীন মেঘাবলি সকলেরই আদি কারণ, জল। এই জন্যই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া এই সমুদয় উৎপাদন করিয়া থাকে। পদার্থের ঈদৃশ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা কেবল পরমাণু সমুহের সংযোগ বিয়োগ দ্বারা সংঘটিত হয়।

শরীরে স্বাস্থ্য বিধানার্থ বিশুদ্ধ বায়ু যেমন প্রয়োজনীয়; নির্ম্মল জল ও তদ্রূপ, কিন্তু হায়! অনেকে তাহা বুঝে না। এবং অনেকে অবগত হইয়াও তৎপ্রতিপালনে যত্নবান হন না, একি সামান্য শোচনীয় বিষয়! আমাদিগের প্রাচীন আর্য্যগণ ইহার সম্যক্ উপকারিতা ও উপযোগীতা বিশেষরূপে অবগত হইয়া তদানুযায়ী কার্য্য করিতে যে বদ্ধ পরিকর ছিলেন, তাহা তাঁহাদের রচিত গ্রন্থ নিচয় পাঠে সবিশেষ অবগত হওয়া যায়। পাঠকগণের গোচরার্থে আগামী বারে সেই সমুদয় প্রকটন করিবার সম্পূর্ণ বাসনা রহিল। বলা বাহুল্য যে সেই পূজ্য মহাজনদিগের বাক্য উপেক্ষা করায় ভারতের আজ এত দুরাবস্থা, তাই কি ধনী, কি নির্ধনী, কি সমর্থ, কি

অসমর্থ, কি প্রৌঢ়, কি বৃদ্ধ, কি বালক, কি যুবক সকলেই অকালে কালের করাল গ্রাসে সমাহিত হইতেছে।

ক্রমশঃ

শ্রী রাধিকা প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

---*---

আয়ূর্ব্বেদ।

১

সংক্রামক জ্বর।

অধুনা বঙ্গদেশের অবনতির মূল কারণ—সংক্রামক জ্বর; এক জ্বরেই দেশের যে কি অনিষ্ট করিয়াছে, তাহা ভাবিলেও হৃৎকম্প হয়, যে পল্লীগ্রাম অগ্রে বহুজন-সমাকীর্ণ সুখ-নিকেতন ছিল, তাহা এক্ষণে শ্মশানে পরিণত হইয়াছে, যেখানে গ্রাম্য লোকের বিশ্রামের আমোদের স্থান ছিল, সেখানে শিবাদল আনন্দে ক্রীড়া করিতেছে কত প্রাসাদ ভগ্ন—কত রম্য উপবন ভয়সঙ্কুলবন-সমাচ্ছন্ন; পাঠক! —যদি কখন পল্লীগ্রামে গিয়া থাক, যদি পল্লীগ্রামে তোমার নিবাস হয়, সহজেই উপলব্ধি হইবে,—সে ছবি স্মরণ করিলে ভাবী উন্নতির সকল আশা নষ্ট হইবে।

"সংক্রামক জ্বরের কারণ কি?" তাহা স্থির নিশ্চয় করা সুকঠিন; কত রাসায়নিক পণ্ডিত কত অনুসন্ধিৎসু বুদ্ধিমান্ এ বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়া কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই, আর আমরা তাহার কি নূতন তত্ত্ব উদ্ভাবন করিব? তথাপি আমাদের স্থির বিশ্বাস এই জ্বরসন্তপ্ত ভারতে এ বিষয়ের যত আন্দোলন হয় ততই ভাল, এই আন্দোলনের মধ্য হইতে এক দিন না একদিন গূঢ় সত্য তত্ত্বের উদ্ভাবন হইবে।

যখন আমাদের দেশে স্বাস্থ্যের অবস্থা ভাল ছিল, তখন বর্ষা, শরৎ ও বসন্ত কালেই জ্বর হইত; তন্মধ্যে শরৎকালে কার্ত্তিক মাসের জ্বরেই অনেকে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতেন। এই জন্যই * কার্ত্তিক মাসের ৮ই হইতে অগ্রহায়ণ মাসের

* কার্ত্তিকস্য দিনানষ্টাবষ্টারগ্রহায়ণস্য চ,
যমদংষ্ট্রাইতিখ্যাতা লাঘবাহারী স জীবতি।

৮ই পর্য্যন্ত "যমদংষ্ট্রা" বা "যমাষ্টকা" নামে খ্যাত; প্রবাদ আছে,—সেই সময়ে যমের আটদ্বার খোলা থাকে, এই প্রবাদই আমাদের দেশের সেই সময়ের জ্বরের ভীষণতার সাক্ষ্য দিতেছে।—সেই শরৎকালেই আমাদের দেশে প্রথম সংক্রামক জ্বরের সৃষ্টি হয়। বর্ষাকালের বৃষ্টিতে জলবায়ু দূষিত হইয়া সেই সময় হইতেই জ্বরের আরম্ভ হইয়া থাকে। পূর্ব্বে এই বঙ্গদেশের অধিকাংশ স্থানেই প্রবলা নদী ছিল, বর্ষার জল সমস্ত সেই নদী স্রোত বর্দ্ধিত করিত। স্বাভাবিক নিয়মে সকল দেশেই জল-নির্গমের পথ ছিল;—ক্রমশঃ নদী সকল শুষ্কা হইল, জল আর রীতিমত বাহির হইতে না পাইয়া পচিয়া এই বিষম জ্বরের প্রাবল্যতা করিয়াছে। জল ও বায়ু মনুষ্যজীবনের প্রধান উপকরণ; এই জন্যই আর্য্যভাষায় জলের নাম জীবন ও বায়ুর নাম জগৎ-প্রাণ। তাহার অন্যতম বিকৃত হইলেই যে স্বাস্থ্যের অপচয় করিবে ইহা সহজবুদ্ধির অনুমোদিত। আয়ুর্ব্বেদ বলিয়াছেন,—

"ভূবাষ্পান্মেঘনিষ্যন্দাৎ পাকাদম্লজলস্য চ।
বর্ষাস্বগ্নিবলে হীনে কুপ্যন্তি পবনাদয়ঃ।"

মেঘের ক্ষরণে অম্ল জলের পাকে ভূবাষ্পহেতু (গ্যাস জন্য) বর্ষাকালে অগ্নি-বল হীন হইলে পবনাদি কুপিত হয়।" এই বচন অনুধাবনা করিলে স্পষ্ট বোধ হইবে, যাহাতে জলের অম্লপাক না হয়, যাহাতে ভূবাষ্পের অনিষ্টকরী শক্তির হ্রাস হয়। তাহার চেষ্টা করিলেই স্বাস্থ্যের উন্নতি হইবে।

প্রথম যে যে দেশে সংক্রামক জ্বরের সৃষ্টি হয়, তথায় প্রায়ই নদীর চর হইয়া তবে জ্বরের সৃষ্টি হইয়াছে।

প্রথম হুগলি জেলার কেদারবাসিনী নাম্নী নদীতে চর পড়িয়া গোপালনগর পরে দ্বারবাসিনীতে সংক্রামক জ্বরের সৃষ্টি হয়। পরে অল্পে অল্পে সরস্বতীনদীর উভয় পার্শ্বে সেই জ্বরের প্রাবল্যতা হইয়া নদীয়া জেলায় উহার সঞ্চার হয়। উলার নিম্নে চূর্ণীনদীর চর এক প্রত্যক্ষ কারণ। কাঁচরাপাড়া প্রভৃতিতে গঙ্গার চর পড়িয়া পরে জ্বরের প্রাবল্যতা ঘটে। চর পড়িল,—গ্রামের জল আর স্রোতে মিশাইতে না পাইয়া কতক গ্রামে, কতক চরে আবদ্ধ রহিল। বর্ষার প্রাবল্যতায় নদী আবার পূর্ব্বের অবস্থা ধারণ করিয়া সেই চর প্লাবিত করিয়া নানা দ্রব্য পচাইয়া বিষময় করিয়া তুলিল,—সুতরাং জ্বরও অবকাশ পাইয়া প্রবলবেগে আক্রমণ করিল। জ্বর স্বাভাবতই সংসর্গজ, একে সে সময়ে সেই অপরিস্কৃত পূতি-জলের ও তজ্জনিত বিষময় ভূ-বাষ্পের জন্য সকলেরই শরীর অস্বাস্থ্যময়, তাহাতে জ্বরের সংসর্গ—সুতরাং সকলেরই জ্বরের আক্রমণ জন্য অনিষ্ট ঘটে। আয়ুর্ব্বেদ সংসর্গজ

রোগ নির্দ্দেশ-স্থলে প্রথমেই জ্বরের উল্লেখ করিয়াছেন। * জ্বরমাত্রেই সংসর্গজ তাহাতে বায়ু জল ও দুর্ব্বাষ্পের বিকৃতিজনিত বিষময় জ্বর যে প্রবল সংক্রামক হইবে ইহা সহজেই উপলব্ধি হই[illegible] পারে। সংক্রামক জ্বর প্রথমে নূতন জ্বরের আকারে আমাদের দেশে উপস্থিত হয়। তাহাতে শারীরিক যন্ত্র সকল পূর্ব্ব হইতে দূষিত থাকিলে অতি সহজেই জ্বরের বিকৃতি ঘটিয়া বিষম অনিষ্ট করে; অথবা নবাবিষ্কৃত "এলোপেথী" চিকিৎসার বলে শীঘ্র জ্বর ত্যাগ করাইবার চেষ্টা করিলেই—বিষম জ্বর ঘটে। পূর্ব্বে এরূপ জ্বরে আমাদের দেশে যে পথ অবলম্বিত হইত এক্ষণে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত মত অবলম্বন করা হয়। ভিন্নদেশীয়,ভিন্ন প্রকৃতির পরীক্ষিত ঔষধে অনেক স্থলে বিষম অনিষ্ট ঘটে, অনেক স্থলে ঔষধের গুণেই রোগীর অবস্থা মন্দ হয়। জ্বর হইল—উপবাস কর, অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে একথা বলিলে রোগী কিছুই খাইতে পাইবে না, এই কথাই বুঝাইত, এখন সে উপবাস নাই, দুগ্ধ, সাগু, এরোরুট, বার্লি, আনারস, প্রভৃতি আহার উপবাসের মধ্যে গণ্য হইয়াছে। বাঙ্গালীর দুগ্ধই বলকর আহার, সেই দুগ্ধই যদি যথেষ্ট পান চলিতে লাগিল, তাহা হইলে উপবাস কি হইল আমাদের স্থূলবুদ্ধি বলিয়া দিতেপারে না। যে দেশের চিকিৎসা সে দেশের পক্ষে দুগ্ধপান উপবাস বলিয়া গণ্য হইতে পারে। মাংসই যাহাদিগের প্রধান খাদ্য, তাহাদের পক্ষে সামান্য দুগ্ধ অবশ্যই উপবাসের মধ্যগত; কিন্তু উদ্ভিজ্জাহারী দুর্ব্বল বঙ্গবাসীর পক্ষে দুগ্ধ পান যদি উপবাস-গণ্য হয়, তাহা হইলে আর আহার কাহার নাম? পরে ঔষধ—জ্বরের একটু বাহুল্যতা বোধ হইলে আধুনিক ইংরাজী চিকিৎসার মতে সুরাই প্রধান ঔষধ। সুরা যে শারীরিক উষ্ণতা রক্ষাকারী তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য কিন্তু সুরা অনেক স্থলে যে বিশেষ অপকার করে তৎপ্রতি সন্দেহাভাব। অনেক স্থানে সামান্য জ্বরীচিকিৎসার গুণে প্রবল রোগী আছে; আমাদের দেশের যে অবস্থা তাহাতে সকল জ্বরের সকল অবস্থায় সুরা সমূহের উপযোগী কি না? কয় জন বিবেচনা করেন! আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা অত্যন্ত কোমল প্রকৃতির, কোনরূপ মাদক দ্রব্যের সামান্য সেবনেই তাহাদের মত্ততা জন্মে, সামান্য জ্বরের আশঙ্কায় তাহাদিগকে যদি অনবরত সুরা প্রদত্ত হয়, তাহাহইলে তাহাদিগের জ্ঞান লোপ হয়, প্রলাপ প্রকাশ পায়। চকিৎসক মস্তিষ্ক দূষিত বলিয়া মস্তকে জল দিতে আরম্ভ করেন, গ্রীবায় "প্লষ্টার" বসাইয়া দেন, আর কেনা তাহাকে দেখিয়া বলিবেন ঘোর বিকার হইয়াছে?

ক্রমশঃ—

শ্রীনৃপেন্দ্র কুমার রায়।

---

* প্রসঙ্গাদ্‌গাত্র সংস্পর্শাৎ নিঃশ্বাসাৎ সহভোজনাৎ।
একশয্যাগনাশ্চৈব বস্ত্রমাল্যানুলেপনৎ॥
কুষ্ঠং জ্বরশ্চ শোষশ্চ নেত্রাভিষ্যন্দ এব চ,
ঔপসর্গিকরোগশ্চ সংক্রামন্তি নরান্নরং॥

মরুৎতত্ত্ব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

পুনরায় তরল পদার্থ বাষ্পাকারে পরিণত হইলে অনেক পরিমাণে উত্তাপ লুপ্ত-ভাবে গ্রহণ করে, ইহাকে বাষ্প হওনের লুপ্ত উত্তাপ কহে। এই তরল পদার্থ বাষ্পাকারে থাকিবার জন্য এই উত্তাপের আবশ্যক। জল বাষ্প হইবার সময় এইরূপে উত্তাপ গ্রহণ করে। ১০০ সেন্টিগ্রেড্ উত্তাপে হইলে জল বাষ্প হয় কিন্তু সেই উত্তাপ প্রাপ্ত হইবার জন্য।

১০০ বাষ্প = ১০০ জল + লুপ্ত উত্তাপ—

পুনরায় বাষ্প ঘনীভূত হইয়া জল হইলে এই উত্তাপ পরিত্যক্ত হয়। অনেকেই অবগত আছেন যে অনেক সময় বৃষ্টি হইবার কিছু পূর্ব্বে হঠাৎ অত্যন্ত গ্রীষ্ম বোধ হয়। তাহার কারণ এই যে জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হইয়া মেঘ উৎপন্ন করিয়া পরে জল কণায় পরিণত হয়। (এবং অল্পক্ষণেই বৃষ্টি হইয়া পড়িতে থাকে। জলীয় বাষ্প এই সময় লুপ্ত উত্তাপ পরিত্যাগ করে।)

মরুৎতত্ত্ব সম্বন্ধীয় ঘটনা সকল উত্তমরূপে বোধগম্য হইবার জন্য পদার্থ দর্শনের কয়েকটী নিয়ম আলোচনা করা হইবে এক্ষণে এই বিষয়টীকে নিম্নলিখিত কয় ভাগে বিভক্ত করিয়া একে একে তাহা বর্ণনা করা যাইবে। যথা

১। বায়ুর তাপ পরিমাণ।

২। বায়ুর বাষ্প পরিমাণ।

৩। বায়ুর গতি পরিমাণ।

৪। বায়ু সম্বন্ধীয় অন্যান্য ঘটনা।

বায়ুর তাপ পরিমাণ।

যে যন্ত্রদ্বারা বায়ুর তাপ পরিমাণ নির্দ্দেশ করা হয় তাহাকে তাপমান যন্ত্র বলে; প্রথমতঃ তাহার প্রস্তুত প্রণালী বর্ণন করা যাইবে। তৎপরে তাহা কিরূপে ব্যবহার করিতে হয় বলা যাইবে।

শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

—✱—

তত্ত্বসংগ্রহ।

ষ্টাণ্ডার্ড পত্রিকার নিউইয়র্কস্থিত সংবাদদাতা বলেন যে সম্প্রতি নিউইয়র্ক ও চিকাগো নামক নগরদ্বয়ের মধ্যে টেলিফোনের পরীক্ষা করা হইয়াছে; উক্ত দুইটী নগরের ব্যবধান সহস্র মাইল। এত দূরবর্ত্তী স্থানদ্বয়েরমধ্যে এপর্য্যন্ত টেলিফোনের পরীক্ষা হয় নাই; পরীক্ষকগণ সম্পূর্ণরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছেন। বিজ্ঞানের উন্নতি সহকারে মনুষ্যের ক্ষমতা কতদূর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে তাহা কে বলিতে পারে?

স্ত্রীলোকদিগের গর্ভাবস্থায় সময়ে সময়ে জ্বর হইয়া থাকে; ঐ প্রকার জ্বরাবস্থায় দুধাগ্নি লতার কাঁচা পাতার (দুই আনা ওজন পরিমিত) রস দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া তিন দিবস একবার করিয়া সেবন করিলে তিনদিনেই জ্বর আরোগ্য হইবে। লতা যদি শুষ্ক হয় তাহাহইলে উহার পালো গরম দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া খাইতে হইবে। এই ঔষধ আমরা ব্যবহার করিয়া ইহার সদ্গুণের প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছি।

কৃত্রিম মধু। দেড়পোয়া বিশুদ্ধ জলে চারিসের উৎকৃষ্ট চিনি, তিন কাঁচ্চা আন্দাজ ফটকিরি মিশ্রিত করিয়া পরে দেড়পোয়া আলকোহল ও পাঁচ ফোঁটা গোলাপী তৈল মিশাও তাহা হইলে স্বাদজনক ও হিতকারী মধুরন্যায় দ্রব্য প্রস্তুত হইবে।

London Journal.

ইউনাইটেড্‌ষ্টেটে সর্ব্বশুদ্ধ ২৮ টী দেশালাই প্রস্তুত করিবার কারখানা আছে; দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে এখন পর্য্যন্ত একটী কারখানাও স্থাপিত হয় নাই।

কপিশাকের পোকানষ্ট করিবার উপায়!—একপোয়া (Hard Soap) কঠিন সাবান এবং একপোয়া কেরোসিন তৈল এক গ্যালন জলের সহিত মিশ্রিত কর। ঐ মিশ্রিত জল মধ্যে মধ্যে কপিশাকের উপর ক্ষেপণ করিলে সকল পোকা নষ্ট হইয়া যাইবে। গত আগষ্ট মাসে আমেরিকানেরা ইহার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, যে কপিশাকের পোকা নষ্ট করিবার ইহাই অতি উত্তম উপায়।

তরঙ্গাকুল সমুদ্রে তৈল নিক্ষেপ করিলে সমুদ্র শান্ত ভাব ধারণ করে। কিছুদিন হইল এবারডীন্ বন্দরে ২৮০ গ্যালন তৈল পরীক্ষার্থে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল; এই পরীক্ষা সফল হইয়াছিল।

বরফ বহুক্ষণ রাখিবার উপায়;—বরফের খণ্ডকে উত্তমরূপে কম্বলে জড়াইয়া যথায় বায়ুর চলাচল নাই এরূপ স্থানে ঝুলাইয়া রাখ; তাহা হইলে বরফ অতি অল্পে অল্পে গলিবে; কারণ প্রথমতঃ কম্বল উত্তম তাপ পরিচালক নহে এবং দ্বিতীয়তঃ ও প্রধানতঃ বরফ হইতে গলিতজল প্রায়সমস্তই কম্বলের উপরের ভাঁজ হইতে বাষ্পাকারে পরিণত হইতে থাকিবে; বাষ্পাকারে পরিবর্ত্তিত হওন কালে উক্তজল চতুর্দ্দিকস্থ বায়ু হইতে অনেক তাপ গ্রহণ করিবে; সুতরাং বায়ু এত শীতল হইবে, যে বরফ শীঘ্র গলিবে না।

Scientific American.

সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

সরোজ-বাসিনী—উপন্যাস—শ্রীব্রজনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য মহৎ। আজ কাল যেমন তেমন একটা গল্প লিখিয়া লোকে গ্রন্থকার নামে পরিচিত হইতে ইচ্ছা করেন। গ্রন্থকারের সেইরূপ ইচ্ছা নাই বলিয়া বোধ হয়। ইনি বাস্তবিক আমাদের সমাজের দুর্গতি দেখিয়া ব্যথিত হইয়াছেন। এবং আপনার মনের ভাব স্থানে স্থানে বিলক্ষণ প্রকাশ করিয়াছেন। ব্রজনাথ বাবুর উদ্দেশ্য মহৎ হইলেও তাঁহার লেখা প্রাঞ্জল ও মনোহর হয় নাই। এবং সকল চরিত্র গুলি সুন্দররূপে সাজাইতে পারেন নাই।

কুসুম-কানন। শ্রীঅধরলাল সেন বি, এ. বিরচিত। এই পুস্তক খানিতে ১৬টি কবিতা সন্নিবেশিত। কবিতা গুলি ইংরাজিকবি মুর ও বাইরণের ধরণে লেখা। সচরাচর ইংরাজি ভাব লইয়া কবিতা লিখিলে যেরূপ শ্রুতিকঠোর হইয়া পড়ে, অধর বাবুর কবিতা গুলিতে সে সকল দোষ নাই। সকল গুলিই সরস ও মিষ্ট। প্রেম যে কি পদার্থ কবি বিলক্ষণ বুঝিয়াছেন এবং অপরকে উহা বুঝাইয়া দিতে তিনি বিলক্ষণ পটু। ইচ্ছা ছিল কয়েক স্থান উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণকে উপহার দিই কিন্তু স্থানাভাব বশতঃ সে বিষয়ে ক্ষান্ত হইলাম। সকল কবিতা গুলিই মিষ্ট হইলেও "কোথা থাকে সুধাকর" আমাদের বিশেষ ভাল লাগিয়াছে। ইহার কিয়দংশ উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

কোথা থাকে সুধাকর, হাসে কুমুদিনী
পুলকিত মনে,
কোথা থাকে দিনকর, দোলে কমলিনী
সহাস বদনে,
কোথা থাকে জলধর, হাসে চাতকিনী
প্রেমের পরশে,
প্রেমের তরঙ্গ ঢলে, পড়ে লো তরঙ্গিনী
সাগর উরসে,
নাহি দূর নাহি কাল, সবে ভাল বাসেরে
মরত ভুবনে
তবে কেন আমি ভাল, বাসিব না তোমারে
লো বিধু বদনে।

গীতি কবিতা—১ম হইতে ৪র্থভাগ। শ্রী গোবিন্দ চন্দ্র রায় বিরচিত। চিত্তরঞ্জিনী সাহিত্য সভা হইতে প্রকাশিত। অধিকাংশ কবিতাগুলিই সুরলয়ে গঠিত। কবিতা গুলির মধ্যে "ভারত বিলাপ" ও "যমুনালহরী" এই দুইটী হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।

সচিত্র

বিজ্ঞান-দর্পণের অনুষ্ঠান-পত্র।

ভূমণ্ডলের যাবতীয় পদার্থপুঞ্জের প্রাকৃতিক কার্য্যসমূহ নিরীক্ষণ করিয়া স্থিরচিত্তে পর্য্যালোচনা করিলে, অন্তঃকরণে অপূর্ব্ব রসের সঞ্চার হয়, এবং এই আশ্চর্য্য ব্যাপারসকল কি নিয়মে সম্পন্ন হইতেছে, তাঁহা অবগত হইবার নিমিত্ত কাহার না কৌতূহল জন্মে? এই নিয়মসমূহেরই বিশিষ্টজ্ঞানকে প্রাচীন আর্য্যগণ বিজ্ঞান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পুরাকালে ভারতবর্ষে বিজ্ঞান শাস্ত্রের যথেষ্ট সমাদর ও আলোচনা ছিল, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ অদ্যাপিও দেদীপ্যমান রহিয়াছে। জ্যোতিষ, বীজগণিত, রেখাগণিত, ক্ষেত্রতত্ত্ব, পরিমিতি, ত্রিকোণমিতি, স্থপতিবিদ্যা, আয়ুর্ব্বেদ, সামুদ্রিক, রসায়ন, উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব, সঙ্গীত, মনোবিজ্ঞান, আত্মতত্ত্ব, দর্শন, বেদান্ত, তন্ত্র, যোগ, স্মৃতি, নীতিজ্ঞান, ন্যায়, অলঙ্কার, রাজ্যজ্ঞান প্রভৃতি বহুবিধ শাখা বহুদূর বিস্তীর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু আমাদের ভাগ্যদোষে অথবা অবস্থা-বৈগুণ্যে তৎসমস্তই লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। এক্ষণে কালসহকারে দিন দিন লোকের জ্ঞান-পিপাসা যেরূপ বর্দ্ধিত হইতেছে, তাহাতে ভারত-বর্ষীয়গণের পক্ষে বিজ্ঞানের শিক্ষা ও অনুশীলন করা নিতান্ত আবশ্যক বিবেচনায় আমরা উন্মত্ততাবশতঃ এককালে বালক, বৃদ্ধ, যুবা বা শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণবাদি সকলপ্রকারের লোককে স্বজাতীয় ও বিজাতীয় শাস্ত্র সকলের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও যথার্থ মর্ম্ম সকল অবগত করিবার অভি-লাষে নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি দেশীয় সুবিখ্যাত পণ্ডিত ও লেখকগণের সাহায্যে মাসিক চারিফর্ম্মা রয়েল আট পেজীর আকারে আবশ্যক-মত চিত্রসহিত মুদ্রিত করিয়া সাধারণকে সন্তুষ্ট করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি। এপ্রকার দুরূহ বিষয়ে কৃতকার্য্য হওয়া আমাদের ন্যায়

সামান্য ও নিঃস্ব ব্যক্তির সাধ্যায়ত্ত নহে। এবং বহুদিনের পরিদর্শনও আমাদিগের বিলক্ষণ প্রতীতি হইয়াছে, যে আমাদের দেশীয় ধনিলোকসম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেরই স্বদেশের প্রতি অনুরাগ ও স্বদেশীয়গণের হিতকামনায় আস্থা নাই, যাঁহাদের আছে তাঁহাদের সংখ্যা সমধিক নহে। তবে মধ্যবিত্ত গ্রাহক ও পাঠকগণ যথাসাধ্য অর্থাদি ব্যয়ে পুস্তকাদি ক্রয় করেন এবং তাহা পাঠ করিয়া, গ্রন্থকর্ত্তার উৎসাহ বর্দ্ধন ও তৎপ্রতি বহুমান প্রদর্শন করিয়া থাকেন। যাহা হউক যতদূর সাধ্য উল্লিখিত অভিলাষ সিদ্ধ করিবার আশয়ে "ভালর মন্দও ভাল" এই প্রকার যুক্তি ও সাহসের উপর নির্ভর করিয়া এই দুঃসাধ্য অধ্যবসায়ে আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছি। গ্রাহক ও পাঠকগণের উৎসাহ ভিন্ন যে আমরা কোন ক্রমেই কৃতকার্য্য হইব না, ইহা বলা বাহুল্য; কারণ নিয়মিত গ্রাহকগণই এতাদৃশ পত্রের জীবন। নিয়মানুসারে মূল্য আদায় না হইলে, কোন মতেই ইহার স্থায়িত্বের সম্ভাবনা নাই। গ্রাহকগণের যাহাতে ক্ষতিবোধ না হয়, তজ্জন্য প্রতিখণ্ডের মূল্য মাসিক চারি আনা ধার্য্য করা হইল। এই রূপ দুরূহ কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইলে, অর্থই প্রধান সহায়, অতএব ভারতের শুভানুধ্যায়ী ও উন্নতিবিধায়ক জনগণের নিকট বিনীতভাবে আমরা প্রার্থনা করিতেছি, যে তাঁহারা প্রতি-মাসে অথবা এককালীন কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থ-সাহায্য দ্বারা এই হিতকর পত্রখানির জীবন দান করিয়া, আপনাদের অতুল কীর্ত্তি রক্ষা করুন। যাঁহারা সাহায্য দান করিবেন, তাঁহাদের নাম বিজ্ঞান-দর্পণে প্রকাশিত হইবে।

বিজ্ঞান-দর্পণে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রকাশ করাই আমাদিগের প্রকৃত ও প্রধান উদ্দেশ্য।

১ জ্যোতিষ-শাস্ত্র
২ সামুদ্রিক
৩ প্রাকৃতিক ভুগোল
৪ আবহ-বিজ্ঞান
৫ কাল-জ্ঞান
৬ ভূবিজ্ঞান
৭ খনিজ-বিজ্ঞান
৮ ধাতু-বিজ্ঞান
৯ প্রাণি-বিদ্যা
১০ রসায়ন
১১ উদ্ভিদ্বিদ্যা
১২ ভেষজ-বিদ্যা
১৩ শারীর-বিদ্যা বা দেহতত্ত্ব
১৪ ধাত্রী-বিদ্যা
১৫ অস্ত্র-চিকিৎসা
১৬ সমসংস্থান বা জড়-বিজ্ঞান
১৭ অসমসংস্থান বা গতি-বিজ্ঞান
১৮ তরল-সমসংস্থান
১৯ তরল-অসমসংস্থান
২০ বায়ু-বিজ্ঞান
২১ শব্দ-বিজ্ঞান
২২ দৃষ্টি-বিজ্ঞান
২৩ তাপ-বিজ্ঞান
২৪ স্বরোদয়
২৫ যন্ত্র-বিদ্যা
২৬ বাষ্পীয়-যন্ত্র
২৭ তড়িৎ-বিজ্ঞান
২৮ তড়িৎ-অসমসংস্থান
২৯ চুম্বকাকর্ষণ
৩০ তড়িৎ-চুম্বকাকর্ষণ
৩১ পাটীগণিত
৩২ বীজগণিত
৩৩ ক্ষেত্রতত্ত্ব
৩৪ ত্রিকোণমিতি
৩৫ পরিমিতি
৩৬ বৈলক্ষণ্যপূরিত-গণিত
৩৭ স্থপতি বা নির্ম্মাণ-বিদ্যা
৩৮ জাতিতত্ত্ব
৩৯ কৃষিতত্ত্ব
৪০ ভাষাজ্ঞান
৪১ রাজ্য-বিজ্ঞান
৪২ রাজনীতি
৪৩ অর্থব্যবহার
৪৪ আত্মতত্ত্ব
৪৫ সমাজতত্ত্ব
৪৬ মনোবিজ্ঞান
৪৭ নীতিতত্ত্ব
৪৮ ধর্ম্মতত্ত্ব
৪৯ মস্তিষ্কতত্ত্ব
৫০ যোগশাস্ত্র
৫১ ন্যায় বা তর্কশাস্ত্র
৫২ বাণিজ্য-বিজ্ঞান

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সাধু।
প্রকাশক।
নং৫ দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি।
কলিকাতা।

শ্রীপ্রাণানন্দ কবিভূষণ।
সম্পাদক।

সচিত্র

বিজ্ঞান-দর্পণ।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

" বিজ্ঞানম্ হি বলং নৃণাং। "

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২।।০ টাকা ডাকমাসুল ।৵০ আনা।

এত অল্প মূল্যে এরূপ সারগর্ভ ও হিতকর মাসিক পত্রিকা আর নাই।

কতিপয় লব্ধ প্রতিষ্ঠ লেখক ও বিজ্ঞানবিৎ বি এ, এম এ ও এম বি দিগের সাহায্যে সন ১২৮৯ সাল হইতে নিয়মিতরূপে প্রতিমাসে প্রকাশিত হইতেছে।

"বিজ্ঞান দর্পণের" উদ্দেশ্য কি আমাদিগের নিজমুখে প্রকাশ না করিয়া শ্রদ্ধাস্পদ "আর্য্য দর্শন" সম্পাদক যাহা বলিয়াছেন তাহাই এস্থলে আমরা উদ্ধৃত করিলাম।

"বিজ্ঞান-দর্পণ" একটী বিশেষ অভাব মোচন জন্য কৃতসঙ্কল্প। যে বিজ্ঞানের চর্চা ভিন্ন আমাদের নিষ্কৃতির অন্য উপায় নাই, সেই বিজ্ঞানের প্রভূত পরিশীলনার নিমিত্ত এই পত্রের আগ্রহ। বাঙ্গলা ভাষায় পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের অন্তর্মর্ম্ম যতই নিষ্কাশিত হইবে, ততই আমাদের শুভদিন নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিবে। এই কারণেই এই পত্রিকা খানিকে বিশেষ আনন্দের সহিত গ্রহণ করিলাম। * * * যাহাতে পত্র খানি স্থায়ী হইতে পারে, তদুদ্দেশে আমাদের প্রত্যেকেরই যথাসাধ্য প্রয়াস স্বীকার করা কর্ত্তব্য।" * * * * *

আমরা একবৎসর কাল "বিজ্ঞান-দর্পণ" প্রচার করিয়া দেখিলাম সাধারণ লোকের বিজ্ঞানের প্রতি তাদৃশ আস্থা জন্মে নাই। বিজ্ঞান-দর্পণের উদ্দেশ্য সাধিত করিতে হইলে এবং বিজ্ঞান-দর্পণকে সাধারণের পাঠ্য করিতে হইলে, বিজ্ঞানের সহিত সাহিত্য বিষয়ক সুকুমার প্রবন্ধ এবং মনোহর উপন্যাস ও কাব্য মিশ্রিত করা আবশ্যক। কিন্তু বিজ্ঞান-দর্পণে এ পর্য্যন্ত সেরূপ পদ্ধতি অবলম্বিত হয় নাই। এক্ষণে তাহার আবশ্যকতা বিবেচনায়, বিজ্ঞান-দর্পণে অতিরিক্ত দুই ফর্ম্মা উপন্যাস প্রভৃতির জন্য সংযোজিত হইবে।

এই অতিরিক্ত দুই ফর্ম্মা বিজ্ঞান-দর্পণের সহচরী স্বরূপ হইবে, ইহার নামও "সহচরী" থাকিবে।

সংক্ষেপতঃ বিজ্ঞান-দর্পণে বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, উপন্যাস, কবিতা ইত্যাদি সকল বিষয়ের আলোচনা করা হইবে।

পরিশেষে জনসাধারণকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইতেছে যে পূর্ব্বে বিজ্ঞান-দর্পণের মূল্য তিন টাকা ছিল কিন্তু এক্ষণে সাধারণের সুবিধার জন্য ইহার আকার

বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মূল্য বৃদ্ধি না করিয়া বরং হ্রাস অর্থাৎ ২।৹টাকা করা হইল। আ
আরও আশা করি গ্রাহকগণের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে ইহার মূল্য আরও কমান হই
বিজ্ঞান-দর্পণ সংক্রান্ত যাবতীয় পত্রাদি ও মনিঅর্ডর প্রভৃতি নিম্নলিখিত ঠি
নায় আমার নামে পাঠাইতে হইবে।

কলিকাতা যোড়াসাঁকো
৫ নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সাধু।
প্রকাশক।

বিজ্ঞান-দর্পণ সম্বন্ধে কতিপয় সম্পাদকগণের অভিপ্রায়।

'The Vijyan Durpun" or the Scientific Mirror is a welcome a
tion to our Vernacular Periodical Press. The first two numbers
before us which are creditable to the conductors of the journal.

Hindoo Patriot. 10th July 1

We have received four numbers of a Bengali monthly period
of the usual size entitled "Bignyan Durpun" The title is no misno
the papers being all scientific. Some of the papers are evide
compiled with great care, and may interest the Bengali reader.
The 'Bignyan Durpun" as a professedly scientific periodica
Bengali, is about the first of its kind.
Anyhow every educated Bengali ought to watch the progress
such literature with interest. *"Reis & Rayyet," 4th Nov. 18*

The Journal is conducted with ability and deserves encouragem
from the public. Brahmo public Opinion. 14. 9.

Article of Scientific interest predominate in this journal.

Calcutta Gazette.

"বিজ্ঞান-দর্পণে অনেক সার প্রবন্ধ সুলিখিত হইতেছে।"

এডুকেশন গেজেট, ২১ শে আশ্বিন

ইহা সাহিত্য জগতের যে একটী অভাব পূরণ করিবার চেষ্টা করিতেছে, তদ্বি
সন্দেহ নাই। বিজ্ঞান-দর্পণের উন্নতি ও দীর্ঘায়ু হইলে আমরা সুখী হইব।"

নববিভাকর। ২৬ অগ্রহায়ণ

বিজ্ঞান-দর্পণের ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে, তবে প্রবন্ধগুলির আরও কিছু স
ধানতা হইলে ভাল হয়। বঙ্গবাসী ২ রা বৈশাখ ১২৯০।

এতদ্ভিন্ন প্রায় সকল সাময়িকপত্র ইহার ভূয়সী প্রশংসা ও ইহার স্থায়
কামনা করিয়াছে। যথা আচার্য্য, মেদিনী, সুলভ সমাচার, প্রভাতী, কল
চারুবার্ত্তা, আনন্দবাজার, প্রভাকর, আদরিণী, হিন্দুরঞ্জিকা, গ্রামবার্ত্তা, ভারতদ
আত্মীয়সুহৃদ, ভারতমিহির, সাহস, উৎকলদীপিকা, উৎকলদর্পণ, বিহার ব
ভারতমিত্র ইত্যাদি। বাহুল্য হেতু সকলের মন্তব্য উদ্ধৃত হইল না।